
অভীক দত্ত
উপন্যাস সমগ্র

অভীক দত্ত

উপন্যাস সমগ্র

১

বুক ফার্ম

Uponash Samagra Vol 1
by
Abhik Dutta

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২০

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ সরকার

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫৫১০১১৬৪৩/১৮-৩১০৫৮-০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

ভূমিকা

লেখা শুরু করেছিলাম কবে? প্রায় পনেরো বছর হতে চলল।

সেমিস্টারগুলোর সময় যখন মাথায় চাপ পড়ত, স্ট্রেস রিলিজের জন্য হয়তো এক দেড় পাতা লিখে রাখতাম। গল্পগুলো শেষ হত না কোনোটাই। ভেবেছি, শেষ করব। হয়ে ওঠেনি। থার্ড ইয়ারের আগে যেমন ভাবিইনি। কোনও দিন, আমিও লিখব।

লেখা শুরু হয়েছিল অশোকনগরের এক কাগজের সম্পাদকের জোরাজুরিতে। নীলাদ্রি ভৌমিক তার নাম। আমি নীলাদ্রিমামা ডাকি। কেন জোর দিতেন জানি না। মূলত তাঁর কথাতেই লেখালেখির শুরু। লিটল ম্যাগ বেরোবে। লিখলাম একটা গল্প । উৎসাহ দিলেন বেশ কয়েকজন। বললেন ছোটোগল্পের চরিত্রেরা আমার লেখার মধ্যে প্রতীয়মান হচ্ছে।

উৎসাহ পেয়েই শুরু হল। এল আদরের নৌকা। কলেজ লাইফের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আদরের নৌকা লিটল ম্যাগ চলত। প্রথম সংখ্যাতে তো বেশিরভাগই আমার গল্প। বন্ধুদের নামে। কে আনবে অত লেখা?

কলেজ পাস আউটের বছর বেরোল প্রথম গল্পের বই। নিজেই বের করলাম। সারাদিন প্রেসে বসে আছি। প্রুফ জিনিসটা কী, ম্যাগ করার আগে বুঝতামই না। পরে দেখলাম বইয়ের আসল জিনিস ওই প্রুফ। কত কত বানান ভুল যে হয়ে থাকে, বোঝা যায় না। এই ঠিক করলাম, আর-একবার প্রুফ দেখার সময় দেখা গেল আরও ভুল বেরোল।

বিরতি এল। ২০০৮-এর পর ছ-বছর পরে দ্বিতীয় বই। লেখায় ফিরতে শুরু করলাম। ২০১৬ থেকে শ্রীচরণেষু পেজে “অর্জুন” ছদ্মনামে জনপ্রিয়তা এল। বইমেলায় বইয়ের চাহিদাও এল।
পাঠক ভালোবাসলেন। ভালোবাসছেন।

আমার লেখালেখিও যেমন এই ভালোবাসা থেকেই আসে। নইলে অফিস করে এসে কি আর লেখার শক্তি থাকে? ওই ভালোবাসাটা আছে বলেই হয়তো। লড়াইটা করতে পারছি।

লিখতে পারছি।

আমার প্রথম উপন্যাস সমগ্র। বাড়ির বইয়ের আলমারিতে ছোটোবেলায় আমার প্রিয় লেখকদের উপন্যাস সমগ্র দেখেছি। আমার উপন্যাস সমগ্র প্রকাশ পাচ্ছে।

যেন কোনও স্বপ্ন দেখছি।

আশা করি পাঠক পছন্দ করবেন আমার লেখা।

ভালো থাকুন।

এই অভিশপ্ত বছর কোনও জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সজীব হয়ে উঠুক, এই আশাটুকু করি।

ইতি

অভীক দত্ত

সূচিপত্র

নীল কাগজের ফুল

পর্ব ১

১

চাঁদ উঠেছে।
এরকম চাঁদ অনেক দিন পর উঠল। সুন্দর লাগছে দেখতে।
জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে ঘরের ভিতর।
জিনিয়ার ঘরের জানলাটা বড়ো। চাঁদ দেখার জন্য আদর্শ। সে বিভোর হয়ে চাঁদ দেখছে। দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।
সৌপ্তিক চলে যাওয়ার এক মাস হয়ে গেল। তবু সে কিছুতেই সৌপ্তিককে ভুলতে পারছে না। কিছু কিছু জিনিস থাকে, যা সব মনে করিয়ে দেয়।
এই যেমন চাঁদ।
চাঁদ উঠলেই সৌপ্তিক মেসেজ করত, "চাঁদ দেখছ?"
জিনিয়া হয়তো তখন কোনও কাজ করছে। বিরক্ত হয়ে লিখত, "আমার কি অন্য কোনও কাজ নেই?"
সৌপ্তিক লিখত, "প্লিজ, একবার দেখে তারপর নাহয় কাজ করো।"
জিনিয়ার মনটা তখন খচখচ করতে শুরু করত। চাঁদ না দেখা অবধি শান্তি মিলত না।
এখন চাঁদই দেখছে সে। অথচ সৌপ্তিক নেই।
ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা পাওয়ার পরেও বিশ্বাস হচ্ছিল না জিনিয়ার। বারবার সৌপ্তিকের মোবাইলে ফোন করে যাচ্ছিল। ফোনটা নট রিচেবল বলে যাচ্ছিল।
এখনও সৌপ্তিকের ফেসবুক প্রোফাইলটা আছে। থাকবে আজীবন।
জিনিয়ার ফার্স্ট সিন করা ছিল সৌপ্তিকের সব আপডেট। এখন কোনও আপডেট আসে না। কিচ্ছু আসে না। সব শেষ হয়ে গেছে।
মালতী এসে ঘরের আলো জ্বালালেন। ক্লান্ত মুখে তার খাটে বসে বললেন, "মশা মারার কয়েলটা তো দিবি। মশার কামড় খেতে ভাল্লাগে?"
জিনিয়া উত্তর দিল না।
মালতী একটু থমকে বললেন, "পৌলমী ফোন করেছিল। বলল একজন ভালো মনোবিদের সন্ধান পেয়েছে। যাবি?"
জিনিয়া বলল, "আমার মনোবিদের দরকার নেই। কিছুদিন সময় দরকার।"
মালতী বললেন, "সময় নিবি তো। অসুবিধা নেই। রুনু যে ছেলেটাকে আনবে বলছে, ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নে কাল।"
জিনিয়া মার দিকে তাকিয়ে বলল, "পারো কী করে মা? ক্লান্তি লাগে না? কষ্ট হয় না একটুও আমার জন্য? সৌপ্তিককে তো তুমিও চিনতে! চিনতে না?"
মালতী থতোমতো খেয়ে বললেন, "তোর কথা ভেবেই বলি মা। গোটা জীবনটা একা কাটাবি তা তো হয় না। তা ছাড়া বাবার রিটায়ারমেন্ট..."

জিনিয়া বলল, "ব্রহ্মাস্ত্র বারবার ব্যবহার করতে নেই, জানো না? ঠিক সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মনে রাখবে তোমার ব্রহ্মাস্ত্র বাবার রিটায়ারমেন্ট। এটা বারবার বললে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।"
মালতী দুঃখী মুখে বসে থেকে বললেন, "আমার আর ভালো লাগে না। আমি আর পারছি না বিশ্বাস কর। একটু শান্তি কি আমি পাব না?"
জিনিয়া বলল, "পাবে। আমি মরলে শান্তি পাবে। খুশি?"
মালতী কেঁদে ফেললেন, "কেন বারবার আমাকেই বলিস বল তো এসব? আমি কী করব? তুই ভালো থাকিস, আমি চাইতে পারি না?"
জিনিয়া বলল, "অবশ্যই চাইতে পারো। একশোবার চাইতে পারো। তোমার চাওয়ার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলছি না। আমার শুধু একটাই কথা। আমার সময় চাই। দয়া করে সেটা দাও। এখনই সং সেজে ছেলেপক্ষের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে বেশ্যা মনে হয়। বেশ্যা মানে খারাপ অর্থে বলছি না কিন্তু। ওই যে রাস্তায় লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, নিজেকে সেরকম লাগবে সেটা বলছি।"
মালতী চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন, "আর কত আঘাত দিবি আমাকে দেখব। কিছু বলব না তোকে। দেখে যাব।"
জিনিয়া বলল, "আহত হওয়ার মতো কথা বোলো না। আমাকে একটু শান্তি দাও। ঠিক হয়ে যাবে। এরকমভাবে বারবার খোঁচালে সব আবার অগোছালো হয়ে যাবে। বোঝো দয়া করে।"
মালতী উঠলেন, "যাই। রান্নাবান্না দেখি। মশার কামড় খাস না।"
জিনিয়া কিছু বলল না।
মালতী বেরিয়ে গেলেন। জিনিয়ার আবার কান্না পেল। বালিশটায় মুখ গুঁজল। সৌপ্তিক সারাদিন ধরে তাকে একগাদা বস্তাপচা জোকস পাঠাত। মোবাইল খুলে সে জোকগুলো দেখতে লাগল। ভয়েস মেসেজগুলো একের পর এক শুনতে শুরু করল।
বালিশ ভিজে গেল চোখের জলে।

২

আদিদেব বাগানে জল দিচ্ছিলেন। রোহিণী বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন।
জিনিয়া গেট খুলে ঢুকল।
আদিদেব জিনিয়াকে দেখে ম্লান হাসলেন। জিনিয়া প্রত্যুত্তরে হাসল।
রোহিণী জিনিয়াকে দেখে বললেন, "আজ অফিস গেলে না?"
জিনিয়া রোহিণীর পাশে বসে বলল, "ছুটি নিয়েছি কাকিমা। কেমন আছ এখন?"
রোহিণী বললেন, "কেমন থাকা যায়?"
জিনিয়া চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। আদিদেবের গাছে জল দেওয়া হয়ে গেছিল।
জল বন্ধ করে বারান্দায় এসে বসলেন।
জিনিয়া বলল, "রান্নাবান্না কিছু করেছ কাকিমা?"
রোহিণী বললেন, "করব। দেখি কী করা যায়।"
আদিদেব বললেন, "তোমার বাবা মা কেমন আছেন জিনিয়া?"
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, "ভালো।"
আদিদেব বললেন, "তোমার ট্রমা? কেটেছে?"
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, "জানি না।"
রোহিণী আদিদেবকে বললেন, "এসব কথা কেন বলছ ওকে?"

আদিদেব বললেন, "আমরা যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, জিনিয়ারও একই ফিলিংস হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে ক্ষতি নেই তো কোনও।"
জিনিয়া বলল, "না না, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করছি। শুধু মাঝে মাঝে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বড্ড।"
আদিদেব বললেন, "সবখানেই এক ব্যাপার। সকালটা যাও বা কেটে যায়, রাত কাটতে চায় না।"
জিনিয়া বলল, "আমি একবার সৌপ্তিকের ঘরে যাই?"
আদিদেব ঘাড় নাড়লেন, "যাও।"
জিনিয়া উঠে সৌপ্তিকের ঘরে গেল।
সৌপ্তিক চলে যাওয়ার পর থেকে এ ঘরে এসে বসাটা কেমন নেশার মতো হয়ে যাচ্ছে তার। আলনায় সৌপ্তিকের জামা, চাদরে যেন এখনও সৌপ্তিকের গন্ধ লেগে আছে।
খাটে মাথা রেখে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল জিনিয়া।
সৌপ্তিকের সব কিছু আছে। অথচ সে-ই নেই।
মাথা কাজ করে না মাঝে মাঝে। সব এলোমেলো হয়ে যায়। পড়ার টেবিল। কম্পিউটার। ড্রয়ার।
রোহিণী এসে বললেন, "চা করছি। খাবে তো?"
জিনিয়া বলল, "খাব। আচ্ছা ওর ছোটোবেলার অ্যালবামটা দেবে আর-একবার?"
রোহিণী এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা। নিয়ে আসছি।"
অ্যালবামটা হাতে নিয়ে ভারী যত্ন করে দেখতে শুরু করল জিনিয়া।
প্রথমবার যেদিন অ্যালবামটা দেখিয়েছিল সৌপ্তিক, সেদিন ওর জন্মদিন ছিল।
প্রতিটা ছবি দেখে কত হাসিঠাট্টা করেছিল দুজনে।
একটা একটা করে ছবি খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল আবার। কত ছবি। মুখেভাত। প্রথম জন্মদিন। আত্মীয়স্বজনের মাঝে ছবি। তেল চপচপে মাথায় তোলা ছবি একটার পর একটা ছবি দেখে যেতে লাগল জিনিয়া। প্রতিটা ছবি তার মাথায় গেঁথে গেছে এ কদিনে। তবু বারবার দেখতে ভালো লাগে। আবার দেখতে ভালো লাগে। ভালো লাগাও ঠিক না, এ যেন সময় কাটানোর নতুন কোনও উপায়। আজকাল তো সময় কাটতেই চায় না। সবসময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সৌপ্তিকের কথাই মনে পড়ে। এরকম সময় ও থাকলে কী হত, কী বলত? বিকেল হলে কীভাবে বলত, "উফ, কতদিন রোল খাই না। চল চল, ডায়েটিং গুলি মার।"
অথচ দেখা যাবে আগের দিনই রোল খেয়েছে। পুরো পাগল ছিল ছেলেটা।
রোহিণী চা নিয়ে ঢুকলেন। জিনিয়া বলল, "দার্জিলিংয়ের ছবিগুলো দেখছি না।"
রোহিণী খাটের ওপর চা রেখে বসলেন, বললেন, "ও হ্যাঁ। সেগুলোও আছে তো। ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি।"
জিনিয়ার কী মনে হতে বলল, "থাক কাকিমা। আমি এরকম আসি, তোমার খারাপ লাগে, না?"
রোহিণী বললেন, "নাহ। ভালো লাগে। সতুকে এত ভালোবাসো তুমি, ভাবলে তোমার জন্যও কষ্ট হয়।"
জিনিয়া বলল, "চেষ্টা করছি, একদিন হয়তো আসা বন্ধ হয়ে যাবে।"
রোহিণী জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "নিজের খেয়াল রেখো। ভালো করে খাওয়াদাওয়া কোরো। আমি ওর মা হয়েও বলছি, এত বেশি করে ওর মধ্যে জড়িয়ে পোড়ো না, কষ্ট ছাড়া কিছুই পাবে না আর।"
জিনিয়া মাথা নাড়ল, "জানি।"
রোহিণী বললেন, "তোমায় একটা কথা বলা হয়নি। আজ সমু আসছে বিকেলে। ট্রেনে আছে এখন।"
জিনিয়া বলল, "ও।"
রোহিণী বললেন, "ছুটি পেল কোনওমতে। খুব জোর করছে আমাদের দেরাদুন নিয়ে যাবে বলে। বড়ো ছেলের দায়িত্ব পালন করতে চাইছে আর কি। ওর বাবা শুনবে না, জানি। দেখি। ছেলে জোরাজুরি করে যদি। আমার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠছে এ বাড়ি।"

জিনিয়া বলল, "চলে যাবে তোমরা? এ বাড়ি কী হবে?"
রোহিণী বললেন, "বিক্রি হয়ে যাবে হয়তো।"
জিনিয়া দিশেহারার মতো বসে রইল।

৩

হাওড়ায় নেমে সৌম্য দরদাম না করেই ট্যাক্সি নিল। গরম লাগছে। প্রি-পেড ট্যাক্সি না নিলে অনেকগুলো টাকা নিয়ে নেয়, ট্রেন থেকে নেমে আর লাইনে ইচ্ছা করছিল না।
শহরে পৌঁছে বরাবরই ভালো লাগে। হাওড়া ব্রিজ, গঙ্গা অনেক কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে। এবার দিচ্ছিল না। চুপ করে বসে থাকল সে।
আদিদেব অপেক্ষা করছিলেন। ট্যাক্সি থামতে এগিয়ে গেলেন। সৌম্য বলল, "মা কোথায়?"
আদিদেব বললেন, "জিনিয়া এসেছে। ওর সঙ্গে কথা বলছে।"
সৌম্য বলল, "কখন এসেছে?"
আদিদেব বললেন, "সকালে।"
সৌম্য নাক কুঁচকাল, "এখনও যায়নি? কী সমস্যা ওর?"
আদিদেব সৌম্যর কাঁধে হাত রাখলেন, "ওকে কিছু বলিস না। মেন্টাল শকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।"
সৌম্য বলল, "সে ঠিক আছে, কিন্তু মেন্টাল শক থেকে মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে।"
আদিদেব বললেন, "তোকে কিছু বলতে হবে না। তুই চেঞ্জ কর।"
সৌম্য ব্যাগটা বারান্দায় নামিয়ে সৌপ্তিকের ঘরে উঁকি মারল। রোহিণী বললেন, "এলি?"
সৌম্য বলল, "হ্যাঁ।"
রোহিণী বললেন, "তুই ফ্রেশ হ, আমি কিছু বানাচ্ছি।"
সৌম্য চলে যাচ্ছিল, জিনিয়া ডাকল, "শুনুন।"
সৌম্য অবাক হল। জিনিয়ার সঙ্গে তার আগে কোনও দিন কথা হয়নি। ডাক শুনে সে দাঁড়াল, "হ্যাঁ।"
জিনিয়া বলল, "বাড়িটা প্লিজ বিক্রি করবেন না, সৌপ্তিকের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।"
রোহিণী অপ্রস্তুত হলেন। সৌম্যর মাথা গরম হয়ে গেল হঠাৎ করে। সে কোনও কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল।
মার ওপর রাগও হচ্ছিল। মার কাজই হল উটকো ঝামেলাগুলো প্রশ্রয় দেওয়া। ফোনে জিনিয়ার কাজকর্ম শুনেই বুঝেছিল সতু চলে যাওয়ার পর মেয়েটা সাইকো হয়ে গেছে। এখন যদি তাদের পরিবারের মধ্যে ঢুকে তার কাজকর্মও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তাহলে তো মহা সমস্যা!
হাত পা ধুয়ে, চেঞ্জ করে বিছানায় শুল সে। রোহিণী চা নিয়ে এসে বললেন, "চা নে। জিনিয়া চলে গেছে।"
সৌম্য চা নিয়ে বলল, "বসো।"
রোহিণী বসলেন। সৌম্য চেঁচিয়ে ডাকল, "বাবা।"
আদিদেব এলেন। সৌম্য বললেন, "মেয়েটা কি রোজ আসছে?"
আদিদেব চেয়ার টেনে বসে বললেন, "দু-এক দিন পর পর।"
রোহিণী বললেন, "ওরকম করে বলিস না বাবা। সতুকে বড়ো ভালোবাসত মেয়েটা।"
সৌম্য বলল, "বুঝেছি মা। কিন্তু তোমাদেরও তো ভালো থাকতে দিতে হবে। সর্বক্ষণ এসে যদি এই মেয়েটা পাগলামি করে যায়, তাহলে তোমরাও ডিপ্রেশনে চলে যাবে। সেটা বুঝতে পারছ কি? এখন বলছে বাড়ি বেচবেন না। আশ্চর্য! আমি কি এখানে বাড়ি বেচতে এসেছি? আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। ওকে কে বলেছে বাড়ি বেচব?"
রোহিণী বললেন, "আমরা চলে গেলে বাড়ি রেখেই বা কী করবি?"

সৌম্য বাবার দিকে তাকাল, "তুমিও কি তাই ভাবো?"
আদিদেব বললেন, "আমি কিছু ভাবি না। ইন ফ্যাক্ট আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছাও করছে না আর। তুই কী করবি কর। ভালো লাগে না আর কিছু।"
সৌম্য বলল, "আমি কী করব মানে? আমাদের তো কথা হয়ে গেছে। পরশু আমরা চলে যাব। তোমাদের গোছগাছ হয়েছে? মা?"
রোহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "হচ্ছে।"
সৌম্য বলল, "হয়নি তার মানে। কী চাইছ তোমরা? আমি ছুটি পাই না। কোনও ভাবে ম্যানেজ করে এলাম। ঘর ভাড়া করলাম। এদিকে এখনও তোমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে যাচ্ছ। বলা যাবে, কী চাইছ?"
আদিদেব বললেন, "যাব তো তোর সঙ্গে। চিন্তা করিস না। রেস্ট নে। এই তুমি চলো। সমু রেস্ট নিক।"
আদিদেব উঠলেন। রোহিণীও। সৌম্য বলল, "কী করল মেয়েটা সারাদিন?"
রোহিণী বললেন, "তোদের অ্যালবামগুলো দেখল। সতুর জামাকাপড়গুলো ভাঁজ করে দিল।"
সৌম্য বলল, "হয়ে গেছে। এ মেয়ে গেছে।"
আদিদেব বললেন, "মেন্টাল স্ট্রাকচার সবার সমান হয় না সমু। সবাই জন্ম থেকে কঠিন মন নিয়ে জন্মায় না। এজন্য কাউকে সাইকো ভেবে নেওয়াটা ঠিক না। মেয়েটাকে সময় দিতে হবে। দেখাই যাক না। আর তুই যদি বাড়ি এখনই না বেচিস, তাহলে জিনিয়াকেই চাবি দিয়ে যাওয়া যায়। ও মাঝে মাঝে এসে দেখে রাখবে।"
সৌম্য বলল, "যা পারো কর। কী করছ, নিজেরাই বুঝতে পারছ না। ধুস।"
সৌম্য রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৪

মালতী সিরিয়াল দেখছিলেন।
অগ্নি অফিস থেকে ফিরলেন। মালতী বললেন, "কফি করে দি?"
অগ্নি বললেন, "হুঁ। তিন্নি কোথায়?"
মালতী বললেন, "ফেরেনি এখনও।"
অগ্নি বললেন, "অফিস যায়নি?"
মালতী বললেন, "না। ওই বাড়ি যাবে বলছিল।"
অগ্নি গম্ভীর মুখে বসে বললেন, "তুমি কিছু বলেছ?"
মালতী বললেন, "আমি আর কত বলব? তুমিই কথা বলো।"
অগ্নি বললেন, "আমাদের কথাতে কিছু নাও হতে পারে। পূরবীকে ডাকি। পিসির কথায় যদি কিছু হয়।"
মালতী বললেন, "বিয়ের জন্য যে গয়নাগুলো কেনা হয়েছিল, সেগুলো আলমারিতে রেখে দিয়েছে। মাঝরাতে বেনারসি, গয়না, সব পরে বসে থাকছে। আমার আর ভাল্লাগছে না।"
কেঁদে ফেললেন মালতী।
অগ্নি বললেন, "ঠিক আছে। ওকে কিছুদিন সময় দাও।"
মালতী বললেন, "আর কতদিন? আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এবার খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে।"
অগ্নি বললেন, "ঠিক আছে, তুমি কফি করো। আমি পূরবীকে ফোন করি।"
মালতী রান্নাঘরে গেলেন। অগ্নি বোনকে ফোন করতে গিয়ে থমকে গেলেন। সিরিয়াল চেঞ্জ করে খবরে দিলেন। খবরের পরিবর্তে একগাদা বিজ্ঞাপন দেখিয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক অবস্থায় অগ্নি চ্যানেল পালটাতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিট পর তামিল চ্যানেল এল। কী মনে হতে সেটাই বসে দেখতে থাকলেন। মালতী কফি নিয়ে এসে বললেন, "এসব কী দেখছ?"
অগ্নি চ্যানেল চেঞ্জ করে বললেন, "দেখছিলাম না। ভাবছিলাম।"

মালতী বললেন, “কী?”
অগ্নি বললেন, “তিন্নিকে নিয়ে কোথাও একটা থেকে ঘুরে আসা যেতে পারে। কলকাতা থেকে দূরে থাকলে মনটা পালটাতে পারে।”
মালতী বললেন, “তুমি ছুটি পাবে?”
অগ্নি বললেন, “পেতে হবে। অনেক দিন তো কোথাও যাওয়াও হয় না। তিন্নি ছুটি পায় নাকি সেটাই দেখার।”
মালতী বললেন, “জানি না পাবে কি না, উলটোপালটা ছুটি নিয়ে নিয়ে তো ছুটি আর কিছু রেখেছে কি না কে জানে। দ্যাখো। আসুক।”
মালতীর কথা শেষ হতে না হতেই কলিং বেল বেজে উঠল।
মালতী দরজা খুললেন। জিনিয়া ঘরে ঢুকল।
মালতীর আজকাল জিনিয়াকে দেখলে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সবসময়ের হাসিখুশি মেয়েটার মুখ থেকে কেউ যেন হাসিটা ব্লটিং পেপার দিয়ে মুছে দিয়েছে।
অগ্নি বললেন, “বোস মা। শোন না, আমরা ভাবছিলাম কোথাও একটা ঘুরে আসি কদিনের জন্য। ছুটি পাবি?”
জিনিয়া সোফায় বসে পড়ে বলল, “জানি না। কথা বলে দেখব।”
অগ্নি বললেন, “দেখ। ফোন কর।”
জিনিয়া বলল, “অফিস যাই কাল। দেখছি।”
অগ্নি বললেন, “অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয় না। দেখ যদি ছুটি ম্যানেজ করতে পারিস। আমিও আর অফিস করে করে পেরে উঠছি না বুঝলি? কোথায় যাবি? পাহাড় না জঙ্গল?”
জিনিয়া বলল, “যেখানে খুশি। তোমার যেখানে ইচ্ছা করছে চলো। আমার কোনও অসুবিধা নেই।”
অগ্নি বললেন, “আচ্ছা শোন না, তোর গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে দিস কালকে মনে করে। লকারে রেখে আসতে হবে। বাড়িতে থাকলে প্রচুর রিস্ক তো, তাই না?”
জিনিয়া মাথা নাড়ল শুধু।
অগ্নি বললেন, “কোথায় গেছিলি মা?”
জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকদের বাড়ি। ওখানেই ছিলাম। ওর দাদা এসেছে।”
অগ্নি মালতীর দিকে এক পলক তাকিয়ে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, “সেই যে ওদের নিয়ে যাবে বলছিল, সেসব কিছু?”
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।
অগ্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “কী-ই বা করবেন। ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। ওর দাদা তো ওখানে কলেজে পড়ায়, তাই না?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ।”
অগ্নি বললেন, “তুই অনেকদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাস না কিন্তু মা। আজকাল আর ইচ্ছে করে না যেতে?”
জিনিয়া বলল, “যাব। আমি ঘরে যাই। তোমরা টিভি দ্যাখো।”
যন্ত্রের মতো উঠে জিনিয়া তার ঘরে চলে গেল।
মালতী কাতর গলায় অগ্নিকে বললেন, “দেখলে? কেমন হয়ে গেছে? ভালো লাগে বলো তো?”
অগ্নি টিভির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন।
কয়েক মিনিট পরে জিনিয়া হঠাৎ এসে বলল, “আচ্ছা বাবা, সৌপ্তিকদের বাড়িটা বিক্রি হবে। আমরা কিনে নিতে পারি না?”
মালতী আর অগ্নি দুজনেই চমকে জিনিয়ার দিকে তাকালেন।

৫

রাত বারোটা। জিনিয়া সব গয়না পরে আয়নার সামনে বসে আছে। তার গায়ে কোনও কাপড় নেই। সে ফোনের ক্যামেরা দিয়ে নিজের কয়েকটা ছবি তুলল।

অন্য সময় হলে ছবিগুলো সৌপ্তিককে পাঠাত। এবার সব ছবি পরপর দেখে ডিলিট করে দিল। সোয়াইপ করে করে তার আর সৌপ্তিকের ফটোগুলো এক এক করে দেখতে শুরু করল।

পাড়ার একটা বাচ্চা কুকুরকে একটা ট্রাক মেরে দিয়ে গেছে। তার মা ক্রমাগত কেঁদে চলেছে।

জিনিয়া গয়নাগুলো খুলে ফেলে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখল। রাতের পোশাক পরে খাটে শুল। ব্যাংক ব্যালেন্স চেক করল নিজের। লাখ খানেকটাকা পড়ে আছে। সৌপ্তিকদের বাড়ির দাম কত হবে? ধারণা করতে পারল না। বিভিন্ন ব্যাংকের হোম লোন স্কিমগুলো পড়তে শুরু করল।

অনেকক্ষণ সেসব দেখতে দেখতে রাত দুটো বাজল।

খিদে পেল হঠাৎ করে। উঠে দরজা খুলে ডাইনিং রুমে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা পাউরুটি প্যাকেট থেকে বের করে খেল।

কী মনে হতে টিভি চালিয়ে কম ভলিউমে দেখতে শুরু করল।

কখন ঘুম এসেছে বুঝতে পারেনি, ঘুম ভাঙতে দেখল সোফাতেই শুয়ে পড়েছিল সে।

অগ্নি কাগজ পড়ছেন চেয়ারে বসে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, “ডাকবে তো!”

অগ্নি বললেন, “ঠিক আছে। ডাকার কী আছে? মশা কামড়ায়নি তো?”

জিনিয়া চুল সরাতে সরাতে বলল, “না। আচ্ছা বাবা, সৌপ্তিকদের বাড়ির দাম কেমন হতে পারে? আমি যদি হোম লোন নিই?”

অগ্নি কয়েক সেকেন্ড জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, “দাম কেমন হতে পারে, আমি তো বলতে পারব না। ওঁরা কত দামে বেচবেন, সেটা ওঁরাই জানেন।”

জিনিয়া ঠোঁট কামড়াল, “রাইট। তাহলে ওঁদেরই ফোন করি?”

অগ্নি বললেন, “সে কর। কিন্তু আমাকে একটা কথা বল মা, এ বাড়ি কি তোর ভালো লাগে না? ওদের বাড়িটা কিনতে হবে কেন?”

জিনিয়া থমকে গেল। কী বলবে বুঝতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ এ কথা, সে কথা ভেবে বলল, “সৌপ্তিকের স্মৃতি তো। বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা? ওর জন্ম, বেড়ে ওঠা, শেষ দিন যখন ঘর থেকে বেরোল, সব... সব স্মৃতি ওখানে। বুঝতে পারছ না বাবা?” জিনিয়ার গলাটা ভীষণ কাতর শোনাল।

অগ্নি কাগজটা রেখে বললেন, “বিক্রমপুরে আমাদের বাড়ি ছিল। দেশভাগের সময় তোর ঠাকুরদাকে সব ফেলে চলে আসতে হয়েছিল। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, সব ওখানে। কিন্তু পেরেছিলেন কি সেটা রাখতে? সব কিছুকে তো ধরে রাখা সম্ভব না। যে ছেলেটাই আর রইল না, তার বাড়িটা কিনে কী করবি বল তো?”

জিনিয়া চোয়াল শক্ত করে বাবার কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অগ্নি জিনিয়ার যাওয়াটা দেখলেন শুধু চুপ করে। পিছু ডাকলেন না।

কিছুক্ষণ পর জিনিয়া তৈরি হয়ে গয়নার বাক্সগুলো অগ্নির সামনের টেবিলে রেখে বলল, “গয়নার বাক্সগুলো নিয়ে নিয়ো বাবা। আমি বেরোচ্ছি।”

অগ্নি অবাক হয়ে বললেন, “কোথায় যাচ্ছিস?”

জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকদের বাড়ি।”

মালতী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, “তুই আজকেও অফিস যাবি না? এরকম করে চাকরিটা রাখতে পারবি?”

জিনিয়া বলল, "যাব, অফিস যাব। ওর দাদার সঙ্গে কথা বলে ওখান থেকে অফিস রওনা দেব।"
মালতী বললেন, "কী কথা বলবি? বাড়ি কিনবি ওদের? তুই এসব কী শুরু করলি বল তো?"
জিনিয়া বলল, "কিছু শুরু করিনি। যদি কেনা সম্ভব হয়, তাহলে ওদের বাড়ি আমিই কিনে নেব।"
মালতী বললেন, "খেয়ে যা কিছু। দাঁড়া, একটু বস, ডালিয়া করেছি। এক চামচ খেয়ে যা। খালি পেটে যাস না।"
জিনিয়া সোফায় বসল। উত্তেজনায় তার পা কাঁপছিল।
অগ্নি এবার সত্যিই মেয়েকে দেখে চিন্তিত হলেন। অসহায় বোধ করছিলেন বড্ড। সব কিছু কি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে এবারে?

৬

ক্লাসরুমের বাইরের গাছে একটা কাঠঠোকরা বসে আছে। উদ্দালক মন দিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল কাঠঠোকরা প্রকৃতিগতভাবে যতটাই কাঠখোট্টা হোক, দেখতে বেশ সুন্দর। চঞ্চুর গঠনটাও বেশ মজার। এটা যদি হেডস্যারের টাকে ঠুকরাতে শুরু করত, তাহলে টাকটার দশা খুব একটা ভালো হত না।
উদ্দালক হেডস্যারের টাকটা কল্পনা করার চেষ্টা করছিল।
সেভেন বি ভীষণ ঝামেলার ক্লাস। কোনও ছেলে কারও পিঠে চিমটি কেটে দিচ্ছে, কেউ বা কারও পিছনে কম্পাস গুঁজে দিচ্ছে, এই ক্লাস সামলানো সবার পক্ষে সম্ভব না। এদিকে আজকাল সরকারি নির্দেশ আছে, শিশুমনে কোনওরকম আঘাত দেওয়া যাবে না। গায়ে হাত তোলার তো প্রশ্নই নেই।
উদ্দালক মারতে চায়ও না। এদের মেরে লাভ নেই। এরা কী হবে এখন থেকেই ঠিক করে নিয়েছে। লাস্ট বেঞ্চের পল্টু যেমন এখন থেকেই বাবার দোকানে বসে। তার পাড়াতেই থাকে। এটা সেটা লাগলে সে-ই দিয়ে যায়। শান্ত ছেলে এমনিতে। ক্লাসে এলে বেয়াদপি শুরু করে।
মাথাটাও একটু ডাল। পল্টু কী করে সেভেনে উঠল, লাখ টাকার প্রশ্ন। পল্টুর বাবা একবার এসে বললেন পড়ানোর জন্য। উদ্দালক না করেনি।
পল্টু মাঝে মাঝে বইখাতা নিয়ে আসে। কিছুটা পড়ার পরে পল্টু অদ্ভুত সব প্রশ্ন শুরু করে। তারা যদি মুরগির ব্যবসা করতে তাহলে কি মুদির দোকানের থেকে বেশি লাভ হত টাইপ প্রশ্ন। সেই সময় উদ্দালকের মুরগির মাংস খেতে ইচ্ছা করে। পল্টু টাকা নিয়ে মুরগির মাংস আনতে ছোটে। দুজনে মিলে রান্না করে। মাস্টার ছাত্র মিলে এক কিলো মাংস সাবাড় করে। পল্টু ভালো খেতে পারে। একাই বেশিরভাগটা টানে। তবে উদ্দালকের রান্না করতে ভালো লাগে। বিভিন্ন স্টাইলে মাংস রাঁধে। পল্টু সেগুলোর স্বাদ পরীক্ষক। খেয়ে গুরুগম্ভীর মন্তব্য করে।
ক্লাসে গোলমাল ভালোই হচ্ছিল। উদ্দালকের সেদিকে মন ছিল না। হেডস্যার তপনবাবু স্কুল ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। ক্লাসের দরজায় এসে জোরে চিৎকার করলেন, "সাইলেন্ট।"
তপনবাবুর সাইলেন্ট শুনে উদ্দালকও নড়ে বসল। স্কুলের মতো সেও চেয়ার থেকে উঠে বলে বসল, "ইয়েস স্যার।"
তপনবাবু ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কি ক্লাস হচ্ছে না চিড়িয়াখানা? হোয়াট ইজ দিস? একটা শব্দ যদি পাই তাহলে গোটা ক্লাসকে টিসি দিয়ে দেব। উদ্দালক, ক্লাসের পরে আমার ঘরে এসো।"
উদ্দালক ঘাড় নাড়ল, "ঠিক আছে স্যার।"
তপনবাবু চলে যেতেই ক্লাসের ছেলেগুলো আবার লাফঝাঁপ দিতে শুরু করল।
উদ্দালক বলল, "টিসি দিলে বুঝবি তোরা।"
শম্ভু ক্লাস পালিয়ে বাথরুমে বিড়ি খায়। তবে উদ্দালকের ক্লাস কখনও পালায় না। সে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, টিসি কী?"
উদ্দালক বলল, "খুব কঠিন একটা ব্যাপার। আর স্কুলে আসতে পারবি না।"

শম্ভু বলল, “সে তো ভালোই স্যার। স্কুলে আসতে ভালো লাগে না। আপনার ভালো লাগে?”
উদ্দালক চোখ নাক মুখ কুঁচকে বলল, “আমারও লাগে না। জঘন্য জায়গা। তার ওপর তোদের মুখগুলো দেখতে হবে ভাবলে আরও জঘন্য লাগে।”
ক্লাসে হাসির রোল উঠল।
শম্ভু বলল, “স্যার আপনি বিয়ে করবেন না?”
উদ্দালক চোখ পাকিয়ে তাকাল।
ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠল।
উদ্দালক বেরিয়ে হেডস্যারের ঘরে গেল। তপনবাবু গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, “এসব কী উদ্দালক? ক্লাস কন্ট্রোল করতে পারো না? রোজ রোজ সেভেন বি-তে ঝামেলা হয়?”
উদ্দালক দেখেছে এই সময় কথা বললেই ঝামেলা। সে হাসি হাসি মুখে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।
তপনবাবু বললেন, “এরকম হলে কিন্তু ভারী বিপদ উদ্দালক। এতগুলো বছর চাকরি করতে হবে তোমায়। এখন থেকেই যদি এরকম হও...”
উদ্দালক বলল, “স্যার, আমার মনে হয় না খুব বেশি বছর চাকরি করতে পারব।”
তপনবাবু বললেন, “কেন?”
উদ্দালক বলল, “ভোটের ডিউটিগুলো পড়লেই আমার মনে হয় এই বোধহয় শেষ। গতবার আমার বুথে বোম ফেলল। আপনার মনে হয় আমরা এত দিন বাঁচব?”
তপনবাবু বললেন, “তাহলে? তুমি ভোট করতে পারছ আর একটা সেভেন বি সামলাতে পারছ না?”
উদ্দালক বলল, “স্যার এই নেতাগুলো সেভেন বি-র ছেলেগুলোর থেকে ভালো। আমি শুধু ভাবি এই ছেলেগুলো যখন বড়ো হয়ে নেতা হবে তখন কী হবে।”
তপনবাবু মাথা চুলকালেন। তিনিও বোধ হয় দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েই ভেবে ফেলেছিলেন। পরক্ষণে সামলে বললেন, “আমি ওসব বুঝি না উদ্দালক। তোমাকে ক্লাস সামলাতে হবে। যেভাবেই হোক। বি এ ম্যান। ওইটুকু বাচ্চাদের তোমার পারসোনালিটি দেখাও। এখন একা আছ, এখনই পারসোনালিটি নেই। বিয়ে করলে কী হবে? তখন তো তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।”
উদ্দালক বলল, “চেষ্টা করছি স্যার।”
তপনবাবু বললেন, “ঠিক আছে যাও। যেটা বললাম মনে রেখো। বি এ ম্যান। বুঝলে? বি এ ম্যান। শো ইওর ম্যানফোর্স।”
বলেই তপনবাবু জিভ কাটলেন।

৭

জিনিয়ার প্রস্তাব শুনে আদিদেব আর রোহিণী দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।
আদিদেব বললেন, “তুমি ভেবে বলছ, যা বলছ?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ। আমি ভেবে নিয়েছি। তোমরা কি বাড়ি বেচবে?”
উৎসুক চোখে তাকাল জিনিয়া।
আদিদেব বললেন, “দ্যাখো মা, এ নিয়ে তো আমরা কিছুই ভাবিনি এখনও। পুরোটাই সৌম্য ঠিক করবে। ওর সঙ্গে কথা বলে তোমাকে জানাব নাহয়?”
জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। কোথায় উনি?”
আদিদেব ইতস্তত করলেন। জিনিয়ার প্রস্তাব শুনে সৌম্য জিনিয়াকে অপমান করে বসতে পারে। বললেন, “ও বেরিয়েছে। ফিরলে কথা বলে তোমাকে ফোন করি?”
জিনিয়া বলল, “অসুবিধা নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারি। আচ্ছা উনি ফোন নিয়ে বেরোননি? দ্যাখো না একটু ফোন করে যদি পাওয়া যায়।”

রোহিণী জিনিয়ার হাত ধরে বললেন, "মা, তোমাকে একটা কথা বলি?"
জিনিয়া বলল, "বলো।"
রোহিণী বললেন, "কথাটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, তবু বলি। তুমি সতুকে ভুলে যাও।"
জিনিয়া রোহিণীর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "তুমি চাইছ না আমি এ বাড়িটা কিনি?"
রোহিণী বললেন, "আমি চাইছি তুমি এবার এগিয়ে যাও। থেকো না আর এই কাল্পনিক পৃথিবীটাতে। তুমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছ। দ্যাখো, আমি তো মা, আমি বুঝতে পারছি সতু নেই বলে তোমার ঠিক কতটা কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই বোধহয় একটা সময় আসে, যখন আমাদের পুরোনো সব কিছুকে ভুলে এগিয়ে যেতে হয়। তুমি ভুলে যাও সতুকে। আমি বলছি তোমায়।"
জিনিয়া মাথা নিচু করে বলল, "সবাই আমাকে শুধু একটা কথাই সর্বক্ষণ বলে যাচ্ছে। ভুলে যাও, ভুলে যাও। আমি কেন ভুলে যাব বলো তো? কেন ভুলে যাব? আমার কোনও অনুভূতি থাকতে পারে না? আমি যদি চাই ওর স্মৃতিটাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে, কেন আমার সেই অধিকার থাকবে না? বিয়েবাড়ি যাবে বলে বেরোল। হঠাৎ করে শুনি ভিড় ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। ও আর নেই। আমি সেদিন থেকে প্রতিটা দিন মরছি একটু একটু করে। আমি যদি চাই কোনওভাবে ওর সঙ্গেই থেকে যেতে, কেন আমাকে থাকতে দেওয়া হবে না? কেন আমাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে সবাই? কী পাপ করেছি আমি?"
কান্নায় ভেঙে পড়ল জিনিয়া। রোহিণী জিনিয়ার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জড়িয়ে ধরলেন জিনিয়াকে।
সৌম্য বাজার গেছিল। অনেক দিন পরে চেনা বাজার ঘুরতে ভালো লাগছিল। সবজি কিনল বেশ খানিকটা। মাংস কিনতে গিয়ে থমকে গেল। সতু মাংস খেতে ভালোবাসত। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ বাজার নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বাড়ি ঢুকে দেখল জিনিয়া কাঁদছে।
সে আদিদেবের দিকে তাকাল, "কী হচ্ছে এখানে বাবা?"
হঠাৎ করে সৌম্য আসায় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে আদিদেব বললেন, "ও আমাদের বাড়িটা কিনতে চায়। সতুর স্মৃতি..."
কথা বলা শেষ করে উঠে পারলেন না আদিদেব, সৌম্য চেঁচিয়ে উঠল, "ইয়ার্কি হচ্ছে এখানে? এ বাড়ি কি আমার বাড়িও না? কী শুরু হয়েছে? যে মারা গেছে সে কি আমারও ভাই না? ন্যাকামি মারার একটা সীমা থাকা দরকার!"
সৌম্যর চিৎকারে জিনিয়া স্থবির হয়ে গেল।
রোহিণী তাড়াতাড়ি সৌম্যর হাত ধরে বললেন, "তুই ঘরে চ। ঘরে চ। এখন রাগারাগি করিস না বাবা।"
সৌম্য ভীষণ রেগে গেছিল। সে বলল, "কেন ঘরে যাব? কেন বেচব বাড়ি? আপনি আমাকে বলুন তো, আপনার বাড়ি কেউ কিনতে চাইলে আপনি বেচে দেবেন?"
জিনিয়া মাথা নিচু করে কেঁদে চলল। আদিদেব বললেন, "সমু ঘরে যা প্লিজ। মাথা ঠান্ডা কর। যা। পাড়ার লোক চলে আসবে এখানে চ্যাঁচামেচি হলে। সিন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে। তুই ঘরে গিয়ে মাথা ঠান্ডা কর।"
সৌম্য ছটফট করতে করতে নিজের ঘরে গেল।
রোহিণী বললেন, "তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না মা, ও খুব সেন্টিমেন্টাল। বাড়ি বেচতে চাইছে না আসলে।"
জিনিয়া ভাঙা গলায় বলল, "তাহলে তোমরা যে চলে যাচ্ছ?"
রোহিণী বললেন, "তুমি সতুর অ্যালবাম, জামাকাপড় নিয়ে যাও। আমরা তো কাল চলে যাব, তুমি আজ নিয়ে যাও সব। তাহলে হবে না?"
জিনিয়া শূন্য দৃষ্টিতে একবার রোহিণী, আর-একবার আদিদেবের দিকে তাকাল।

রান্নাঘরে বাজার রেখে সৌম্য ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে মোবাইল খুটখুট করছিল।
আদিদেব ঢুকলেন। বললেন, "রাগ কমেছে? তোর রাগ তো হাউইয়ের মতো, এই উঠে গেল, তারপর নেমে যায়। কমেছে রাগ?"
সৌম্য গুম হয়ে বসে থাকল।
আদিদেব বললেন, "কাজটা কি ভালো হল সমু? মেয়েটার সঙ্গে সতুর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। একগাদা স্বপ্ন দেখেছিল। সব শেষ হয়ে যাবার পর মেয়েটা যদি একটু পাগলামিও করে, সেটাকে এভাবে চ্যাঁচামেচি করে কমানো সম্ভব?"
সৌম্য বলল, "তো কী করব, তুমি বলো। ওকে বাড়ি বিক্রি করব? এ বাড়িতে আমিও তো বড়ো হয়েছি। সতুর সঙ্গে আমার স্মৃতি নেই? হুট করে এসে যদি বলে বাড়ি কিনতে চায়, আর তাতে যদি আমার মাথা গরম হয়ে যায়, সেটা কি খুব অস্বাভাবিক কিছু?"
আদিদেব সৌম্যর কাঁধে হাত রাখলেন, "একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু আমাদের ছেলে মারা গেছে। তোর ভাই মারা গেছে। আমরা ওকে ভুলতে শহর ছেড়েই চলে যাচ্ছি। মেয়েটাকে তো এখানেই থাকতে হবে। ওর কথা ভাবব না কেউ?"
সৌম্য চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে। আমি সরি বলছি।"
আদিদেব হাসলেন, "গুড। বল। তোর থেকে আমরা সেটাই এক্সপেক্ট করি।"
সৌম্য উঠে বারান্দায় গেল। রোহিণী জিনিয়াকে ধরে বসেছিলেন। সৌম্য চেয়ারে বসে বলল, "আই অ্যাম সরি। আমার ওভাবে বলাটা উচিত হয়নি।"
জিনিয়া কিছু বলল না।
সৌম্য মার দিকে তাকাল। রোহিণী জিনিয়াকে বললেন, "সমু সরি বলছে মা।"
জিনিয়া চোখের জল মুছে বলল, "ঠিক আছে।"
আদিদেব এসে বসলেন। বললেন, "সৌম্য তো ঠিক এরকম না। ওর মাথা চট করে গরম হয়ে যায়। রাগ কমেও যায়। সতুও একইরকম ছিল তুমি জানো। কিছু মনে কোরো না।"
জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে। আমিও দুঃখিত। আমি যে কী করছি, কী বলছি, আমারও মাথায় থাকছে না। আসলে কাল কথায় কথায় তোমরা বললে শহর ছেড়ে তোমরা চলে গেলে বাড়ি বিক্রি করে দেবে, সেই থেকে আমার মাথা কাজ করছে না। আমার শুধু মনে হচ্ছে তাহলে কী হবে? সৌপ্তিকের সবটাই তো এ বাড়িতে। সেটাই যদি না থাকে তাহলে তো সবই চলে গেল।"
সৌম্য বলল, "বাড়ি বিক্রির কথা উঠতে পারে যেহেতু বাবা মা থাকবে না। কিন্তু আমিও এখন বাড়ি বিক্রির পক্ষপাতী নই।"
জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে, আপনারা তো চলে যাচ্ছেন, আমি তবে অ্যালবামগুলো নিই? যেখানে ওর ফটো আছে সে ছবিগুলো?"
সৌম্য বলল, "কাল বাবা বলছিল আমরা যখন থাকব না, আপনার কাছে চাবি দিয়ে যাবে। তাই হোক নাহয়। আপনি চাবি রেখে দিন। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।"
জিনিয়া চমকে আদিদেবের দিকে তাকাল। আদিদেব আর রোহিণী অবাক হলেন সৌম্যর হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে।
জিনিয়া বলল, "আমার তাতে কোনও অসুবিধা নেই। আমার শুধু একটাই অনুরোধ, যদি কোনওভাবে বাড়ি বিক্রি করার কথা আপনাদের মাথায় আসে, তাহলে আমার সঙ্গেই কথা বলবেন প্লিজ। আমি যদি কোনওভাবে না পারি, তখন দেখা যাবে। সৌপ্তিকের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে ভাবতেই আমি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি।"
আদিদেব বললেন, "আমাদের বাড়ির দুটো চাবি আছে। একটা রোহিণী তোমাকে এখনই দিয়ে দিচ্ছে। রেখে দাও। ঠিক আছে?"

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল। বলল, “আমি অফিস যাব। তাহলে আর সৌপ্তিকের কোনও জিনিস এখন আর নিচ্ছি না। মাঝে মাঝে এসে আমি দেখে যাব।”

রোহিণী কাঁদছিলেন। জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “ভালো থাকো মা। সতুর দুর্ভাগ্য এত ভালো বউ নিয়ে সংসার করতে পারল না। আমাদের দুর্ভাগ্য তোমার সঙ্গে থাকতে পারলাম না। যে যা কপাল করে আসে। কিছু তো করার নেই। জীবন এরকমই হয়। দাঁড়াও তোমাকে ডুপ্লিকেট চাবিটা এনে দি।”

রোহিণী উঠলেন।

সৌম্য বলল, “আমার বাবা মাও আমাকে ভুল বোঝে। দূরে দূরে ছিলাম তো বরাবর। সতু দেখে রাখত ওদের। আমি বাবা মাকে আমার কাছে নিতে এসেছি। বাড়ি বেচব এ কথা কোনও দিন ভাবি নি। ভাবতে চাইও না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।”

জিনিয়া চুপ করে বসে রইল। কিছু বলতে পারল না।

৯

সন্ধেবেলা। পল্টু পড়তে এসেছে।

উদ্দালক মুড়ি খাচ্ছিল।

পল্টু দেখে বলল, “স্যার মুড়ি খাচ্ছেন স্যার? আমায় বলতেন, আমি চাউ নিয়ে আসতাম।”

উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। বেশি কথা বলিস না। পড়তে বস। অঙ্কগুলো পারলি কিছু?”

পল্টু বলল, “খুব কঠিন স্যার। পারা যাচ্ছে না।”

উদ্দালক বলল, “কঠিন? দেখি কী অঙ্ক আছে।”

পল্টু বলল, “স্যার, পেম কী?”

উদ্দালক নাক কুঁচকাল, “কী?”

পল্টু বলল, “পেম স্যার।”

উদ্দালক কয়েক সেকেন্ড বোঝার চেষ্টা করে বুঝল পল্টু “প্রেম” জিজ্ঞেস করছে। মাথা চুলকে বলল, “সে খুব কঠিন ব্যাপার। অঙ্কের থেকেও কঠিন। তোর বুঝে কাজ নেই।”

পল্টু বলল, “স্যার বিনোদ পেম করছে জানেন। গালস স্কুলে একটা মেয়ে পড়ে। রোজ যায়।”

উদ্দালক বলল “তো? তোর ইচ্ছা করছে? বাবাকে বলব?”

পল্টু জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “না স্যার। আমার ইচ্ছা করছে না। আপনি অঙ্ক বোঝান।”

উদ্দালক বলল, “তুই এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয় তো। জলদি যা। দাঁড়াবি না দোকানে। নিয়েই চলে আসবি।”

পল্টু ঘাড় নেড়ে দৌড় লাগাল। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়েছিল। বাটিটা সিংকে রেখে এসে সে দেখল ফোন বাজছে। মা ফোন করছে, ধরল, “বলো।”

“কী করছিস? খেলি কিছু?”

“হ্যাঁ। এই তো মুড়ি খেলাম।”

“হুঁ। স্কুল ঠিক চলছে?”

“হ্যাঁ। ওই যেমন চলে।”

“শোন, এই শনিবার কলকাতা যাব। ছুটি নে।”

উদ্দালক বিরক্ত হল, “আবার মেয়ে দেখা? ছাড়ো না মা।”

মা বলল, “আমি ছাড়ব না। তোকে বিয়ে দিয়েই আমি মরব এটা মনে রাখিস।”

“এটা কী ধরনের কথা বললে? এর মধ্যে মরার কথা এল কোত্থেকে বলো তো?”

“তুই যাবি কি না বল।”

“ঠিক আছে যাব। রাখো এবার। পল্টু পড়তে এসেছে। পড়াই।”
“লক্ষ্মী ছেলে আমার। খেয়ে নিস রাতে।”
“খাব। রাখো এবার।”
মা ফোন রাখল।
পল্টু সিগারেট নিয়ে এসেছে। খাটে বসে জানলা খুলে দিয়ে উদ্দালক সিগারেট ধরাল। বলল, “অঙ্কগুলো কিছু কঠিন না। তুই আমার সামনে বসে কর দেখি। আগে প্রশ্নটা খাতায় টোক। আমাকে বোঝা কী বলতে চেয়েছে।”
কয়েকটা অঙ্ক করা হল। পল্টুকে বোঝাতে উদ্দালকের হাল খারাপ হয়ে গেল। শেষে একটা অঙ্কে ডিমের ব্যবসায়ীর উল্লেখ থাকায় উদ্দালক বলল, “যা বাবা, আজ অনেক পড়েছিস, ডিম নিয়ে আয়। আজ ডিমের কষা করি।”
পল্টু খুশি হয়ে বলল, “স্যার আলুও আনি। বড়ো বড়ো করে কাটা আলু আর দুটো করে ডিম। হাঁসের ডিম আনব?”
উদ্দালক বলল, “মুরগিই আন। হাঁস পোষায় না।”
পল্টু ডিম নিয়ে এল। মাস্টার ছাত্রতে মিলে রান্না শুরু হল। পল্টু পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বলল, “স্যার, পেম মানেই টাকা খরচ মনে হয়। বিনোদ ওর বাপের মানিব্যাগ থেকে টাকা ঝেড়েছিল বলে খুব ক্যালানি খেল।”
উদ্দালক ডিম সেদ্ধ দিয়েছিল। চারটে ডিম সেদ্ধ হয়েছে। একটা ডিম ছুরি দিয়ে কেটে গোলমরিচ ছড়িয়ে পল্টুকে বলল, “এ নে, হাফ খা।”
পল্টু হাফ ডিম মুখে চালান করে দিল।
উদ্দালক ডিম খেতে খেতে বলল, “বিনোদের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে ওর বাবা। প্রেমের নেশা ঘুচে যাবে।”
পল্টু কৌতূহলী হল, “কেন স্যার? বিয়ে করলে পেম চলে যায়?”
উদ্দালক বলল, “ওরকমই কিছু ব্যাপার।”
পল্টু বলল, “আপনি পেম করেননি?”
উদ্দালক বলল, “না।”
পল্টুর এবার আরও কৌতূহল বাড়ল। বলল, “কেন স্যার?”
উদ্দালক বলল, “সময় পাইনি।”
পল্টু বলল, “তা হবে স্যার। পেমে অনেক সময় লাগে। বিনোদ তো সারাক্ষণ ফোনে কথা বলে যায়। খেলতে ডাকি, আসে না। আপনি তো সারাদিন পড়েছেন বলুন?”
উদ্দালক দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “হ্যাঁ, অনেক পড়ে এখন তোদের পড়াচ্ছি।”
পল্টু বকে যেতে লাগল। উদ্দালক আবার সিগারেট ধরাল।
লাল লাল ডিমের ঝাল ঝোল খেতে দারুণ হল। পল্টু দাঁত বের করে বলল, “যাই স্যার। আবার বাড়িতে গিয়ে খেতে হবে। বাবা বলেছে কাল আপনার জন্য ভেটকি মাছ পাঠিয়ে দেবে। ওটাও ঝাল করে রান্না করা যাবে।”
উদ্দালক বলল, “সাবধানে যা।”
পল্টু চলে গেলে উদ্দালক দরজা বন্ধ করে ডায়েরি নিয়ে বসল।
একটা লেখা মাথায় আসছে। দেখা যাক, কতটা পাতায় নামাতে পারে...

১০

টিচার্স রুমে তারাপদবাবু আর সমরেশবাবুর প্রায়ই ঝামেলা লাগে। দুজনে দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থক। উদ্দালক স্কুলে পৌঁছে দেখল শুরু হয়ে গেছে ঝামেলা।

তার ফার্স্ট পিরিয়ড অফ আছে। সে চেয়ারে বসে মন দিয়ে দুজনের বক্তব্য শুনতে লাগল। পাশ থেকে সুদেববাবু ফিসফিস করে বললেন, "আজ আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন তোমার, মনে আছে তো?"
উদ্দালক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অবিবাহিত হবার এই এক সমস্যা। সবাই বিভিন্ন জায়গার মেয়েদের সঙ্গে তাকে জুড়ে ফেলবে। সুদেববাবুর শালি আছে। বেশ কয়েকবার কথা তুলেছেন। উপরোধে শেষে একবার "হ্যাঁ" বলে ফেলেছে। সেদিন যে আজকেই তা মাথায় ছিল না। বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে।"
সুদেববাবু বললেন, "চিংড়ি চলে তো?"
উদ্দালক বলল, "চলে।"
সুদেব বললেন, "মাটন? রেজালাটা আমার মিসেস দারুণ করে বুঝলে?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ।"
সুদেব বললেন, "কাঁচা আমের চাটনি?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ। আচ্ছা আমাকে হেডস্যারের ঘরে যেতে হবে। আমি ঘুরে আসি।"
সুদেববাবু বললেন, "কেন বলো তো?"
উদ্দালক বলল, "মা এক মেয়ে দেখেছে। শনিবার আশীর্বাদ। ছুটি নিতে হবে।"
সুদেববাবুর মুখটা এতক্ষণ কর্পোরেশনের ভেপার লাইটের মতো জ্বলছিল। উদ্দালকের কথায় সে মুখে লোডশেডিং চলে এল, "মানে? তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ। ঠিক হয়ে গেছে তো। ওহ আপনাকে বলা হয়নি তার মানে।"
সুদেববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আজকের রাতের প্রোগ্রামটা ক্যানসেল হতে পারে বুঝলে? গিন্নি বলছিল বটে কী একটা সমস্যা আছে।"
উদ্দালক গম্ভীর মুখে বসে রইল। মানুষের মতো হাড়হারামি জিনিস খুব কম আছে। যতক্ষণ ধান্দা আছে, ততক্ষণ জ্বালিয়ে খাবে। যেই দেখবে তাকে দিয়ে ধান্দা মেটার সম্ভাবনা নেই, তখন মুখ ঘুরিয়ে নেবে। সুদেববাবু কিছুক্ষণ পরেই উঠে গিয়ে কোত্থেকে ঘুরে এসে বললেন, "না হে, আজ প্রোগ্রামটা হচ্ছে না। আমার গিন্নির শরীরটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে।"
তারাবাবু আর সমরেশবাবুর কাজিয়াটা বেড়ে উঠেছে। উদ্দালক এবার গলা নামিয়ে বোমাটা ছাড়ল, "আসলে আশীর্বাদ না, এমনি দেখতে যেতাম। ঠিক আছে, প্রোগ্রাম যখন ক্যানসেল করেছেন, তখন থাক।"
সুদেববাবুর মুখের ঔজ্জ্বল্য ফিরে এল। বললেন, "ওহ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আসলে বুঝলে না, গিন্নির শরীর খারাপ থাকলেও শালিই সব করবে। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। আর তোমাকে একটা কথা বলি, বাইরে এসো।"
সুদেববাবু উঠলেন। অগত্যা উদ্দালককেও উঠতে হল। টিচার্স রুমের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে সুদেববাবু গলা নামিয়ে বললেন, "কলকাতার মেয়েদের বিয়ে করবে না কখনও। ওখানে তো ফ্রি সেক্স চলে। বিয়ের আগে সবার হয়ে যায়।"
উদ্দালক ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, "কী হয়ে যায়?"
সুদেববাবু বললেন, "আরে জীবনবিজ্ঞানে পড়ায় না, নিষেক; নিষেক হয়ে যায়। সব পর্দাছেঁড়া মাল। কলকাতার মেয়ে বিয়ে কোরো না হে। আমার কথা শোনো, আমার শালিকে দেখো আজ, যেমন নম্র, তেমন ভদ্র। ছেলেদের দিকে চোখে চোখ রেখে কথা পর্যন্ত বলতে গিয়ে গলা কেঁপে-টেপে একশা হয়ে যায়। তোমার বাবা মার নাম্বারটাও দিয়ো আমাকে। দরকার হলে আমি কথা বলে নেব।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে, আপনি তো আজকের প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করেই দিয়েছেন, শনিবার আমি কলকাতা থেকে ফিরি, তারপর নাহয় একদিন নেমন্তন্ন করবেন? আজ ছেড়ে দিন।"
সুদেববাবু হতাশ মুখে বললেন, "আর কলকাতার মেয়ে যদি তোমার পছন্দ হয়ে যায়, তখন কী হবে?"
উদ্দালক বলল, "পছন্দ হবে না। আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মনে থাকবে।"

সুদেববাবু খুশি হয়ে বললেন, “মনে থাকবে?”
উদ্দালক বলল, “নিশ্চয়ই মনে থাকবে। আপনি এত রিসার্চ করেছেন কলকাতার মেয়েদের ব্যাপারে, আমার মনে থাকবে না?”
সুদেববাবু বললেন, “বাহ। এসো, আমি আঙুর এনেছি, আঙুর খাও।”
ঘণ্টা পড়ে গেল প্রার্থনার। উদ্দালক বলল, “টিফিনে খাই? আপাতত দেশ বন্দনায় মন দি?”
সুদেববাবু দাঁত বের করে বলল, “আমার শালির নামও বন্দনা। সুন্দর নাম না?”
উদ্দালক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলল।

১১

অফিসে দেরি করে ঢুকল জিনিয়া। বস সুপ্রতিম রায় তার ডেস্কে এসে বললেন, “সব ঠিক আছে জিনিয়া?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে।”
সুপ্রতিম বললেন, “শরীর?”
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।
সুপ্রতিম বললেন, “যাওয়ার সময় অফিস ভেহিকেলে যেয়ো। একা যেতে হবে না। আমি বলে রাখব।”
জিনিয়া বলল, “থ্যাংকিউ স্যার।”
সুপ্রতিম বললেন, “টেক কেয়ার।”
সুপ্রতিম যেতে সুলগ্না তার কাছে এসে বলল, “তোকে নিয়ে খুব ভাবছেন স্যার আজকাল। তোর কথাই জিজ্ঞেস করছিলেন।”
জিনিয়া কম্পিউটার অন করে বলল, “ও।”
সুলগ্না বলল, “কী হল? আজকে আর গালাগালি দিলি না।”
জিনিয়া বলল, “ভালো লাগছে না।”
সুলগ্না তার পাশে বসল। জিনিয়ার থমথমে মুখে দেখে বলল, “কাল আসিসনি কেন? কোথাও গেছিলি?”
জিনিয়া মিথ্যে বলল, “বাড়িতেই ছিলাম, সারাদিন শুয়ে ছিলাম।”
সুলগ্না বলল, “শোন না, আজ অফিসের পরে রক্ষিতের বাড়িতে পার্টি আছে। চ, ভালো লাগবে।”
জিনিয়া বলল, “যাব না। কাজ আছে।”
সুলগ্না বলল, “কী হয়েছে ইয়ার তোর? এরকম করছিস কেন?”
জিনিয়া ক্লান্ত গলায় বলল, “কালকের কাজগুলো করি। অনেক কাজ বাকি। গত কয়েক দিন রোজ তাড়াতাড়ি বাড়ি গেছি। সেগুলোও সারতে হবে। তোর আর কিছু বলার না থাকলে এখন যা।”
সুলগ্না আহত গলায় বলল, “ওকে, ওকে। কাজ কর তুই। সরি।”
সুলগ্না চলে গেল।
জিনিয়া পাথরের মতো মুখ করে কাজ করে গেল। লাঞ্চে একা একা বেরোল। সুলগ্না বেরোল তবে জিনিয়ার থেকে একটু দূরত্ব রেখে। একটা ছোটো ছাউনিতে জিনিয়া রুটি, পনির খেয়ে একা একা রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার অফিসে ফিরে এল।
সুলগ্না আবার জিনিয়ার কাছে গিয়ে বলল, “আজ ডাকলি না? একা একা খেয়ে এলি?”
জিনিয়া সুলগ্নার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার ভালো লাগছে না কিছু। তুই বুঝতে পারিস না কেন আমি এরকম করছি? আমাকে একটু একা ছাড়তে পারবি না? লিভ মি অ্যালোন। প্লিজ।”
সুলগ্না বলল, “ঠিক আছে। ছেড়ে দেব একা। আমাকে যদি মনে হয় কিছু বলার আছে তো বল। খুলে বল। যদি মনে হয় আমি তোর সিক্রেট রাখতে পারব, তাহলেই বল, নইলে বলতে হবে না। ওকে?”
জিনিয়া খানিকক্ষণ দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। সুলগ্না একগ্লাস জল এগিয়ে দিল জিনিয়ার দিকে। বলল, “জলটা খা।”

জিনিয়া জলটা পুরোটা খেয়ে নিল। তারপর বলল, "ওর বাবা মা দেরাদুন চলে যাচ্ছে।"
সুলগ্না বলল, "সৌপ্তিকের বাবা মা?"
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।
সুলগ্না বলল, "বেশ। তাতে কী হবে?"
জিনিয়া মাথা নাড়ল, "জানি না কী হবে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে সৌপ্তিক এটা আমার সঙ্গে ঠিক করল না। খুব বাজে করল। সেদিন আমি ওকে যেতে বারণ করেছিলাম। আমাকে উলটোপালটা বুঝিয়ে চলে গেল জানিস?"
সুলগ্না জিনিয়ার হাত ধরে নরম গলায় বলল, "ঠিক করেনি তো। খুব ভুল করেছে। কিন্তু এগুলো ওর হাতেও ছিল না, তোর হাতেও ছিল না। প্রি-ডেস্টিনড। কারও তো কিছু করার নেই বল? আর ওর বাবা-মার এখানে একা একা থাকাটাও ঠিক হত না। ওঁরা চলে গেলে ঠিক ডিসিশনই নিয়েছেন। এবার তোকেও একটা ডিসিশন নিতে হবে।"
জিনিয়া উদভ্রান্ত মুখে সুলগ্নার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ডিসিশন নিতে হবে? মুভ অন করার? হবে না। আমি পারব না।"
সুলগ্না মাথা নাড়ল, "স্বাভাবিক। এরকম শক থেকে বেরোতে পারা কারও পক্ষে সম্ভবও না। তবে কী বল তো, আমাদেরকেও নিজেদের একটা সেকেন্ড চান্স দেওয়া উচিত। হতে পারে, আমরা আগের মতো ভালো না থাকলেও, শান্তিটা পেতে পারি। পারসোনালি এটা আমি ফিল করি। তোকে আমি বিয়ে করতে বলছি না, বা কোনও রিলেশনে জড়াতে বলছি না। শুধু বলছি, গিভ ইওর লাইফ অ্যানাদার চান্স। দিয়ে দেখ, অন্তত একটা চেষ্টা তো কর।"
জিনিয়া কিছু বলল না। মনিটরের দিকে ফিরে আবার কঠিন মুখে কাজ করতে শুরু করল।
সুলগ্না কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠল। নিজের কিউবিকলে যাওয়ার আগে বলল, "প্লিজ কাম ব্যাক জিনিয়া। প্লিজ।"
জিনিয়া এবারেও কোনও উত্তর না দিয়ে কাজ করে যেতে থাকল।

১২

রাত আটটা নাগাদ জিনিয়া বাড়ি ফিরল। মালতী আর অগ্নি টিভি দেখছিলেন।
অগ্নি বললেন, "অফিসের গাড়ি দিয়ে গেল?"
জিনিয়া ব্যাগ টেবিলে রেখে সোফায় বসল, "হ্যাঁ।"
অগ্নি বললেন, "অফিসে সব ঠিকঠাক?"
জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"
মালতী বললেন, "ও বাড়ি গেছিলি? কী হল?"
জিনিয়া বলল, "ওরা চলে যাচ্ছে কাল। বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাবে।"
মালতী বললেন, "বাড়ি বিক্রি করবে?"
জিনিয়া বলল, "না। চাবি দিয়ে গেছে আমাকে। মাঝে মাঝে দেখে আসব।"
মালতী হাঁফ ছাড়লেন অগ্নির দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণেই চিন্তিত মুখে বললেন, "কিন্তু ওদের বাড়ি চুরি-টুরি হলে তোর ঘাড়ে আসবে না তো?"
জিনিয়া মার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।
অগ্নি বললেন, "কোথাও ঘুরতে যাবি মা? কতদিন কোথাও যাওয়া হয় না।"
জিনিয়া বলল, "কোথায় যাবে বলো?"
মালতী অবাক হয়ে অগ্নির দিকে তাকালেন।
অগ্নি বললেন, "পাহাড়ে যাবি? সিকিম? দাস আছে, বললেই টিকিট কেটে দেবে।"

জিনিয়া বলল, "তোমরা যা ঠিক করবে। মা, রুনুমাসিকেও খবর দিয়ে দাও। কোন ছেলে দেখতে আসবে বলছিলে না? আসতে বলে দাও।"
অগ্নি ভ্রূ কুঁচকালেন, "কী হয়েছে তোর? হঠাৎ করে এই ডিসিশনগুলো নিতে শুরু করলি আবার?"
জিনিয়া বলল, "তোমরা সারাক্ষণ বলছ না মুভ অন করতে? মুভ অন করি। তোমরা যদি তাতে খুশি হও, তাহলে তাই হোক।"
কথাটা বলে জিনিয়া উঠে ঘরে চলে গেল।
মালতী উত্তেজিত ভাবে চাপা গলায় অগ্নিকে বললেন, "আমি রুনুকে ফোন করে দি? এখন রাজি হয়েছে, কখন আবার অন্য কথা বলবে কোনও ঠিক নেই তো!"
অগ্নি গম্ভীর মুখে বললেন, "কোথাও কাউকে ফোন করতে হবে না। কাল সকাল অবধি দেখি। ও যদি তারপরেও বলে, তখন গিয়ে ফোন করবে। এই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করছে। একটা সত্তা সৌপ্তিকের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাইছে, আর-একটা সত্তা মুভ অন করতে চাইছে। প্রচণ্ড দ্বিধায় পড়ে গেছে মেয়েটা। ওকে এখন কোনওরকম জোর করবে না।"
মালতী বললেন, "তোমার রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে..."
অগ্নি বললেন, "তো কী হয়েছে? রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে তো কী হয়েছে? মেয়ে সেলফ ডিপেনডেন্ট, আমার পেনশন থাকবে, কী অসুবিধা আছে? এসব ভিক্টোরিয়ান মেন্টালিটি ছেড়ে বেরোনোর চেষ্টা করো।"
মালতী কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, "আমার হয়েছে জ্বালা। মেয়ের বাবা, মেয়ে সবার কাছে মুখঝামটা খেয়ে বেড়াই। আমি আর কী করব?"
অগ্নি বললেন, "অনেক কিছু করার আছে। মেয়ে যেগুলো খেতে পছন্দ করে সেগুলো বানাও। আর দয়া করে মেয়ের মাথাটা বিয়ে বিয়ে করে খারাপ করে দিয়ো না। একটা মেয়ের বিয়ে করা ছাড়াও অনেক কাজ থাকে সেটা বোঝার চেষ্টা করো।"
মালতী বললেন, "রুনু যে ছেলেটাকে দেখেছে, তিন্নিদের মতো প্রাইভেট অফিসের ঝঞ্ঝাট নেই। স্কুলে পড়ায়, ভালো ছেলে। ফ্যামিলিতেও ওর মা ছাড়া কেউ নেই। এক ছেলে। এরকম ফ্যামিলি পাওয়া যাবে না। পরে একটা বাজে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, মেনে নিতে পারবে তো?"
অগ্নি বললেন, "বিয়েই হবে সেটা ধরে নিচ্ছ কেন? মেয়ে বিয়ে না করে ভালো থাকতে পারে না?"
মালতী রেগে গেলেন, "এমন অলুক্ষুনে কথা বলবে না কোনও দিন।"
অগ্নি বললেন, "অলুক্ষুনের কী আছে বুঝলাম না। পৃথিবীতে সবাইকে বিয়ে করে সংসার করতে হবে? কেউ কেউ নিজের মতো থাকতে পারবে না? বাবা-মার সঙ্গে কাটাল, এদিক সেদিক ঘুরল, ইচ্ছেমতো জীবন কাটাল, সম্ভব না?"
মালতী বললেন, "আর আমরা চোখ বুজলে? তখন কী হবে?"
অগ্নি বললেন, "জীবন কারও জন্য থেমে থাকে না। বিয়ে দিয়ে একটা আনহ্যাপি ম্যারেড লাইফে মেয়েটাকে ঠেলে দিয়ো না। শোনো আমার কথা। আরও কদিন অপেক্ষা করো।"
মালতী বললেন, "আমি তিন্নিকে এরকম দেখতে পারছি না আর। কষ্ট লাগছে।"
অগ্নি বললেন, "কষ্ট আমিও পাচ্ছি। কিন্তু মেনে নাও। এই সময়টা তাড়াহুড়ো করার না। অপেক্ষা করার। অপেক্ষা করো। সময় দাও মেয়েকে।"
মালতী রান্নাঘরে চলে গেলেন রাগ করে। তাঁর আর অগ্নির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

১৩

সৌম্য বাবা-মার ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছিল। আদিদেব টিভি দেখছেন অন্য ঘরে।

রোহিণী কেঁদে যাচ্ছিলেন। সৌম্য বলল, "কেন কাঁদছ মা? আমার ভালো লাগে তুমি এরকম করে কাঁদলে?"
রোহিণী বললেন, "সব ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতেই কেমন লাগছে রে সমু। একটা দিন, জীবনটাই পালটে দিল।"
সৌম্য চুপ করে গেল। রোহিণী বলে চললেন, "শিয়ালদায় এক কামরার ভাড়াবাড়িতে থাকতাম বিয়ে করে এসে অবধি। তোর বাবা এ জমি কিনল। বাড়ি করল। তোরা বড়ো হলি। কত কিছু জড়িয়ে আছে প্রতিটা ঘরের কোনায়। ভাবলেই যে কী কষ্ট হচ্ছে! আমরা ওখানে গেলে তোর অসুবিধা হবে না বাবা?"
সৌম্য বলল, "কেন অসুবিধা হবে মা? আমি তো সবসময়ে সবাইকে নিয়ে থাকতে চেয়েছি। এতদিন হয়নি। এবার হচ্ছে। আমি এতেই খুশি। আর কী চাওয়ার থাকে বলো? কেন এসব উলটোপালটা কথা ভাবো বলো তো?"
রোহিণী বললেন, "তা তো জানি বাবা। তুই আর সতু দুজনেই পাগলা গোছের বরাবর। তোদের মতো ছেলে কি সব বাবা-মার কপালে থাকে? তাও সতুটা..." রোহিণীর কথা আটকে গেল।
সৌম্যরও চোখে জল এসে গেছিল। রোহিণী যাতে না দেখেন, তাড়াতাড়ি সেটা মুছে নিয়ে বলল, "সব মালপত্র নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা তো কলকাতাতে আর আসব না, এমন নয়। মোটামুটি কাজ চালাবার মতো যা যা লাগে নিয়ে নিচ্ছি। মা দ্যাখো তো, এই শাড়িটা নেবে কি না?"
রোহিণী বললেন, "জিনিয়ার সঙ্গে তোকেও মানাত সমু। মেয়েটা বড্ড ভালো ছিল। সতুকে বড়ো ভালোবাসত।"
সৌম্য মার দিকে তাকিয়ে বলল, "এসব কী কথা বলছ মা? সতু যাকে ভালোবাসত তাকে আমি বিয়ে করতে যাব কেন? মাথাতেই এনো না এসব কথা। তা ছাড়া আমার বিয়ে করারই ইচ্ছে নেই এ জন্মে। এসব ইচ্ছে মাথাতেও এনো না।"
রোহিণী চোখ মুছে বললেন, "জানি তো, আমিও জানি এ চিন্তার কোনও মাথামুন্ডু নেই। কিন্তু মেয়েটার ওপরে কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে যেন। এসে চুপ করে সতুর ঘরে বসে থাকবে। সতু স্কুলে কী করত, ছোটোবেলায় কীভাবে সাইকেল থেকে পড়ে গেছিল, সব গল্প খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবে। এরকম ভালোবাসা আজকালকার দিনে কেউ বাসে বল তো?"
সৌম্য বলল, "সতু ভালো থাকত। তোমরাও ভালো থাকতে। কী করবে মা, কপালে নেই। আমার কাছে দুজনে থাকো এখন। খারাপ রাখব না। কলকাতা আর এই বাড়িটা মিস করবে, এই যা।"
রোহিণী বললেন, "সে তো জানি। তুই কেন আমাদের খারাপ রাখবি সমু? তবে বাবা রাগটা কমা। তোর রাগটা বড্ড লাগামছাড়া হয়ে যায় আজকাল। জিনিয়ার কাছে ভাগ্যিস ক্ষমা চেয়েছিলি, নইলে আমি আর তোর বাবা বড্ড লজ্জায় পড়ে যেতাম।"
সৌম্য বলল, "পরিস্থিতিটাই এমন, মাথা ঠিক রাখা যায় না আসলে। সব কিছু কেমন হাতের বাইরে চলে গেল।"
রোহিণী বললেন, "কথাটা ওকে আমিই বলে ফেলেছিলাম সমু। আমিও তো বুঝতে পারছিলাম না, আমরা চলে গেলে জিনিয়াকে কী বলে সান্ত্বনা দেব। দোষটা আমারই। বয়স হচ্ছে তো, কী বলতে কী বলে ফেলি বুঝি না। ও মেয়েও যে সব কথাই মাথার ভিতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কী করে বুঝব?"
রোহিণীর গলা ধরে এল।
সৌম্য বলল, "ঠিক আছে। এখন আর এ কথা ধরে বসে থাকতে হবে না। বাদ দাও।"
রোহিণী বললেন, "মনে আছে সমু, ছোটোবেলায় একটা ডিমকে দুভাগ করে তোদের দুভাইকে খাওয়াতাম ভাত আর মাখন দিয়ে। এক গ্রাস তুই, আর-এক গ্রাস সতু। গ্রাসগুলোকে আলাদা আলাদা করে রাখতাম। তুই সবসময় ফার্স্ট হতিস। সতু জল খেয়ে ফেলত কতটা করে। আজকাল সারাক্ষণ এসব কথা মাথায় ঘুরপাক খায়।"

সৌম্য থমকে গেল। উঠে রোহিণীকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

১৪

শেয়ালদা স্টেশনে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হল উদ্দালকের। মা তাকে দেখেই বলল, “কত রোগা হয়ে গেছিস! খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস তুই?”

উদ্দালক বলল, “ওজন তিন কিলো বেড়েছে। কী যে বলো না!”

মা বলল, “ওরকম বলতে নেই। নজর লাগে।”

বাবা বলল, “হ্যাঁ, পারলে সারাজীবন আঁচলেই বেঁধে রাখো। ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ছেলেটা বিয়ে করবে না, সেটাও তোমার জ্বালাতনে শিকেয় উঠল।”

মা রেগে গেল, “একদম পিছু ডাকবে না। ভালো সিদ্ধান্ত? বুড়ো বয়সে কে ওকে খাওয়াবে?”

বাবা বলল, “বৃদ্ধাশ্রমে থাকবে। এনাফ রোজগার করে নেবে। একা থাকার মজাই আলাদা। দেশ বিদেশ ঘুরবে। বিয়ে করা মানেই ঝামেলা।”

মা বাবার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, “তুমি কি চাও, আমি এখান থেকে যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব? চাও?”

বাবা বলল, “ওরে বাবা থাক। খচে যেয়ো না।”

মা গজগজ করতে লাগল।

#

অগ্নি অপেক্ষা করছিলেন বারান্দায়। তাদের ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, “আমি ভাড়াটা দিয়ে দি।”

উদ্দালক বলল, “না না, সে কী, এসব একদম না। আমি দিয়ে দিচ্ছি।”

অগ্নি উদ্দালকের উষ্মা প্রকাশ দেখে খুশি হলেও মুখে কিছু বললেন না।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অগ্নি বললেন, “আসুন।”

তারা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসল। জিনিয়ার এক মেসো-মাসিও এসেছেন। মালতী চা দিলেন। উদ্দালক চারদিক দেখছিল। এই প্রথম তার কোথাও বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়া। অস্বস্তি হচ্ছিল। লজ্জাও হচ্ছিল। কোত্থেকে লুচি ভাজার গন্ধ আসছিল। তার মন সেদিকে চলে গেল। সে বা পল্টু, কেউ ভালো লুচি ভাজতে পারে না। লুচি ভাজতে গিয়ে সেটা বিভিন্ন আকারের হয়ে যায়। পরোটা তাও চলে যায়।

এ কথা সে কথার পর জিনিয়া একেবারে ন্যূনতম প্রসাধনে এল। মালতীর শত অনুরোধেও জিনিয়া সাজেনি। উদ্দালক জিনিয়ার দিকে তাকাতে পারল না। অস্বস্তি হচ্ছিল। জিনিয়াও তার দিকে একবারও তাকাল না। শক্ত হয়ে বসে রইল।

আবার কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপের পরে অগ্নি বললেন, “তিন্নি, তুই উদ্দালককে নিয়ে তোর ঘরে যা। কথা বল।”

জিনিয়া উদ্দালককে না ডেকেই উঠে গেল। উদ্দালক কী বলবে বুঝতে না পেরে বাবার দিকে তাকাল। বাবা ইশারা করল জিনিয়াকে অনুসরণ করতে।

সে জিনিয়ার পিছন পিছন জিনিয়ার ঘরে গেল।

ছোটো ঘর। সম্ভবত তারা আসবে বলেই সাজানো হয়েছে। উদ্দালক দেখল খাটের ওপর নীললোহিত সমগ্র। সে খুশি হয়ে বলল, “বাহ, আপনি নীললোহিত পড়েন?”

জিনিয়া তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ, পড়ি। সৌপ্তিক দিয়েছিল। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছিল। ও ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আমার বাবা, মা বা রুনুমাসি কেউই আপনাদের এ কথা বলবে না। আমি বলে দিলাম।”

উদ্দালক বলল, “খুব খারাপ লাগল শুনে। আপনাদের লাভ ম্যারেজ হত?”
জিনিয়া মাথা উপর-নিচ করল।
উদ্দালক বলল, “স্বাভাবিক। তাহলে আপনাকে আজকে জোর করা হয়েছে?”
জিনিয়া বলল, “হুঁ। ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল। আমার কী হবে ভেবে আমার মায়ের ঘুম হচ্ছে না। সবাই বোঝাতে শুরু করেছে আমার মুভ অন করা উচিত। আমি এসবের অত্যাচার থেকে বাঁচতেই শেষমেশ রাজি হয়েছি। আমি আর এসব নিতে পারছি না।”
উদ্দালক বলল, “স্বাভাবিক। মানুষ একা ভালো থাকলে কেউ দেখতে পারে না। যেভাবেই হোক তাকে বিয়ে দিয়েই ছাড়বে। ভাবটা এমন, আমরা নিজেরা খারাপ আছি, তোরাও খারাপ থাক। অদ্ভুত ব্যাপার যাই বলুন।”
জিনিয়া এবার একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গেল।
উদ্দালক বলল, “আমার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কম বেশি একই। বিয়ে করতে আমারও তেমন ইচ্ছা নেই।”
জিনিয়া বলল, “আপনার কোনও অ্যাফেয়ার?”
উদ্দালক বলল, “নাহ। ওসব হয়নি। প্রচুর পড়াশোনা করেছি এক কালে। কিন্তু স্কুলে পড়ানো ছাড়া আর কোনও চাকরি পেলাম না। সে কাজও ভালো লাগে না। ছাত্র পেটানো অপেক্ষা ভ্যারেন্ডা ভাজা ভালো।”
জিনিয়া বলল, “আপনি কি আমাকে পছন্দ করবেন?”
উদ্দালক বলল, “আপনাকে পছন্দ না করলেও আগামী কয়েক মাস আমাকে মেয়ে দেখে বেড়াতে হবে। মা ছাড়বে না। আমি প্রেম-ট্রেম অত বুঝি না বুঝলেন। কাঠখোট্টা টাইপ লোক। তবে আপনার পাস্ট শুনে খারাপ লাগছে এটাও সত্যি।”
জিনিয়া বলল, “আমি কারও সিমপ্যাথি চাই না।”
উদ্দালক বলল, “আমি সিমপ্যাথাইজ করছিও না। জাস্ট বললাম।”
জিনিয়া বলল, “ওরা আমাকে পাগল ভাবে।”
উদ্দালক বলল, “কারা?”
জিনিয়া বলল, “সবাই। সৌপ্তিক চলে যাবার পর ওর বাড়ি যেতাম অফিস না গিয়ে। ওর অ্যালবামগুলো ঘাঁটতাম। ওর আলমারি গুছিয়ে দিয়ে আসতাম। ওর বাবা মা ওর দাদার কাছে দেরাদুনে চলে গেল। ওর মা বলল ওদের বাড়ি বেচতে পারে। আমি কিনব ভাবলাম হোম লোন নিয়ে। এসব শুনে আমার বাবা মা ভাবল আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি। সবাই বলে এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, মুভ অন করো। সব ভুলে এগিয়ে যাওয়া এত সোজা বুঝি?”
উদ্দালক বলল, “আপনি আপনার প্রেমিককে ভালোবেসে তার বাড়িটা কিনে নিতে চেয়েছিলেন?”
জিনিয়া মাথা নাড়ল।
উদ্দালক নীললোহিত সমগ্র হাতে নিল। তৃতীয় খণ্ড। গোটা গোটা অক্ষরে সৌপ্তিক লিখেছিল, “তিন্নিকে সতু।”
বইটা বন্ধ করে রেখে সে বলল, “বেশ করেছিলেন। এতে কে কী বলল অত কান দেওয়ার দরকার ছিল না। যারা এতে সমস্যা দেখেছে, তাদের সমস্যা আছে।”
জিনিয়া বলল, “আমি কোনও দিন ওকে ভুলতে পারব না। যাকেই বিয়ে করি, আমি সুখী হব না।”
উদ্দালক বলল, “সেটাও অস্বাভাবিক কিছু না। আচ্ছা, আপনাদের বাড়ি থেকেই কি লুচির গন্ধ আসছে?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ, মা ভাজছিল।”
উদ্দালক বলল, “এই যে যতবার ছেলে পক্ষ দেখতে আসে, আপনার মা লুচি করেন?”
জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকরা যখন এসেছিল মা করেছিল। তারপরে আপনারাই প্রথম এলেন।”

উদ্দালক বলল, "ভীষণ অপচয়। দেখুন আপনার যা অবস্থা দেখলাম, তাতে আপনাকে বাড়ির ইমোশনাল অত্যাচার সামলাতে বিয়ে করতেই হবে। আমাকেও করতে হবে। নইলে আপনাদের বাড়িতে লুচির পর লুচি হয়ে যাবে, আর আমাকে প্রতি শনি-রবিবার বাবা-মার সঙ্গে টো টো কোম্পানি করতে হবে। চলুন আমরা বিয়ে করে নি। আমি এক ঘরে শোব, আপনি আর-এক ঘরে শোবেন। ইট উইল বি লাইক এ কন্ট্র্যাক্ট। খারাপ হবে?"

জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কিন্তু কোনও দিন ভুলেও আমাকে ছুঁতে দেব না। আর সৌপ্তিকের বাড়ির চাবি আমার কাছে আছে। মাঝে মাঝেই আমি সে বাড়ি যাব। আমি ওকে নিয়েই সারাজীবন কাটাব। আপনার কোনও আপত্তি থাকবে তাতে?"

উদ্দালক মাথা নাড়ল, "একেবারেই নয়। আমি অঙ্কের লোক। শান্তিপ্রিয়ও বটে। আপনাকে আমার ঠিকঠাক লাগছে। আমার আপনাকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি নেই। আপনি করবেন?"

জিনিয়া বলল, "আমি কিন্তু যে শর্তগুলো বললাম, একদম স্ট্যাম্প পেপারে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নেব। আপনারও কোনও শর্ত থাকলে সেগুলো আপনি আমাকে বলতে পারেন। আমিও সই করে দেব।"

উদ্দালক বলল, "শর্ত একটাই। আপনি আমার প্রাইভেসিতে ঢুকবেন না। আমিও আপনার এরিয়ায় ঢুকব না। ডান?"

জিনিয়া উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে কিচ্ছু না ভেবে বলল, "ডান।"

১৫

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে তারা বেরোল জিনিয়াদের বাড়ি থেকে। ট্যাক্সিতে উঠেই মা জিজ্ঞেস করল, "অত কী কথা বলছিলি রে বাবু?"

বাবা বলল, "সেটা ও কেন বলতে যাবে? নিশ্চয়ই প্রাইভেট কোনও কথাই হবে।"

মা বলল, "এখন প্রাইভেট কোনও কথা হয় না। যা হয় বিয়ের পরে। সবাই মিলেই তো ঠিক করতে হবে।"

উদ্দালক বলল, "এখানেই বিয়ে করব। কথা এগিয়ে নাও।"

মা বলল, "মানে? তুই-ই ঠিক করে নিলি? কী এমন কথা হল?"

উদ্দালক বলল, "কথার কিছু না। প্রতি শনিবার সিএল নিয়ে তো মেয়ে দেখতে যাওয়া সম্ভব না। এই মেয়েকেই বিয়ে করে নেব। ঠিকঠাক লেগেছে।"

বাবা খুশি হয়ে বলল, "দ্যাখো, ছেলে আমার মতো হয়েছে। তুমি তো মেয়ে পছন্দ করছ না শাড়ি পছন্দ করছ বুঝেই উঠতে পারি না। দেখেই যাবে, দেখেই যাবে। তারপর সবথেকে ওঁচা শাড়িটা নিয়ে ঘরে আসবে।"

মা বলল, "আমি ওঁচা পছন্দ করি? আর তুমি? নিজে যে জামাগুলো পরো সেগুলো কে পছন্দ করে দেয় তোমায়?"

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মৃদু মৃদু হাসতে দেখে উদ্দালক বলল, "শোনো, এখন রাস্তাঘাটে ঝগড়া করে তো লাভ নেই। বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া কোরো।"

মা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ মানে যে কত চিন্তা তা যদি তুই বুঝতি! পৃথিবীর সবাই লাভ ম্যারেজ করে বাচ্চার বাবা হয়ে গেল, আর তোর জন্য টাকা খরচা করে মেয়ে দেখতে আসতে হচ্ছে। তোর লজ্জাও লাগে না।"

উদ্দালক বলল, "আমার প্রেম-ট্রেম পোষায় না। প্রেম করেই বা কটা লোক ভালো আছে? তোমাদের তো প্রেম করে বিয়ে। ভালো আছ নাকি তোমরা? সারাক্ষণ ঝগড়া করে যাচ্ছ।"

মা ধমক দিল, "তোকে অত বুঝতে হবে না। ঝগড়াটাও ভালো থাকার মধ্যেই পড়ে। অত বুঝলে তো হয়েই যেত। কী গো, ঠিক বলছি তো?"

বাবা খুক খুক করে কাশতে কাশতে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা খুব ভালো আছি। শুধু তোর মা একটু বকাঝকা বেশি করে এই যা।"
মা বলল, "কী? আমি বকাঝকা করি?"
বাবা হাসতে লাগল, উদ্দালক, সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারও।
মা বলল, "ঠিক আছে, আমি মেয়ের মাসিকে খবর দিচ্ছি, ব্যাপারটা এগিয়ে নিয়ে যাক। ওরা একবার আসুক আমাদের বাড়ি। তোর স্কুলেও যদি ভেরিফিকেশনের জন্য যায়, ঘুরে আসুক। তবে মনে হয় না অত কিছু করবে। ভদ্র ফ্যামিলিই মনে হল। তবু তোর মাসিদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেব। একটা বিয়ে মানে অনেক ঝামেলা।"
উদ্দালক বলল, "কোনও ঝামেলা না। বিয়ে করব ঠিক করলেই বিয়ে হয়। অত চিন্তা করতে হবে না। তোমরা হ্যাঁ বলে দাও।"
মা গালে হাত দিল, "সে কী রে, একদিন দেখে এসেই মেয়ের বাড়ির হয়ে কথা বলা শুরু করেছিস! বিয়ের পরে তো পুরো বউয়ের আঁচলে বাঁধা পড়বি বাবু!"
উদ্দালক হাসল, "তা পড়ব। বিয়ে দিচ্ছ যখন, জোর করেই দিচ্ছ যখন, তখন এসব হ্যাজার্ড তো নিতেই হবে মা।"
মা বাবার দিকে তাকাল, "শুনলে তোমার ছেলের কথা? শুনলে?"
বাবা বলল, "ঠিকই তো বলেছে। বউয়ের ন্যাওটা হলে তো লোকে ভালোই থাকে। আমি কি খারাপ আছি?"
মা বলল, "হুহ। তুমি নাকি বউয়ের ন্যাওটা। তাস খেলতে গেলে আমার ডাকটুকু শুনতে পাও না, এসেছেন আমার ন্যাওটা হতে। ফালতু কথা বোলো না তো একদম। তুমি যেখানে যেখানে যোগাযোগ করার করো। খবর নাও এই মেয়েটা কেমন। পরিবার কেমন। তোমার বন্ধু পুলিশে আছে না? খবর নাও। বিয়ের পর ফোর নাইন্টি এইট যেন না খাই বাবু। খুব ঝামেলা।" মা দু হাত তুলে প্রণাম করল।
বাবা বলল, "বাবা! তুমি জেল অবধি ভেবে নিলে? সাধে কি তোমায় ত্রিকালদর্শী ভাবি?"
মা কটমট করে বাবার দিকে তাকাল।
#
স্টেশন পৌঁছে মা একচোট কান্নাকাটি করল। "ভালো থাকিস বাবু, ঠিক করে খাওয়াদাওয়া করিস। একদম নিজের খেয়াল রাখিস না। ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবি তো? বল?"
উদ্দালক মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সব রাখব। তোমরা সাবধানে যাও।"
বাবা আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাকে বলল, "এ বাড়িই ফাইনাল তো?"
উদ্দালক ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"
বাবা হাঁফ ছেড়ে বলল, "বাঁচালি বাবা! এ বয়সে দৌড়াদৌড়ি কি আর পোষায়? তাও আজকের তাসের আড্ডাটা মনে হয় গেল।"
বাবার গলা শেষটায় বিমর্ষ শোনাল।
উদ্দালক হেসে ফেলল।

১৬

সন্ধে নাগাদ স্টেশনে নেমে উদ্দালক দেখল পল্টু একটা বাইক নিয়ে হাজির হয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, "বাইক কোত্থেকে পেলি তুই?"
পল্টু বলল, "কাকুর বাইক। উঠুন স্যার। ঝড়ের বেগে নিয়ে যাব।"
উদ্দালক বলল, "খেপেছিস? তোর লাইসেন্স আছে?"
পল্টু বলল, "লাইসেন কী স্যার?"

পল্টু অবাক পৃথিবী মোড়ে চলে যায় মাঝে মাঝেই। এমন একটা মুখ করে প্রশ্নটা করল, দেখে উদ্দালকের হাসি পেয়ে গেল।
সে বলল, "তুই পিছনে বস। আমাকে চালাতে দে।"
পল্টু বলল, "ঠিক আছে স্যার। আপনি চালান।"
উদ্দালক গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। পল্টু বসে বলল, "স্যার কি বিয়ে করতে গেছিলেন?"
উদ্দালক বলল, "একদিনে কে বিয়ে করে রে পল্টু?"
পল্টু বলল, "বিনোদ করেছে স্যার। মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে ফোন করেছে বিয়ে করে ফেলেছে নাকি। হেবি ঝামেলা চলছে এলাকায়।"
উদ্দালক বিষম খেয়ে বলল, "বিনোদের কত বছর বয়স?"
পল্টু বলল, "কত আর, চোদ্দো-পনেরো হবে। মেয়েটার এগারো।"
উদ্দালক বলল, "বাহ। খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিনোদ। বিনোদের বাবা কী বলছে?"
পল্টু বলল, "বিনোদের বাপ বলছে শুয়োর মারার গরম রড ছেলের পিছনে ঢোকাবে। ওর মা কান্নাকাটি করছে। সব মিলিয়ে হেবি ঝামেলা।"
হাসতে হাসতে উদ্দালক আর-একটু হলেই বাইক নিয়ে পড়ছিল। চৌরাস্তার মোড় এলে উদ্দালক বাইক থামিয়ে বলল, "দাঁড়া চা খেয়ে নি। তুই কী খাবি?"
পল্টু বলল, "আমিও চা খাই। মালাই চা খান স্যার। ভালো করে।"
উদ্দালক দুটো মালাই চা নিল।
পল্টু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "স্যার বউদি চলে এলে কি আমাকে আর পড়াবেন না?"
উদ্দালক বলল, "কেন পড়াব না? সব চলবে যেমন চলছিল।"
পল্টু খুশি হয়ে বলল, "তাহলে ঠিক আছে স্যার। নইলে আমি অশিক্ষিত থেকে যাব।"
উদ্দালক পল্টুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "তুই আজকাল যা অঙ্ক করছিস তাতে এখনও তোকে শিক্ষিত বলা যাবে না পল্টু।"
পল্টু মাথা চুলকে বলল, "শিখে নেব স্যার। চিন্তা করবেন না।"
উদ্দালকের ফোন বাজছিল।
উদ্দালক দেখল বাড়ি থেকে ফোন আসছে। চায়ের ভাঁড়টা এক চুমুকে শেষ করে সে ফোনটা ধরল, "হ্যালো।"
মার গলা ভেসে এল, "পৌঁছে গেছিস বাবু?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ মা। এই তো চৌরাস্তায় চা খাচ্ছি।"
মা বলল, "শোন, পরের শনিবার ছুটি নিবি। আসানসোল যেতে হবে। বর্ণালী একটা সম্বন্ধ এনেছে। এ মেয়ে ক্যানসেল।"
উদ্দালক অবাক হয়ে বলল, "কেন? এ মেয়ে ক্যানসেল কেন? কী হয়েছে?"
মা বলল, "আরে সে অনেক কাণ্ড। এখনই জানতে পারলাম। এ মেয়ের আগে প্রেম ছিল। সে ছেলে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। এরকম বাড়িতে বিয়ে করতে হবে না। একে তো প্রেম ছিল, তার ওপর অপয়া মেয়ে।"
উদ্দালক বলল, "সে জানি তো। জিনিয়া আমায় সে কথা বলেছে তো। তাতে কী হয়েছে? সাইন্সের স্টুডেন্ট হয়ে পয়া অপয়া মানব কেন? তাহলে পড়াশোনা করতে গেলাম কেন মা?"
মা বলল, "আমি জানি না, তুই এই বিয়ে করবি না।"
উদ্দালক কয়েক সেকেন্ড থমকে গিয়ে বলল, "আমিও আর কোনও মেয়ে দেখতে যাব না। বিয়ে করলে এই মেয়েকেই করব, আর নইলে কোনও দিন করব না।"

মা বলল, “মানে? আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনও দাম নেই তোর কাছে?”
উদ্দালক বলল, “অবশ্যই দাম আছে মা। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে কোনও মেয়ের এক্স মারা গেছে বলে তাকে বিয়ে করা যাবে না, এরকম কুযুক্তির জন্য আমি আমার সিদ্ধান্ত পালটাতে পারব না। আমি তোমাকে বলে দিলাম, বিয়ে করলে এই বাড়িতেই করব। তোমরা কথা এগোও।”
মা বলল, “আমার তোকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। আগেই জেনেশুনে নিয়ে ক্যানসেল করা উচিত ছিল। যাওয়াটাই উচিত হয়নি।”
উদ্দালক বলল, “মেয়েটা কিন্তু আমাকে শুরুতেই বলেছে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল, ছেলেটা মারা গেছে। কোনও তথ্য গোপন করেনি আমার কাছে। তুমি কথা এগোও। আমি এ বাড়িতেই বিয়ে করব। আর কোনও মেয়েও দেখতে যেতে পারব না।”
মা রেগেমেগে ফোন কেটে দিল।
পল্টু কান খাড়া করে সব কথা শুনছিল। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার স্যার? খুব বাওয়াল?”
উদ্দালক দোকানে তার জন্য আর-এক কাপ চা অর্ডার করে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “হ্যাঁ রে পল্টু, খুব বাওয়াল। আজ লুচি খাবি? আর-একবার চেষ্টা করে দেখা যেতেই পারে, কী বলিস?”
পল্টু দাঁত বের করে রাজি হয়ে গেল।

১৭

রবিবার সকাল।
বাজারে যেতেই সুদেববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উদ্দালকের। সুদেববাবু তাকে দেখেই এগিয়ে এলেন, “কী হে, কী খবর মাস্টার? কাটিয়ে দিয়েছ তো কলকাতার সম্বন্ধটা?”
উদ্দালক বলল, “ওই আর কি।”
সুদেব বললেন, “তাহলে আজ রাতেই চলে এসো। বাজার তো করেই নিচ্ছি। কী বলো?”
উদ্দালক বলল, “আজ একটু সমস্যা আছে সুদেববাবু। পরে কোনও এক দিন হবে।”
সুদেব বললেন, “কী সমস্যা? আমাকে বলো।”
উদ্দালক শ্বাস ছাড়ল। এরা প্রাইভেট স্পেস বলে কিছু আছে বুঝতে চায় না। সে বলল, “আছে কিছু একটা। আজ হবে না।”
সুদেব বললেন, “ঠিক আছে। জানিয়ো। আজ কিন্তু ভালো পাবদা উঠেছিল।”
উদ্দালক বলল, “আমি পাবদা খাই না।”
সুদেব হাঁ করলেন, “পাবদা খাও না? আড় মাছ?”
উদ্দালক মাথা নাড়ল।
সুদেব বললেন, “তাহলে চিংড়ি? আগের দিন তো বললে চিংড়ি খাও?”
উদ্দালক বলল, “না। আমার অ্যালার্জি ধরা পড়েছে। চিংড়ি খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি।”
সুদেব তার আগাপাশতলা দেখে বললেন, “অ। ঠিক আছে। তোমরা আজকালকার দিনের ছেলেপিলে। তোমাদের ঠিক বুঝতে উঠতে পারি না বাপু। কখন যে কী বলো কিছুই বুঝি না। ঠিক আছে।”
সুদেববাবু তাকে না ঘাঁটিয়ে চলে গেলেন। উদ্দালক হাঁফ ছাড়ল। একটা জ্যান্ত কাতলা নিয়ে বাজার থেকে বেরোতে যাবে, দেখল বাবা ফোন করছে। ধরল, “বলো।”
বাবা বলল, “কাল তো সব শুনলাম। তোর মা খুব রাগারাগি করছে। সে নাহয় আমি সামলে নেব। কিন্তু তুই আমাকে বল দেখি, তুই শিওর তো?”
উদ্দালক মিষ্টির দোকানে ঢুকে এক প্লেট কচুরি আর দুটো রসগোল্লা অর্ডার করে বলল, “হ্যাঁ, শিওর।”

বাবা বলল, “তোর মা মাঝে মাঝে পাগলের মতো করে ঠিকই, কিন্তু তোকে নিয়ে চিন্তাও করে। এতদিন বিয়ে করিসনি। তার ওপর তুই মফস্সলের ছেলে। কলকাতার মেয়ের সঙ্গে সংসার করতে পারবি তো?”
উদ্দালক বলল, “এ তো কোনও বিগ বস খেলা হচ্ছে না বাবা। একটা বিয়ে হবে। মেয়েটা আমাকে ওর সমস্যার কথা আগেই বলে দিয়েছিল। আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া মেয়েদের এরকম কমোডিটি বানিয়ে মেয়ে দেখার নামে এইসব অসভ্যতা আমার পোষায় না কোনও কালেই। আমি ঠিকই করেছিলাম, যে মেয়েকে প্রথম দেখব তাকেই বিয়ে করব। আর ডিসপুটের কোনও ব্যাপার নেই। মেয়েটা একজনকে ভালোবাসত। ঠিক আছে। তাতে সমস্যা কোথায়?”
বাবা বলল, “তোর জন্য গর্ব হয় আমার। তোকে একটা কথা বলি, থিওরিটিক্যালি তুই ঠিক। একশো ভাগ ঠিক। তবে মেয়েটা যদি তোকে কোনও দিন ভালো না বাসে, সেক্ষেত্রেও তো সমস্যায় পড়বি।”
উদ্দালক বলল, “ভালোবাসতেই হবে এরকম কোনও মাথার দিব্যি আমি দিচ্ছি না বাবা। না হলে না হবে। সব বিয়েই কি উত্তীর্ণ হয়?”
বাবা বলল, “জেনেশুনে বিষ পান করতে চাস? কী কারণে?”
উদ্দালক বলল, “কোনও কারণ নেই। শুধু আগে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিল বলে বিয়ে ক্যানসেল করে দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা আমি অন্তত খুঁজে পাচ্ছি না, এটা বলতে পারি।”
বাবা বলল, “ঠিক আছে। আমি তোর মাকে বোঝাচ্ছি। রাজি করিয়ে নেব ঠিক, কবে বিয়ে করতে চাস বল।”
উদ্দালক বলল, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। করতে যখন হবেই, তখন দেরি করে লাভ নেই।”
বাবা বলল, “বেশ। কথা বলছি আমি। ওদেরও আমাদের বাড়ি আসতে বলছি।”
উদ্দালক ফোন রেখে কচুরি খেয়ে নিল।
ফিরে রান্না বসাল। মাছের ঝোল আর ভাত। রান্না হয়ে গেলে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে সিলিং দেখায় মন দিল। এটা তার প্রিয় কাজ। টিকটিকি দেখতে ভালো লাগে তার। শিকারের সামনে কী করে এত অবিচল, শান্ত থাকে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।
বাড়িওয়ালা সদাশিববাবু ভালো মানুষ। বেশি জ্বালাতন করেন না। মাস্টার বলে সম্মানও করেন যথেষ্ট। এ এলাকায় আর কিছু না থাক, শিক্ষকদের সম্মান আছে।
লুঙ্গি পরে সদাশিববাবু তারে কাপড় মেলছিলেন। জানলা দিয়ে তার দিকে চোখ পড়ায় বললেন, “মাস্টারবাবু, আপনি কবে আমার দলে ভিড়বেন? আপনাকে এরকম শুয়ে থাকতে দেখে আমার ভারী হিংসা হয় যা বলুন।”
উদ্দালক হেসে ফেলল, “মনে হচ্ছে আর বেশিদিন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারব না। আমারও সমন এসে পড়েছে।”
সদাশিববাবু দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, “হায় রে, সুখে থাকতে কেন যে ভূতে কিলোয় মানুষকে। অ্যাদ্দিন দিব্যি ছিলেন, চোখের সামনে আপনাকে বলি হতে দেখতে হবে। তা এ বাড়িতেই সংসার করবেন তো, নাকি অন্য বাড়ি দেখতে শুরু করেছেন?”
উদ্দালক বলল, “কেন, বিয়ে করে আপনার বাড়িতে থাকলে সমস্যা আছে?”
সদাশিববাবু লজ্জিত হয়ে হাসলেন, “না না, আমি কি তাই বলতে চেয়েছি নাকি? আমি বলছি বউমাকে নিয়ে এই কটা ঘরে থাকতে পারবেন?”
উদ্দালক বলল, “খুব ভালোভাবে থাকব।”
সদাশিববাবু বললেন, “ঠিক আছে। তবু কোনও অসুবিধে হলে বলবেন। অবশ্য আমার গিন্নি আছে। বউমার অসুবিধা হবে না কোনও।”
উদ্দালক হাসল। বাস্তবিকই এমন ভালো বাড়িওয়ালা পাওয়া যায় না। নিঃসন্তান দম্পতি। বাড়িতে কিছু ভালো রান্না হলে তাকে দিয়ে যাবেন ভদ্রমহিলা। এমন আন্তরিকতা আজকালকার দিনে বিরল হয়ে যাচ্ছে।

পল্টু সাইকেল নিয়ে এল। উদ্দালক বলল, "কি রে, তুই এখন কি অঙ্ক করতে এলি?"
পল্টু বলল, "স্যার মাছ ধরতে দিচ্ছে বড়ো পুকুরে। যাবেন নাকি?"
উদ্দালক বলল, "মাছ ধরা আমার পোষায় না। গিয়ে কী করব?"
পল্টু বলল, "মাছ ধরবেন। তিনশো টাকা এন্ট্রি ফি। যে যা মাছ পাবে, তার।"
উদ্দালক বলল, "ধুস, তুই যা। আমার পোষাবে না।"
পল্টু মুখ কালো করে চলে যাচ্ছিল। উদ্দালক পিছু ডাকল, "ঠিক আছে চ। তবে ছিপ তুই-ই ফেলিস। ওসব আমার দ্বারা হবে না।"
সঙ্গে সঙ্গে পল্টুর মুখে যেন টিউবলাইট জ্বলে উঠল।

১৮

অফিস থেকে বেরিয়ে দুজনে একটা ক্যাফেতে বসল। অফিসে ব্যক্তিগত কথা বেশি আলোচনা করা সম্ভব হয় না। কথা বললেই চারপাশ থেকে কৌতূহলী কান পেতে সবাই বসে থাকবে।
কফি অর্ডার করার পরেই সুলগ্না অবাক চোখে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর ইউ সিরিয়াস? তুই বিয়ে করবি?"
জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ। কেন? প্রবলেম কী আছে এতে?"
সুলগ্না বলল, "আমার কেমন ঘেঁটে যাচ্ছে সব কিছু। এত তাড়াতাড়ি?"
জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ। বাড়ি থেকে মারাত্মক প্রেশার আসছে। বাবার চাপ আছে, মায়ের চাপ আছে। নেওয়া যাচ্ছিল না আর।"
সুলগ্না বলল, "তুই পারবি? মানে সংসার করতে পারবি?"
জিনিয়া বলল, "সংসার তো করব না। ইট উইল বি ওয়ান টাইপ অফ এগ্রিমেন্ট। উদ্দালকের বাড়ি থেকে প্রেশার আছে বিয়ে করার, আমার বাড়ি থেকেও প্রেশার আছে। সো উই ডিসাইডেড টু স্টে টুগেদার। দ্যাটস ইট। কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজ বলতে পারিস। সৌপ্তিককে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব না। বাড়ির প্রেশার না থাকলে আমি এ বিয়ের ঝামেলায় যেতাম না। বাড়ি গেলেই বাবা-মার গম্ভীর মুখ, মার কথায় কথায় সেন্টু দেওয়া, আমি আর নিতে পারছিলাম না জাস্ট।"
সুলগ্না বলল, "আর ইউ শিওর, দিস ম্যান, উদ্দালক... এই কন্ট্র্যাক্ট মেনে চলার ম্যাচিওরিটি দেখাতে পারবে?"
জিনিয়া মাথা নিচু করে বলল, "প্রোপোজালটা ও-ই দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছে পারবে। দেখা যাক। না পারলে আমাকে অন্য রাস্তা দেখতে হবে। তখন আর বাড়ি ফিরব না। শহরের বাইরে কোথাও ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসব। নইলে হয়তো সৌপ্তিকদের বাড়িতে যদি থাকতে দেয়, সেখানে থাকব।"
সুলগ্না বলল, "আর ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিস আসবি নাকি তুই?"
জিনিয়া বলল, "দেখা যাক কী করি। ভাবিনি এখনও। মিটে যাক সব কিছু। শোন না, সৌপ্তিকদের বাড়ির ওদিকে একটা নার্সারিতে গেছিলাম। কয়েকটা গাছ পুঁতব ঠিক করেছি। এই উইকএন্ডে যাবি? একা চাপ হয়ে যাবে।"
সুলগ্না কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "ম্যান, ইউ আর সো ফাকড আপ। তুই কী করছিস, কেন করছিস, নিজেও বুঝতে পারছিস না।"
জিনিয়া বলল, "তুইও বলবি তো আমি পাগল হয়ে গেছি? বল। একশোবার বল, আমি কিচ্ছু বলব না। না গেলে যাস না। আমি একাই যাব। আগের দিন গিয়ে সৌপ্তিকের ঘর পরিষ্কার করলাম। প্রাইমারি স্কুলে সবকটা পরীক্ষায় ও ফার্স্ট হত। সেই রেজাল্টগুলো গুছিয়ে রাখলাম। এইগুলো নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে আমাকে।"

সুলগ্না জিনিয়ার কাঁধে হাত রাখল, "আমি তোকে বুঝতে পারি। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আর-একটা যেটা করতে যাচ্ছিস, সেটা ঠিক না ভুল, আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। দেখিস, সেটাও যেন দুঃস্বপ্ন না হয়ে যায়।"
জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকের খবরটা শোনার পর থেকে আমি আর নিজের মধ্যে নেই। যা করি, করতে হয় বলেই করি। সুইসাইড করা পৃথিবীর কঠিনতম কাজগুলোর একটা আর এত কিছুর পরেও আমার মনে হয় বাবা-মার প্রতি কিছু হলেও কর্তব্য করা বাকি আছে আমার। শুধুমাত্র এ কারণেই সেটা করে উঠতে পারিনি। নইলে..."
সুলগ্না বলল, "ভুলেও ভাবিস না। সুইসাইড ইজ নট দ্য সলিউশন। তাহলে পৃথিবীর সবাই সুইসাইড করে বেঁচে যেতে পারত। মরতে সবাইকেই হবে, তা বলে কাপুরুষের মতো মরাটা কখনও সলিউশন হতে পারে না। আচ্ছা, এই উদ্দালক ছেলেটা কেমন দেখতে? হ্যান্ডু?"
জিনিয়া বলল, "দেখিনি ভালো করে। খেয়ালই ছিল না।"
সুলগ্না বলল, "ছেলেটাই তোকে প্রোপোজালটা দিয়েছে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং কিন্তু। ব্যাটারও কোনও অ্যাফেয়ার ছিল নাকি? বা অন্য কোনও কেস না তো? গে না তো?"
জিনিয়া কাঁধ ঝাঁকাল, "জানি না। থাকলে থাকবে। আমার কোনও সমস্যা নেই। আমার আর সৌপ্তিকের স্মৃতির মাঝে এক্সক্ল্যামেট্রি সাইন হয়ে না দাঁড়ালে আমি কিচ্ছু বলব না, ব্যস।"
সুলগ্না বলল, "বুঝেছি। রিলেশন, উইদাউট ইমোশন। তাই তো?"
জিনিয়া ম্লান হাসল, "রাইট।"

পর্ব ২

১

বউভাত।
রাত দেড়টা বাজে।
উদ্দালকের ভাইবোনেরা হইহই করে উদ্দালককে ফুলশয্যার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল। বাইরে অনেকেই আড়ি পাতছে।
উদ্দালক ধমক দিয়ে সবাইকে তাড়াল।
ঘরে ঢুকে এসির তাপমাত্রা আরও কমিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার গরম লাগছে না?"
জিনিয়া বলল, "লাগছে।"
উদ্দালক বলল, "তাহলে চেঞ্জ করে নিন। আমি মেঝেতে শুয়ে নিচ্ছি। বিছানা আনিয়ে রেখেছি। প্রচুর পরিশ্রম হল। মাংসটা আপনাদের বাড়িতেই বেশি ভালো হয়েছিল। সাধে কি বলে কলকাতার রান্না? ব্যাপারই আলাদা। মিষ্টিটাও বড্ড ভালো। কোথাকার ছিল?"
জিনিয়া বলল, "আমাদের বাড়ি গেলে দেখিয়ে দেব। বলছি, আমাকে একবার ও বাড়ি নিয়ে যাবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই বিয়ের ঝামেলায় যাওয়া হচ্ছে না। সৌপ্তিকের ঘরটা নোংরা হয়ে গেছে মনে হয় অ্যাদ্দিনে।"
উদ্দালক মেঝেতে তোশক পেতে বিছানা করে নিয়ে বালিশে আরাম করে শুয়ে বলল, "একদম। ওসব ভাববেন না। কলকাতা ঘোরাও হবে। খাওয়াদাওয়াও হবে। কত জায়গা আছে।"
জিনিয়া বলল, "আমি তো বেশি ঘুরতে ভালোবাসি না। আমি ওদের বাড়িতে থাকব, আপনি ঘুরে নেবেন, ঠিক আছে?"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। আচ্ছা শুনুন, ফুলশয্যায় নাকি বউকে আংটি দিতে হয়। আমি কিনতে ভুলে গেছিলাম। মা কিনে দিয়েছে। এটা আপনি খুব অসুবিধা না হলে পরে থাকুন।"

উদ্দালক পকেট থেকে আংটি বের করে জিনিয়াকে দিল।

জিনিয়া নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তবে আমি এ বাড়িতে সিঁদুর পরলেও আপনার ওই ভাড়াবাড়িতে গিয়ে সিঁদুর পরতে পারব না। আশা করি জোর করবেন না।"

উদ্দালক বলল, "প্রশ্নই ওঠে না জোর করার। বিয়ের ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছেন আপনি আমায়। আমি তো কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আচ্ছা, আমি ঘুমালাম। গুড নাইট।"

উদ্দালক পাশ ফিরল এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

জিনিয়া অবাক হয়ে গেল।

অদ্ভুত লোক তো! সৌপ্তিক চলে যাবার পর রাতের পর রাত তার ঘুম হয় না। এদিকে এ শুল আর ঘুমিয়ে পড়ল? পৃথিবীতে এরকম মানুষও আছে?

কেমন হালকা নাকও ডাকছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ঘর সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে চেঞ্জ করে এল। বিয়েবাড়ির সানাই এখনও মৃদু শব্দে বাজছে। জিনিয়ার চোখে জল চলে এল। সৌপ্তিক বেঁচে থাকলে এই রাতটাই কত আনন্দময় হয়ে উঠতে পারত।

বাইরে থেকে লোকের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। কাজের বাড়ি। অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছে। তাদের ঘুমানোর তোড়জোড় চলছে। সে আর উদ্দালক সব কিছু মেনে বিয়ে করেছে। তেমনই চুক্তি হয়েছিল। যে যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ফটোগ্রাফার যতবার হাসতে বলেছে সে নিক্তিতে মেপে হেসেছে।

সবার বউ ভারী পছন্দ হয়েছে। তার সামনেই বলেছে মুখ ভারী মিষ্টি। জিনিয়ার মন পড়ে আছে সৌপ্তিকের বাড়িতে। কী হচ্ছে কে জানে। একজন লোক ঠিক করে রাখা আছে রাতে ঘুমানোর জন্য। তাতে অন্তত চুরিটা হবে না।

সালোয়ার পরেছে সে। হাতে বিয়ের একগাদা চুড়ি, শাঁখাবাঁধানো, পলাবাঁধানো শব্দ করছে। এই শব্দটা এককালে তার ভারী প্রিয় ছিল। পিসতুতো দাদা বিয়ের ঠিক পরে তাদের বাড়ি এসেছিল। বউদির হাতে চুড়িগুলো শব্দ করছে, কী ভালো লাগছিল। সে ঠিক করেছিল বিয়ের পরেও সে হাত বেশি খালি রাখবে না। সারাক্ষণ সব চুড়ি পরে থাকবে।

এখন সব গয়না খুলে রেখে দিল। গয়নাপ্রিয় জিনিয়ার গয়নার উপর কোনও মোহই নেই এখন আর। বিনা কারণেই দু চোখ ভরে জল এল। সব কিছু কেমন ছারখার হয়ে গেল। স্বপ্নগুলো দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল।

ফোনের হিডেন ফোল্ডারে রাখা তার আর সৌপ্তিকের ফটোগুলো দেখে চলল সে। যত দেখতে থাকল, তত কাঁদতে থাকল। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ উদ্দালক উঠে ঘরে রাখা জলের বোতল থেকে অনেকটা জল খেয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার ঘুম আসেনি এখনও?"

জিনিয়া বলল, "আমার ঘুম আসে না। নিশাচর হয়ে গেছি আজকাল।"

উদ্দালক বলল, "সে কী? না ঘুমালে অনেক রোগ হয় তো।"

জিনিয়া বলল, "জানি। কী করব বলুন? আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।"

উদ্দালক বলল, "ঘুমাব। আমার তো ইচ্ছাঘুম। চোখ বুজলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু আপনি না ঘুমালে আমার অস্বস্তি হবে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, জেগেই যখন আছেন, একটা কাজ করি দাঁড়ান।"

জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, "কী?"

উদ্দালক বলল, "দাঁড়ান না। আসছি।"

দরজা খুলে উদ্দালক বেরোল। কয়েক মিনিট পরে আইসক্রিমের একটা বড়ো বার নিয়ে এসে বলল, "চলুন, দুজনে মিলে মেরে দি। বেঁচে গেছে জিনিসটা। খান খান। ভ্যানিলা ভালো লাগে না?"

জিনিয়া বলল, "না না, থাক না।"

উদ্দালক প্লেট আর ছুরি নিয়ে এসেছিল। বার থেকে কেটে আইসক্রিম প্লেটে রেখে চামচ দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে জিনিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "খেয়ে নিন। লজ্জা করে লাভ নেই। আইসক্রিম সামনে রেখে না

খেলে ঠাকুর পাপ দেয়। আপনি তো পল্টুকে চেনেন না। পল্টু একাই এই বার দুটো মেরে দেবে। চ্যাম্পিয়ন ছেলে। অথচ সারাদিন দৌড়োচ্ছে, ঘুরছে, সাঁতার কাটছে, শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। আর শহরের লোক কত কিছু ভেবে খাওয়াদাওয়া করে। এই ক্যালোরি বেড়ে যাচ্ছে, এই ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে, কার্বোহাইড্রেট কন্ট্রোল করো, বাপরে।”

উদ্দালক এমন করে কথাটা বলল, জিনিয়ার হাসি পেল। সে অল্প হেসে সামলে নিয়ে আইসক্রিমের একটু মুখে দিল। সেই সাড়ে বারোটার সময় খেয়েছে। ঠুসে খাইয়েছে সবাই বেশি আদর দেখিয়ে। জিনিয়া তবু খেতে পারেনি তেমন। এখন আইসক্রিমটা খেতে অমৃতের মতো লাগল। উদ্দালক তার নিজের ভাগের আইসক্রিমটা খেয়ে প্লেটটা খাটের তলায় রেখে বলল, “আপনার খাওয়া হয়ে গেলে এখানেই রেখে দেবেন। আমি সকালে ম্যানেজ করে পাচার করে দেব।”

জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে।”

উদ্দালক আবার শুয়ে পড়ল। পড়া মাত্রই আবার ঘুম। জিনিয়া হতাশ চোখে উদ্দালকের দিকে তাকাল। ভীষণ হিংসে হল। এত সহজে কেউ কী করে ঘুমিয়ে পড়তে পারে?

২

জিনিয়ার রাতে ঘুম হয়নি। ভোর পাঁচটার দিকে উঠোনে শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখল উদ্দালকের মা একাই উঠোন ধুচ্ছেন। তাকে দেখে বললেন, “তুমি ঘুমোওনি?”

জিনিয়া বলল, “ঘুম আসছিল না।”

উদ্দালকের মা বললেন, “ও হয়। নতুন জায়গা তো। কোনও অসুবিধা হয়নি তো কাল রাতে?”

জিনিয়া বলল, “না।”

উদ্দালকের মা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “হুঁ।”

জিনিয়া বুঝল ভদ্রমহিলা অন্য কিছু বলতে চাইছিলেন। সে বলল, “খুব টায়ার্ড ছিলাম।”

উদ্দালকের মা বললেন, “সে যাই হোক, আমাদের বয়স বাড়ছে। নাতি নাতনি যাই হোক, তাড়তাড়ি হলে ভালো হয়। ছেলে তো ধনুকভাঙা পণ করে বসল বিয়ে করলে তোমাকেই করবে।”

ঝাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মহিলা। জিনিয়া বলল, “আমি হেল্প করব?”

মা বললেন, “না, না। আমি করে নিচ্ছি। এত লোক, ধুলোবালি গিজগিজ করছে উঠোনে। পারা যায় না। তোমাকে তো আমার কিছু জিজ্ঞেস করাও হয়নি। রান্নাবান্না পারো কিছু? আগেকার দিন হলে বউমাকেই বউভাতে রান্না করতে হত। এখন আর সেই দিন নেই। ক্যাটারার এসে গেছে।”

জিনিয়া বলল, “পারি। রান্না করতে আমার ভালো লাগে।”

মা বললেন, “তাও ভালো। আমি তো জানতাম কলকাতার মেয়ে মানে ম্যাগি ছাড়া আর কিছু রান্না করতে পারে না।”

জিনিয়া বলল, “ভুল জানতেন। দেখুন না, আমাদেরও ধারণা ছিল মফস্সলের শাশুড়ি মানেই অশিক্ষিত হবে। তা তো না। আপনি মাস্টার্স করেছেন।”

উদ্দালকের মার মুখে হালকা হাসি এল, “তা করেছি। পড়াশোনা করতে ভালো লাগত। চাকরির পরীক্ষাও দিয়েছি। ওরা পার্টির লোককে নিল। বাবুর বাবা বা আমরা তো কোনও দিন ওসব পার্টি করিনি। তাই হল না। বরাবরই আমার পড়াশোনা ভালো লাগে।”

ঝাঁটা রেখে উদ্দালকের মা বললেন, “এসো রান্নাঘরে। চা খাই।”

জিনিয়া উদ্দালকের মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। উদ্দালকের মা বিভাবরী গ্যাস জ্বালিয়ে বললেন, “ওই টুলটায় বসো।”

জিনিয়া বসল। বিভাবরী বললেন, “চিনি খাও তো?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ।”
বিভাবরী বললেন, “আমাদের ছেলে বরাবরই ইন্ট্রোভার্ট। কারও অসুবিধা হবে এমন কাজ কখনও করে না। একবার ওর বন্ধু ওর কতগুলো বই নিয়ে চলে গেল। দেয় আর না। সে বন্ধু এ বাড়িতে এসেছে। বাবুকে বললাম, বাবু বল তোর বইগুলো দিয়ে যাক। ছেলে বলে, থাক মা। এখন বললে লজ্জা পাবে। অন্যে লজ্জা পাবে সে নিয়েই ছেলে চিন্তায় পড়ে থাকে। এ ছেলের কী আর হবে। তা তোমাদের প্রেমটা কবছর ছিল?”
বিভাবরী হঠাৎ করে জিনিয়াকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন।
জিনিয়া একটু থতোমতো খেয়ে বলল, “প্রেম মানে?”
বিভাবরী বললেন, “তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল না? আমি জানি সব। আমাকে বলতে পারো।”
জিনিয়া একটু থমকে গিয়ে বলল, “তিন বছরের ছিল। আশীর্বাদও হয়ে গেছিল।”
বিভাবরী চা ছেঁকে তার দিকে কাপ এগিয়ে একটা টুলে বসে কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, “বিয়ের পর বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন আসবে। বাবু তো যাবে না আমি জানি। পারলে এখনই ও স্কুলে চলে যায়। বাবুর ইচ্ছা আরও পড়াশোনা করতে আমেরিকার কোনও ইউনিভার্সিটিতে যাবে। আমার অত চাহিদা নেই। ছেলে বাড়ির কাছে থাকলেই ভালো। তোমার অফিস কবে থেকে যেন?”
জিনিয়ার মুড অফ হয়ে গেছিল। চা খেতে ইচ্ছা করছিল না আর। তবু বিভাবরীর প্রশ্নের উত্তরে বলল, “চার দিন পর।”
বিভাবরী বললেন, “লেডিজ স্পেশাল আছে। ওতেই যাবে। উলটোডাঙায় নেমে আবার অটো করতে হবে, তাই না?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ।” বিভাবরী বললেন, “শাঁখা পলাগুলো খুলে রেখেছ?”
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।
বিভাবরী বললেন, “ঠিক আছে। ওসব আজকাল কেউ পরেও না। হাতে কিছু একটা পরে থেকো, তাহলেই হবে। আমাকে একটা কথা বলবে?”
জিনিয়া বলল, “বলুন।”
বিভাবরী বললেন, “বাবুকে বিয়ে করলে কেন তুমি? কী দেখলে ওর মধ্যে?”
জিনিয়া বিভাবরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি ঠিক বলতে পারব না। আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ও আমার মধ্যে কী দেখল।”
বিভাবরী তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “তাহলে কি আর তোমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম? সে আদর্শবাদী ছেলে। মেয়েদের কমোডিটি হিসেবে নাকি দেখা উচিত না। ঘরে ঘরে খাবার ধ্বংস করে শাড়ি পছন্দ অপছন্দ করার মতো মেয়ে পছন্দ করা যাবে না। কত ভারী ভারী কথা! নিজের ছেলেকে নিজেই চিনতে পারি না ভালো করে।”
জিনিয়া চুপ করে বসে রইল।

৩

বিকেল নাগাদ পৌঁছল তারা। গাড়ি থেকে নামতেই পল্টু একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এসে উদ্দালককে আর জিনিয়াকে প্রণাম করে বলল, “স্যার ঘর একদম পরিষ্কার করে রেখেছি। কোনও অসুবিধা হবে না।”
প্রণাম পেয়ে জিনিয়া খানিকটা ঘাবড়ে গেছিল। উদ্দালক হাসিমুখে বলল, “আরে এই তো পল্টু। ওর কথা বললাম না আপনাকে?”
জিনিয়া বলল, “ও হ্যাঁ।”
বাড়িওয়ালা সদাশিববাবু আর তাঁর স্ত্রী শোভনা গাড়ির শব্দ শুনে নেমে এসেছিলেন। জিনিয়াকে আদর করে গৃহপ্রবেশ করালেন।
উদ্দালক ঘরের অবস্থা দেখে খুশি হয়ে পল্টুকে বলল, “তুই এসব করেছিস?”

পল্টু বলল, "হ্যাঁ স্যার। বাবা বলল স্যার আসছেন বউদিকে নিয়ে, যা ভালো করে ঘর পরিষ্কার করে রাখ। বাবা মিষ্টিও পাঠিয়েছে।"
সদাশিববাবু বললেন, "আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ রান্না করতে হবে না।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। আজ তাহলে পল্টু পড়বি না?"
পল্টু মাথা চুলকে বলল, "কাল থেকে আসব স্যার?"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে।"
পল্টু খুশি হয়ে চলে গেল। সদাশিববাবুরা আরও কিছুক্ষণ বসে তারপর গেলেন।
ঘর ফাঁকা হলে উদ্দালক জিনিয়াকে বলল, "আপনি এই বেডরুমে শোবেন। আমি স্টাডিতে শোব। এসি লাগবে নাকি আপনার? তাহলে কিনে নেওয়া যাবে।"
জিনিয়া বলল, "এ ঘরে সৌপ্তিকের একটা ফটো লাগালে আপনি কি খুব রাগ করবেন?"
উদ্দালক বলল, "না না। রাগ করব কেন? এই ঘরটা আপনি ব্যবহার করবেন। তেমনই তো কথা হয়েছিল। কোনও সমস্যা নেই।"
জিনিয়া বলল, "এ বাড়ির ভাড়া কত? আমি যদি অর্ধেক টাকা দিই, তাহলে আপত্তি আছে?"
উদ্দালক বলল, "নো আপত্তি। মিষ্টি খাবেন? এখানকার মালাই চমচম বিখ্যাত। পল্টু নিশ্চয়ই সেই মিষ্টিই এনেছে। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।"
উদ্দালক মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে এল। জিনিয়া সেখান থেকে একটা মিষ্টি তুলে খেয়ে বলল, "সত্যি ভালো খেতে।"
উদ্দালক একসঙ্গে দুটো মুখে চালান করে দিয়ে বলল, "এখানে সব পিওর জিনিস। কোনও ভেজালের ব্যাপার নেই। এ কারণেই এখনও পড়ে আছি এখানে। শেষমেশ হয়তো কোথাও যাওয়াও হবে না। দেখা যাক কী হয়।"
জিনিয়া বলল, "আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি।"
উদ্দালক হাত ধুয়ে নিয়ে বলল, "কী?"
জিনিয়া বলল, "আপনার মা সৌপ্তিকের ব্যাপারে সবই জানেন। এ ব্যাপারে আমাকে বেশ কয়েকবার হিন্টও দিয়েছেন।"
উদ্দালক বলল, "ধুস, ওসব কথা নিয়ে চিন্তা করবেন না। কে কী বলল, সেসব নিয়ে ভাবলে আমাদের এগ্রিমেন্টটা ওয়ার্ক আউট করবে না। আপনি আপনার জগৎ নিয়ে থাকবেন, আমি আমার জগৎ নিয়ে। কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করব না। মনে করুন আমরা একটা হোস্টেলে আছি। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাব না। সিম্পল। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি দেখছি বেরিয়ে চপ শিঙাড়া কিছু পাওয়া যায় নাকি।"
উদ্দালক বেরিয়ে গেল। জিনিয়া ব্যাগ থেকে সৌপ্তিকের ফটো বের করে দেওয়ালে টাঙিয়ে সৌপ্তিকের হাসিমুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে চেঞ্জ করে নিল। খানিকটা কৌতূহল হতে উদ্দালকের স্টাডিরুমে ঢুকল। ঘরভর্তি শুধু বই আর বই। একটা ছোট্ট তক্তপোশ এক কোণে। বালিশও আছে তাতে।
জিনিয়া বইগুলো নেড়েঘেঁটে দেখতে দেখতেই উদ্দালক চলে এল, "বেগুনি পেয়ে গেলাম, খেয়ে নেবেন।"
জিনিয়া বলল, "আপনি এই ছোট্ট তক্তপোশে শুতে পারবেন?"
উদ্দালক বলল, "এখানেই তো ম্যাক্সিমাম দিন শুয়ে পড়ি। পড়তে পড়তে ঘুম চলে আসে। সব যে পড়ার বই, তা না। এই যেমন আপনার হাতে আছে ব্রজদার গুল্প সমগ্র। রূপদর্শী, মানে গৌরকিশোর ঘোষের লেখা। ছোট্ট বই, কিন্তু ইমপ্যাক্ট অ্যাটম বোমার সমান।"
জিনিয়া বইটা রেখে উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ। এরকম এগ্রিমেন্ট না থাকলে আমি সত্যি সমস্যায় পড়তাম।"

উদ্দালক হেসে বলল, “ধুস, যা হয়েছে দু পক্ষের ভালোর জন্যই হয়েছে। নিন নিন, বেগুনিটা ঠান্ডা হলে এক্কেবারে ভালো লাগবে না।“

৪

সদাশিববাবুর স্ত্রী রুটি, বেগুনভাজা, ডাল, মাংস করেছিলেন। তারা খেয়ে এলে জিনিয়া বেডরুমে গেল। উদ্দালক স্টাডিরুমে।

রাত এগারোটা।

উদ্দালক স্টাডিরুমে পড়ছিল। জিনিয়া এসে বলল, “একটু বসতে পারি এখানে? কী সব শব্দ আসছে। ভয় লাগছে।”

উদ্দালক হাসল, “শেয়াল ডাকার শব্দ। কলকাতা থেকে এলে একটু ভয় লাগাটা স্বাভাবিক। বসুন।”

জিনিয়া বসল। উদ্দালক বলল, “আপনি তো নিশাচর প্রাণী। বই পড়তে পারেন। ‘মার্ডার অন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস’ পড়েছেন?”

জিনিয়া মাথা নাড়ল।

উদ্দালক বলল, “আপনার পেছনের তাকের থার্ড র‍্যাকের সেকেন্ড বই। পড়ে দেখুন। ভারী ইন্টারেস্টিং।”

জিনিয়া বলল, “আপনার মুখস্থ থাকে?”

উদ্দালক বলল, “হ্যাঁ। নিজেই গুছিয়ে রাখি। মনে থাকে কোথায় কী রাখি। পড়ে দেখুন।”

জিনিয়া উঠল না। বলল, “আমার ইচ্ছে করছে না পড়তে। সৌপ্তিকের কথা মনে পড়ে রোজ এই সময়টা। আর কোনও কিছু করতেই ইচ্ছা করে না।”

উদ্দালক বলল, “আচ্ছা। তাহলে বসে থাকবেন?”

জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ।”

উদ্দালক বলল, “বেশ।”

সে বই পড়ায় মন দিল।

জিনিয়া বলল, “আপনি এগ্রিমেন্টটা এইজন্যই করেছেন যে আপনি নিজের জগতে থাকতে পারবেন, মানে এরকম বই পড়েই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান?”

উদ্দালক বলল, “হ্যাঁ। বিয়ে মানেই অনেক হ্যাপা। আমি নিতে পারতাম না।”

জিনিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। উদ্দালক একটা নোটপ্যাড নিয়ে বই থেকে নোট নেওয়া শুরু করল। জিনিয়া উঠে ঘর থেকে বেরোল। উদ্দালক সেটা লক্ষ করল, কিন্তু কিছু বলল না। ঘণ্টাখানেক বাদে জিনিয়া এসে বলল, “আমাকে একদিন সৌপ্তিকদের বাড়ি নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কবে যাব?”

উদ্দালক বলল, “কালকেই যেতে পারি। আমার স্কুল কাল ছুটি আছে। কাল চলুন। কোনও অসুবিধে নেই।”

জিনিয়া বলল, “পরশু থেকে আমারও অফিস আছে। কী করে যাতায়াত করব?”

উদ্দালক বলল, “আমি একটা টোটো দেখে রাখব। স্টেশনে দিয়ে আসবে। তারপর পারবেন তো?”

জিনিয়া ঘাড় নাড়ল। উদ্দালক বই রেখে বলল, “আমি এবার ঘুমিয়ে পড়ব। আপনি কি এখানেই বসে থাকবেন?”

জিনিয়া বলল, “না, ঠিক আছে। আমি ও ঘরে যাচ্ছি।”

উদ্দালক বলল, “এখানে কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই। দরজা জানলা খুলে শুলেও কেউ আসবে না। নিরুপদ্রব জায়গা। নিশ্চিন্তে থাকুন।”

উদ্দালক তক্তপোশে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

জিনিয়া উঠে বেডরুমে গিয়ে ছিটকিনি দিল। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। সৌপ্তিকের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ ধরে। খাটে শুয়ে ছটফট করল কিছুক্ষণ। জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তাঘাট

শুনশান। বাড়ির বাইরে রাস্তায় স্ট্রিটলাইট জ্বলছে। তাদের পাড়ার কুকুরটার মতো একটা কুকুর শুয়ে আছে রাস্তার উপরে।
বেডরুমে একটা টিভি আছে। জিনিয়া টিভি চালাল কম ভলিউমে। কিছুক্ষণ দেখে বন্ধ করে দিল। টিভির নিচে একটা ডায়েরি রাখা। ডায়েরিটা খুলে দেখল একটা হিসেব করেছে উদ্দালক, হিসেবটা এক বছর আগের। এরকম লেখা—
১২-৩-২০১৯
পল্টুদের দোকান থেকে আনা হয়েছে
১ কিলো চাউল, না না চাউল না, চাল
৫০০ গ্রাম মুগ ডাল।
১ কিলো আলু।
১ কিলো পেঁয়াজ।
হলুদের প্যাকেট।
পোস্তর প্যাকেট।
এক প্যাকেট সিগারেট (সিগারেট ছেড়ে দিতে হবে। সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়)

তারপরের দিন আর কোনও হিসেব লেখা নেই। পরপর কয়েকটা লাইন লেখা
বৃষ্টি হবে
আকাশ পাতাল
বৃষ্টি ভেজা
শুকনো বাতাস।
আমের পরশ পাতায় পাতায়...
(আমের পরশ পাতায় পাতায়? ধুস, আমার দ্বারা কবিতা হবে না)

তার পরের পাতায় উদ্দালক লিখেছে—
ক্লাস সেভেন বি-তে পড়াতে হবে। জীবনে আমার একটাই দুঃস্বপ্ন ছিল। সেভেন বি। সে স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। এরপর আমি একে একে সব ক্লাসের বি বা সি সেকশন পড়াব। কোনও ছাত্র আমার কথা শুনবে না। হেডস্যার আমায় বকা দেবেন। জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠবে। ঠিক আছে। এই ডায়েরিতে আর কিছু লিখব না। এলোমেলো লেখা হয়ে যাচ্ছে।

এরপরে ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই। জিনিয়ার কৌতূহল হল। উদ্দালকের আর কোনও ডায়েরি আছে? ঘরে কোনও ডায়েরি দেখতে পেল না সে।

৫

সৌপ্তিকদের বাড়ির তালা খুলে জিনিয়া বলল, “কদিন এলাম না। নোংরা হয়ে গেছে।”
উদ্দালক বলল, “বাগানটা কিন্তু ভারী সুন্দর। অযত্নে গাছগুলো মরে যাচ্ছে। আগাছাও হয়েছে। এখানে কিছু গাছ লাগানো যেতে পারে।”
জিনিয়া ঝাঁটা বের করে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল।
উদ্দালক ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। জিনিয়া একটা ঘর দেখিয়ে বলল, “এটা সৌপ্তিকের ঘর। খাটের ওপর অ্যালবাম রাখা আছে। দেখুন।”
উদ্দালক সৌপ্তিকের ঘরে ঢুকল।

ঘরে সৌপ্তিকের একটা বাঁধানো ছবি রাখা। সে একটা ন্যাকড়া জোগাড় করে ছবিটা মুছে দিল। জিনিয়া সেটা দেখে কিছু বলল না। বলল, "লাঞ্চে কী খাবেন? রান্না করব?"
উদ্দালক বলল, "কী দরকার আছে? খাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে। আমি বই নিয়ে এসেছি। পড়ছি, আপনি সময় নিন।"
জিনিয়া বলল, "ঠিক আছে।"
উদ্দালক ড্রয়িং রুমের সোফায় বসে বই পড়তে শুরু করল।
জিনিয়ার ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছিল। সে সৌপ্তিকের অ্যালবাম দেখতে বসল।
উদ্দালকের ফোন বাজছিল। দেখল মা ফোন করছে। ধরল, "বলো।"
মা বলল, "কী খবর তোর? কী করছিস?"
উদ্দালক বলল, "কলকাতা এসেছি।"
মা বলল, "কী করতে?"
উদ্দালক বলল, "ওর অফিসের কিছু কাজ ছিল। সেগুলো মিটিয়ে নিয়ে ফিরব।"
মা বলল, "হুঁ। সংসার কিছু করছিস, না আগের মতোই করে যাচ্ছিস?"
উদ্দালক বলল, "কেন সংসার করব না? বিয়ে দিয়েছ তো সংসার করার জন্যই। দারুণ সংসার করছি।"
মা বলল, "আমি দেখতে যাব?"
উদ্দালক বলল, "কেন আসবে না? অবশ্যই আসবে। তুমি আসতে চেয়েছ আর আমি আটকেছি, কোনও দিন হয়েছে?"
মা বলল, "দেখ বাবু, আমি তোর কিছুই বুঝতে পারিনি। তুই আমার ছেলে, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তুই অনেক দূরের কেউ। তুই এই মেয়েকে নিয়ে সুখে থাকতে পারবি?"
উদ্দালক বলল, "না পারার তো কোনও কারণ নেই।"
মা বলল, "তোকে ওর আগের প্রেমিকটার কথা কিছু বলেছে?"
উদ্দালক আড়চোখে দেখল জিনিয়া মন দিয়ে সৌপ্তিকের অ্যালবাম ঝাড়পোঁছ করছে। সে বলল, "হ্যাঁ, সব তো বলেনি। বলেছে কিছুটা। এরকম অনেকেরই থাকে। এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"
মা বলল, "আমি মাথা ঘামাব না তো কে ঘামাবে? আমাকেই তো মাথা ঘামাতে হবে! অদ্ভুত জেদ করে বিয়েটা করলি জোর করে। সব কথা আমাকে খুলেও বলিস না। তুই কি আমাকে শত্রু মনে করিস?"
উদ্দালক বলল, "তা না মা। এখানে শত্রু মিত্র কোনও ব্যাপার নেই। অহেতুক রিঅ্যাক্ট করছ তুমি।"
মা বলল, "জিনিয়ার বাবা বলছিলেন দুই ফ্যামিলি একসঙ্গে কোথাও একটা ঘুরতে গেলে ভালো হয়। যাবি?"
উদ্দালক বলল, "আমার তো স্কুল আছে। তোমরা ঘুরে এসো।"
মা ধমক দিল, "যখনই কোনও কাজের কথা বলি, তুই স্কুল দেখিয়ে দিস। গরমের ছুটিতে তো যেতে পারবি। যাবি কি না বল, তাহলে টিকেট কাটতে দেব।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখি ওর অফিস ছুটি পাবে নাকি, তাহলে জানাব।"
মা গজগজ করতে লাগল, "আর-এক নতুন ঝামেলা শুরু হয়েছে। আমরা কিছু ঠিকও করতে পারব না?"
উদ্দালক বলল, "কেন করতে পারবে না? আমি কি না বলে দিয়েছি? আমি বললাম কথা বলে জানাব। রাগ করছ কেন? প্রেশারের ওষুধ খেয়েছ?"
মা বলল, "খেয়েছি। তোর চিন্তায় আমার ঘুম হয় না ভালো করে। প্রেশার সুগার সব বেড়ে যাবে।"
উদ্দালক বলল, "চিন্তা করার কিছু নেই মা। আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, চাকরি করছি, খাচ্ছি ঠিকঠাক। কত লোক আছে খেতেই পায় না ঠিক করে। চাকরি পর্যন্ত পেতে তাদের কত কষ্ট। তাদের থেকে তো ভালো আছি। অকারণ চিন্তা কোরো না। নিজের খেয়াল রাখো। রাখি?"
ফোন রেখে উদ্দালক শ্বাস ছেড়ে বই পড়তে শুরু করল। জিনিয়া বলল, "আমি এই অ্যালবামটা নিয়ে যাব।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। ওঁরা কিছু মনে করবেন না তো? ওঁদের বলে নেবেন।"
জিনিয়া একটু থমকে বলল, "তা ঠিক, না বলে নেওয়া যাবে না।"
উদ্দালক সোফার ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। সকাল সকাল ট্রেনে করে কলকাতা আসার ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে গেছিল তার।
জিনিয়া বলল, "আপনি খাটে শুতে পারেন।"
উদ্দালক বলল, "না ঠিক আছে। আপনার হয়ে গেলে ডাকবেন। আমি একটু ঘুমাই।"
শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্দালক ঘুমিয়ে পড়ল।

৬

শেয়ালদা স্টেশন থেকে তারা ট্রেনে উঠল বিকেল নাগাদ। অফিস টাইমের ভিড়। জিনিয়াকে বসিয়ে তার সামনে বসে উদ্দালক বলল, "ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে পারবেন?"
জিনিয়া বলল, "পারব। পারতে হবে। না পারলে হবে না, চাকরি ছাড়তে পারব না।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। প্রথমদিকে নাহয় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।"
জিনিয়া বলল, "না না পারব।"
উদ্দালক আর কিছু বলল না।
সন্ধে সাতটা নাগাদ তারা ট্রেন থেকে নামল। অটো নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল পল্টু দাঁড়িয়ে আছে। উদ্দালক জিভ কাটল, "দেখলেন, পল্টু আসবে ভুলেই গেছিলাম।"
দরজা খুলল উদ্দালক। পল্টু বলল, "স্যার, কাল স্কুলে যাবেন তো?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ। কেন রে?"
পল্টু বলল, "মিষ্টি নিয়ে যাবেন স্যার। সব স্যাররা বলছিল আপনি এলেই খাওয়াতে বলবে। আপনি আগে থেকেই মিষ্টি নিয়ে যাবেন।"
উদ্দালক জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল, "এখানকার নিয়ম এটাই। রিটায়ারমেন্ট থেকে বিয়ে, সবেতেই খাওয়াতে হয়। এদিকে দেখুন এখানে সবাইকেই বিয়েতে বলেছিলাম, কেউ গেলেন না। জানে অত দূরে গিয়ে কী হবে, সেই তো স্কুলে খাওয়াদাওয়া হবে।"
জিনিয়া হাসল। উদ্দালক পল্টুকে বলল, "যা স্টাডিতে গিয়ে অঙ্কগুলো করতে শুরু কর। আমি আসছি।"
পল্টু স্টাডিরুমে গিয়ে বসল।
উদ্দালক ফ্রেশ হয়ে পড়াতে বসল। জিনিয়া কিছুক্ষণ টিভি দেখল। তার খিদে পাচ্ছিল। সেই দুপুরের পরে আর খাওয়াও হয়নি।
উদ্দালক ঘর নক করল। জিনিয়া খুলে দেখল উদ্দালকের হাতে রোল। উদ্দালক বলল, "এখানকার রোল। কলকাতার মতো লাচ্চা পরোটার রোল না, তবে খেতে ভালো। আপাতত এই খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করুন, পল্টু দেশি মুরগি নিয়ে আসছে, রাতে রুটি দিয়ে সেই খাওয়া যাবে। আপনি দেশি মুরগির ঝোল খান তো?"
জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"
কিছুক্ষণ পরেই রান্নাঘরে ছাত্র শিক্ষকের চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হল। পল্টু মাংস ধুয়ে নিল। উদ্দালক একটা বারমুডা আর গামছা পরে রান্না শুরু করল। জিনিয়া বলল, "আমি কিছু করে দেব?"
উদ্দালক বলল, "আপনি? না না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমরাই করে নিচ্ছি।"
পল্টু গম্ভীর গলায় বলল, "স্যার, বউদি আটা মেখে দিতে পারবেন?"
জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ পারব। দাও।"
উদ্দালক বলল, "না না, কী দরকার, আমরা করে নিচ্ছি।"
জিনিয়া বলল, "না ঠিক আছে। আমি রুটি করতে পারি। কটা রুটি করতে হবে?"
উদ্দালক বলল, "আপনি কটা খাবেন?"

জিনিয়া বলল, “তিনটে।”
উদ্দালক বলল, “আমিও তিনটে। আর পল্টুর জন্য বারোটা। মানে আঠেরোটা রুটি করতে হবে।”
জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, “পল্টু বারোটা খেতে পারবে?”
উদ্দালক হাসল, “ও হল বাংলার দামাল ছেলে। এই সাঁতার কাটছে, এই দৌড়োচ্ছে, সারাক্ষণ ওর খিদে পায়। আপনার অসুবিধে হলে থাক। আমি রুটি করে দিচ্ছি।”
জিনিয়া বলল, “না না, আমি করে নেব। কোনও অসুবিধা নেই। করছি।”
তিনজনে মিলে দেড় ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়ে গেল। বেশিরভাগ মাংস পল্টুই খেল। খাওয়ার পর পল্টু বলল, “স্যার রসগোল্লা নিয়ে আসব? এরকম সুন্দর রান্নার পর রসগোল্লা ভালো লাগবে।”
উদ্দালক বলল, “থাক। তোকে আর বেরোতে হবে না। আমি সাইকেল নিয়ে গিয়ে নিয়ে আসছি। তুই বউদির কাছে বস।”
উদ্দালক বেরিয়ে গেল।
পল্টু বলল, “বউদি আপনি জামরুল খাবেন? আমাদের বাড়িতে দারুণ জামরুল হয়।”
জিনিয়া হাসল, “ঠিক আছে। নিয়ে এসো।”
পল্টু উৎসাহ পেয়ে বলল, “আমি ভালো গাছও বাইতে পারি। ডাব হলে পেড়ে নিয়ে আসব।”
জিনিয়া বলল, “তুমি এইটুকু বয়সে এত সব কিছু পারো?”
পল্টু দাঁত বের করল, “হ্যাঁ বউদি। সব পারি। স্যার পারেন না। আমি একদিন স্যারকে বললাম স্যার চলুন নারকেল গাছ বাই, বললেন ওরে বাবা, ওসব আমি পারব না। নারকেল গাছ বাওয়া কী এমন কঠিন বলুন?”
জিনিয়া বলল, “সেটা তো আমিও জানি না। আমিও কোনও দিন নারকেল গাছ বাইনি।”
পল্টু হাত-টাত নাড়িয়ে গাছ বাওয়া নিয়ে জ্ঞান দিতে শুরু করল। জিনিয়ার শুনতে মজা লাগছিল। এই কৈশোরের স্বাদ তারা পায়নি। কংক্রিটের জঙ্গলে আর মোবাইলের যুগে এখনও এই কৈশোর বেঁচে আছে, এটাও কম নয়।
উদ্দালক এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। বলল, “রসগোল্লার সঙ্গে পান্তুয়াও নিয়ে এসেছি। এখানকার বিখ্যাত। আর আপনার জন্য টোটো বলে এলাম। কাল সাড়ে সাতটার সময় চলে আসবে। আটটা দশের লেডিস স্পেশাল পেয়ে যাবেন।”
পল্টু রসগোল্লা মুখে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, “আচ্ছা স্যার, বউকে কি কেউ আপনি করে কথা বলে?”
জিনিয়া হাঁ হয়ে গেল। উদ্দালক হো হো করে হেসে উঠল।

৭

অগ্নি টিভি দেখছিলেন। মালতী এসে বসলেন, “মেয়েটার জন্য চিন্তা হয় খুব।”
অগ্নি বললেন, “কেন? বিয়ে বিয়ে করে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছিলে তো। এখন চিন্তা হচ্ছে কেন?”
মালতী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “তিন্নিকে তোমার আমার থেকে কি কেউ বেশি চেনে? ছোটো থেকেই মারাত্মক জেদি মেয়ে। যেটা ঠিক করে, সেটাই করে এসেছে বরাবর। সে মেয়ে হঠাৎ করে নিজে থেকেই বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেল, সংসার করতে চলে গেল, আমার এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।”
অগ্নি বললেন, “তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে বিশ্বাস করো। এতদিন আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছিলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বলে। আমি বলেছিলাম, ওকে কিছুদিন সময় দাও। দিলে না। এখন যখন ও বিয়ে করেও নিল, তখনও তোমার অসুবিধা হচ্ছে। শোনো, উদ্দালক ছেলেটাকে তো আমি দেখেছি। খুবই ভদ্র এবং ভালো ছেলে। সময় দাও। মিটে যাবে সব কিছু।”
মালতী বললেন, “তুমি তিন্নিকে চেনো না? মিটে যাবে বলে তোমার মনে হয়?”
অগ্নি বললেন, “তাহলে মেয়ের বিয়ে দিলে কেন?।”

মালতী মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "আমার কিছু ভালো লাগছে না।"
অগ্নি বললেন, "প্রবলেম ক্রিয়েট করতে তোমার কোনও জুড়ি নেই, জানো তো?"
মালতী বলল, "তাহলে কী করতাম? সৌপ্তিকের ছবি নিয়ে বসে থাকছে, মাঝরাতে বিয়ের বেনারসি, গয়না পরে বসে থাকছে, আমি একা কত প্রেশার নেব? পারা যায়?"
অগ্নি বললেন, "নিতে হবে না। প্রেশার নিয়ো না। অসংখ্য ফ্যামিলি ভালোবাসাহীনতাতেই টিকে রয়েছে চিরকাল। আর যদি না টিকতে পারে, ডিভোর্স করে নেবে। ও সেলফ ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে। ওর কোনও অসুবিধা হবে না।"
মালতী আর্তনাদের মতো শব্দ করে বললেন, "এ কথা তুমি বলতে পারলে? শেষে ডিভোর্স? সমাজে কোনও মান সম্মান থাকবে আর?"
অগ্নি বললেন, "না থাকার কী আছে? ডিভোর্স কী এমন হাতি ঘোড়া ব্যাপার? এতে মান সম্মান যাবে কেন? কম্প্যাটিবল হয়নি একটা সম্পর্ক, ভেঙে গেছে। যেতেই পারে। নো বিগ ডিল।"
মালতী বললেন, "তুমি সব কিছু এত ছোটো করে দ্যাখো কেন? এতগুলো টাকা খরচ করে বিয়েটা হল, এত এত লোক খেয়ে গেল, তারা যখন জানবে বিয়েটা ডিভোর্স হয়ে গেছে, তখন ভালো লাগবে?"
অগ্নি হেসে ফেললেন, "তোমাকে এত কে ভাবতে বলেছে বলো তো? এই রদ্দি সিরিয়ালগুলো আছে, সেগুলো দেখে সময় কাটাও না। বেশি ভেবে ফ্যালো, বেশি রিঅ্যাক্ট করে ফ্যালো। এগুলো ধীরে ধীরে কমিয়ে ফ্যালো বরং। নির্লিপ্ত থাকো। মেয়েটা বড়ো হয়েছে, ওর লাইফের ডিসিশন ওকেই নিতে দাও। সব কিছুতে নাক গলাতে যেয়ো না। থাকুক ওরা ওদের মতো। যা হবে দেখা যাবে।"
মালতী বললেন, "আমি পারি না। আমার চিন্তা হয়।"
অগ্নি বললেন, "পারতে হবে। শরীরে, মনে নির্লিপ্ততা আনতে হবে। ভাবো তো, সৌপ্তিকের খবরটা পাওয়ার পরে তিন্নি ঠিক কীসের মধ্যে দিয়ে গেছিল? ওকেও তো বুঝতে হবে! গোটা সমাজের লোক কী ভাববে বুঝতে পারছ, মেয়ের ডিভোর্স হলে তারা কী বলবে সেটা বুঝতে পারছ, আর নিজের মেয়ের কষ্টটা বুঝতে পারছ না, তাহলে কী করে হবে?"
মালতী কেঁদে ফেললেন, "আমি কি এতটাই খারাপ?"
অগ্নি বললেন, "খারাপ তো কেউ বলেনি তোমাকে! একবারও বলিনি তুমি খারাপ। আমি শুধু বলতে চাইছি তুমি এবার তিন্নির থেকে বেরিয়ে এসো। ঠাকুরের শরণাপন্ন হও। তাও যদি না পারো, তাহলে বই পড়ো, সিনেমা দ্যাখো। বাজার-টাজার করো। মোদ্দা কথা, তিন্নিকে রেহাই দাও। ও তো ওর কোনও সমস্যা তোমার কাছে এসে ডিসকাস করে না। তুমি কেন অকারণ ওর সমস্যার মধ্যে ঢুকতে চাইছ? মেয়ে বড়ো হয়েছে। বোঝো, বুঝতে চেষ্টা করো।"
মালতী থমথমে মুখে বসে রইলেন।

৮

ঘেমে নেয়ে অফিসে পৌঁছল জিনিয়া। সুলগ্না দেখে বলল, "কি রে, এই অবস্থা কেন?"
জিনিয়া বলল, "এখন রোজই এই অবস্থা হতে চলেছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করব।"
সুলগ্না বলল, "ওহ, সে তো ভুলেই গেছিলাম। তারপর কেমন কাটছে ম্যারেড লাইফ? শাঁখা, সিঁদুর কোথায়?"
জিনিয়া বলল, "ওসব পরে কী হবে? সত্যিকারের তো আর বিয়ে করিনি। কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজে আবার ওসব পরে নাকি?"
সুলগ্না বলল, "তাও ঠিক। আচ্ছা বসের সঙ্গে দেখা করে আয়। খোঁজ করছিলেন।"
সুপ্রতিম চেম্বারে কাজ করছিলেন। জিনিয়া নক করে প্রবেশ করল। সুপ্রতিম বলল, "কেমন কাটছে ম্যারেড লাইফ জিনিয়া?"

জিনিয়া হাসল, “ভালো স্যার।”
সুপ্রতিম বললেন, “তুমি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করবে এখন?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ স্যার।”
সুপ্রতিম বললেন, “পারবে তো?”
জিনিয়া বলল, “প্রথম কদিন অসুবিধা হবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।”
সুপ্রতিম বললেন, “হ্যাঁ তা হবে। তোমার অফিস ভেহিকেল লাগলে নিয়ে নেবে। ওকে?”
জিনিয়া বলল, “থ্যাংকিউ স্যার।”
ডেস্কে এসে বসে জিনিয়া দেখল উদ্দালক ফোন করছে। ধরল সে, “হ্যাঁ, আমি পৌঁছেছি।”
উদ্দালক বলল, “ফেরার সময় ট্রেনে উঠতে পারবেন তো?”
জিনিয়া বলল, “হ্যাঁ, পারব। অসুবিধা হবে না।”
উদ্দালক বলল, “ওকে। আমি স্কুলে বেরোলাম। বাই।”
ফোনটা রেখে জিনিয়া কম্পিউটার অন করল। সুলগ্না এসে বলল, “আচ্ছা জিনিয়া, আমাকে একটা কথা বলবি?”
জিনিয়া বলল, “কী?”
সুলগ্না তার দিকে তাকিয়ে বলল, “সিরিয়াসলি নো ফিজিক্যাল রিলেশন? আই মিন, তোর বর তো বেশ হ্যান্ডু রে, তোর ইচ্ছা করেনি?”
জিনিয়া কঠিন মুখে বলল, “আমার বর বলে কিছু নেই। তুই জানিস ব্যাপারটা কী। বারবার এভাবে মেনশন করলে ভালো লাগবে না আমার।”
সুলগ্না বলল, “ওকে, ওকে। এক্সট্রিমলি সরি। জাস্ট এক লাইনে বল, ঠিক কী হচ্ছে তোদের দুজনের মধ্যে?”
জিনিয়া বলল, “কিছুই হচ্ছে না। আমরা দুজন আলাদা দুটো ঘরে থাকি জাস্ট লাইক হোস্টেল। সিম্পল। অ্যান্ড ডেফিনিটলি হি ইজ এ জেন্টলম্যান। ভীষণ ভদ্রলোক। কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।”
সুলগ্না মুখ চুন করে বলল, “এই হয় তো, যারা সত্যিকারের ভালো ছেলে, তারা এরকম উলটোপালটা বিয়ে করে দিন কাটিয়ে দেয়।”
জিনিয়া বলল, “মানে?”
সুলগ্না বলল, “মানে আবার কী? ভালো ছেলেগুলো আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না, কিছু প্লেবয় পড়ে থাকে, আর কিছু ঠরকি বুড়ো। নইলে দেখ, তোর তো বিয়ের দরকার ছিল না, কিন্তু ভালো ছেলে পেয়ে গেলি। দিস ইজ কলড সৌভাগ্যবতী মেয়ে।”
জিনিয়া বলল, “এরকম ব্যাপার? উদ্দালকের সঙ্গে কথা বলব? ওকে বিয়ে করবি?”
সুলগ্না বলল, “থাক ভাই। মিছে আশা দেখাস না আর। কষ্ট হয়। তবে তুই যা ডেসক্রিপশন দিচ্ছিস, সে অনুযায়ী এ ছেলে একদিকে ভদ্র, অন্যদিকে কোল্ড হার্টেড। এসব ছেলের থেকে দূরে থাকাই ভালো। এরা কাউকে ভালোবাসতে পারে না।”
জিনিয়া বলল, “ভালোবাসাটা চাইনি বলেই তো এই বিয়েটা করেছি সুলগ্না। দেখা যাক, সব কিছু কোন দিকে যায়। ভদ্রলোকের সম্পর্কে আমার এখন অবধি কোনও অভিযোগ নেই।”
সুলগ্না বলল, “আচ্ছা? প্রেমে পড়ে যাচ্ছিস না তো আবার?”
জিনিয়া ছিটকে গেল খানিকটা। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।
সুলগ্না বলল, “কী হল?”
জিনিয়া কড়া গলায় বলল, “আমার সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি না মারলেই খুশি হব। প্লিজ।”
সুলগ্না জিনিয়ার কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বলল, “সরি ইয়ার। এক্সট্রিমলি সরি। আমি অত ভেবে কিছু বলিনি।”

জিনিয়া বলল, "ওকে। নাও, জাস্ট লিভ মি অ্যালোন।"
সুলগ্না বলল, "রেগে গেলি?"
জিনিয়া বলল, "না, ঠিক আছে। প্লিজ এখন যা। ভালো লাগছে না।"
সুলগ্না বলল, "এক্সট্রিমলি সরি। আবার সরি বলছি। প্লিজ রেগে থাকিস না।"
জিনিয়া চুপ করে রইল।
সুলগ্না নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল। জিনিয়া কিছুক্ষণ কাজ করে ওয়াশরুমে গিয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেলল। কিছুক্ষণ কেঁদে সুপ্রতিমের চেম্বারে গিয়ে বলল, "স্যার এখন একটু বেরোতে হচ্ছে। দরকার পড়েছে হঠাৎ একটা।"
সুপ্রতিম বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। গাড়ি লাগবে?"
জিনিয়া বলল, "না স্যার।"
সুপ্রতিম বললেন, "ঠিক আছে। সাবধানে যাও।"
জিনিয়া আর দাঁড়াল না। বেরিয়ে গেল।
ট্যাক্সি নিয়ে সৌপ্তিকদের বাড়ি পৌঁছল। দরজা খুলে সৌপ্তিকের ঘরে গিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

৯

স্কুলে ঢুকেই সুদেববাবুর তোম্বা মুখটা দেখল উদ্দালক। সে হেসে বলল, "সব ঠিক তো স্যার?"
সুদেববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "হুম।"
টিচার্সরুমে যেতে সবাই হইহই করে উঠলেন। তারাপদবাবু বললেন, "হালকায় ছেড়ে দেব না কিন্তু বাপু। বিয়ের মেনুটাই স্কুলে করতে হবে। শুধু মিষ্টিতে হবে না।"
উদ্দালক বলল, "আচ্ছা বেশ। আপনাদের এই প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম।"
বিরাট একটা গিফট প্যাকেট তার জন্য রাখা হয়েছিল। উদ্দালককে সব শিক্ষক মিলে সেটা দিলেন। হেডস্যার বললেন, "অদ্ভুত ছেলে তো বাপু তুমি? এই কদিন ছুটিতেই হয়ে গেল? কোথাও বেড়াতে গেলে না?"
উদ্দালক হাসল, "হ্যাঁ স্যার, মানে যাব, আপনাকে বলা হয়নি, যাব।"
হেডস্যার বললেন, "ঠিক আছে। ছুটিছাটা লাগলে আমাকে বলবে।"
সারাদিনই ক্লাস ছিল। স্কুল থেকে বেরিয়ে উদ্দালক সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছে এমন সময় দেখল জিনিয়ার মা ফোন করছেন, উদ্দালক ধরল, "হ্যাঁ বলুন।"
মালতী বললেন, "বলছি জিনিয়াকে ফোনে পাচ্ছি না বাবা। ও কি ফিরেছে?"
উদ্দালক থমকে গিয়ে বলল, "অফিসে ফোন করেছিলেন?"
মালতী বললেন, "ওর বন্ধু আছে সুলগ্না বলে একজন। সে বলল ফার্স্ট হাফেই বেরিয়ে গেছে। ফোনও পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি না ঠিক, কী হল।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। আপনি রাখুন, আমি দেখছি।"
ফোন রেখে উদ্দালক জিনিয়ার ফোনে চেষ্টা করল। ফোন নট রিচেবল বলছে।
সাইকেল নিয়ে সে সোজা স্টেশনে চলে গেল।
কপাল ভালো ট্রেন এসে গেছিল। টিকেট কাটার সময় পেল না। মাথাতেও আসেনি টিকেট কাটার কথা। সৌভাগ্যবশত রাস্তায় বা শিয়ালদা স্টেশনে তার চেকিং হল না। শিয়ালদায় নেমে ট্যাক্সি করে সে যখন সৌপ্তিকদের বাড়ি পৌঁছল, তখন রাত সাড়ে আটটা বাজে। দেখল আলো জ্বলছে।
খানিকটা ইতস্তত করে কলিং বেল বাজাল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় জিনিয়া এল।
উদ্দালক বলল, "বাড়িতে ফোন করেননি, আপনার বাড়ির লোক চিন্তা করছে তো।"
জিনিয়া গেট খুলে তার কথার উত্তর না দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

উদ্দালক বাড়িটায় ঢুকে সৌপ্তিকের ঘরে গেল। বিছানা এলোমেলো। সৌপ্তিকের ছবি নামিয়ে খাটে রাখা। বোঝা যাচ্ছে ওর ছবি জড়িয়ে ধরে জিনিয়া শুয়ে ছিল।
উদ্দালক বলল, "রাতে যিনি থাকেন, কখন আসবেন?"
জিনিয়া বলল, "জানি না। আপনি কেন আসতে গেলেন? আমি খবর পাঠিয়ে দিতাম।"
উদ্দালক বলল, "আপনার মা চিন্তা করছিলেন। আমার কেন জানি না মনে হল আপনি এখানেই আছেন। তাই চলে এলাম।"
জিনিয়া বলল, "আপনার খুব দায়, না?"
উদ্দালক বলল, "কীসের দায়?"
জিনিয়া বলল, "ভালো থাকার? সবার কাছে ভালো সেজে বেড়ান, খুব দায় আপনার, না?"
উদ্দালক রাগল না। বলল, "নাহ্। আমার সেসব দায় নেই। দায়িত্ব আছে বলতে পারেন। এই যেমন এখানে আপনি একা আটকে গেলে কোথায় যাবেন, সেটা নিয়ে ভাবলাম একবার। একই বাড়িতে থাকি আমরা। একটা হোস্টেলে থাকলেও তো রুমমেটের জন্য চিন্তা হয়। ব্যাপারটা সেরকমই।"
জিনিয়া বলল, "আমি কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব।"
উদ্দালক বলল, "সে থাকুন। এখান থেকে আপনার অফিসে যেতেও সুবিধা হবে। তবে যাঁদের বাড়ি, তাঁদের পারমিশন নিতে হবে। এই বাড়িতে আর-একজন রাতে থাকতে আসবেন। তিনি লোক হিসেবে কেমন, তাও জানেন না। ব্যাপারগুলো মিটিয়ে থাকতে চেষ্টা করুন বরং। তাহলে সুবিধা হবে।"
জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
উদ্দালক সৌপ্তিকের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চুপ করে বসল। কিছুক্ষণ পর জিনিয়ার কান্নার আওয়াজ থেমে এল। শান্ত হল সে। বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "চলুন।"
উদ্দালক উঠল। জিনিয়া বলল, "সরি।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। এগুলো হতেই পারে। এখন অনেক রাত হয়েছে। কাল তো আপনাকে আবার আসতে হবে। এখানে থাকবেন কি? রাতে যিনি আসবেন, তাঁকে নাহয় আজ আসতে বারণ করে দেবেন?"
জিনিয়া বলল, "থাকতে পারব না আমি এখানে। পারছি না। আমার আজ শুধু মনে হচ্ছে ওকে আমি ঠকালাম বিয়ে করে।"
উদ্দালক বলল, "আপনি মাথা ঠান্ডা করুন। কেউ কাউকে ঠকায়নি। আপনি থাকবেন না এখানে তো? ঠিক আছে, চলুন শিয়ালদাই যাওয়া যাক।"
জিনিয়া বলল, "আপনি একদম ভালো সাজবেন না। আপনার ভালো সাজার নাটক আমি আর নিতে পারছি না।"
উদ্দালক বলল, "আচ্ছা বেশ। চলুন, শিয়ালদা তো যাবেন? ট্রেন ধরতে হবে তো। চলুন।"
জিনিয়ার চোখে আবার জল চলে এসেছিল। চোখ মুছে সে বলল, "চলুন।"

১০

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। পল্টুকে বলা ছিল। একজন চেনা টোটোওয়ালা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিল। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে পল্টু সাইকেল নিয়ে গেছিল আগেই।
উদ্দালক সারা রাস্তা কোনওরকম কথা বলেনি। জিনিয়া পাথরের মতো বসে ছিল। পল্টুকে বলা ছিল। পল্টু অত রাত অবধি তার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। রুটি, তরকারি দিয়ে তারপর গেল।
উদ্দালক দরজা খুলে বলল, "ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নিন।"
জিনিয়া বলল, "আমার খিদে নেই।"
উদ্দালক বলল, "খিদে না থাকলেও খেতে হয়। আমিও খিদে না থাকলেও অনেক সময় খাই। প্রথম যখন হস্টেলে থাকতে গেছিলাম, সারাদিন বাড়ির জন্য মনখারাপ করত। খাওয়ার ওপর কোনও রাগ দেখাবেন না।

পারলে গরম জলে স্নান করুন। ভালো লাগবে।”
জিনিয়া আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকল। সত্যি সত্যিই সে গরম জলে স্নান করে বেরিয়ে চেঞ্জ করে খেতে বসল। উদ্দালক সেটা দেখল, তবে কিছু বলল না।
সেও খেতে বসল। বলল, “রাত দেড়টার সময় রুটি ভালো লাগে না, যাই বলুন। সেই ট্রেনে দূরে কোথাও যেতে হলে বাড়ি থেকে শুকনো পরোটা করে দেয় না? দারুণ লাগে।”
জিনিয়া বলল, “আমি সরি। আপনার সঙ্গে আমি হঠাৎ করেই খুব খারাপ ব্যবহার করে ফেললাম, যেটা করা উচিত হয়নি। তবে আপনার মনে হয় না আপনি একটু বেশিই ভালো সাজছেন? এতটা ভালো হয় কি লোকে?”
উদ্দালক হেসে ফেলল। বলল, “দেখুন, আমি ভালো নই একবারেই। এটা এক্কেবারে ভুল ধারণা। প্রতিটা মানুষের ডার্ক সাইড থাকে। আমারও আছে। আমি সেলফিশ লোক। বিয়ে থা করতে চাইনি। এদিকে বাড়ি থেকে ক্রমাগত জোর দিয়ে যাচ্ছিল। আমি পড়াশোনা করতে চাই। পৃথিবী দেখতে চাই। বিয়ে করলে তো সেটা সম্ভব ছিল না। আমি দেখলাম আপনি চাকরি করেন। সেলফ ডিপেন্ডেন্ট। আমাকে কোনও দিন ভালোবাসবেন না। তার মানে ইমোশনালি পিছুটানের কোনও ব্যাপারও নেই। আপনাকে কলকাতায় রেখে আমি দিব্যি বেরিয়ে পড়তে পারব। এবার বলুন তো, আমার এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমি কেন আপনাকে বিয়ে করব না? সব দিক থেকেই আপনি আমার জন্য পারফেক্ট পাত্রী। আমার পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আপনি ছাড়া কোনও অপশন আছে নাকি? আর ভালো সাজার কথা বলছেন? খামোখা খারাপই বা সাজতে হবে কেন? দুজন রুমমেট আছে। একজন রুমমেট একটু সমস্যায় পড়লে আর-একজন যাবেই। কাল আমার শরীর খারাপ হলে আপনি প্যারাসিটামল কিনে আনবেন না? ব্যাপারটা এই। আর কিচ্ছু না।”
জিনিয়া বলল, “আপনার কাছে মাথা ধরার ওষুধ আছে? আমার মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামলের কথায় মনে পড়ল।”
উদ্দালক বলল, “খেয়েদেয়ে একটা প্যারাসিটামল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। না ঘুম এলেও চেষ্টা করুন। ফোনটা দূরে রেখে ঘুমান। ঘুম আসবে।”
জিনিয়া বলল, “ওকে। চেষ্টা করছি।”
উদ্দালক খেয়েদেয়ে থালা সিংকে রেখে বলল, “কাল থেকে এক মাসিকে আসতে বলেছি। রান্নাবান্না করে দেবে, ঘরদোর মুছে দেবে। থালা ধোয়ার দরকার নেই। মাসিই ধোবে।”
জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে।”
উদ্দালক স্টাডিরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল।
জিনিয়া থালা সিংকে রেখে মুখ ধুয়ে বেডরুমে গিয়ে সৌপ্তিকের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজল। ঘুম এল অনেক দিন পর। এতটাই ঘুম এল যে পরের দিন সকালে উদ্দালককে দরজা ধাক্কিয়ে চিৎকার করতে হল, “অফিস যাবেন না?”
ঘুম ঘুম গলায় জিনিয়া বলল, “আমি আজ যাব না। টোটোওয়ালাকেও বারণ করে দিন। ঘুম পাচ্ছে।”
উদ্দালক আর কিছু বলল না।
জিনিয়া ঘুমাচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দশটা বাজল। দেখল উদ্দালক স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাকে দেখে বলল, “সারাদিন একা একা কী করবেন? বই পড়তে পারেন, টিভি দেখতে পারেন। মাসি রান্না করে দিয়ে গেছে। খেয়ে নেবেন। সকালের জন্য রুটি আলুর দম আছে।”
জিনিয়া বলল, “খবরের কাগজ নেন না আপনি?”
উদ্দালক স্টাডিরুম থেকে কাগজ এনে দিয়ে বলল, “এই যে। আমি চেষ্টা করছি লাঞ্চ টাইমে একটু উঁকি দিয়ে যাওয়ার। যে-কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবেন।”
জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে।”

উদ্দালক বলল, "স্কুল থেকে সবাই মিলে ডাইনিং সেট, আরও কী কী সব দিয়েছে। টেবিলের ওপর রেখেছি। দেখে নেবেন। ওদের আবার খাওয়াতে হবে। আমি আসি। সাবধানে থাকবেন। বাড়িওয়ালা কাকিমাকে বলব আপনার সঙ্গে কথা বলতে?"
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, "না, আমি আর-একটু ঘুমাতে চেষ্টা করি বরং।"
উদ্দালক বলল, "ফাইন। সেটাই বেস্ট হবে। আসি?"
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল।
উদ্দালক বেরোতে জিনিয়া অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিল যেতে পারবে না।
কিছু কাজ পেন্ডিং আছে জানালেন সুপ্রতিম। জিনিয়া জানাল ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে যতটা সম্ভব করে দেবে সে। টিভি চালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখল জানলা দিয়ে পল্টু উঁকি মারছে, "আজ স্কুল ডুব দিয়েছি। স্যার জানেন না। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। দেখি জানলা খোলা। আপনি অফিস যাননি বউদি?"
জিনিয়া হাসল, "না, যাইনি। তুমি স্কুল ডুব মারলে কেন?"
পল্টু মাথা চুলকে বলল, "স্কুল আমার ভালো লাগে না। স্যারের ক্লাস ছাড়া একটা ক্লাসও ভালো না। আচ্ছা আপনি ডাব খাবেন?"
জিনিয়া বলল, "কোত্থেকে আনবে তুমি?"
পল্টু বলল, "একটু অপেক্ষা করুন, নিয়ে আসি।"
সাইকেল বাঁই বাঁই করে চালিয়ে পল্টু চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুটো ডাব এনে বলল, "এ নিন। আমাদের গাছের। আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নেব। চানাচুর খাবেন? দিয়ে যাচ্ছি!"
জিনিয়া হেসে ফেলল। এ ছেলেটা এক্কেবারে পাগল তো!

১১

দুপুরবেলা।
জিনিয়া বই পড়ছিল উদ্দালকের স্টাডিরুমে। টেনিদা সমগ্র। পল্টু আমের আচার দিয়ে গেছে। আচার খেতে খেতে বই পড়তে বেশ ভালো লাগছিল। ফোন বাজতে শুরু করল তার। দেখল মা ফোন করছে। ধরল, "বলো।"
মালতী বললেন, "কি রে, অফিসে আছিস মা?"
জিনিয়া বলল, "না, আজ অফিস যাইনি।"
মালতী বললেন, "ও। জামাইও যায়নি?"
জিনিয়া বলল, "কে জামাই?"
মালতী একটু থমকে বললেন, "উদ্দালক।"
জিনিয়া বিরক্ত গলায় বলল, "এরকম জামাই জামাই বলবে না। শুনতে ভালো লাগে না। নাম ধরে ডাকো।"
মালতী বললেন, "আচ্ছা। বলব না। উদ্দালক স্কুলে যায়নি?"
জিনিয়া বলল, "গেছে।"
মালতী বললেন, "কাল কী হয়েছিল?"
জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকের বাড়ি গেছিলাম। ওখানেই ছিলাম। রাতে জানালাম তো।"
মালতী বললেন, "সেটা তো জানি ওখানে ছিলি। কিন্তু গিয়ে ঠিক কী সমস্যা হয়েছিল সেটা তো বলতে পারিস?"
জিনিয়া বলল, "সৌপ্তিকের কথা মনে পড়ছিল। কী করব বলো? ভালোবেসেছিলাম তো। এত সহজে তো ভোলা যায় না।"
মালতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "উদ্দালক রাগ করেনি?"
জিনিয়া বলল, "জানি না। করতেও পারে। তাতে আমি কী করব?"

মালতী বললেন, "দেখ তিন্নি, কোনও ছেলে অন্য কারও অস্তিত্ব মেনে নিতে চায় না। তুই উদ্দালকের সামনে বেশি সৌপ্তিকের কথা বলিস না। ঠিক আছে?"
জিনিয়া কোনও তর্ক না করে বলল, "ঠিক আছে। তোমার আর কিছু বলার আছে? রাখলাম।"
মালতী কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল জিনিয়া।
উদ্দালক ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বলল, "খেয়ে নি চলুন। বাহ, ভালো বই পড়ছেন তো। 'তপন চরিত' পড়ে দেখতে পারেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বেশি লোক পড়েনি। ভালো লাগবে দেখবেন।"
জিনিয়া উঠল। বলল, "আচ্ছা, আপনি আমাকে একটা কথা বলুন।"
উদ্দালক বলল, "কী কথা?"
জিনিয়া বলল, "আমার মা বলল কোনও ছেলে অন্য কারও অস্তিত্ব মেনে নিতে চায় না। আপনার সামনে সৌপ্তিকের কথা বললে আপনি মেনে নিতে পারেন না?"
উদ্দালক বলল, "ধুস, আমার কেন ওসব হবে? আমরা তো কন্ট্র্যাক্ট ম্যারেজ করেছি। ওসব যারা সারাক্ষণ প্রেম প্রেম করে লাফায় তাদের মধ্যে হতে পারে। আমাদের বাঙালিদের সমস্যা হল, আমরা সারাজীবন প্রেমটাই করে যাই। প্রেম ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে। তার মধ্যে সবথেকে উপরের দিকে আছে পড়াশোনা। সর্বক্ষণ রিলেশন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে করে আমরা পড়াশোনার বারোটা বাজিয়ে দি। ক্লাস এইট-নাইন থেকে পাবলিক আজকাল প্রেম করতে শুরু করে। এই তো পল্টুদের ক্লাসের বিনোদ নাকি এখনই প্রেম করে। কী হবে প্রেম করে? নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা মার খাবে। আর কম বয়সের মেয়ে বাচ্চা কোলে ঘুরে বেড়াবে। ভালোবাসা জিনিসটাই বোগাস বুঝলেন?"
জিনিয়া বলল, "আপনি এত কিছু কী করে বুঝলেন? আপনি কোনও দিন কোনও রিলেশনে ছিলেন?"
উদ্দালক জোরে হেসে উঠল, "খেপেছেন? আমাকে পাগল কুকুরে কামড়েছে যে আমি রিলেশনে যাব? আমার বরাবর পাখির চোখ একটাই। আরও পড়াশোনা করে যাওয়া। আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন রিলেশনশিপ। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন?"
জিনিয়া চুপ করে ডাইনিং টেবিলে বসল। উদ্দালক খাবার বেড়ে দিল। জিনিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনার কি ধারণা প্রেম করে বিয়ে হলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে? আমার আর সৌপ্তিকের বিয়ে হলে প্রেম নষ্ট হতে পারত ভবিষ্যতে?"
উদ্দালক বলল, "কেস ভ্যারি করে। এক-একজনের এক-একরকম হয়। আপনার কী হত, সেটা আমি কী করে বলব? হতে পারে সৌপ্তিক বেঁচে থাকলে সংসার করে, ঝগড়া করে, বাচ্চা নেওয়ার পরে এখন যে ভালোবাসাটা আপনি ওকে বাসেন, তখন নাও বাসতে পারতেন। আবার উলটোটাও হতে পারে। খুব ভালো সংসার করতেন। কোনও কিছুই আগে থেকে বলা সম্ভব না। পৃথিবীতে সবটাই অনিশ্চয়তায় চলে। আজ আমরা বেঁচে আছি, ঠিক দশ মিনিট পরে ভয়াবহ একটা ভূমিকম্পে সব শেষও হয়ে যেতে পারে। কিছুই বলা যায় না।"
জিনিয়া গম্ভীর মুখে বলল, "সৌপ্তিক বেঁচে থাকলে অবশ্যই ভালো করে সংসার করতাম আমি।"
উদ্দালক বলল, "নিশ্চয়ই। এ নিন। মাছের ঝোলটা ভালো হয়েছে।"
জিনিয়া বলল, "আমার খিদে পাচ্ছে না। পরে খাব।"
উদ্দালক বলল, "খেয়ে নিন। বললাম না, ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের খেয়ে নিতে হয়। নিন, মাছ নিন।"
জিনিয়া আর কোনও কথা বলল না।

১২

ক্লাস নাইন এ-র ছেলেরা খুবই ভালো। ঝামেলাও করে না। উদ্দালক একগাদা অঙ্ক দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল। লাস্ট পিরিয়ড। সে যখন স্কুলে পড়ত, এই সময়টা বাইরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে যেত। এই

ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের কয়েকটা ছেলের মধ্যে সেরকম হাবভাব দেখা যাচ্ছে। উদ্দালক গলা তুলে ডাকল, "এই তোরা এদিকে আয় দেখি খাতা নিয়ে।"

চারটে ছেলে খাতা নিয়ে তার সামনে এল। উদ্দালক খাতাগুলো দেখল। নিতান্ত দায়সারাভাবে প্রশ্নটা টুকে খাতার মধ্যে আঁকিবুকি কেটেছে। সে বলল, "ইচ্ছা করে না ক্লাস করতে তোদের?"

ছেলেগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

উদ্দালক বলল, "কী করবি স্কুল ছুটি হলে?"

একজন বলল, "ফুটবল খেলতে যাব স্যার।"

ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। উদ্দালক বলল, "সে তো যাবি। কিন্তু ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবি না? মন নেই? সামনের বছর মাধ্যমিক তো। এই সময়টা ক্লাসটা ঠিক করে কর অন্তত, যা বেঞ্চে গিয়ে বস।"

সবাই বেঞ্চে গিয়ে বসল। উদ্দালক বোর্ডে অঙ্কগুলো কষে দিয়ে বলল, "যা তোদের ছুটি। কাল অঙ্কগুলো ফ্রেশ করে করে নিয়ে আসবি।"

ছেলেদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য এবং অবিশ্বাস দেখা দিল। উদ্দালক শেষ বেঞ্চ থেকে সবাইকে একে একে ছেড়ে দিয়ে টিচার্স রুমের দিকে রওনা দিল। করিডরে হেডস্যার তপনবাবুর সঙ্গে দেখা হল তার। হেডস্যার অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কী? তুমি এখনই সবাইকে ছুটি দিয়ে দিলে কেন? পনেরো মিনিট বাকি ছিল তো?"

উদ্দালক বলল, "লাস্ট পিরিয়ডে কেউ ম্যাথস দেয় স্যার? এদের মাথা কাজ করে? ছেড়ে দিলাম টাস্ক দিয়ে।"

তপনবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, "তা বটে। লাস্ট পিরিয়ডে অঙ্ক দিতে নেই। ঠিকই বলেছ তুমি, আমার ছোটোবেলাতেও এই সময় আমার ক্লাস করতে একবারেই ইচ্ছা করত না। তবে ইদানীং ছেলেরা কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড হয়ে পড়ছে। দেখা গেল, তুমি তাড়াতাড়ি ছেড়েছ বলে পেরেন্টস-টিচার মিটিংয়ে এদের বাপ মা তোমার নামেই নালিশ ঠুকে দিল।"

উদ্দালক বলল, "খুব চান্স আছে স্যার এটা হবার। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা এদের মতো ছিলাম না। প্রথম দিকের ছেলেপিলেরা বড্ড সেলফিশ আর মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। আমার তাই লাস্ট বেঞ্চের ছেলেই পছন্দ।"

তপনবাবু খুশি হলেন, "তা যা বলেছ। তবে আমাদের সময় লাস্ট বেঞ্চে অনেক বেশি নটোরিয়াস এলিমেন্ট থাকত। এসব তো কিচ্ছু না। বাপরে! যা লেভেলে হেডুর মিমিক্রি নামত..." বলেই তপনবাবু জিভ কেটে বললেন, "দেখেছ, এখন যে আমিই হেডু, সেটাই ভুলে গেছি।"

উদ্দালক হেসে ফেলল। তপনবাবু বললেন, "যাক গে, এসব বাদ দাও। ম্যারেড লাইফ কেমন কাটছে বলো?"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে স্যার। কোনও সমস্যা নেই।"

তপনবাবু অবাক হয়ে বললেন, "সমস্যা? সমস্যা কেন থাকতে যাবে হে? সমস্যার তো কারণ নেই।"

উদ্দালক সহজ হবার চেষ্টা করল, "না মানে ওই আর কি।"

তপনবাবু বললেন, "ওই আর কি না। করেছ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজ কি সবার দ্বারা হয় রে ভাই? এখন হাজার রকম লজ্জা আসবে। তুমি ঘুরতে নিয়ে যাও কোথাও মিসেসকে! আমি তোমার ছুটির ব্যবস্থা করছি।"

উদ্দালক বলল, "সে যাব স্যার। দেখি কথাবার্তা বলে।"

তপনবাবু বললেন, "যাক গে, ক্লাস যখন ছুটি দিয়ে দিয়েছ, আটকে রাখব না আর তোমাকে। যাও যাও। বাড়ি যাও।"

উদ্দালক হেসে বেরোল।

স্কুল থেকে ফেরার পথে সাইকেল নিয়ে এলাকাটা চক্কর দিতে ভালোই লাগে। উদ্দালক ধীরে ধীরে প্যাডেল করছিল। পল্টু বড়ো পুকুরের দিক থেকে ছিপ নিয়ে ফিরছিল। উদ্দালক ধমক দিল, "অ্যাই, আজ স্কুল ডুব দিলি কেন?"
পল্টু দাঁত বের করল, "ইচ্ছা করছিল না স্যার। এই দেখুন না, বউদির জন্য মাছ ধরতে এসেছিলাম। ভালো চারা পেয়েছি। নিয়ে যাব রাত্তিরে।"
উদ্দালক বলল, "সে যাই কর, স্কুল কামাই করলে কিন্তু তোর বাবার কাছে রিপোর্ট করব আমি জানিয়ে রাখলাম।"
পল্টু পালাল।
উদ্দালক হাসতে হাসতে আবার সাইকেল নিয়ে রওনা দিল।

১৩

ফিরে বেশ কয়েকবার বেল বাজানোর পর জিনিয়া ঘুমচোখে দরজা খুলল। উদ্দালক অপরাধী গলায় বলল, "ঘুমাচ্ছিলেন বুঝি? বাজে ব্যাপার হয়ে গেল। কাল থেকে এক্সট্রা চাবি নিয়ে যাব।"
জিনিয়া বলল, "না, ঠিক আছে।"
উদ্দালক ফ্রেশ হল। স্টাডিরুমে গিয়ে তক্তপোশে শুল।
জিনিয়া ঘরের বাইরে এসে বলল, "আসতে পারি?"
উদ্দালক তড়িঘড়ি উঠে বসল, "আসুন।"
জিনিয়া ঘরে ঢুকে বলল, "আপনার একটা ডায়েরি ও ঘরে পেলাম। পড়ে ফেলেছি, সরি।"
উদ্দালক হাসল, "ওহ, ওটা কিছু না। পড়লেও অসুবিধা নেই।"
জিনিয়া বলল, "আপনি ডায়েরি লেখেন?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ লিখি। আপনি লেখেন নাকি?"
জিনিয়া বলল, "নাহ। লেখাপড়ার অভ্যাসটাই চলে গেছে এখন।"
উদ্দালক বলল, "লিখলে অনেকটা হালকা হওয়া যায়। যাক গে, আপনি চা খাবেন? করব তাহলে।"
জিনিয়া বলল, "আমি করছি। আপনি বসুন।"
উদ্দালক হাসল, "বেশ।"
জিনিয়া চা করে নিয়ে এল। উদ্দালক চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "বাহ। ভালো হয়েছে।"
জিনিয়া বলল, "আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"
উদ্দালক বলল, "নিশ্চয়ই। করুন।"
জিনিয়া বলল, "আপনি আদৌ এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবেন? আমার কেন জানি না মনে হয় আপনি কোথাও যাবেন না। এখানেই দিব্যি সেটল করে যাবেন।"
উদ্দালক মাথা নাড়ল, "জানি না। নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে কোথাও যাওয়া তো, নাও যেতে পারি। কেন বলুন তো?"
জিনিয়া বলল, "এমনিই। সারাদিন ধরে একগাদা প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে শুরু করে যার কোনও মানে হয় না। এর মধ্যে পল্টু এসে ডাব দিয়ে গেল, আচার দিয়ে গেল। আন্তরিকতা আছে জায়গাটার।"
উদ্দালক বলল, "প্রতিটা মানুষের মতো প্রতিটা জায়গাই স্পেশাল। কেউ খারাপ না। শুধু ভালোটা দেখে নিতে হয়। এই যেমন আপনার আজকে রেস্টটা দরকার ছিল দিব্যি বুঝতে পারছি। ঘুমিয়ে আপনাকে ফ্রেশও লাগছে।"
জিনিয়া বলল, "হতে পারে। আবার কখন মনখারাপটা চলে আসবে সেটা ভেবেও ভয় লাগে। বিয়ের দুনিয়ায় আমাকে বোধহয় কেউ বিয়ে করত না। আমি ডিসপুটেড মেটিরিয়াল। আমার হাজারখানেক সমস্যা আছে।

নিজেও বুঝি, আমার মানসিক সমস্যাও আছে। ভাগ্যিস আপনি এমন একটা প্রস্তাব দিলেন। আর আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। মুড অফ থাকলে আমি যা নয় তাই বলতে থাকি। নিজের মধ্যে থাকি না তখন আর।”

উদ্দালক বলল, “কোনও অসুবিধা নেই। বলে যদি হালকা হতে পারেন, একশোবার বলবেন। কন্ট্র্যাক্ট টার্মিনেট করতে হলেও বলবেন। আমার কোনও প্রবলেম নেই।”

জিনিয়া বলল, “প্রবলেম হবে না? আপনি সত্যিই এতটা কোল্ড হার্টেড লোক?”

উদ্দালক বলল, “ভীষণ। আমি ভীষণ স্বার্থপরও বটে। নিজেরটা ছাড়া আমি কারোটা বুঝি না।”

জিনিয়া বলল, “রিয়ালি?”

উদ্দালক বলল, “রিয়ালি। তবে আমি লাজুক টাইপের সেলফিশ লোক। এই যেমন আমার এখন ঘুমোতে ইচ্ছা করছে, আপনার সঙ্গে বকবক করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু আপনি বসে আছেন বলে ভদ্রতার খাতিরে বলতেও পারছি না, ব্যাপারটা সেরকমই আর কী!”

জিনিয়া বলল, “এক্সট্রিমলি সরি। আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি আসছি।”

উদ্দালক বলল, “থ্যাংক ইউ।”

জিনিয়া উদ্দালকের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার হঠাৎ খুব কান্না পেল।

এত রূঢ়ভাবে কথাটা বলতে পারল?

সে বেডরুম থেকে আবার উদ্দালকের ঘরে গিয়ে নক করল, “শুনুন।”

উদ্দালক চোখ বুজেছিল। সে অবস্থাতেই বলল, (এরপর উদ্দালকের কথা থাকার কথা। তারপর জিনিয়ার।) “আপনি আমার সঙ্গে ব্যবহারটা ভালো করলেন না। খারাপ লাগল। সৌপ্তিক থাকলে কখনও এরকম করত না।”

উদ্দালক বলল, “সরি। তবে প্রতিটা মানুষ এক হয় না। আমিও তেমন সৌপ্তিক নই। আপনাকে ভালোও বাসি না। এটা আপনাকে বুঝতে হবে।”

জিনিয়ার চোখ ফেটে জল আসছিল। তবু সে বলল, “আপনি মানুষটা মোটেও ভালো নন। আপনার প্রায় সবটাই লোকদেখানো।”

উদ্দালক বলল, “সেটাও হতে পারে। আর কিছু না বলার থাকলে দরজাটা বন্ধ করে যাবেন।”

জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে তার রুমের দিকে রওনা দিল।

১৪

জিনিয়ার মাথা গরম হয়ে ছিল। ঠিক কেন গরম হচ্ছিল সে বুঝতে পারছিল না।

কিছুক্ষণ টিভি দেখে ভালো লাগল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। সৌপ্তিকের ছবির দিকে তাকাল।

সৌপ্তিক হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

জিনিয়া বলল, “ভালো লাগছে না তোর? খুব মজা পাচ্ছিস বল আমি এভাবে কষ্ট পাচ্ছি দেখে? পা। তাতে যদি ভালো থাকিস তো থাক।”

ফোন বেজে উঠল। জিনিয়া দেখল সুলগ্না ফোন করছে, ধরতে ইচ্ছা করল না প্রথমে।

সুলগ্না ছাড়ার মেয়ে না। আবার ফোন করা শুরু করল।

এবারে ধরল জিনিয়া, “বল।”

সুলগ্না বলল, “তুই কি এখনও আমার উপর রাগ করে আছিস?”

জিনিয়া বলল, “কেন রাগ করব? কী হয়েছে?”

সুলগ্না বলল, “কাল অফিস থেকে বেরিয়ে গেলি। আন্টি ফোন করেছিলেন আমাকে। আমি তো বুঝেছিলাম তুই সৌপ্তিকের বাড়ি গেছিস, কিন্তু কাল আমার ওভাবে তোকে বলা উচিত হয়নি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি

ভাই।”
জিনিয়া বলল, “ঠিক আছে। রাখ এখন। ভালো লাগছে না।”
সুলগ্না বলল, “সে নাহয় রাখব। তোর শরীর ঠিক আছে তো?”
জিনিয়া বলল, “হুঁ।”
সুলগ্না বলল, “কাল অফিস আসবি?”
জিনিয়া বলল, “আসব। রাখি এবার?”
সুলগ্না বলল, “আমি সত্যিই সরি রে। আমি বুঝতে পারছি তুই ভীষণ রেগে আছিস।”
জিনিয়া বলল, “বারবার এক কথা বললে আমি আরও রেগে যাব। রাখ ফোনটা। আমার কাজ আছে।”
সুলগ্না বলল, “কী কাজ রে? সংসারের কাজ? এই তুই বাসন মাজিস? কাপড় কাচিস?”
জিনিয়া বলল, “আমার সিরিয়াসলি তোর সঙ্গে এখন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না সুলগ্না। রাখলাম।”
সুলগ্না কিছু বলার আগেই জিনিয়া ফোন কেটে দিল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল সে। সদাশিববাবু কাগজ পড়ছিলেন। তাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, “ভালো আছ তো বউমা? সব ঠিক আছে? কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?”
জিনিয়া হাসল, “হ্যাঁ, ভালো আছি। অসুবিধা হচ্ছে না কোনও।”
সদাশিববাবু বললেন, “কাগজ পড়বে?”
জিনিয়া বলল, “না না। আমি একটু বসি।”
সদাশিববাবু বললেন, “বেশ, বসো।”
সদাশিববাবুর স্ত্রী শোভনা তাকে দেখেছিলেন। দুজনের জন্যই চা নিয়ে এলেন। চা-টা খেয়ে জিনিয়ার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। বলল, “খুব ভালো চা তো।”
শোভনা বললেন, “আমার ভাই দার্জিলিং গেছিল। নিয়ে এসেছে। সত্যিই খুব ভালো। তোমরা কোথাও বেড়াতে যাবে না?”
জিনিয়া বলল, “ঠিক হয়নি কিছু। দেখা যাক। আমার অফিসে ছুটি পাওয়া খুব সমস্যার।”
শোভনা বললেন, “ছুটি না পেলে জোর করে যাবে। হানিমুনে না গেলে হয় নাকি? এই তো বিয়ে করেই দুজনে স্কুল অফিস শুরু করে দিলে। এগুলো খুব খারাপ। একসঙ্গে কোথাও ঘুরে এসো। দেখবে খুব ভালো লাগবে। এখনই তো ঘোরার বয়স। আমরা বিয়ের পরে পুরী গেছিলাম। তখন তো দিঘা, পুরী আর দার্জিলিংই যেত সবাই। এখন কতরকম যাওয়ার জায়গা হয়েছে।”
জিনিয়া চুপ করে চা খেতে লাগল।
সদাশিববাবু বললেন, “আমরা গত বছর এই সময়েই গোয়া গেছিলাম। মন্দ লাগেনি, কী বলো গিন্নি?”
শোভনা বললেন, “ধুস, গোয়া এই বয়সে কি পোষায়? আমার বাপু পাহাড়ই ভালো লাগে। হাঁটুতে ব্যথা হয় যদিও পাহাড় ভাঙতে, তবু পাহাড়ের ধারেকাছে কিছু হয় না। তোমার কী ভালো লাগে বউমা?”
জিনিয়ার মনে পড়ে গেল তার আর সৌপ্তিকের ঠিক হয়েছিল দুজনে মিলে পাহাড়ে যাবে। সে একটু থমকে বলল, “পাহাড় ভালো লাগে।”
শোভনা হাসলেন, “যাক, তাহলে তুমিও আমার দলেই পড়লে। ভালো হল। এবার তোমার বরকে জোর করো পাহাড়ে নিয়ে যেতে। ঘুরে এসো বউমা, এই সময় আর ফিরে আসবে না বিশ্বাস করো। যাও যাও।”
পারলে শোভনা এখনই তাদের পাঠিয়ে দেন।
জিনিয়ার হাসি পেল। বলল, “আচ্ছা বলব।”

১৫

পল্টু পড়তে এসেছে একগাদা চারাপোনা নিয়ে। উদ্দালক বলল, “এগুলো কে বাছবে?”

পল্টু বলল, "আমিই বেছে দেব স্যার। বউদির ভালো লাগবে।"
উদ্দালক বলল, "তুই পড়বি, না মাছ বাছবি?"
পল্টু বউদি বউদি করে ডাকতে লাগল। জিনিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পল্টু বলল, "এই দেখুন বউদি, এই মাছগুলো আমি ধরেছি।"
জিনিয়া বলল, "বাহ।"
উদ্দালক বলল, "এই তুই পড়তে বোস। পরে দেখছি মাছগুলো নিয়ে কী করা যায়।"
পল্টু মাথা চুলকে স্টাডিতে চলল উদ্দালকের সঙ্গে। জিনিয়া মাছগুলো ধুয়ে, কেটে, ভেজে এক প্লেট মাছভাজা নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকে বলল, "এই নাও পল্টু, ভেজে আনলাম।"
পল্টু খুব খুশি হয়ে বলল, "আরিব্বাস, বউদি রান্না জানেন। এটা খুব ভালো হল। আপনি খেয়েছেন বউদি?"
জিনিয়া বলল, "না, আমি খাব। তুমি খাও।"
পল্টু বলল, "না, তা কী করে হয়? আপনার জন্য আনলাম তো। আপনি খান আগে।"
অগত্যা জিনিয়াকে একটা মাছভাজা খেতে হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা বিঁধল। ছোটো মাছের কাঁটা। গলায় থাকবে না বেশিক্ষণ, কিন্তু কাশি হতে শুরু করল।
পল্টু শশব্যস্ত হয়ে বলল, "স্যার মুড়ি আছে? মুড়ি খেলে ঠিক হয়ে যাবে।"
উদ্দালক বলল, "মুড়ি মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। নিয়ে আয় শিগগির।"
পল্টু দৌড়োল।
জিনিয়ার ছোটো মাছ খাওয়া অভ্যাস নেই। বাড়িতে থাকতেও সে খেত না। কাশতে কাশতে বমি চলে এল তার। উদ্দালক জিনিয়ার হাত ধরে বলল, "চলুন চলুন। আপনি ছোটো মাছ খান না বলবেন তো!"
বেসিনে গিয়ে খানিকটা কেশে গলায় আঙুল দিয়ে কাঁটা বের করতে খানিকটা বমি হয়ে গেল।
উদ্দালক জিনিয়াকে ধরে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে মাথায় ঘাড়ে জল দিয়ে বলল, "এখন ঠিক লাগছে?"
জিনিয়ার কাশি থেমেছিল। সে কোনওমতে বলল, "খানিকটা।"
উদ্দালক জিনিয়ার হাত ধরে বলল, "দেখি নাড়িটা।"
জিনিয়া হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "নাড়ি দেখার কী আছে? আমার কি জ্বর এসেছে?"
উদ্দালক বলল, "তাও ঠিক, জ্বর আসবে কেন? তবু আপনি শুয়ে পড়ুন। অনেক কাশলেন তো।"
জিনিয়া বলল, "আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আপনি আপনার কাজ করুন।"
উদ্দালক বলল, "সে তো করছি। আপনি অসুস্থ হয়ে গেলে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না?"
জিনিয়া বলল, "কী ভাববেন? বিকেলবেলা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোলেন। কোনও সুস্থ মানুষকে দেখিনি বিকেলবেলা এভাবে ঘুমোতে পারে।"
উদ্দালক বলল, "ওহ, সে তো একটু ঘুমোতেই হবে, নইলে রাতে পড়ব কী করে? কেন, আপনি কি বেরোতেন কোথাও?
জিনিয়া বলল, "বাজার যেতে হত আমায়। কিছু জিনিস কেনার ছিল।"
উদ্দালক বলল, "আরে এই ব্যাপার? লিখে দিন না কী লাগবে, পল্টু নিয়ে আসবে।"
জিনিয়া কয়েক সেকেন্ড কড়া চোখে উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "পল্টুকে দিয়ে সব আনানো সম্ভব? আপনার কি বই বাদ দিয়ে অন্য কোনও বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই?"
উদ্দালক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলল, "এ বাবা, সরি, সরি। আচ্ছা আপনি তৈরি হয়ে নিন। ঘুরে আসি বাজার থেকে।"
জিনিয়া বলল, "মাছগুলো কে খাবে?"
উদ্দালক বলল, "ও পল্টু আসুক, একাই খেয়ে নেবে। আমি ওকে অঙ্ক দিয়ে যাচ্ছি। চলুন। ঘুরেই আসি।"

পল্টু মুড়ি নিয়ে এল। উদ্দালক পল্টুকে একগাদা অঙ্ক করতে দিয়ে বলল, "সব বসে বসে কর। আমি বউদিকে নিয়ে আসছি।"
পল্টু বড়ো করে মাথা নাড়ল।
জিনিয়া সালোয়ার কামিজ পরে বেরোল। উদ্দালক বলল, "সাইকেলের পিছনে বসতে পারবেন?"
জিনিয়া বলল, "বসিনি কোনও দিন। সামনেই বসি।"
উদ্দালক বলল, "সামনে বসবেন? আচ্ছা বসুন।"
সন্ধে নেমেছে। জিনিয়াকে সাইকেলের সামনে বসিয়ে উদ্দালক সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল। জিনিয়ার ভালো লাগছিল। কোত্থেকে একটা মিষ্টি হাওয়া আসছে।
বাজারে পৌঁছে কসমেটিক্সের দোকানে জিনিয়া অনেক সময় নিয়ে নিল। উদ্দালক দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। ফেরার সময় জিনিয়া আবার সামনের সিটে বসল।
বাজার যাওয়ার সময় অতটা হয়নি। ফেরার সময় জিনিয়ার মনে হল উদ্দালকের উষ্ণ নিঃশ্বাস তার ঘাড়ে পড়ছে। ভালো লাগছিল তার। খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ শিউরে উঠল সে।
এ কী করতে যাচ্ছিল সে?
জিনিয়া বলল, "সাইকেল দাঁড় করান প্লিজ।"
উদ্দালক সাইকেল দাঁড় করিয়ে বলল, "কী হল?"
জিনিয়া বলল, "আমি হেঁটেই ফিরব।"
উদ্দালক অবাক গলায় বলল, "সে আবার কী? অনেকটা পথ তো!"
জিনিয়া বলল, "না, আমি হেঁটেই ফিরব।"
উদ্দালক সাইকেল থেকে নামল, "বেশ। তাই সই। চলুন। দিন, আপনার হাতের ব্যাগটা আমায় দিন। সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দি।"
জিনিয়া দিল। উদ্দালক চুপ করে হাঁটতে লাগল।
জিনিয়া বলল, "আমার বিয়েটা করা ঠিক হয়নি। সৌপ্তিককে ঠকানো হয়ে যাচ্ছে।"
উদ্দালক বলল, "এটা আবার কখন থেকে মনে হচ্ছে?"
জিনিয়া বলল, "এই তো। এখন থেকেই। আমি... কী বলব..."
উদ্দালক বলল, "ফিজিক্যালি আমার প্রতি অ্যাট্রাকটেড হচ্ছেন?"
জিনিয়া থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কড়া গলায় বলল, "এরকম মনে হচ্ছে কেন আপনার?"
উদ্দালক বলল, "আপনার মনের মধ্যে দুটো সত্তা কাজ করে তো। একটা সত্তা সৌপ্তিককে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায়। এরকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। ইট হ্যাপেনস।"
জিনিয়া রেগে গেল, "খুব জানেন না? খুব বেশি বুঝে গেছেন? পড়ান তো এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরের স্কুলে। তাও কথা বলছেন যেন বড়ো কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট!"
উদ্দালক হাসল, "আপনার এই দ্বন্দ্বটা ভীষণ স্বাভাবিক একটা দ্বন্দ্ব। হতে পারে আমি ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরের আরও লঝঝড়ে মাস্টারমশাই, কিন্তু সত্যিটা স্বীকার করলে কি আপনার খুব একটা ক্ষতি হবে? একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একসঙ্গে থাকলে এগুলো হতেই পারে। ইন ফ্যাক্ট আমিও আপনার প্রতি ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশন বোধ করি না বললে অন্যায় হবে। এগুলো হয়। পরিণত সম্পর্কে শরীর আসে। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাজ হল সেটা থেকে নিজেদের দূরে রাখা, মানে আমাদের মতো সিচুয়েশনে।"
জিনিয়া বলল, "আমি সৌপ্তিককে খুব ভালোবাসি। আর আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন।"
উদ্দালক বলল, "আপনি সৌপ্তিককে ভালোবাসেন না, আমি একবারও বলিনি। সাইকেল থেকে নামলেন কেন?"
জিনিয়া বলল, "এমনি। আমার হাঁটতে ভালো লাগে।"

উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। হাঁটুন।"
জিনিয়া বলল, "আমি বাড়ি চলে যাব। আপনার সঙ্গে থাকব না।"
উদ্দালক বলল, "ঠিক আছে। কালকেই চলে যাবেন?"
জিনিয়া বলল, "হ্যাঁ। কালকে চলে যাব।"
উদ্দালক বলল, "ফাইনাল?"
জিনিয়া বলল, "ফাইনাল।"
উদ্দালক আর কিছু বলল না। চুপচাপ সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

১৬

বাড়ি ফিরে জিনিয়া ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।
উদ্দালক দেখল পল্টু অঙ্ক নিয়ে তখনও হাবুডুবু খাচ্ছে। সে বলল, "কি রে, কটা হল?"
পল্টু বলল, "একটাও হচ্ছে না স্যার।"
উদ্দালক শ্বাস ছেড়ে বলল, "বস। তোকে নিয়ে আর পারি না সত্যি।"
পল্টু বলল, "স্যার, বউদি কোথায় গেলেন?"
উদ্দালক বলল, "তোর কী তাতে? পড়তে এসেছিস, পড়ে যা। বউদি কোথায় তোর জেনে কী হবে? দেখি আয়।"
পল্টুর মুখটা শুকিয়ে গেল। উদ্দালক গম্ভীর মুখে পল্টুকে অঙ্ক করিয়ে গেল।
পল্টু যাওয়ার পরে জিনিয়া একবার বেরিয়ে এসে খেয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল।
উদ্দালক খেয়ে পড়তে শুরু করল।
পরদিন ভোর হতেই জিনিয়া ব্যাগপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে বলল, "আমাকে টোটো ডেকে দিন। আমি চলে যাব।"
উদ্দালক দাঁত মাজছিল। বলল, "বলে দিয়েছি অলরেডি। এসে দাঁড়িয়ে আছে বা এখনই আসবে দেখুন।"
জিনিয়া কোনও কথা না বলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।
উদ্দালক ব্রাশ করে বই নিয়ে বসল।
কিছুক্ষণ পর সদাশিববাবু জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন, "বউমা কি চলে গেল? ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে বেরোল দেখলাম যেন।"
উদ্দালক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষের কৌতূহল বড্ড বেশি। বলল, "হ্যাঁ। বাড়ি গেছে।"
সদাশিববাবু অবাক গলায় বললেন, "যাহ্। কালকেই বলল আপনাকে বলবে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা, আর আজকে চলে গেল?"
উদ্দালক বলল, "হ্যাঁ, বিশেষ কাজ পড়ে গেছে। আপনি বাজার যাবেন না? এরপরে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে তো।"
সদাশিববাবু বুঝলেন উদ্দালক তাঁকে কাটাতে চাইছে। বললেন, "ও হ্যাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, যাই বরং।"
উদ্দালক চুপ করে বই পড়তে লাগল। স্কুলের সময় হলে তৈরি হয়ে স্কুলে গেল।
স্কুলে ঢুকেই হেডস্যারের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে বললেন, "ঠিক করলে কোথায় যাবে?"
উদ্দালক হেসে বলল, "না স্যার, এখনও ডিসিশন নিতে পারিনি। দেখি।"
হেডস্যার বললেন, "ঠিক হলে ছুটি নিয়ে নিয়ো। ট্রেনের টিকেট তো এখন তৎকালে পাবে না। ফ্লাইটেই যেতে হবে। আমার বাপু প্লেনে বড্ড ভয় করে। ছেলে জোর করে আন্দামান নিয়ে গেছিল। বাপ রে বাপ, ওসব আমার পোষায় না।"
উদ্দালক বলল, "আচ্ছা স্যার দেখব।"

তপনবাবুর সামনে থেকে সরে উদ্দালক টিচার্স রুমে গিয়ে বসল। তারাপদ স্যার আর সমরেশবাবু আবার ঝগড়া শুরু করেছেন। সুদেববাবু তার দিকে তাকাচ্ছেন না। রাগ এখনও পড়েনি বোঝা যাচ্ছে।

প্রথম ক্লাসটা সিক্সের। প্রেয়ারের পর ক্লাসে গিয়ে পড়াতে শুরু করল সে। এ সেকশন হলেও নিচের ক্লাস বলে ছেলেরা বড্ড দুরন্ত। ধমকধামক দিতে ইচ্ছে করে না কোনওবারেই। উদ্দালক একগাদা অঙ্ক দিয়ে দিল। ছেলেগুলো অঙ্ক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সিক্সের পাশের ক্লাস সেভেন বি। জানলা দিয়ে ক্লাসের বাইরেটা দেখা যায়। উদ্দালক দেখল পল্টুকে নিল ডাউন করিয়ে রাখা হয়েছে। সে ক্লাস থেকে বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখল উদয় স্যারের ইতিহাস ক্লাস। পল্টু ফিসফিস করে বলল, "স্যার ইতিহাস বই আনতে ভুলে গেছি।"

উদ্দালক বলল, "খেতে ভুলে যাস না?"

পল্টু ভালো মানুষের মতো মাথা নেড়ে বলল, "না।"

উদ্দালকের হাসি পেল। সে আবার তার ক্লাসে ফিরে এল। ছেলেরা অঙ্ক নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। পিছনের বেঞ্চের কয়েকটা ছেলেকে বেঞ্চের উপরে দাঁড় করিয়ে দিল। ছেলেগুলো হাসিমুখে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন এর থেকে আনন্দের কাজ আর কিছু হতে পারে না।

কয়েকজনের খাতা দেখে হতাশায় মাথা নাড়ল উদ্দালক। অঙ্কের অবস্থা খুব খারাপ। বলল, "আজ লাস্ট ক্লাসের পরে কেউ বাড়ি যাবে না। এক্সট্রা ক্লাস নেব।"

ছেলেরা হতাশ মুখে মাথা নাড়ল। ক্লাসটা শেষ হলে উদ্দালক টিচার্স রুমে গিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করল। অনেক দিন পর স্কুল পালাতে ইচ্ছা হল। স্কুল পালিয়ে কোথায় যাওয়া যেতে পারে? সিনেমা হলে? ভেড়ির তীরে ভারী সুন্দর হাওয়া দেয়। ওখানে গিয়েও চুপ করে বসে থাকলে মন্দ হত না।

শিক্ষকরা স্কুল পালাতে পারে?

কথাটা ভেবেই হেসে ফেলল সে।

১৭

অগ্নি ব্রেকফাস্ট করছিলেন। মালতী চা নিয়ে এলেন।

অগ্নির সামনে বসে বললেন, "কী রান্না করব?"

অগ্নি বললেন, "আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? করো যেটা খুশি। বাজার আছে?"

মালতী বললেন, "মাছ এনো ওবেলা বেরিয়ে। আজকের মতো মাছ আছে।"

কলিং বেল বেজে উঠল। মালতী বললেন, "এখন আবার কে এল? দেখি।"

দরজা খুললেন মালতী। দেখলেন জিনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বড়ো ব্যাগ।

বললেন, "কি রে? কী হল?"

জিনিয়া ব্যাগটা সোফার সামনে রেখে সোফায় বসে বলল, "যা আছে খেতে দাও। অফিস বেরোব।"

মালতী বললেন, "সে ঠিক আছে। এত বড়ো ব্যাগ নিয়ে এলি কেন?"

জিনিয়া বলল, "চলে এলাম। থাকব না ওখানে আর। পোষাল না।"

মালতী ছিটকে গিয়ে অগ্নির কাছে গিয়ে বললেন, "দেখলে? চলে এসেছে।"

অগ্নির খাওয়া হয়ে গেছিল। তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিলেন না। হাত মুখ ধুয়ে টাওয়েলে হাত মুছে বললেন, "ও অফিস যাবে বলল তো। খেতে দাও।"

মালতী বললেন, "মানে? তুমি কিছু বলবে না?"

অগ্নি জিনিয়ার পাশে বসে বললেন, "খেতে দাও ওকে। ও একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে। ও যেটা ঠিক করবে, তাই হবে।"

মালতী বললেন, "আর বিয়ে হল, বাড়িতে অষ্টমঙ্গলায় জামাই এসে গেল, পাড়ার লোক জানল, আত্মীয়স্বজনরা জানল, তার কী হবে?"

অগ্নি জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, “কী বলে দেখ তোর মা। নিজের মেয়ের থেকে এরাই বেশি হয়ে গেছে।”
জিনিয়া মার দিকে তাকাল, “তুমি কী চাও? বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?”
মালতী রেগে গিয়ে বললেন, “আমি কিছু চাই না। আমার চাওয়া না চাওয়ার তো কোনও দামই নেই। এত ভালো একটা ছেলে, তাও চলে এলি। যা পারিস কর।”
মালতী গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।
অগ্নি জিনিয়ার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, “ঝগড়া হয়েছে?”
জিনিয়া মাথা নাড়ল, “না। ঝগড়া হবে কেন? উদ্দালক খুবই ভালো ছেলে। ঝগড়া হবার মতো কিছু হয়নি।”
অগ্নি বললেন, “তবে?”
জিনিয়া বলল, “থাকব না জাস্ট, ঠিক করে ফেললাম। এটাই। থাকা হবে না আর কি।”
অগ্নি বললেন, “তাহলে কী করবি?”
জিনিয়া বলল, “যদি বাড়িতে থাকতে দাও, তাহলে বাড়ি থেকেই অফিস যাতায়াত করব। আর কিছু না।”
অগ্নি জিনিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, “বেশ, তাই করিস। যেটা ইচ্ছা সেটা করিস।”
জিনিয়া বলল, “আর তুমি আমার বিয়েতে যা খরচ করেছ জানিয়ো, শোধ করে দেব সব।”
অগ্নি হেসে ফেললেন, “ধুর পাগল। ও তো তোরই টাকা। এসবের আবার হিসেব হয় নাকি? পাগল মেয়ে। যা, অনেকটা জার্নি করে এসেছিস। স্নান করে খেয়ে অফিস যা।”
জিনিয়া উঠে স্নানে গেল। স্নান করতে করতে কাঁদতে শুরু করল। কেন কাঁদছিল নিজেই বুঝতে পারল না। স্নান সেরে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ব্যাগ থেকে সৌপ্তিকের ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল। মালতী পাউরুটি আর অমলেট প্লেটে তার সামনে দিয়ে বসলেন।
জিনিয়া বলল, “মা এখন কোনও প্রশ্ন কোরো না প্লিজ। পরে কোরো।”
মালতী বললেন, “আমি কি তোর শত্রু মা?”
জিনিয়া বলল, “না। শত্রু হবে কেন? তবে বন্ধু হতে গিয়ে আমাকেই বুঝে উঠতে পারলে না কখনও।”
মালতী কেঁদে ফেললেন, “চিরকাল এই সংসারের জন্য খেটে আজ আমাকে এটা শুনতে হল।”
জিনিয়া আর কিছু বলল না। চুপ করে খেয়ে বেরিয়ে গেল।
অফিস করল সারাদিন কোনও কথা না বলে।
সুলগ্না কথা বলতে এসেছিল, সে বলল, “এখন যা। পরে কথা হবে।”
সন্ধে হলে অফিস থেকে বেরোল সে। সৌপ্তিকদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখল আলো জ্বলছে। ভাবল রাতে যে ভদ্রলোক থাকেন, তিনিই এসেছেন হয়তো। বেল বাজাতে সৌম্য দরজা খুলল।
জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, “আপনি? বাবা মা আসেননি?”
সৌম্য বলল, “না, আমি একা এসেছি। বাড়িটা সত্যিই বেচব এবার। ওদিকে একটা প্রপার্টি কেনার কথা চলছে। এ শহর থেকে পাততাড়ি গোটানোর সময় হয়ে গেল এবার।”
জিনিয়া বলল, “আপনার স্মৃতি? ভাইয়ের স্মৃতি? এসবের কোনও মূল্য নেই?”
সৌম্য হাসল, “আপনিও তো বিয়ে করে নিয়েছেন। আপনি মূল্য দিয়েছেন?”
জিনিয়া বলল, “বিয়ে করিনি সেভাবে, বিশ্বাস করুন। ইন ফ্যাক্ট আমি চলেও এসেছি ও বাড়ি ছেড়ে।”
সৌম্য বলল, “আপনি আসুন এবার। আমার গার্লফ্রেন্ড আসার কথা। ও আপনাকে দেখলে অন্য কিছু ভাবতে পারে। প্লিজ।”
জিনিয়া সৌপ্তিকের বাবার মোবাইলে চেষ্টা করল। ফোন অফ বলছে।
সৌম্য হাসিমুখে বলল, “নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেছে সবার। পাবেন না কাউকে। আসুন। নমস্কার।”
জিনিয়া স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরল।

এক লহমায় মাথাটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল তার।

১৮

সন্ধে হয়েছে। পল্টু পড়তে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, "বউদি নেই স্যার?"

উদ্দালক বলল, "না।"

পল্টু বলল, "অফিস গেছেন?"

উদ্দালক বলল, "তোর এত জেনে কী হবে? অঙ্ক খাতা খোল।"

পল্টু বলল, "ভাবলাম আজকেও দেশি মুরগি নিয়ে আসব।"

উদ্দালক বলল, "আজ ভাল্লাগছে না ওসব। আলুসেদ্ধ ভাত খাব।"

পল্টুর মুখটা নিভে গেল, "ওতে হবে?"

উদ্দালক বলল, "হবে। না হওয়ার কী আছে? দেখি খাতা দেখি।" পল্টু খাতা বের করে দিল। উদ্দালক পড়াতে শুরু করল। পড়ানো হয়ে গেলে পল্টু আর-একটু উশখুশ করল। উদ্দালক বলল, "তুই বাড়ি যা। আমার পড়া আছে আবার।"

পল্টু বিমর্ষ মুখে বলল, "বউদির দেরি হয়ে গেল।"

উদ্দালক বলল, "বউদি আসবে না। তুই বাড়ি যা।"

পল্টু মনখারাপ করে চলে গেল।

ইংরেজি কাগজের সুডোকু সলভ করতে বসল উদ্দালক। খানিকটা করে ভালো লাগল না। বই খুলে বসল। সেটাও ভালো না লাগায় উঠে গ্যাস জ্বালিয়ে ভাত আলুসেদ্ধ একসঙ্গে বসিয়ে দিয়ে খেয়ে নিল।

বেডরুমে ঢুকল। তার ডায়েরিটা পড়ে আছে। খুলে দেখল জিনিয়া তার লেখার পরের পাতায় অনেকগুলো ছবি এঁকেছে। ফোন বাজল, দেখল জিনিয়ার মা ফোন করছেন। ধরল, "হ্যালো।"

মালতী নিচু গলায় বললেন, "বাবা, তোমাদের কি ঝগড়া হয়েছে?"

উদ্দালক বলল, "না তো। কেন বলুন তো?"

মালতী বললেন, "না মানে তিন্নি বলছে আর ফিরবে না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন একটা মান সম্মানের ব্যাপার বলো তো?"

উদ্দালক বলল, "কেন? মান সম্মানের ব্যাপার কেন? এখানে ওর পোষায়নি, চলে গেছে। মান সম্মানের কী হল?"

মালতী বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ না বাবা কী কী সমস্যা হতে পারে? শুধু আমাদের কেন? তোমাদেরও সমস্যা হতে পারে।"

উদ্দালক একটু থমকে বলল, "ঠিক আছে। দুটো দিন যাক। দেখি আপনার মেয়ে কী করে। তারপর নাহয় কী করব ঠিক করা যাবে।"

মালতী বললেন, "দেখো কিন্তু। ওর বাবা এসব বুঝতে চায় না। আমি তো মা, আমার ভিতরেও তো অশান্তি হয় বলো? দ্যাখো, রাত সাড়ে নটা বাজে, এই একটু আগে বাড়িতে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। এভাবে চলে বলো তো? সমস্যা হয় না?"

উদ্দালক বলল, "সে অফিসের কাজ ছিল হয়তো। আচ্ছা আমি দেখছি ফোন করে।"

মালতী কাতর আর্তি করলেন, "দেখো বাবা। তুমিই পারবে।"

উদ্দালক হাসল, "না, আমি পারব না কিছুই। তবে দেখছি।"

ফোন রেখে উদ্দালক জিনিয়াকে ফোন করল। একবার পুরো রিং হয়ে কেটে গেল। দ্বিতীয়বার আবার রিং হতে জিনিয়া ধরল, "বলুন। আপনার কী চাই?"

উদ্দালক বলল, "কিছু চাই না। আপনার আঁকার হাত তো বেশ ভালো। ছবি আঁকেন আপনি?"

জিনিয়া থমকে গিয়ে বলল, “আপনি কোথায় দেখলেন?”
উদ্দালক বলল, “এই তো, আমার ডায়েরির পাতায়। বেশ ভালো ডিজাইনগুলো হয়েছে কিন্তু।”
জিনিয়া বলল, “আপনার আর কিছু বলার আছে?”
উদ্দালক বলল, “দেখুন, রুমমেট হিসেবে দুজন ছিলাম। একজন রুমমেট মেস ছেড়ে চলে গেছে। মাসি যা রান্না করেছে, তা এক্সেস হয়ে গেছে। আমি সেই খোঁজ নিতেই ফোন করলাম যে আমার রুমমেট ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছোতে পেরেছে কি না।”
জিনিয়া বলল, “পেরেছি। রাখুন। আমার ভালো লাগছে না কিছুই।”
উদ্দালক বলল, “আরে কেন ভালো লাগছে না বলবেন তো একবার।”
জিনিয়া চুপ করে গেল।
উদ্দালক বলল, “আরে বলুন। কী হল?”
জিনিয়া বলল, “সৌপ্তিকের দাদা এসেছে। ও বাড়ি বিক্রি করে দেবে।”
উদ্দালক বলল, “বেশ তো। আমি আর আপনি কিনে নেব। দুজনের মাইনেয় হাউজবিল্ডিং লোন পাওয়া যাবে তো। এই নিয়ে এত চাপ নেওয়ার কী আছে?”
জিনিয়া অবাক হয়ে বলল, “মানে? আপনি কিনবেন কেন?”
উদ্দালক বলল, “আরে আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি আমার রুমমেট। তা ছাড়া কলকাতায় একটা বাড়ি হবে সেটাও মন্দ না। মাঝে মাঝে আমি, আপনি, পল্টু গিয়ে পিকনিক করে এলাম। খারাপ হবে ব্যাপারটা?”
জিনিয়া কেঁদে ফেলল। উদ্দালক বলল, “আরে, কাঁদছেন কেন? কী হল?”
জিনিয়া বলল, “থ্যাংক ইউ।”
উদ্দালক বলল, “ধুস। থ্যাংক ইউয়ের কিছু নেই। কাল আসুন দেখি ও বাড়ি। কথা বলি সৌপ্তিকের দাদার সঙ্গে। দেখি কী বলেন ভদ্রলোক।”

১৯

ভোরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পল্টুর সঙ্গে দেখা হল উদ্দালকের। পল্টু বাজারের ব্যাগ নিয়ে সাইকেলে চেপে যাচ্ছে। তাকে দেখে দাঁত বের করল, “কোথায় যাচ্ছেন স্যার?”
উদ্দালক বলল, “কলকাতা যাচ্ছি।”
পল্টু বলল, “বউদিকে আনতে?”
উদ্দালক শ্বাস ছাড়ল, “বউদিকে আনা ছাড়া কলকাতায় অনেক কাজ থাকে। তুই স্কুলে যাবি কিন্তু আজকে।”
পল্টু বলল, “আজ যাব না স্যার। আপনি যাবেন না, আমি গিয়ে কী করব?”
উদ্দালক বলল, “ঠিক আছে। তাহলে অঙ্কগুলো করবি।”
পল্টু ব্যাজার মুখে বলল, “করব। অঙ্কটা খুব বাজে জিনিস স্যার।”
উদ্দালক বলল, “তা ঠিক। খুবই বাজে জিনিস। পড়াশোনাটাও বাজে জিনিস। তবু করতে হয়। কী করবি?"
পল্টু বলল, “বনগাঁ লোকাল ধরবেন স্যার? খুব ভিড় হবে এখন।”
উদ্দালক বলল, “চিন্তা করিস না। ও ঠিক চলে যেতে পারব।” পল্টু সাইকেল নিয়ে বাজারের দিকে চলে গেল।
স্টেশনে পৌঁছে সুদেববাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল উদ্দালকের। শালি, বউ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। উদ্দালক সরাসরি সামনে গিয়ে দাঁড়াল, “কোথায় যাচ্ছেন?”
সুদেব এবার আর উত্তর না দিয়ে পারলেন না, “শ্বশুরবাড়ি। কাজ আছে।”
উদ্দালক বলল, “আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করছেন কেন স্যার?”
সুদেব হাসার চেষ্টা করলেন, “অ্যাভয়েড? না না তা কেন?”

উদ্দালক সুদেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। সুদেব পরিচয় করালেন। উদ্দালকের নাম শুনে সুদেবের স্ত্রীর মুখটা পানসে হয়ে গেল।

ট্রেন দেখা গেল। উদ্দালক বলল, "সাবধানে যান, আমি আসি? একদিন কিন্তু সস্ত্রীক বউদির হাতের চিংড়ির মালাইকারি খেতে যাব, কেমন?"

সুদেব হে হে করে কাটিয়ে গেলেন। উদ্দালক হেসে ফেলল। সুদেব সেটা বুঝে তার দিকে কটমট করে তাকালেন।

উদ্দালক আর সুদেবকে জ্বালাল না। সরে গেল। ট্রেন আসছে। এ পথে ট্রেনে ওঠাও যুদ্ধ করার সমতুল্য। সে প্রস্তুত হল।

#

সৌম্য উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি বাড়িটা কিনবেন?"

উদ্দালক সৌম্যর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আমি না ঠিক। আমরা। আমি আর ও দুজনেই। বিক্রি করবেন শুনলাম।"

সৌম্য বলল, "এ জায়গায় বাড়ির দাম অনেক হবে, অ্যাফোর্ড করতে পারবেন?"

উদ্দালক বলল, "করতে হবে। সৌপ্তিকের স্মৃতি আছে যখন। ঘটি বাটি বন্ধক রাখতে হলে রাখব।"

সৌম্য অবাক চোখে উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনিও কি জিনিয়ার মতো পাগল হয়ে গেলেন? আপনি বুঝতে পারছেন না মেয়েটা পাগল? মেন্টালি চ্যালেঞ্জড একটা মেয়ে?"

উদ্দালক বলল, "আমি পাগল হইনি। আর সাইকোলজিকাল স্টাডি বলছে কম বেশি আমরা সবাই পাগল। কারও পারসেন্টেজ বেশি। কারও কম। আপনি নিজেকেই দেখুন। প্রথমে ঠিক করলেন বাড়ি বেচবেন না। জিনিয়াকে চাবি দিয়ে গেলেন। পরে কী এমন হল যে সেটা বেচার কথা মাথায় এল? আমি বলছি কেন এল। যখনই আপনি জানতে পারলেন জিনিয়া মাঝে মাঝেই এ বাড়ি আসছে, আপনার ধারণা হল এই বাড়িটা হয়তো জিনিয়া দখল নেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনার সম্পত্তি বেদখল হওয়ার ভয় মাথায় এল। ঠিক বলছি তো?"

সৌম্য কয়েক সেকেন্ড উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "বেদখল হবার কথা ভাবিনি, কিন্তু একটা মেয়ে যে বারবার আমার বাড়ি যাতায়াত করবে, সে ব্যাপারটা আমি ভালোভাবে নিইনি।"

উদ্দালক বলল, "বেশ। আর-একটা কথা বলি আপনাকে। জিনিয়া সৌপ্তিককে ভালোবাসত। আজকাল ঠিকঠাক ভালোবাসার মানুষের বড়োই অভাব। জিনিয়ার মধ্যে সেটা নেই। ওর ভালোবাসায় কোনও ভেজাল ছিল না। তাই ও যেটা করেছে, তাতে পাগলামি সামান্য থাকতে পারে, বিন্দুমাত্র ধান্দাবাজি নেই। আর আপনার বাড়ি বেদখল হবার ভয়টাও নেই। বুঝেছেন?"

সৌম্য বলল, "আপনি জিনিয়াকে ভালোবাসেন, তাই না?"

উদ্দালক বলল, "নাহ। ভালোবেসে কিছু হয় না বুঝলেন? অর্ধেক বাঙালি ভালোবেসে কেরিয়র নষ্ট করল। মন দিয়ে কাজ করুন, প্রেম ভুলুন, দেখবেন অনেক ভালো থাকবেন। এই জিনিয়াকেই দেখুন, প্রেম প্রেম প্রেম করে মাথা খারাপ করে ফেলল। কী লাভ হল?"

সৌম্য বলল, "তাহলে বাড়ি কেনার কথা ভাবলেন কেন? অর্থনৈতিক ক্ষতি যেটা হবে, সেটা ভালো হবে?"

উদ্দালক বলল, "আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক লটারিতে এক কোটি টাকা পেয়ে আনন্দে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছিলেন। তার ছেলেরা সেই টাকা ভাগাভাগি করে নিল। দু বছরের মাথায় সব টাকা উড়িয়ে যা অবস্থা ছিল, তার থেকেও খারাপ অবস্থা হয়ে গেল তাদের। টাকা দিয়ে কী হবে? হোম লোন নিলে একটা বড়ো অঙ্কের হাউজ বিল্ডিং লোন মাইনে থেকে কেটে যাবে। এই তো? কষ্ট করে থাকতে হবে, সপ্তাহে চারদিন মাংস খাই, তার জায়গায় দুদিন খাব। এর বাইরে আর কী হবে? চাপ নেবেন না। আপনি বলুন কত টাকায় বেচবেন বাড়ি। আমরা কিনে নেব।"

সৌম্য মাথা নেড়ে হেসে বলল, "বাঙালি মাত্রেই ইমোশনাল ফুল।"
উদ্দালক বলল, "আপনি বাঙালি নন? আপনার ইমোশন নেই? দাঁড়ান, এক মিনিট।"
মোবাইল বের করল উদ্দালক। গ্যালারি থেকে একটা ছবি বের করে সৌম্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা মনে হয় আপনাদের দুই ভাইয়ের ছবি, তাই না? এ বাড়ি তখন হচ্ছে সম্ভবত, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে ইট দেখা যাচ্ছে। প্লাস্টার হয়নি। জমি, ইট, সিমেন্ট সবই বাজারে পাওয়া যায় সৌম্যবাবু, কিন্তু এই স্মৃতিটা কি পাওয়া যাবে?"
সৌম্য মোবাইলটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।
উদ্দালক বলল, "এবার সোয়াইপ করুন মোবাইলটা। পরের ছবিতে যান। দেখুন, জিনিয়া আমার ডায়েরিতে আপনাদের এই বাড়ির ছবিটাই এঁকেছে। একটা মেয়ে তার প্রেমিককে কতটা ভালোবাসলে তাকে এভাবে আত্মস্থ করতে পারে বলুন তো? ইমোশনাল ফুল? হলই বা, তাতে কি আদৌ কিছু আসে যায়?"
সৌম্য মাথা নিচু করল।
উদ্দালক বলল, "বাড়িটার জন্য কত দাম ঠিক করলেন জানাবেন সৌম্যবাবু। এ বাড়িটা আমরাই কিনব। আপনি আসতে পারেন নিজের ছোটোবেলার বাড়ি দেখতে। চিন্তা নেই, আমরা বাধা দেব না। আসি।"
উদ্দালক উঠল। সৌম্য আর কোনও কথা বলতে পারল না।

২০

ব্যাংকে লোনের কাগজপত্রে সইসাবুদ সেরে বেরিয়ে উদ্দালক বলল, "শরবত খেতে ইচ্ছা করছে। খাবেন নাকি?"
জিনিয়া বলল, "চলুন।"
উদ্দালক বলল, "প্যারামাউন্ট যাব। চলুন মেট্রো ধরি।"
দুজনে মেট্রোতে এম জি রোডে নেমে হাঁটতে শুরু করল। উদ্দালক বলল, "কলেজলাইফে প্রচুর বই কিনতে আসতাম এখানে। পড়ার বইয়ের বেশি থেকে একগাদা লিটল ম্যাগ আর গল্পের বই কিনে ফিরতাম। ফুট থেকে বই কিনেছি। কত বিখ্যাত লেখকের সই ছিল সেসব বইতে। রদ্দির দামে বেচে দিয়েছে কেউ। সে জিনিস আবার রিসাইকেল হয়ে কলেজ স্ট্রিটেই বিক্রি হয়ে অন্য কোনও বইপ্রেমী কিনেছেন। মানুষের কাছে নস্টালজিয়ার মূল্য খুব সীমিত। মূল্যবোধও। নইলে বাবা-মাকে কেউ বৃদ্ধাশ্রমে দিতে পারে?"
জিনিয়া বলল, "আপনি সৌম্যকে এমন কী বললেন যাতে ও বাড়িটা আমাদেরই বেচতে রাজি হয়ে গেল?"
উদ্দালক হেসে বলল, "বলেছি কিছু একটা। এখন মনে করতে পারছি না। কেন বলুন তো?"
জিনিয়া বলল, "এত টাকা ইএমআই দিতে পারব?"
উদ্দালক বলল, "দিতে হবেই। মানুষের বেঁচে থাকতে কী এমন টাকা লাগে? হয়ে যাবে। আর গাড়ি-টাড়ি তো এ জন্মে কিনতাম না। সাইকেলেই প্রকৃতির জন্য বেস্ট। কোনও এমিশন নেই, পরিবেশে কোনও দূষণও নেই। ও নিয়ে ভাববেন না। তা ছাড়া বিদেশ যাব বলে অনেক টাকা জমিয়েছি। সবসময় তো স্কলারশিপের ভরসায় থাকা যায় না। আছে কিছু টাকা। অসুবিধা হবে না।"
জিনিয়া বলল, "আপনি কেন টাকা দিতে যাবেন?"
উদ্দালক বলল, "আপনার জন্য ভাববেন না। আমারও নিজের দেশের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে। বিদেশের ছাত্র পড়িয়ে ডলারে না কামিয়ে নাহয় দেশের অগাবগা ছাত্রদের মানুষ করি। দেখি পারি কি না। দিনের শেষে সাইকেল চালিয়ে আলের ধার দিয়ে ঘরে ফেরা, রাত্তিরে মাস্টার ছাত্র মিলে রান্না করে খাওয়া, এসব লাইফ ছেড়ে কে যাবে বলুন তো বাইরে? আমাকে কি পাগলা কুকুরে কামড়েছে নাকি?"

জিনিয়া বলল, "আমি বুঝেছি।"
উদ্দালক বলল, "কী বুঝেছেন?"
জিনিয়া বলল, "আমার মতো আপনার হেড অফিসেও স্ক্রু ঢিলা আছে।"
উদ্দালক বলল, "তা আছে। সুস্থ মানুষ হয়ে মানুষে মানুষে দাঙ্গা করার থেকে মনে হয় দু-চারটে ঢিলা স্ক্রু নিয়ে কিছু মানুষের কাজে আসা ভালো। আপনার কী মনে হয়?"
জিনিয়া বলল, "আমার কিছু মনে হয় না। আমি মনে হয় ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাব।"
উদ্দালক বলল, "ধুস। পাগল হতে যাবেন কেন? ভালো কাজ করলে কেউ পাগল হয় না। সৌপ্তিকের বাড়িটা ভালো কোনও কাজে লাগানো যেতে পারে। পথশিশুদের আশ্রয়স্থল করা যেতে পারে। তাতে কি সৌপ্তিক খুব একটা দুঃখিত হবে? মনে হয় না।"
জিনিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, "সেটা তো ভাবিনি। এরকম করলে সত্যি খুব ভালো ব্যাপার হবে।"
উদ্দালক বলল, "বাড়িটার নামও একটা ভেবে রেখেছি। আপনার চরিত্রের সঙ্গে খুব যাবে।"
জিনিয়া বলল, "কী?"
উদ্দালক হাসল, "অপরাজিতা।"
জিনিয়া বলল, "সত্যি এখন ভাবলেন? না আগে থেকে ভেবেছিলেন?"
উদ্দালক বলল, "না, এখনই ভাবলাম। যদিও আপনার নামটাও ফুলের নামেই, তবু আপনি অপরাজিতাই বটে। সৌপ্তিক ভাগ্যবান।"
জিনিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।
উদ্দালক বলল, "ডাবের শরবত খেয়ে কবিরাজি কাটলেট খাব বুঝলেন? তারপর আরও কিছু বই কিনব। একটা ব্যাগও কিনতে হবে বইগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। আহ, কলেজ স্ট্রিট! মানুষের যাওয়া আসা, বইয়ের গন্ধ, হাতে টানা রিকশা... মনে হয় কোনও স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। কলকাতাকে বোধহয় দূরে থেকেই বেশি ভালোবাসা যায়।"
জিনিয়া বলল, "কলকাতা বড়ো কষ্টও দেয়।"
উদ্দালক বলল, "আর সেই কষ্টকে ভুলতেও সাহায্য করে। পল্টুকে একদিন নিয়ে আসতে হবে। ব্যাটা প্যারামাউন্টে এলে সাত আট গ্লাস শরবতের নিচে থামবে না মনে হয়। অনেক জায়গা ঘোরার আছে। এক কাজ করব, স্কুল থেকে এবার শীত পড়লে এক্সকারশন করব। জমে যাবে। দেখি, গিয়েই হেডুকে ধরব। আচ্ছা, আমি তো আজকে চলে যাব। আপনি ভাববেন না, ইএমআইয়ের টাকা ঠিক পাঠিয়ে দেব প্রতি মাসে। চিন্তার কিছু নেই।"
জিনিয়া ঘাড় নাড়ল, "ঠিক আছে।"
উদ্দালক একটা বইয়ের দোকান দেখে দাঁড়িয়ে গেল, "ইরিব্বাস! সতীনাথ ভাদুড়ির বই। এই আপনি একটু দাঁড়ান, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।"
ব্যস্তসমস্ত হয়ে উদ্দালক বইয়ের দোকানের ভেতর প্রবেশ করল।

২১

দুদিন পরের কথা।
রাত আটটা। পল্টু পড়তে বসেছে। আশ্চর্যজনকভাবে সব অঙ্কই ঠিক করছে। উদ্দালক অবাক হয়ে বলল, "কি রে পল্টু, তুই তো কামাল করে দিচ্ছিস রে ব্যাটা, এই কঠিন অঙ্কগুলোও পারছিস কী করে?"
পল্টু দাঁত বের করে বলল, "প্যাকটিস করছি স্যার। অঙ্কগুলো আজকাল আর আগের মতো কঠিন লাগে না।"
উদ্দালক খুশি হয়ে বলল, "তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। আজ তাহলে মাংস হয়ে যাক। কী বলিস?"
পল্টু হাসল, "হ্যাঁ স্যার। হয়ে যাক।"

উদ্দালক মানিব্যাগ নিতে উঠল। পল্টু জিজ্ঞেস করল, "স্যার, বউদি আর আসবেন না?"
উদ্দালক বলল, "না। বউদির বাড়ি তো কলকাতায়। উনি ওখানেই থাকবেন।"
পল্টু বলল, "এরকম হয় নাকি? বিয়ের পর তো বউ বরের সঙ্গে থাকে।"
উদ্দালক বলল, "হয়, কলকাতায় হলে এরকম হয়।"
পল্টু বলল, "কী যে বলেন স্যার, বিনোদের বাবা তো মেয়েটাকে কথা দিল বিনোদ বড়ো হলেই বিয়ে দিয়ে মেয়েকে ঘরে তুলবে। তাহলে আপনার বউ দূরে থাকবে কেন?"
উদ্দালক বলল, "খুব পেকেছিস ব্যাটা। যা, মুরগি নিয়ে আয়। আমি পেঁয়াজ কাটতে বসি।"
পল্টু মুখ কালো করে বেরোল।
উদ্দালক পেঁয়াজ কাটতে বসল।
কয়েক সেকেন্ড পরেই লাফাতে লাফাতে পল্টু এসে বলল, "স্যার, স্যার, বউদি এসেছেন।"
উদ্দালক অবাক হয়ে বলল, "কী? ইয়ার্কি মারছিস?"
পল্টু বলল, "হ্যাঁ স্যার। এই তো।"
উদ্দালক ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল জিনিয়া টোটো থেকে নামছে। দোতলা থেকে সদাশিববাবু আবার উঁকি দিয়ে সেটা দেখছেন। সে বাইরে আর কিছু বলল না।
জিনিয়া ব্যাগ নিয়ে ঢুকল। পল্টুকে বলল, "তোর জন্য কলকাতার ভালো মিষ্টি নিয়ে এলাম পল্টু। তুই কোথায় যাচ্ছিলি এখন?"
পল্টু বলল, "মাংস আনতে।"
জিনিয়া বলল, "তাই নাকি? তা কটা রুটি খাবি বল? রুটি করে ফেলি শিগগিরি।"
পল্টু বলল, "আজ তো বেশি খুশি। তাই আজ পনেরোটা খাব।"
জিনিয়া হাসতে হাসতে বলল, "তাই হবে।"
পল্টু লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।
জিনিয়া উদ্দালকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার? আপনি মনে হচ্ছে একবারেই খুশি হননি?"
উদ্দালক বলল, "না, ঠিক তা নয়। আপনি বলতে পারতেন আমাকে। আমি স্টেশনে আনতে যেতাম নাহয়।"
জিনিয়া বলল, "বাড়িটা ঠিক পোষাচ্ছে না বুঝলেন। মা সারাক্ষণ এমন মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন আমি মরে গেছি। ওরকম করলে থাকা যায়! তার উপর আপনার মাও ফোন করছেন। এত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তা ছাড়া সৌপ্তিকদের বাড়িতে ঠিক কী করতে হবে, সে প্ল্যানটাও তো বসে করতে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে আমি জ্বালাতন করব না। আপনি পড়ুন। মন দিয়ে পড়ে যান। আমি আমার মতোই থাকব, ঠিক যেমন কথা হয়েছিল। ভালোবাসাটা সৌপ্তিকেরই থাক। আমরা সারাজীবন নাহয় বন্ধু হয়ে থাকি। দেখি, আটা কোথায়, আটা মাখি। পল্টুর জন্য রুটি করে রাখি।"
উদ্দালক বলল, "না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আটা মেখে দিচ্ছি। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন।"
জিনিয়া বলল, "স্টেশনে নেমেই আমি ফ্রেশ হয়ে গেছি। এখানকার হাওয়াটাই আলাদা। একফোঁটা পলিউশন নেই।"
উদ্দালক হাসল, "তা ঠিক।"
জিনিয়া বলল, "আচ্ছা শুনুন।"
উদ্দালক বলল, "বলুন।"
জিনিয়া বলল, "আপনার আসল ডায়েরিটা আমাকে দেবেন? আমি পড়তে চাই।"
উদ্দালক বলল, "কী করবেন পড়ে?"
জিনিয়া বলল, "সময় কাটাব। কী আর করব?"
উদ্দালক বলল, "প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি পড়ুন। বেশি ভালো লাগবে।"

জিনিয়া বলল, “আপনি দেবেন না, তাই তো?”
উদ্দালক বলল, “ব্যাগটা ঘরে রেখে ফ্রেশ হয়ে নিন। আমি পেঁয়াজ কেটে রেডি করি সব।”
জিনিয়া বলল, “কথা ঘুরিয়ে দিলেন অমনি?”
উদ্দালক বলল, “ডায়েরি লিখি না আমি। ডায়েরি লিখে কী হবে? স্মৃতি লিখে রাখা? হয় না জাস্ট। সব মোমবাতিই জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায় একদিন। মোমের যে অংশ বাতাসে মিশে যায়, আমাদের জীবনটাও সেরকম। চলে যাওয়ার পর এখানেই মিশে থাকব, কেউ মনে রাখবে। কেউ ভুলে যাবে। লিখে কী হবে?”
জিনিয়া চেয়ারে বসে পড়ে বলল, “আপনি বড়ো ভারী ভারী কথা বলেন। এরকম কঠিন কথা না বলে বোঝানো যায় না?”
উদ্দালক বলল, “সে বোঝানো যায়। তার জন্য আরও পড়াশোনা করতে হবে। যত জানব, তত সহজ হবে চারপাশ। যত কম জানব, তত কঠিন হবে সব কিছু।”
পল্টু লাফাতে লাফাতে মাংস নিয়ে ঢুকল। বলল, “স্যার, বাবা বলেছে কাল আমাদের বাড়ি খেতে। ভেটকি মাছ আনাবে।”
উদ্দালক বলল, “বাহ্। এ তো দারুণ খবর রে।”
জিনিয়া উঠল, “ব্যাগটা রেখে এসে রুটি করি তোর পল্টু। দাঁড়া, এখনই আসছি।”
পল্টু বলল, “তাড়াতাড়ি আসুন বউদি। মাছ ধরার গল্প বলব। বড়ো পুকুরে ইয়াব্বড়ো কাতলা ধরলাম কালকে।”
“আচ্ছা, শুনব রে বাবা শুনব”, বলে হাসতে হাসতে ব্যাগ নিয়ে বেডরুমে ঢুকল জিনিয়া।
ঘর অন্ধকার ছিল। আলো জ্বালল সে।
খাট জুড়ে ঝলমল করছে নীল কাগজ দিয়ে বানানো একগাদা অপরাজিতা ফুল…

অন্তবিহীন

১
।। রাঘব।।

রাঘব যখন পৌঁছল তখন দুপুর দেড়টা বেজে গেছে। কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করছিল।
দরজা খুললেন একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। তাকে দেখে বললেন, "তোমাকে কি অরিন্দম পাঠিয়েছে?"
রাঘব বলল, "হ্যাঁ।"
"এসো এসো ভিতরে এসো।" ভদ্রলোক দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।
রাঘব ভিতরে ঢুকল। বলল, "আমি কি অপেক্ষা করব?"
ভদ্রলোক বললেন, "বসো, আমি বাণীকে ডেকে দিচ্ছি।"
রাঘব সোফায় বসল।
বাড়িটা খুব একটা বড়ো না, কিন্তু খুব সুসজ্জিত। সল্টলেকের মতো জায়গায় এই বাড়ির দাম কি কোটি ছাড়িয়ে যাবে? রাঘব ভাবনা ছেড়ে দিল। তাদের গ্রামের লোকজন এসব বাড়িতে গেলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।
"ওহ, তুমি এসে গেছ?"
বাণী ম্যাম চলে এসেছিলেন। রাঘব উঠে দাঁড়াল, "হ্যাঁ ম্যাডাম। আমি এসে গেছি।"
ম্যাডাম বললেন, "বসো বসো। তুমি কি ট্রেনে এলে?"
রাঘব বলল, "হ্যাঁ ম্যাম, ট্রেনে এলাম।"
ম্যাডাম বললেন, "আচ্ছা। এখানে ডিউটি করতে হলে কোথায় থাকবে? আমাদের তো নিশাচর প্রাণীদের মতো কাজ। রাতে শুট থাকে, সন্ধের দিকে বাড়ি থেকে বেরোব, ভোরবেলা ফিরব। দিনের বেলাতেও গাড়ির দরকার হয়।"
রাঘব বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম, অরিন্দম স্যার সবই বলেছেন।"
ম্যাডাম বললেন, "কবে থেকে শুরু করতে পারবে?"
রাঘব বলল, "যেদিন বলবেন ম্যাডাম। আমি এখন বসেই আছি। সেরকম কোনও কাজ নেই।"
দরজা যে ভদ্রলোক খুলেছিলেন, তিনি চলে এসেছিলেন। রাঘব বুঝল ইনি সম্ভবত ম্যাডামের স্বামী। ভদ্রলোক বললেন, "তুমি কাল থেকেই চলে এসো, আচ্ছা তোমার নাম যেন কী?"
ম্যাডাম বললেন, "রাঘব, রাইট?"
রাঘব মাথা নাড়ল। ম্যাডাম ভদ্রলোককে বললেন, "কারও নাম আমি ভুলি না দেখলে? অরিন্দম ওর নাম বলেছিল, আমার ঠিক মনে আছে।"
ভদ্রলোক হাসলেন, "তাই তো দেখছি। যাই হোক, মাইনেকড়ির কথাটা বলে নাও।"
ম্যাডাম বললেন, "দ্যাখো, সারাদিনের কাজ তো বুঝতেই পারছ, চন্দন যা নিত তাই দেব ওকে।"
রাঘব বলল, "অরিন্দম স্যার তো বলেছেন পনেরো মতো..."
ভদ্রলোক চোখ বড়ো বড়ো করে ম্যাডামের দিকে তাকালেন। ম্যাডাম স্বামীর দিকে না তাকিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, ওটা আমিই বলেছি। পনেরো হাজার তো পাবেই, তার সঙ্গে আলাদা টিফিনের খরচও পাবে। তোমার

কোনও নেশা আছে?”
রাঘব দুদিকে মাথা নাড়ল।
ম্যাডাম বললেন, “খুব ভালো। এটাই চাইছিলাম। শোনো, বুবকার জন্যও একজন ড্রাইভার দরকার।”
ম্যাডাম স্বামীর দিকে তাকালেন।
ভদ্রলোক ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বুবকা ওর গাড়ি কাউকে ছুঁতে দেবে ভেবেছ?”
ম্যাডাম গলা নামিয়ে বললেন, রাঘব তাও শুনতে পেল, “বুবকার একজন ড্রাইভার থাকলে ওকে অ্যাটলিস্ট ট্র্যাক করতে পারতে ও কী করে, কোথায় যায়! দিন দিন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে ছেলেটা।”
ভদ্রলোক গলা না নামিয়েই বললেন, “যাচ্ছে কী! গেছে। কাল শুনলাম মাঝরাতে কোন রিকশাওয়ালাকে ঠুকে দিয়েছে। তাও নিজে বলেনি, সকালে তোমার বড়ো ছেলে গাড়ির সামনেটা দেখে ওকে চেপে ধরার পরে স্বীকার করেছে।”
ম্যাডাম মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললেন, “মান সম্মান সব শেষ করে দিল ছেলেটা। এইজন্যই বলছি ওর জন্যও একটা ড্রাইভার রাখো। শোনো, ওকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। ব্যাপারটা আমি দেখছি। রাঘব।”
রাঘব বলল, “হ্যাঁ ম্যাডাম।”
ম্যাডাম বললেন, “তুমি আর-একজন ড্রাইভারের খোঁজ দিতে পারবে? আমাদের আর-একটা গাড়ি আছে, ওর জন্য।”
রাঘব একটু ভেবে নিয়ে বলল, “হ্যাঁ ম্যাডাম। কবের মধ্যে লাগবে বলুন?”
ম্যাডাম বললেন, “যত তাড়াতাড়ি পারো। ভীষণ দরকার। আচ্ছা শোনো, তুমি তো সেই কত দূর থেকে এসেছ। খেতে বসে পড়ো।”
রাঘব অবাক হয়ে তাকাল। ম্যাডাম উঠলেন, “এসো এসো।”
রাঘব উঠল। তাকে ডাইনিং টেবিলে বসানো হল।
ম্যাডাম নিজের হাতে খাবার বেড়ে দিলেন। রাঘবের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। এঁরা এত বড়োলোক আর তার মতো একজন গরিব ড্রাইভারকে এভাবে খাওয়াচ্ছেন, তাও ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে!
ম্যাডামের স্বামীও তদারক করছিলেন।
তার খাওয়া হয়ে গেলে ম্যাডাম বললেন, “আজ থেকে তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন। নিজেকে আলাদা ভাববে না। কাল সকাল থেকে চলে এসো। আউটহাউসে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর ওই ড্রাইভারের ব্যাপারটাও ভুলো না কিন্তু।”
রাঘব মাথা নাড়ল। সঞ্জয় এখন বসেই আছে। ওকে বললেই এক পায়ে খাড়া হয়ে যাবে।

২
।। বুবকা।।

“স্যার। কলেজ গার্ল লাগবে?”
বুবকার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। যে লোকটা প্রশ্নটা করল তার দিক মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওই অবস্থাতেই। কেমন একটা তেলতেলে ব্যাপার আছে লোকটার মধ্যে। বুবকা খানিকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, “এইজন্য শালা ভুলভাল জায়গায় সস্তার বারে আসতে চাই না। আপনার আমাকে দেখে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হচ্ছে আমার কলেজ গার্ল লাগবে?”
লোকটা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে ওই তেলতেলে ভাবটা বজায় রেখেই বলল, “স্যার একবার দেখুন তো।”
বুবকা কটমট করে লোকটার দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। বিল দিয়ে বেরিয়ে পার্কিংয়ের দিকে এগোল।

লোকটা বেরিয়ে এল তার সঙ্গে, দেঁতো হাসি হেসে বলল, "স্যার তাহলে কী ঠিক করলেন?"
বুবকা পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, "বিষ কিনে খেয়ে মরে যান।" লোকটা থতোমতো খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।
গাড়ি স্টার্ট দিল বুবকা। তারপরেই মনে পড়ল সিগারেটের কথা। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ফোনটা বাজছিল।
বুবকা দেখল বাবা ফোন করছে।
ফোনটা ধরল না। বেশ খানিকক্ষণ ড্রাইভ করার পরে আবিষ্কার করল গাড়ির তেল শেষের দিকে।
কিছু একটা ভাবল কয়েক সেকেন্ড ধরে। তারপর আরও খানিকক্ষণ ড্রাইভ করে একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা পার্ক করে কলিং বেল বাজাল।
কেউ দরজা খুলল না দেখে অধৈর্য হয়ে বুবকা বারবার কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছিল।
কয়েক মিনিট পর বৈভবী দরজা খুলল। বুবকা বিরক্ত গলায় বলল, "কী করছিলে এতক্ষণ? ঘুমাচ্ছিলে?"
বৈভবী শান্ত গলায় বলল, "ভিতরে এসো।"
বুবকা ঘরে ঢুকে জুতো খুলে বৈভবীর ড্রয়িংরুমের সোফাতেই পা তুলে বসল।
বৈভবী বলল, "আজও কি গলা অবধি?"
বুবকা বলল, "ধুস শালা, স্টুডিওতে কে যেন বলল, একটা বারের কথা, ওখানে গেছিলাম। কী সব লোক, বলে কিনা কলেজ গার্ল চাই?"
বৈভবী হাসল, বলল, "ভালো তো, তোমার তো কলেজ গার্লই চাই বুবকা। তোমার বয়স কত?"
বুবকা বলল, "আমি কী জানি আমার বয়স কত! তোমার কত?"
বৈভবী বসল বুবকার সামনের সোফায়। বলল, "মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই।"
বুবকা বলল, "তোমার তিরিশ না?"
বৈভবী বলল, "কিপ গেসিং।"
বুবকা বলল, "সেদিন কে যেন বলছিল তুমি আমার থেকে অনেক বড়ো। বারো বছর অ্যাটলিস্ট। তার মানে পঁয়ত্রিশ হবে তোমার।"
বৈভবী বলল, "কে বলছিল? আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে কথা হয়?"
বুবকা ফিকফিক করে হাসতে লাগল, "কী যে বলো। কথা হবে না? তুমি একটা এত বড়ো হিরোইন ছিলে। তারপরে মিসেস বাণী মিত্র তোমার কেরিয়ারে কন্টিনিউয়াস কাঠি করে সেটা ফুটুর ডুম করে দিল, আর তার ছোটো ছেলে সেই তোমার সঙ্গে শুতেই সারাক্ষণ তোমার কাছে চলে আসে, সেটা নিয়ে কথা হবে না?"
বৈভবীও হাসল, বলল, "তুমি কি এভাবেই সবার সঙ্গে আমার ইন্ট্রোডাকশন করাও বুবকা?"
বুবকা উঠে বসল। বৈভবীর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, "না। তোমার নামে কেউ বাজে কথা বললে তাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব না বৈভবী।"
বৈভবী হাতটা ছাড়িয়ে নিল না। বলল, "সামনে কেউ বলে না বুবকা। তুমি ছোটো ছেলে। তুমি কিছুই বুঝবে না। পরপর দুটো সিনেমা হিট হবার পরেও কেন আমি আর কাজ পেলাম না, নিদেনপক্ষে একটা সিরিয়ালে একটা কাকিমার পার্টও কেউ কেন দিল না, সেটা তুমি এখনও বুঝবে না।"
বুবকা বৈভবীর হাত শক্ত করে ধরে বলল, "আমার বোঝার দরকার নেই। শুধু এটুকু বুঝে নাও, যে আমাদের আলাদা করার চেষ্টা করবে, তাকে আমি পুঁতে রেখে দেব।"

৩

।। অলকা।।

অলকা তৈরি হচ্ছিল।
শুভ স্নান সেরে বেরিয়ে তাকে দেখে বলল, "আজকে কটা বাজাবে?"
লিপস্টিকটা পুরু করে ঠোঁটে দিতে দিতে অলকা বলল, "জানি না। শুটের কোনও ঠিক থাকে নাকি।"
শুভ মাথা চুলকে বলল, "এত দেরি?!"
অলকা বলল, "দ্যাখো বস, এইসব কথা সুচিত্রা সেনের বর বলত, মানা যেত! ফিফটিজের প্যানপ্যানানি এখন চালালে হবে?"
শুভ বলল, "পরের মাসে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি তো?"
অলকা বলল, "হবে না, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম।"
শুভ হতভম্ব গলায় বলল, "হবে না? ইশ, একগাদা টাকা দিয়ে দিলাম তো ভোম্বলকে। ও যদি টাকা ফেরত না দেয়?"
অলকা বলল, "ওসব টাকার গল্প অন্য জায়গায় দিয়ো। আমারই তো টাকা। আমি বুঝে নেব।"
শুভ একটু ম্রিয়মাণ হয়ে বলল, "আমার একটা চাকরি হলেই তোমার সব টাকা শোধ করে দিতাম।"
অলকা বলল, "শাড়ির কুঁচিটা ধরো তো।"
শুভ হাঁটু গেড়ে বসে অলকার শাড়ির কুঁচি ধরল। অলকা শাড়িটা সামলাতে সামলাতে বলল, "তোমার চাকরির আশায় বসে থাকলে আর দেখতে হত না। তাও ভালো, ছেলে মেয়ে হয়নি। তোমার মাকে দয়া করে ওই ফাটা রেকর্ডটা বাজাতে বারণ কোরো।"
শুভ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ধুস! মা অত বোঝে নাকি? আচ্ছা তুমি চিন্তা কোরো না, আমি বলে দেব।"
অলকার হয়ে গেছিল। ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, "ঠিক কতটা কাঠখড় পুড়িয়ে এই মেন সাইড রোলটা পেয়েছি সেটার ব্যাপারে কোনও আইডিয়া আছে তোমাদের? এখনই যদি ঝুলে গেল তাহলে কী হতে পারে ভেবেছ কখনও? তোমার মা না বুঝুক, তুমি তো বুঝবে।"
শুভ অলকার পিছন পিছন আসছিল, বলল, "আজ আমারও ফিরতে দেরি হতে পারে।"
অলকা বলল, "তুমি কোথায় যাবে?"
শুভ বলল, "আসানসোল। দ্যাখো, কাজটা হয়ে গেলে তো বেঁচেই যাই।"
অলকা বলল, "আরে কী কাজ সেটা তো বলবে?"
শুভ বলল, "দাদা যাবে। দাদার সঙ্গে।"
অলকা বিরক্ত গলায় বলল, "এই দাদা দাদা ভাবটা ছাড়ো তো। পলিটিক্স করে কিন্তু কোনও কাজ পাবে না এটা তোমাকে বলে দিলাম। সামান্য বুদ্ধি থাকলেও সেটা বুঝতে তুমি। দল বাড়ানো ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না, সেটা বোঝো তুমি?"
শুভ বলল, "ওরকম বোলো না, দাদা ছিল বলেই তোমার কাজটা..."
অলকা ফিরে দাঁড়াল। রাগি গলায় বলল, "ওই ধারণা নিয়েই থাকো।"
শুভ থতোমতো খেয়ে গেল।
গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। অলকা গাড়িতে গিয়ে উঠল। ড্রাইভারকে বলল, "তোমার স্যার কোথায় এখন?"
ড্রাইভার বলল, "ফ্ল্যাটে আছেন। আপনি গেলে বেরোবেন।"
অলকা আর কিছু বলল না। বসে বসে মোবাইল ঘাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একটা অ্যাপার্টমেন্টের তলায় গাড়িটা দাঁড়াল। অলকা গাড়ি থেকে নেমে লিফটে উঠল।
দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। অলকা ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।
সে সরাসরি বেডরুমে প্রবেশ করল। দেখল দীপ্ত শুয়ে আছে। তাকে দেখে ঘুম ঘুম গলায় বলল, "এত শাড়ি

গয়না পরে এসেছ কী করতে? পরতেও তো টাইম লাগে।”
অলকা বলল, “আমার সেজে থাকতে ভালো লাগে।”
দীপ্ত বলল, “এখন তো সেই সব খুলতে হবে।”
অলকা বলল, “আবার পরে নেব, চিন্তা করছ কেন?”
দীপ্ত উঠে বসল। বলল, “আজ থাক, শরীরটা ভালো নেই।”
অলকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাটের ওপর বসে বলল, “সামনের দরজাটা এভাবে খুলে ঘুমাও, কোনদিন তো সব চুরি হয়ে যাবে।”
দীপ্ত বলল, “নিয়ে যাক যা আছে। আমাকে বাদ দিয়ে যেটা খুশি নিয়ে যাক।”
অলকা বলল, “এবার একটা বিয়ে করো দীপ্ত। এভাবে আর কদিন?”
দীপ্ত বলল, “কেন? পরের বউয়ের কি শুতে ইচ্ছা করে না আজকাল? সেলিব্রিটি হয়ে গেছ বুঝি একটা বালের সিরিয়াল করেই?”
অলকা বলল, “এসব বলে ছোটো করতে ভালো লাগে তোমার?”
দীপ্ত হাতড়ে একটা সিগারেট নিয়ে সেটা ধরিয়ে টানতে টানতে বলল, “সব সময় নিজের অওকাদে থাকবে অলকা। দেখবে ভালো থাকবে। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে তিন-চারবার আমি প্রস আমি প্রস বলবে। তাতে দেখবে বাস্তবটা বুঝতে সুবিধা হবে।”
অলকার চোখে জল এসে গেছিল। সে বলল, “আমি বেরোলাম। ট্যাক্সি করে স্টুডিও চলে যাব।”
দীপ্ত সিগারেটটা রেখে অলকার হাত ধরে অলকাকে টেনে নিজের কাছে নিল, দীর্ঘক্ষণ ধরে অলকার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, “বাহ, এই লিপস্টিকটা বেশ ভালো তো! ব্রেকফাস্টটা জমে গেল!”

৪
।। বাণী মিত্র।।

বাণী মিত্রের মুড আজ ঠিক নেই।
অফিসে আসার সময় গাড়িতেই খবর পেয়েছেন টিআরপি রিপোর্ট এসেছে। তিন্নির সংসার দু নম্বরে নেমে গেছে। আর-একটা প্রোডাকশন “সহেলির চুড়ি” চারে ছিল, ছয়ে চলে গেছে।
দীপ্ত রায় প্রোডাকশনের “ব্যানার্জি বাড়ির বউ” এক নম্বরে চলে এসেছে। বাণী মিত্র অফিসে এসেই সুভাষকে ডেকে পাঠালেন।
সুভাষ অফিসেই ছিল। ম্যাডামের সামনে এসে দাঁড়াল। বাণী মিত্র ঠান্ডা গলায় বললেন, “তিন্নির সংসার নেমে গেল কেন সুভাষ?”
সুভাষ মাথা চুলকে বলল, “ম্যাডাম, ব্যানার্জি বাড়ির বউ এখন মেগা উইক যাচ্ছে। বাড়ির বড়ো ছেলে আর-একটা বিয়ে করেছে, সেই নিয়ে তুমুল অশান্তি চলছে। ওইসবেই হবে হয়তো।”
বাণী মিত্র মোবাইল ঘাঁটছিলেন। বললেন, “রিখিয়াকে বলুন নতুন কোনও টেনশন ক্রিয়েট করতে। এভাবে বাজার ছেড়ে দেবেন নাকি?”
সুভাষ বলল, “রিখিয়া ম্যাম তো বলছিলেন তিন্নির সংসার আর টানতে পারছেন না। কোনও ভাবে শেষ করে দিলে হয় না?”
বাণী মিত্র সুভাষের কথায় পাত্তা না দিয়ে ওকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বললেন, সুভাষ ইতস্তত করে বেরিয়ে গেল। বাণী মিত্র ফোনটা কানে নিয়ে বললেন, “এই রিখিয়া, তিন্নি নেমে গেছে শুনেছিস তো?”
রিখিয়া ধরা গলায় বলল, “হ্যাঁ দিদি, একটু আগেই মেসেজটা পেয়েছি।”
বাণী বললেন, “ভাইরাল বাধালি নাকি?”

রিখিয়া বলল, "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে।"
বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "কী যে করিস না। বৃষ্টিতে ভিজেছিলি?"
রিখিয়া বলল, "হ্যাঁ। কিছু করার ছিল না আসলে। ছাতা নিতে ভুলে গেছিলাম।"
বাণী বললেন, "ওষুধ নে, ফেলে রাখিস না।"
রিখিয়া বলল, "চিন্তা কোরো না, ঠিক হয়ে যাবে। আর তিন্নির সংসার নিয়েও ভেবো না। কালকেই একটা ট্যুইস্ট আনছি।"
বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "ওর বরের আর-একটা বিয়ে দিস না, ব্যানার্জি বাড়ির গল্পে অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু।"
রিখিয়া বলল, "সেটা শুনেছি, তুমি দ্যাখো না আমি কী করি।"
বাণী বললেন, "একটা কাজ করা যেতে পারে। তিন্নির একটা আগের বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসতে পারিস।"
রিখিয়া বলল, "দেখেছ দিদি, আমাদের চিন্তা কত এক লাইনে যায়? আমি এটাই ভেবেছিলাম।"
বাণী গর্বিত গলায় হাসলেন, "সে তো হবেই। তুই আমার অন্য মায়ের পেটের বোন।"
রিখিয়া বলল, "দিদি, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?"
বাণী বললেন, "বল না।"
রিখিয়া বলল, "মানে..."
বাণী বললেন, "কী? বুবকাকে নিয়ে কিছু? ও ছাড়া আর কী হবে?"
রিখিয়া বলল, "হ্যাঁ দিদি। বুবকাকে নিয়েই।"
বাণী মাথায় হাত দিলেন, বললেন, "বল।"
রিখিয়া বলল, "দুপুরে বুবকা আমায় ফোন করেছিল। বলল, বৈভবীকে নিয়ে একটা স্টোরি ভাবতে।"
বাণী অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন, "তুই কী বললি?"
রিখিয়া বলল, "আমি কী বলব? হেসে আচ্ছা দেখব দেখব, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব এসব বলে ফোনটা কেটে দিলাম!"
বাণী বললেন, "শোন, বুবকাকে ব্লক করে দে। ওর ফোন তোকে ধরতে হবে না।"
রিখিয়া বলল, "কিন্তু দিদি..."
বাণী বললেন, "আমি বলছি তো, তোকে ভাবতে হবে না। বুবকাকে ব্লক করে দে।"
রিখিয়া বলল, "দিদি, বুবকার প্রোপোজালটা কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও ছিল না। বৈভবীর..."
বাণী বললেন, "বল শুনছি।"
রিখিয়া বলল, "না মানে তুমি রাগ করবে বলি যদি।"
বাণী বললেন, "বল বল।"
রিখিয়া বলল, "মানে তুমি যেদিন যে স্ক্রিপ্টটা বলছিলে, তাতে লিড রোলে বৈভবীকে..."
বাণী কঠিন গলায় বললেন, "এখন রাখছি, অনেক কাজ আছে।"
রিখিয়া থতোমতো গলায় বলল, "আচ্ছা আচ্ছা দিদি। রাখছি।"
বাণী ফোনটা কেটে দিলেন।
স্টুডিও যাবার জন্য উঠলেন।

৫
।। তথাগত।।

গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন আছে একটা। সকাল থেকেই একটা টেনশন কাজ করছে তথাগতর মধ্যে।

অন্যান্য দিন সাতটায় ওঠে।
আজ ভোর পাঁচটাতেই ঘুম ভেঙে গেল তার।
ল্যাপটপটা খাটের ওপর খোলা ছিল।
বেশ খানিকক্ষণ পয়েন্টগুলো ঝালিয়ে নিল মনে মনে। দেখল সব ঠিকঠাকই আছে।
আরও এক ঘণ্টা বিছানাতেই শুয়ে থাকল সে। ছটা নাগাদ উঠে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোল। আউটহাউস কদিন ফাঁকা ছিল, এখন আবার একজন ড্রাইভার এসেছে। তথাগত বেরিয়ে দেখল ছেলেটা দাঁত মাজছে। সে বলল, "তোমার নাম কী যেন?"
ছেলেটা একটু তটস্থ হয়ে বলল, "রাঘব, দাদা।"
তথাগত বলল, "কখন ফিরল মা?"
রাঘব বলল, "আড়াইটে।"
তথাগত বলল, "তোমার তো তাহলে ঘুম হল না ঠিক করে।"
ছেলেটা বলল, "অভ্যাস আছে দাদা। এই তো, এবার ঘুমাব।"
তথাগতর হাসি পেল, "দাঁত মেজে ঘুমাবে?"
ছেলেটাও হাসল, "হ্যাঁ দাদা। ম্যাডাম আজ দশটা নাগাদ কোথায় একটা যাবেন বলছিলেন।"
তথাগতর মনে পড়ল। আজ প্রীতিকাকে নিয়ে মার গয়না কিনতে যাওয়ার কথা আছে। তা বলে দশটায়? তাহলে কি অন্য কোথাও যাবে?
সে বলল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"
ছেলেটা বলল, "উত্তর চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে।"
তথাগত বলল, "চাষের জমি আছে তোমাদের?"
ছেলেটা বলল, "না দাদা। সেরকম কিছুই নেই।"
তথাগত বলল, "তোমার ঘরে মশারি আছে তো?"
ছেলেটা বলল, "না, এখনও কেনা হয়নি।"
তথাগত বলল, "সে কী? এখানে মশারি ছাড়া আছ কী করে? তুমি আমার থেকে টাকা নিয়ে নিয়ো। আজকে বাজার খুলতেই মশারি কিনে নিয়োনিয়ো।"
রাঘব কৃতজ্ঞ মুখে হাসল।
এতক্ষণ লক্ষ করেনি, তথাগত দেখল বুবকার গাড়িটা নেই। সে ফোন নিয়েই বেরিয়েছিল, বুবকাকে ফোন করল।
পুরো রিং হয়ে গেল, বুবকা ফোন ধরল না।
তথাগত আবার ফোন করল, এবার বুবকা ধরল, ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "কী বে গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী, সকাল সকাল ঝাঁট জ্বালাচ্ছিস কেন?"
তথাগত বলল, "তুই কোথায়? রাতে ফিরিসনি কেন?"
বুবকা বলল, "আমি কোথায়, তা জেনে তুই কী করবি?"
তথাগত দেখল রাঘব তার কথা শুনছে হাঁ করে। সে গেট খুলে রাস্তায় বেরোল। অনেকেই মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে। সে গলা নামিয়ে বলল, "মা ঘুম থেকে ওঠার আগে ঢুকে যা, নইলে আবার অশান্তি হবে।"
বুবকা বলল, "ম্যানেজ করে দিবি, বলবি এসেই বেরিয়ে গেল।"
তথাগত বলল, "আমি ম্যানেজ করার জন্য থাকব না আজ। প্রেজেন্টেশন আছে অফিসে। আগে আগে অফিস যাব।"
বুবকা বলল, "আবে তুই আমায় নিয়ে এত চাপ নিস কেন? জানিসই তো অমনিও মা ঝাড়বে এমনিও

ঝাড়বে। এই টিপিক্যাল গুড বয় ইমেজটা আমার সঙ্গে কেন মারাস দাদা? এক কাজ কর, তুইও এখানে চলে আয়, দুই ভাই মিলে লুচি আলুর দম খাই ব্রেকফাস্টে।"

তথাগতর মাথা গরম হচ্ছিল, "তুই বৈভবীর ওখানে আছিস, না?"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ। আছি তো। কার বাপের কী বাল? এই তো আমার বুকের কাছে শুয়ে আছে বৈভবী। কে কী করতে পারবে?"

তথাগত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, "আমি আর কিছু বলব না তোকে, তুই যা ইচ্ছা কর।"

বুবকা বলল, "এ দাদা।"

তথাগত বলল, "রাখছি এখন।"

বুবকা বলল, "শোন না।"

তথাগত বলল, "কী!"

বুবকা বলল, "হাজারখানেক টাকা দে। ক্রেডিট কার্ডের আপার লিমিট গাঁড় মেরে গেছে। গাড়িতে তেল ভরতে হবে।"

তথাগত বলল, "এখন কী করে দেব? এনইএফটি করা যায় নাকি এত সকালে?"

বুবকা বলল, "আইএমপিএস কর। এখনই কর।"

তথাগত বলল, "এতগুলো টাকা তুই কী করিস বুবকা? তুই তো পরশুই বাবাকে টুপি পরিয়ে তিরিশ হাজার নিয়ে গেলি।"

বুবকা বিরক্ত গলায় বলল, "ধ্যার বাল। তুইও আজকাল হিসেব চাইছিস! বাপের টাকা চেয়েছি আমি? তোর টাকা চেয়েছি। আর শোন, হাজার না, পাঁচ হাজার পাঠা। তোর ভাইটা না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, ভালো লাগবে?"

হাসি পেয়ে গেল তথাগতর। বলল, "আমার স্যালারিটা দেখছি তোর জন্যই তুলে রাখতে হবে এর পর থেকে।"

বুবকা বলল, "রাখবি তো! তবে তোকে নিয়ে চিন্তা হয় দাদা। তুই তো আমার মতো না, বিয়ের পর বউয়ের আঁচলের তলায় চলে যাবি, আর তখন আমায় চিনবিও না শালা।"

তথাগত বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, বৈভবীর কোলে শুয়ে অনেক ফিলোজফি দেখিয়েছিস। এবার বাড়ি ফের। আর শোন, গাড়ির কাজটা করাস।"

বুবকা বলল, "ও তো অনেক খরচা। ওটা বাবার ঘাড়ে ফেলে দেব।"

তথাগত হেসে ফেলল। বলল, "যা পারিস কর, আমি রাখছি।"

বুবকা বলল, "ট্রান্সফার করে দে, ভুলিস না দাদা। মরে যাব কিন্তু।"

তথাগত কেটে দিল ফোনটা।

মোবাইল ব্যাংকিং খুলে বুবকার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করে দিতে গিয়েও থমকে গেল।

ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা ভাবল।

তারপর ফোনটা পকেটে রেখে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ট্রান্সফারটা করল না।

৬

।। বাণী মিত্র।।

প্রীতিকাকে বেশ পছন্দ বাণীর। তবে মুখে সেটা বোঝান না।

বনেদি বাড়ির মেয়ে। মুখটাও ভারী মিষ্টি। বাবাইয়ের পছন্দ আছে।

প্রথমে যে গয়নাগুলো কিনবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তার থেকেও বেশ কয়েকটা বেশি কিনে ফেললেন।

প্রীতিকা অবাক হয়ে বলেছিল, "এত কিনে কী হবে?"
বাণী প্রীতিকার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, "একদম চুপ থাকবি। কোনও কথা বলবি না।"
প্রীতিকা বলল, "আন্টি, আমি এমনিতেই গয়না পরি না, তুমি তো আমাকে সিরিয়ালের বউ বানিয়ে দিচ্ছ।"
বাণী বললেন, "সবই থাকবে রে মা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরবি। বড়োরা যখন কিছু দেয় তখন মানা করতে নেই।"
প্রীতিকা আর কিছু বলল না। বাণী নিজের জন্যও একটা নেকলেস নিলেন। বহুদিন গয়না কেনা হয় না। অথচ একটা সময় ছিল যখন রীতিমতো টাকা জমিয়ে গয়না কিনতেন।
টাকা হাতে এল যখন, তখন আর গয়না কেনার সময় হল না। প্রোডাকশন হাউস, অফিস, স্টুডিও আর বাড়ি যাতায়াতটাই জীবন হয়ে গেল।
মন দিয়ে নেকলেস দেখছিলেন, এমন সময় শুনতে পেলেন, "আরে ম্যাডাম, কী খবর?"
বাণী মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। দীপ্ত, সঙ্গের মেয়েটাকে চিনলেন না।
বললেন, "ওহ, তুমি? কেমন আছ?"
দীপ্ত বলল, "কেমন থাকতে পারি বলুন আমরা?"
বাণী হাসলেন, "ঠিকই। তবে তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছ। এই উইকের টপ টিআরপি পেয়েছ।"
দীপ্ত পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "সবই এঁর কৃপা ম্যাডাম।"
মেয়েটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বাণী বললেন, "ওকে তো ঠিক চিনলাম না?"
দীপ্ত ভীষণ সুপুরুষ। ছ ফুট লম্বা। সানগ্লাসটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "ও হল আমার ব্যানার্জি বাড়ির ছেলের দ্বিতীয় বউ।"
বাণী মেয়েটির দিকে তাকালেন। কপালে সিঁদুর। মুখটার মধ্যে একটা আলগা লজ্জা মিশে আছে। একটা কানাঘুষো শুনছিলেন বটে দীপ্তর ব্যাপারে সম্প্রতি, এই তাহলে সেই?
মেয়েটিকে বললেন, "তোমার নাম কী?"
মেয়েটা বলল, "অলকানন্দা মুখার্জি।"
বাণী হাসলেন, "মন দিয়ে কাজ করো। এই ইন্ডাস্ট্রিতে সুস্থ থাকাটা সবথেকে দরকার। সেটা মাথায় রেখো।"
অলকা মাথা নাড়ল। দীপ্ত বলল, "ও খুব হার্ডওয়ার্কিং। ইচ্ছা আছে আর-একটা সিরিয়ালে ওকে লিডে নেবার। লেটস সি। উনি কে ম্যাডাম? ওঁকে কি ইন্ট্রোডিউস করছেন নতুন কোনও সিরিয়ালে?"
প্রীতিকা চুপ করে তাদের কথা শুনছিল। দীপের কথা শুনে হেসে ফেলল। বাণীও হাসলেন, বললেন, "উনি আমার ফ্যামিলিতে ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছেন। আমার বড়ো ছেলের উড বি।"
দীপ্ত হো হো করে হাসল। বলল, "সরি সরি ম্যাম। আচ্ছা আমার একটা অভিযোগ আছে।"
বাণী বললেন, "কী ব্যাপারে বলো তো?"
দীপ্ত বলল, "বুবকার মতো একজন এত ট্যালেন্টেড ছেলে হারিয়ে যাচ্ছে। এটা জাস্ট মেনে নিতে পারি না।"
বাণী গম্ভীর হলেন, "আমি আর ওর ব্যাপারে কী বলব?"
দীপ্ত বলল, "অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ইচ্ছা ছিল। একটা সিনেমার কথা ভাবছিলাম। বুবকার কথা ভেবেওছিলাম, ওকে তো ফোনেই পাওয়া যায় না আজকাল।"
বাণী বললেন, "তুমি যে ভেবেছ এটাই অনেক। ওকে এক্সপেক্ট করে কিছু কোরো না। আমার আর ওর ওপর কোনও এক্সপেক্টেশন নেই।"

।। বুবকা।।

"তুমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলে না?"

বৈভবী রান্না করছিল। বুবকা রান্নাঘরে একটা চেয়ারে বসে শশায় কামড় দিতে দিতে বৈভবীকে জিজ্ঞেস করল।

বৈভবী বলল, "হ্যাঁ, ডেবিউতেই।"

বুবকা বলল, "মার সঙ্গে তোমার আসল বাওয়ালটা কী নিয়ে হয়েছিল?"

বৈভবী বলল, "সেসব তুমি জেনে কী করবে?"

বুবকা বলল, "বলো না, শুনতে ভালো লাগে। জ্ঞান বাড়ে।"

বৈভবী বলল, "ফার্স্টের মেগাটা সুপার হিট হবার পর তোমার মার সেকেন্ড সিরিয়াল। লিড ছিলাম আমি। টানা শিফটে কাজ করিয়ে যেতেন। একদিন শরীর খারাপ হল। আমাকে বলে দিলেন আমি নাকি মিথ্যা কথা বলছি। আমি এত রেগে গেছিলাম আর শ্যুটিং-এই যাইনি। তারপর তোমার মা-ই যা দায়িত্ব নেওয়ার নিয়ে নিলেন আমার, কেরিয়রটা শেষ করে দিলেন।"

বুবকা বলল, "বাল শেষ করল।"

বৈভবী বলল, "সকাল সকাল খিস্তি দিতে ভালো লাগে তোমার?"

বুবকার শশা খাওয়া হয়ে গেছিল। সেটা ফেলে বলল, "খিস্তি তো দিতেই হবে। মানুষের শরীর খারাপ হবে না?"

বৈভবী বলল, "তোমার মায়েরও কিছু করার ছিল না বুবকা। মরিয়া হয়ে গেছিলেন তিনি। আমি শুধু ওই মিথ্যেবাদী তকমাটা সহ্য করতে পারিনি। মিথ্যে কথাটা আমার ধাতে নেই। টানা আঠেরো ঘণ্টা কাজ করার পর শরীর খারাপ হতেই পারে এটা ওঁর বোঝা উচিত ছিল।"

বুবকা বলল, "তুমি মার হয়ে কথা বলছ কেন?"

বৈভবী বলল, "বাস্তবটা বলছি।"

বুবকা বলল, "দীপ্ত রায়ের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করোনি কেন?"

বৈভবী বলল, "আমি লোকের পায়ে গিয়ে পড়তে পারি না বলে। তেল মারাটা আমার ধাতে নেই বলে।"

বুবকা বলল, "দীপ্ত রায় তোমাকে অফার দিলে যাবে?"

বৈভবী বুবকার দিকে তাকাল। বলল, "যাব। কেন যাব না?"

বুবকা বলল, "আমার দাদাটাও একটা শুয়োরের বাচ্চা জানো তো?"

বৈভবী বলল, "হঠাৎ এই কথা?"

বুবকা বলল, "মালটাকে বললাম টাকা নেই, কিছু টাকা পাঠা। ঠিক পাঠাল না। ওদিকে একটা গুড বয় গুড বয় ইমেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

বৈভবী বলল, "তোমারও তো ওই ইমেজটাই রাখা উচিত ছিল। বখে গেলে মাঝপথে। আমার পাল্লায় পড়ে।"

বুবকা উঠে বৈভবীকে জড়িয়ে ধরল, "তোমাকে নিয়ে আমি জাহান্নামেও চলে যাব। তাতে যে যা খুশি বলুক কিচ্ছু যায় আসে না।"

বৈভবী ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "রান্না করার সময় এসব করতে নেই। যাও, দূরে গিয়ে বসো।"

বুবকা আবার চেয়ারটায় গিয়ে বসল। তারপর বলল, "আজ ভাবলাম তোমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাই।"

বৈভবী বলল, "আমি হয়তো দুপুরে একবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

বুবকা বলল, "কী করতে?"

বৈভবী বলল, "অনেকদিন দেখা হয় না। ভদ্রলোক একা একা কী করছে কে জানে।"

বুবকা বলল, “নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখতে পারো না?”
বৈভবী বলল, “নাহ, বাবা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। তা ছাড়া তুমি কী করবে তখন?”
বুবকা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, “তাও ঠিক। আমি কী করব? তুমি আমার কথা ভাবো? সত্যি?”
বৈভবী হেসে বলল, “না, ভাবি না তো। কোনদিন দাদার মতো একটা লক্ষী মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হবে। আমি জানি তো।”
বুবকা বলল, “ধুস। কী যে বলো!”
বৈভবী বলল, “অভিনয়টা ছেড়ো না বুবকা। ভুল করছ।”
বুবকা বলল, “অত খাটনি পোষায় না বিশ্বাস করো। মেগার ওই বালের ইলাস্টিকের মতো টেনে নিয়ে যাওয়া গল্পের জন্য খাটতে পোষায় না আমার। ওরা ওইসব বালছাল নিজেরা বানাক, নিজেরাই দেখুক। কারা দ্যাখে এসব? একটা লোকের গাদা গাদা বউ। সে গল্পের না আছে কোনও মাথা না আছে কোনও মুন্ডু! মানুষকে টুপি পরিয়ে যাচ্ছে বাণী মিত্র দীপ্ত রায়রা আর মানুষ সে টুপি পরছে।”
বৈভবী বলল, “শুধু একদিক দেখলে হবে বুবকাবাবু? অন্যদিক দেখবে না? কত লোকের পেটের ভাত আসছে এটা থেকে সেটা দেখবে না? ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তো ধুঁকছে। রিমেক করে করে কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিটা খিল্লি হয়ে গেছে। টিভি সিরিয়াল যে একা হাতে ইন্ডাস্ট্রিটা ধরে রেখেছে সেটা দেখবে না?”
বুবকা বলল, “ফাক সিরিয়াল, ফাক ইন্ডাস্ট্রি। বিশ্বাস করো, মেগাতে আমি কোনও চ্যালেঞ্জই খুঁজে পেতাম না। মা ওই একই গল্প চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক সিরিয়ালে। গ্রামের মেয়ে, শহরের ছেলে, গ্রামের মেয়েকে শহরে নিয়ে এল, একটা ফ্যামিলি এস্টাব্লিশ করল। ফ্যামিলির লোক কাঠি করল, আর মেয়েটা সেই কাঠি সামলে লড়াই করে যাচ্ছে। এই হল গল্পের স্ট্রাকচার। এবার এটাকেই উলটে পালটে যেটাকে চালানো হচ্ছে, সেটা আর যাই হোক কোনও আর্টের মধ্যে পড়ে না।”
বৈভবী হাসল, বলল, “বুঝবে না। মানুষের পেট চালাতে আর্ট দরকার নেই। খাবার দরকার।”
বুবকা বলল, “আমার বুঝতে হবেও না। আমি আর ওয়েট করতে পারব না। যা রান্না হয়েছে দাও, গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। বাসে বাড়ি যাব আজ। তারপর দাদার কীভাবে মারতে হয় সেটা দেখছি।”

৮
।। তথাগত।।

“তোমার মা আজ একগাদা গয়না কিনে দিলেন”, প্রীতিকা স্কচে চুমুক দিতে দিতে বলল।
এক রেস্তোরাঁয় ডিনার করতে এসেছে তারা।
তথাগত বলল, “ভালো তো। বাণী মিত্রর বউমা হচ্ছ। তোমারই তো মার্কেট এখন।”
প্রীতিকা বলল, “তোমার প্রেজেন্টেশন কেমন ছিল আজ?”
তথাগত প্রীতিকার প্লেটটা দেখে মুখটা বিকৃত করল, “এইসব ডিশ খাও কী করে তুমি? এত ডায়েট করে কী হবে?”
প্রীতিকা বলল, “তুমিও খাও। স্পাইসি ফুড অ্যাভয়েড করো। গুড ফর ইউ।”
তথাগত বলল, “ধুস,একটু মশলা না হলে ভালো লাগে নাকি কিছু?”
প্রীতিকা বলল, “তুমি সাবকনশাসে বুবকাকে হিংসা করো না?”
তথাগত অবাক হল, “এর মধ্যে বুবকা এল কোত্থেকে?”
প্রীতিকা বলল, “আমি ভাবছিলাম। এই যে তোমার ঘড়ি ধরে চলা কর্পোরেট লাইফ, কোনও অ্যাডেড স্পাইস নেই, একটা ঠিকঠাক সংসারী মেয়েকে বিয়ে করবে, অফিস করবে, বাড়ি ফিরবে, এসব তুমি ঠিক

মন থেকে মেনে নিতে পারো না, না?”
তথাগত বলল, “আমার ঠিক কোন ব্যাপারটা দেখে তুমি এই কনক্লুশনে এলে, কাইন্ডলি একটু বলবে?”
প্রীতিকা হাসল, “জানি না, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। তুমি আর তোমার বাবা খুব ম্যাড়ম্যাড়ে লাইফ লিড করো।”
তথাগত বলল, “বুবকার লাইফ তোমার কোন দিক থেকে ঈর্ষণীয় মনে হয়? এমন কোনও নেশা নেই যেটা ও করে না, একদিন পর পর হয় বাবার কাছে নয় আমার কাছে হাতে পায়ে ধরে টাকা নিয়ে যায়, একটা হোরের সঙ্গে শোয়, সিরিয়াসলি! তোমার কী দেখে মনে হয় আমি ওকে হিংসা করি?”
প্রীতিকা বলল, “অনেক দিক আছে। ওর আনপ্রেডিক্টেবল লাইফস্টাইলটাই তো তুমি হিংসা করো। করো না?”
তথাগতর চোয়াল শক্ত হল, “না, করি না। ইন ফ্যাক্ট আমি আজকাল অন্য কিছু নিয়ে ভাবি।”
প্রীতিকা বলল, “কী ভাবো?”
তথাগত বলল, “আজকাল আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি।”
প্রীতিকা বলল, “সত্যি?”
তথাগত বলল, “হ্যাঁ, সত্যি। আজকাল মা বড়ো একা হয়ে যাচ্ছে। খুব স্ট্রেস যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি। কম স্ট্রাগল তো করেনি। এবার মার পাশে দাঁড়াতে হবে।”
প্রীতিকা বলল, “তোমার মাকে বলেছ?”
তথাগত বলল, “ইন ফ্যাক্ট মা-ই আমাকে অন্যভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করেছে। আমি বুঝি সেটা।”
প্রীতিকা বলল, “আমি আর-একটা স্কচ নেব।”
তথাগত বলল, “বাড়ি যাবে না নাকি?”
প্রীতিকা বলল, “কিছু হবে না। ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।”
তথাগত বলল, “না, আর খেতে হবে না।”
প্রীতিকা বলল, “তুমি চাকরি ছেড়ো না।”
তথাগত বলল, “মানে?”
প্রীতিকা হাসল, “তোমার দ্বারা হবে না। তুমি ঝুঁকি নিতে পারবে না।”
তথাগত বলল, “স্কচ খেতে দিচ্ছি না দেখে তুমি এই কনক্লুশনে চলে এলে?”
প্রীতিকা বলল, “ঠিক তা না। এটা বোঝা যায়।”
তথাগত বলল, “আর কী কী বুঝতে পারো?”
প্রীতিকা বলল, “বাদ দাও। আচ্ছা, আজ বুবকাকে কোনও টাকা দেওয়ার কথা ছিল তোমার? তারপর দাওনি?”
তথাগত অবাক হয়ে বলল, “কে বলল তোমায়?”
প্রীতিকা বলল, “বুবকাই বলেছে।”
তথাগত বলল, “বুবকা তোমার নম্বর পেল কোত্থেকে?”
প্রীতিকা কাঁধ ঝাঁকাল, “তার আমি কী জানি? তোমার থেকেই পেয়েছে হয়তো!”
তথাগত বলল, “আমি তো ওকে কোনও নম্বর দিইনি! শিট! আমার মোবাইলে এরপর থেকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে।”
প্রীতিকা বলল, “কেন টাকা দাওনি ওকে? বাসে ট্রাভেল করতে হয়েছে নাকি?”
তথাগত রাগে ফুঁসছিল। বলল, “আমার টাকাটা বেশি হয়ে যায়নি প্রীতিকা। মনে রেখো, আমি মার থেকে একটা টাকাও নিই না। ওর ফান্ডিং আমি করতে পারব না।”
প্রীতিকা বলল, “তুমি প্রথমে বলেছিলে দেবে?”

তথাগত বলল, “হ্যাঁ। তারপরেই মনে হল টাকাটা আবার কোথাও মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। তখনই ঠিক করি টাকাটা দেব না।”
প্রীতিকা বলল, “তোমাকে দেখে তো এতটা টাফ মনে হয়নি। দিস ইজ গুড। এবার মনে হচ্ছে তুমি প্রোডাকশন হাউসে খুব একটা মিসফিট হবে না।”
তথাগতর রাগ পড়েনি তখনও, “আমি তো ভাবতেই পারছি না ও তোমাকে ফোন করে দেবে। দিস ইজ টু মাচ ইয়ার। টু মাচ। এবার বাড়িতে কথা বলতে হবে।”
প্রীতিকা একটু থেমে বলল, “আরও একটা কথা বলল, জানতাম না সেটা।”
তথাগত বলল, “কী?”
প্রীতিকা বলল, “ইউ অ্যান্ড বৈভবী! ওয়ান্স আপন আ টাইম। রিয়েলি?”
তথাগত আগুন চোখে প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে রইল।

৯
।। বুবকা।।

“গুরু, মুরগির গলার যে চর্বিটা থাকে, ওটা ঝাল ঝাল করে রেঁধে বাংলা দিয়ে খেয়েছ কখনও?”
জয়েন্টটা বানাতে বানাতে পিকলু বলল কথাটা।
বুবকা বলল, “যা পারিস খাওয়া। নেশাটা হয় যেন। কী বালের জয়েন্ট বানালি, কিছুই হচ্ছে না!”
পিকলু খিক খিক করে হেসে বলল, “তুমি গুরু নীলকণ্ঠ হয়ে গেছ। তোমার আর কোনও নেশাতেই কিছু হবে না।”
বুবকা বলল, “তাহলে সে জিনিস বানা যে জিনিসে কিছু হবে! সকাল থেকে বহুত ঝাঁট জ্বলে আছে ভাই। ভালো কিছু দে।” পিকলু জয়েন্টটা বানিয়ে বুবকার হাতে দিয়ে বলল, “তুমি একটু ওয়েট করো বস। বাংলাটা নিয়ে আসি। শেফালি, তাড়াতাড়ি করো না।”
শেফালি ঝামটা দিল, “তুমিই রান্না করো তাহলে।”
শেফালি পিকলুর বউ। একটা ঝাল ঝাল মাংসের গন্ধ ম ম করছে পিকলুর বস্তির বাড়িতে। ঘরটা অবশ্য ছোটো হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পিকলুর সঙ্গে বুবকার কীভাবে আলাপ হয়েছিল সেটা বুবকাও ভুলে গেছে, তবে মাঝে মাঝে খুব মেজাজ খিঁচড়ে থাকলে আর পকেটে কম টাকা থাকলে বুবকা পিকলুর কাছে চলে আসে। খুব কম পুঁজিতে নেশাটা তুঙ্গে তুলে দিতে পিকলুর জুড়ি মেলা ভার।
জয়েন্টটা টানতে টানতে টিভি দেখছিল বুবকা। শেফালি সিরিয়াল চালিয়ে রান্না করছে। ওর শব্দ শুনলেই সিরিয়াল দেখা হয়ে যায়। বুবকা বলল, “ওই বউদি, অন্য চ্যানেল দাও না।”
শেফালি রান্নাঘর থেকে কড়া গলায় বলল, “তাহলে কিন্তু রান্না করব না আর।”
বুবকা বলল, “আচ্ছা আচ্ছা। করো করো। কী যে দ্যাখো এগুলো! ওই যে মেয়েটা দেখছ না সতী সাবিত্রী সেজে বেড়াচ্ছে, সামনে দেখলে দৌড়ে পালাতে!”
শেফালি বলল, “আমার ও দেখে কী হবে? সময় তো কেটে যায় এটা দেখে দেখে।”
বুবকা বলল, “হ্যাঁ, ওইজন্যই তো তোমাদের টুপি পরিয়ে সব বড়োলোক হয়ে গেল।”
ফোনটা বাজছিল। বুবকা ফোন ধরল, “কে বে? আমার যুধিষ্ঠির দাদাটা নাকি?”
তথাগত থমথমে গলায় বলল, “কী বলেছিস তুই প্রীতিকাকে?”
বুবকা বলল, “এখন কটা বাজে?”
তথাগত বলল, “কেন, ঘড়ি নেই?”

বুবকা বলল, "বল না।"
তথাগত বলল, "সাড়ে নটা। কেন?"
বুবকা বলল, "সত্যি মাইরি। কপাল করে একটা বউ পেয়েছিস বটে। সারাদিন কেটে গেল, তোকে এখন বলল? উফ... তোর বউকেই সতী সাবিত্রীর পার্টে নিতে বলব এবার মাকে।"
তথাগত বলল, "ফালতু কথা বন্ধ কর বুবকা। এইসব কী বলেছিস তুই প্রীতিকাকে? আমার সঙ্গে বৈভবীর রিলেশন ছিল?"
বুবকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "কেন, ছিল না?"
তথাগত বলল, "কবে ছিল গান্ডু?"
বুবকা হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, "এই যে, এই যে, ভালো ছেলের মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে গেছে। শোন শোন দাদা, তুই সকালে আমাকে মুরগি করলি। তোর জন্য আমাকে বাসে বাসে ঘুরতে হল। আমিও হালকা করে তোকে টেনশন দিলাম। স্কোর ১-১। ঠিক আছে না? কী বলিস?"
তথাগত বলল, "তুই ইমিডিয়েটলি প্রীতিকার সঙ্গে কথা বল। ওকে বল তুই ইয়ার্কি মেরেছিস।"
বুবকা বলল, "বলব তো। নিশ্চয়ই বলব। দাদার সংসার ভালো থাকবে, কে না চায় বল? আইএমপিএস-টা করে দে, এখনই বলে দিচ্ছি।"
তথাগত বলল, "শোন, তোকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, আমার থেকে কোনও দিন তুই একটা টাকাও পাবি না। মাথায় রাখিস এটা।"
পিকলু এসে গেছিল। সঙ্গে মাংসের চাটও। বুবকা সেদিকে তাকিয়ে বলল, "অসাধারণ। এই না হলে জীবন!"
তথাগত বলল, "কী অসাধারণ?"
বুবকা বলল, "ঝাল ঝাল মুরগির গলা আর কচকচির ঝাল খেয়েছিস কোনও দিন দাদা বস্তির ঘরে? সঙ্গে বাংলা? কী বালের জীবন কাটাস বল তো?"
তথাগত ফোনটা কেটে দিল।
বুবকা বলল, "ভাই পিকলু, বাঁড়া আর কিছুতে নেশা হত না, এবার কিছু না খেলেও নেশা হয়ে যাবে। ঢাল ঢাল।"

১০
।। বাণী মিত্র ।।

বাণী মিত্র অফিস থেকে বেরোলেন যখন তখন রাত তিনটে বাজে। শ্যুটিং শেষ হতে দেরি হয়ে গেছে। বাণী গাড়িতে উঠে রাঘবকে বললেন, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"
রাঘব বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম।"
বাণী বললেন, "মুখ ধুয়ে নাও।"
রাঘব গাড়ি থেকে জলের বোতল নিয়ে মুখ ধুয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। বাণী মিত্রের ফোনটা বেজে উঠল, বাণী দেখলেন শম্পা ফোন করছে, বিরক্ত হলেন, তবু ধরলেন, "বল শম্পা।"
শম্পা তাঁর সিরিয়ালের বয়স্কা অভিনেত্রী, তাঁরই বয়সি। একটু আগেই শ্যুটিং শেষে বাড়ি রওনা হয়েছেন, প্রতিদিনই রাতের দিকে স্টুডিও পাড়ার গসিপগুলো করার জন্য বাণীকে ফোন করেন। বাণীর গসিপ পছন্দ না, কিন্তু শম্পার সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক, স্ট্রাগলের সময়টা শম্পা অনেক সাহায্য করত, তাই বাণী শম্পার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না।

“এই বাণী, আজ তো তোকে আসল কথাটাই বলা হয়নি।”
বাণী দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বললেন, “কী হল আবার?”
শম্পা উত্তেজিত গলায় বললেন, “আমাদের রীতিশা রে, এখন কার সঙ্গে ঝুলেছে শুনেছিস?”
বাণী বললেন, “হ্যাঁ, জানি তো, অরিত্রর সঙ্গে। আজ শুনলাম তো।”
শম্পা বললেন, “বোঝ, অরিত্র তো রীতিশার বাপের বয়সি হবে!”
বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, “অরিত্রর সিনেমা এখন আর কেউ দ্যাখে না শম্পা। ও প্রথম প্রথম দু-তিনটে সিনেমা ভালো করেছিল। ইদানীং ভীষণ খারাপ সিনেমা বানাচ্ছে। ওর রিসেন্ট সিনেমাটা দেখতে গেছিলাম আমি আর তথা। হাফটাইমের বেশি টিকতে পারিনি। এখন এইসব নিউজ করিয়ে যদি খবরে আসতে পারে আসুক না।”
শম্পা বললেন, “রীতিশার জন্য খারাপ লাগে। ট্যালেন্টেড ছিল। এসব করে কেরিয়রটা শেষ করছে।”
বাণী বললেন, “কী আর করবি। যার পাঁঠা যে যেদিক দিয়ে খুশি কাটুক।”
শম্পা বললেন, “আচ্ছা, আজ একটা খবর শুনলাম।”
বাণী বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না, “আবার কী?”
শম্পা ফিসফিস করে বললেন, “বুবকা দীপ্ত রায়ের সঙ্গে কোনও সিনেমা করছে নাকি?”
বাণী অবাক হলেন, সকালে দীপ্ত কথাটা একবার বলেছিল না? এটা গসিপ হয়ে বাজারে রটল কী করে? তিনি বললেন, “কে বলেছে তোকে এটা?”
শম্পা বললেন, “আজ শ্যুটের সময়ই শুনলাম তো! কে যেন বলল একটা!”
বাণী মনে করার চেষ্টা করলেন দীপ্তর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন প্রীতিকা ছাড়া আর কেউ ছিল নাকি। মনে করতে পারলেন না। বললেন, “একটু মনে করে বল কে বলেছে।”
শম্পা বললেন, “সম্ভবত পিউপা। দীপ্তর স্টুডিওর শ্যুট শেষ করে এসেছিল আজ। ওখানেই শুনেছে মে বি।”
বাণী বললেন, “কাল পিউপাকে ধরব তো! এসব রাবিশ খবর কেন রটাচ্ছে!”
শম্পা প্রমাদ গুনলেন, “তুই এখনই রিঅ্যাক্ট করিস না, আমি একটু ভেবে তোকে কাল জানাব।”
বাণী বললেন, “আর কিছু বলেছে?”
শম্পা বললেন, “হ্যাঁ। সম্ভবত বৈভবীও থাকবে।”
বাণী বললেন, “ওহ। ঠিক আছে, আমি তো জানতেই পারব। আচ্ছা আমি এখন রাখছি রে। টায়ার্ড লাগছে।”
শম্পার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাণী ফোনটা কেটে দিলেন। গাড়ি ই এম বাইপাস ধরেছে। রাস্তায় দু-একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে।
বাণী বললেন, “জল আছে রাঘব?”
রাঘব বাণীর জলের বোতলটা দিল। বাণী জল খেলেন। কয়েকদিন আগে তথাগত ফেসবুক করা শিখিয়েছে। বাণী অতটা মোবাইলের সঙ্গে সড়োগড়ো নন। কারও মেসেজের রিপ্লাই করেন না। চুপচাপ সব কিছু দেখে আবার ফোন রেখে দেন।
তথাগত আর প্রীতিকা ডিনার করতে গেছিল। কয়েকটা ছবি আপলোড করেছে প্রীতিকা। সেগুলো দেখলেন। মেসেঞ্জারে অনেকের মেসেজ এসেছে। অনেকেই একটা সুযোগের জন্য একের পর এক মেসেজ করে যায়। সবাই এখন শর্টকাট খোঁজে। আগে যে কাজটা স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরে ঘেমে নেয়ে পাওয়া যেত না, আজকাল এরা ভাবে একটা মেসেজ করেই পাওয়া যাবে। তথাগতকে বলার পরে ব্লক করা শিখিয়ে দিয়েছিল।
কয়েকজনকে ব্লক করলেন। সাজেস্টেড ফ্রেন্ডে বুবকার প্রোফাইল দেখাচ্ছে। বুবকা তাঁর ফ্রেন্ড লিস্টে নেই।
বুবকার প্রোফাইলটা খুললেন। উলটোপালটা আপডেটে ভর্তি। বাণীর সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর জি করের দিনটার কথা। এই তো সেদিন হবে। একদিন বয়সেই কী চিৎকার! সেই ছেলেটা

কত বড়ো হয়ে গেল! কবে থেকে হাতের বাইরে চলে গেল বুবকা? যেদিন থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর স্ট্রাগল শুরু সেদিন থেকেই? সময় দিতে পারতেন না। বুবকার ধারণা, বাণী সবসময় তথাগতকে প্রেফার করেন। বুবকার কভার ফটোটার দিকে চোখ পড়ল বাণীর। বৈভবীর সঙ্গে হাসি হাসি মুখে সেলফি তুলেছে। বেশ খানিকক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।
এতক্ষণ মনটা নস্টালজিক হয়ে পড়ছিল।
ছবিটা আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনল বাণী মিত্রকে।

১১

।। অলকা।।

"একটা কথা বলব খচে যাবে না তো? মানে একটা জিনিস শুনলাম আর কি!"
অলকা তৈরি হচ্ছিল। শুভর কথায় বলল, "সেসব শোনা ছাড়া তোমার তো কোনও কাজও নেই এখন। কী শুনলে বলো?"
শুভর মুখটা ছোটো হয়ে গেছিল। বলল, "তোমার আর ওই দীপ্ত রায়ের ব্যাপারে। তুমি নাকি আজকাল খুব দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে যাও?"
অলকা লিপস্টিক মাখতে মাখতে বলল, "কোন শুয়োরের বাচ্চা এসব রটাচ্ছে?"
শুভ বলল, "দাদার ওখানে। একজন ঠাট্টা করে বলল। সবাই খুব হাসাহাসিও করল আমায় নিয়ে।"
অলকা বলল, "রাস্তা ঘাটে আল বাল ছাল লোক তোমার বউয়ের সম্পর্কে উলটোপালটা বলে দেবে, সেগুলো তুমি শুনে এসে ঘরে রিলে করবে?"
শুভ বলল, "আমি কী করব? আমাকে যদি এসব বলে তো?"
অলকা বলল, "প্রতিবাদ করবে! নইলে দাদার ওখানে যাওয়া ছেড়ে দেবে।"
শুভ বলল, "চাকরিটা হয়ে যাবে যে, নইলে কবে ছেড়ে দিতাম।"
অলকা বলল, "তোমার এ জন্মে চাকরি হবে না। দেখি, শাড়ির কুঁচিটা ধরো।"
শুভ উঠে অলকার শাড়ির কুঁচি ধরল। অলকা শাড়িটা ঠিক করতে করতে বলল, "তার চেয়ে স্টুডিও যেতে পারো। কিছু না কিছু কাজ থেকেই যায়।"
শুভ বলল, "আমি তো ইউনিয়নের মেম্বার না। আমাকে ওখানে কাজে নেবে কেন?"
অলকা বলল, "তাহলে এত দাদা দাদা করো কেন? দাদার দলই তো ওখানে আছে! ম্যানেজ করতে পারছ না?"
শুভ বলল, "ও হয় না। আমি ঠিক বলতে পারি না।"
অলকা বলল, "আমি কথা বলছি আজ স্টুডিওতে গিয়ে।"
শুভ বলল, "ব্যাপারটা ভালো দেখাবে? তুমি একটা যাকে বলে স্টার আর আমি ছোটোখাটো কাজ করব?"
অলকা বলল, "তাহলে কোরো না। দাদার চামচাদের কাছে বউয়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা শুনে কান ভর্তি করো।"
শুভ বলল, "তুমি রেগে যাও কেন বলো তো? আমি কি এসব কথায় কিছু মনে করি?"
অলকা বলল, "কে জানে তুমি কী মনে করো। কে দেখতে যাচ্ছে। আজ আবার কোথাও যাবার প্ল্যান করছ নাকি?"
শুভ বলল, "হ্যাঁ, আজ নৈহাটি যেতে পারি। তবে বিকেলের দিকে। তোমার এই কানের দুলটা দেখিনি তো আগে, দারুণ কিন্তু। ইমিটেশন নাকি?"

অলকা সতর্ক হল, “না বোধহয়, শ্যুটিংয়ে পরেছিলাম, খুলতে ভুলে গেছি।”
শুভ বলল, “ধুস! শ্যুটিংয়ের দুল পরা যায় নাকি? ওরা খুলে নেয় না?”
অলকা বলল, “আমি সিনিয়র তো এখন। অতটা কড়াকড়ি থাকে না।”
শুভ বলল, “তুমি তো সেই দিন শুরু করলে গো। তুমি আবার সিনিয়র হলে কবে?”
অলকা বিরক্ত গলায় বলল, “ফালতু পেঁচিও না তো। ফালতু প্যাঁচানো ভালো লাগে না। বললাম তো, প্রোডাকশনের জিনিস, খুলে আসব আজ।”
শুভ আর কিছু বলল না।
অলকা তৈরি হয়ে গেছিল। শুভ বলল, “আজ তো আমার বিকেলে নৈহাটি আছে, এখন বরং তোমার সঙ্গেই যাই।”
অলকা বলল, “কোথায় যাবে?”
শুভ বলল, “কেন স্টুডিও। দেখে আসি। তুমি যদি কিছু ম্যানেজ করতে পারো আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পারব।”
অলকা বলল, “কথা তো বলি আগে। কাল পরশু করে নিয়ে যাব তোমায়।”
শুভ বলল, “কেন, আজ গেলে কী হবে?”
অলকা বিরক্ত হল, “যত দিন যাচ্ছে একটা ঘট তৈরি হচ্ছ। বললাম না আজ গিয়ে কোনও লাভ নেই!”
শুভকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অলকা গাড়িতে গিয়ে উঠল।
শুভর মুখটা কেমন ছোটো হয়ে গেছে।
অলকার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

১২

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডাইনিং টেবিলে এসে বাণী দেখলেন বুবকা একা একা ব্রেকফাস্ট করছে। বুবকার সামনে বসলেন।
বললেন, “কোথায় থাকো তুমি?”
বুবকা মার দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার খাবারে মনোযোগ দিয়ে বলল, “কাজ থাকে।”
বাণী বললেন, “কী কাজ থাকে?”
বুবকা বলল, “এই তো, শ্যুট শুরু হবে। কী যেন নাম সিনেমাটার! ওহ, এখনও তো সিনেমার নাম ঠিক হয়নি। হলে বলব তোমায়।”
বাণী বললেন, “কার সিনেমা?”
বুবকা বলল, “ওই তো দীপ্ত রায় প্রোডাকশনের। ডিরেক্টর অরিত্র মুখার্জি।”
“স্ক্রিপ্ট পড়েছ?”
বুবকা বাণীর দিকে তাকাল, “স্ক্রিপ্ট পড়ে কী হবে? কাজ দেয় না কেউ, পেলাম, এই অনেক।”
বাণী বললেন, “কাজ দেয় না, না মাঝপথে তুমি পালিয়ে যাও?”
বুবকা বলল, “আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে কিছু। তোমাদের ওখানে অনেক জ্যাঠামশাই। আমার পোষায় না।”
রান্নার মেয়েটা চলে এসেছিল। বাণী তাকে ইশারায় রান্নাঘরে যেতে বললেন। বুবকার দিকে তাকালেন, “তুমি স্ক্রিপ্ট না পড়ে কাজ করছ, এটাও তোমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসে ছিল?”
বুবকা বলল, “অরিত্র মুখার্জি তো বড়ো ডিরেক্টর। ও খারাপ বানায় নাকি?”

“তোমার সামনে অনেক সুযোগ ছিল বুবকা, উলটোপালটা সিনেমায় অভিনয় না করলেই পারতে।”
“তো কী করব? প্যানপ্যানানি সিরিয়ালে অ্যাক্টিং করে যাব? কোনও চ্যালেঞ্জ আছে ওতে?”
“ওতে চ্যালেঞ্জ আছে নাকি জানি না, তবে এই খাবারটা ওই প্যানপ্যানানি সিরিয়াল থেকেই আসে এটা মাথায় রেখো।”
বুবকা একটু থমকাল। তারপর আবার খাওয়া শুরু করল, “সিরিয়ালে সমস্যা না। তোমার হাউসের ওই জ্যাঠামশাইগুলো আমাকে মানে না।”
“বিকজ দে আর ইওর সিনিয়রস। অ্যান্ড দে ডিজার্ভ ইওর রেসপেক্ট। তুমি কী মনে করো? আমি একা একা ভেলভেট পিকচারস তৈরি করেছি? ওরা সবাই না থাকলে আমরা এ জায়গায় কোনও দিন আসতে পারতাম না।”
“জানি তো। সেজন্যই তো চুপচাপ সরে পড়েছি।”
“সেটা একমাত্র কারণ?”
“না, সেটা একমাত্র কারণ কেন হতে যাবে? বৈভবীও কারণ। তুমি বৈভবীকে সহ্য করতে পারো না, তুমি ওকে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দিয়েছ। আমি কেন সেখানে থাকতে যাব যেখানে বৈভবী ব্ল্যাকলিস্টেড?”
বাণী বুবকার দিকে তাকালেন। ছেলেটা সরাসরি কথা বলে চিরকালই। বৈভবীর কথাটাও কেমন অনায়াসে বলে দিল।
বুবকার খাওয়া হয়ে গেছিল। কথাটা বলে শক্ত চোখ মুখ করে বাণীর দিকে তাকিয়ে থাকল।
বাণী বললেন, “বৈভবী তোমার থেকে ঠিক কত বছরের বড়ো জানো?”
বুবকা বলল, “হবে বারো তেরো।”
বাণী বললেন, “এই ডিফারেন্সটা তোমার নর্মাল মনে হয়?”
বুবকা বলল, “কেন? ও ছেলে আর আমি মেয়ে হলে তো তোমাদের কাছে ডিফারেন্সটা নর্মালই মনে হত!”
বাণী বললেন, “তোমার নর্মাল মনে হয়?”
“অফকোর্স মনে হয়।”
“তুমি যে সিনেমাটা করছ অরিত্রর,ওখানে নিশ্চয়ই ওরা বৈভবীকেও কাস্ট করেছে?”
বুবকা কিছুক্ষণ মার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কী করে জানলে?”
বাণী বললেন “গেস করলাম। করেছে?”
বুবকা বলল, “হ্যাঁ করেছে।”
বাণী বললেন “তোমার হিরোইন?”
বুবকা বলল, “না, হিরোইন না, অলকা না কাকে একজন হিরোইন করছে দীপ্ত রায়।”
“বৈভবীকে কেন হিরোইন করছে না? কেন ওর কাছে তোমাদের সম্পর্কটা নর্মাল লাগছে না?”
বুবকা টেবিল থেকে উঠে পড়ল, “তুমি এসব যুক্তি দিয়ে বৈভবীর সঙ্গে আমার ব্রেক আপ করাতে চাইছ।”
বাণী হাসলেন, “তোমাকে কোনও দিন কোনও কিছুতে বাধা দিয়েছি? যা ইচ্ছা তাই তো করে বেড়াচ্ছ? একবারও বলেছি এটা আমার পছন্দ না?”
বুবকা বলল, “না বললেও বোঝা যায়।”
বাণী বললেন, “অ্যাডভান্স নিয়েছ দীপ্তর থেকে?”
বুবকা বলল, “নিইনি।”
বাণী বললেন, “তোমাকে যদি বলি তোমাকে আর বৈভবীকে নিয়ে সিনেমা করব আমরা, তুমি দীপ্তকে না করে দেবে?”
বুবকা খানিকক্ষণ মার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “ট্র্যাপ! তাই তো?”
বাণী গম্ভীর হলেন, “তুমি ভুলে যাচ্ছ বুবকা তুমি আমার ছেলে, কেন ট্র্যাপ দিতে হবে?”

বুবকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “তুমি যখন আমায় তুমি তুমি করে বলো তখন তুমি আমার ওপর রেগে থাকো। এখন তো রেগে রেগেই কথাগুলো বলছ। এই কথাটাও সেভাবেই বলছ নিশ্চয়ই।”
বাণী বললেন, “তোমাকে আমার বোধহয় আর কোনোদিনও তুই করে বলা হবে না। যাই হোক, যেটা বললাম সেটার উত্তর দাও।”
বুবকা বলল, “আমি এই কাজটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। তা ছাড়া সবসময় নিজের হাউসে কাজ করাটার মধ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। আমি এখন এই কাজটা সিরিয়াসলি করতে চাই।”
বাণী বললেন, “তুমি যদি সিরিয়াসলি কাজটা করতে তাহলে আমার থেকে খুশি আর কেউ হত না। কিন্তু তুমি সেটা করবে না। তুমি ঠিক সিনেমাটার মাঝবরাবর গিয়ে নতুন কোনও সমস্যা তৈরি করবে। নামটা আমার খারাপ হবে।”
বুবকা বলল, “তোমার কেন খারাপ হবে?”
বাণী বললেন, “সেটা তোমার বোঝার ক্ষমতা থাকলে এখানে সেখানে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে না।”
বুবকা কাঁধ ঝাঁকাল, “গ্রেট। আচ্ছা বাই।”
বলে বাণীর উত্তরের অপেক্ষা না করে বুবকা বেরিয়ে গেল। বাণী কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে দীপ্তকে ফোন করলেন। ফোনটা বেজে গেল, দীপ্ত ফোন তুলল না।

১৩

।। অলকা।।

“তোমায় যে ব্রেকটা দিচ্ছি, সেটা সম্পর্কে তোমার কোনও আইডিয়া আছে?”
এসিটা সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় চলছে। তার ঠান্ডা লাগছিল। তবু অলকা কোনও চাদর গায়ে না জড়িয়ে চুপচাপ দীপ্তর খাটে বসে ছিল।
দীপ্তর প্রশ্নের উত্তরে সে কিছু বলল না।
দীপ্ত বলল, “চুপ করে আছ কেন?”
অলকা বলল, “শুভ কিছু একটা সন্দেহ করছে।”
দীপ্ত অবাক গলায় বলল, “কে শুভ?”
অলকা দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, “শুভকেও ভুলে যাচ্ছ তুমি?”
দীপ্ত কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, “ওহ, শিট। হ্যাঁ। তোমার ওই কী যেন বলে, অগ্নি সাক্ষী করে সাত পাক ঘুরে বিয়ে করা বর!”
অলকা বলল, “হুঁ।”
দীপ্ত বলল, “তো কী সন্দেহ করছেন তিনি?”
অলকা বলল, “আজকাল চাকরির আশায় কোন এক নেতার চামচাগিরি করে। ওখানে শুনে এসেছে আমি নাকি খুব তোমার ফ্ল্যাটে আসি।”
দীপ্ত সিগারেট ধরাল, “আস। তো? হোয়াটস দ্য বিগ ডিল?”
অলকা বলল, “তোমার কাছে এগুলো কী মনে হয়? খেলা?”
দীপ্ত বলল, “খেলার কী হল! তুমি তো বাচ্চা নও, তোমার তো নাক টিপলে দুধ বেরোয় না! তোমার কি এখন দুঃখ হচ্ছে নাকি ওই অকর্মার ঢেঁকিটার জন্য? ডিভোর্স দিয়ে দাও। তোমার এখন ব্রাইট ফিউচার। ভুলে গেলে হবে? মালটাকে ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আস। আমরা একসঙ্গে থাকব। সিম্পল।”
দীপ্ত জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

অলকা বলল, “আমি পারব না, আমার বাড়ি থেকে অনেক ঝামেলা হবে।”
দীপ্ত বলল, “দূর বাল! এইজন্য রাস্তা থেকে দেশি কুত্তা তুলে ঘরে আনতে নেই।”
অলকা রাগল না, দীপ্তর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আমাদের বাড়ির ওদিকে যে লোকটা রিকশা চালাত, সে কখনও কখনও মদ খেয়ে এসে এরকম ভাষায় কথা বলে। তুমি যখন বলো, আমি তখন ভাবি খুব একটা পার্থক্য নেই তোমাদের। তুমি শুধু মদ না খেয়েও এই ভাষায় কথা বলতে পারো।”
দীপ্ত বলল, “আমায় এসব কথা বলে লাভ নেই। নাও ইউ ডিসাইড, তুমি কী করতে চাও।”
অলকা বলল, “শুভর একটা চাকরি দরকার।”
দীপ্ত অবাক গলায় বলল, “আমায় এখন ওকে চাকরি দিতে হবে?”
অলকা বলল, “ইনভলভমেন্ট দরকার। একা একা থাকলে অশান্তিটা বাড়বে, কমবে না। তোমার ভালোর জন্যই বলছি। তুমি নিশ্চয়ই রাস্তার কুকুরকে বাড়ির বউ বানাবে না।”
দীপ্ত সিগারেটটা রেখে অলকাকে জড়িয়ে ধরল, “রাগ হয়েছে?”
অলকা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “না, রাগ হয়নি। তুমিই তো শিখিয়েছ প্রস-দের এসব কথায় রাগ করতে নেই।”
দীপ্ত বলল, “চাকরি আমি কোথা থেকে দেব?”
অলকা বলল, “কিছু না কিছুতে ঢুকিয়ে দাও। কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে পেরে যাবে।”
কলিং বেল বাজল। দীপ্ত বলল, “কোন শুয়োরের বাচ্চা এল আবার। তুমি বসো, আমি দেখছি।”
দীপ্তও নগ্ন ছিল। একটা স্পোর্টস ট্রাউজার পরে খালি গায়ে দরজা খুলতে গেল।
কয়েক মিনিট পরে বেডরুমে এসে গম্ভীর গলায় বলল, “তুমি রেডি হয়ে ড্রয়িং রুমে যাও। তোমার বর এসেছে।”

১৪

।। অলকা।।

দীপ্ত অলকাকে কথাটা বলে বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে এল। শুভ দাঁড়িয়ে ছিল। দীপ্ত বলল, “বসুন, চা খাবেন?”
শুভ বলল, “অলকা কোথায়?”
দীপ্ত বলল, “শ্যুটিংয়ে যাবে তো। তৈরি হচ্ছে।”
শুভ বলল, “তৈরি হয়েই তো বেরোল!”
দীপ্ত হেসে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, “বাড়ির মেকআপ আর শ্যুটের মেকআপ এক হয় না তো, দুটো আলাদা।”
শুভ বলল, “বাকিরা কোথায়?”
দীপ্ত বলল, “বাকিদের হয়ে গেছে। অলকার বাকি। চা খাবেন?”
শুভ বলল, “আমি চা খাই না।”
অলকা বেডরুম থেকে ঠান্ডা গলায় ডাকল, “ওকে পাঠিয়ে দিন।”
দীপ্ত বলল, “আপনাকে ডাকছে।”
শুভ বলল, “আমাকে?”
দীপ্ত বলল, “হ্যাঁ, যান। সোজা গিয়ে ডানদিকে।”
শুভ উঠল। কোনও দিকে না তাকিয়ে দীপ্তর বেডরুমে গিয়ে ঢুকল। দীপ্তর বেডরুমটা বিরাট। একদিকে

কাচের জানলা। বড়ো খাটের একদিকে ওয়ার্ডরোব। খাটের পাশে ড্রেসিং টেবিল। বেডরুমে তখনও খাটের ওপর চাদর ইতস্তত ছড়ানো, অ্যাশট্রেতে দীপ্তর ফেলে যাওয়া সিগারেট পড়ে আছে। শুভ হাঁ করে সব দেখছিল। অলকা শাড়ি পরছিল। বলল, "কুঁচিটা ধরো তো।"

শুভ হাঁটু গেড়ে বসল। অলকা বলল, "এখানে এলে কেন?"

শুভ বলল, "পাঁজাদা ফোন করে বলল, তুমি এখানে আছ। কী মনে হল। চলে এলাম।"

অলকা বলল, "পাঁজাদা কে? তোমার দাদার চামচাদের একজন?"

শুভ বলল, "হ্যাঁ।"

অলকা বলল, "যে কেউ তোমাকে ফোন করবে আর তুমি সেখানে চলে যাবে?"

শুভ বলল, "কত বড়ো ফ্ল্যাট না?"

অলকা বলল, "উত্তরটা দাও আগে।"

শুভ বলল, "কত টাকা দাম হবে ফ্ল্যাটটার?"

অলকা বলল, "তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি শুভ।"

শুভ বসে অলকার শাড়ির কুঁচি ধরছিল। ওখান থেকে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে অলকার গলাটা টিপে ধরে বলল, "হ্যাঁ রে খানকি মাগি, আমাকে কী ভেবেছিস, তুই যেখানে সেখানে লাগিয়ে বেড়াবি, আমি তোর ব্রা প্যান্টি ধুয়ে বেড়াব?"

শুভর আচমকা হানায় অলকার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল, ও দুহাত দিয়ে কোনওমতে শুভকে ধাক্কা দিয়েই দীপ্তকে ডাকতে শুরু করল। শুভ অলকার ধাক্কায় একটু বেসামাল হয়ে গেছিল। এবার তীব্র রাগে অলকাকে জোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে চ্যাঁচ্যাতে লাগল, "তোর সাহস কত, হ্যাঁ? দীপ্ত রায়ের বেডরুমে ডেকে অওকাত দেখাতে চাইছিস? কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় শুয়ে বেরিয়ে আমার ঘরে আসবি রোজ, তোর টাকায় আমি মুতি, বুঝেছিস, মুতি?"

দীপ্ত দৌড়ে চলে এসেছিল, সে পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিয়ে শুভকে বলল, "বেরিয়ে যান। জাস্ট গেট আউট।"

শুভ দীপ্তর মতো লম্বা চওড়া না, তবু দীপ্তর দিকে তেড়ে এল। দীপ্ত শুভর পেটে জোরে একটা লাথি কষাল। শুভ মেঝেতে শুয়ে কাতরাতে লাগল।

দীপ্ত শুভর কলার ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লক করে ঘরে ফিরে এল।

অলকা মেঝেতে বসে পড়েছে। শাড়ি অবিন্যস্ত। চোখগুলি বিস্ফারিত।

দীপ্ত অলকাকে ধরে তুলে খাটে বসাতে বসাতে আশ্বস্ত করতে চাইল, "চিন্তা কোরো না, আমি আছি তো।"

অলকা বলল, "ও আমাকে কত কিছু বলে গেল।"

দীপ্ত অলকাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কিচ্ছু হয়নি সোনা, আমি তো আছি।"

অলকা বলল, "ও আজকের আগে কোনও দিন আমার গায়ে হাত দেয়নি। ও যে কথাগুলো বলল, কোনও দিন আমি ভাবতেও পারিনি এই কথাগুলো ও আমাকে বলতে পারে।"

দীপ্ত বলল, "আমি তো এটাই চেয়েছিলাম অলকা। যা হয়েছে, ভালো হয়েছে। তুমি ভেঙে পড়ছ কেন?"

অলকা বলল, "আমি তো এটা চাইনি। আমি তো দিনের শেষে ওর কাছেই ফিরে যাচ্ছিলাম। ও কি এখনও বাইরে আছে?"

দীপ্ত অলকাকে ধরে ছিল এতক্ষণ। এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, "জানি না।"

অলকা কোনওমতে শাড়িটা ঠিক করতে করতে উঠল। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে আবার খাটে এসে বসে বলল, "চলে গেছে।"

দীপ্ত একটা সিগারেট ধরাল, "তুমি চিন্তা কোরো না, আমি সব সামলে নিচ্ছি। ও কোন নেতার চামচাগিরি করে না, সেখান থেকেও লাথি খাবে ও। তুমি শান্ত হও।"

অলকা দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার মা, বাবা, পাড়ার লোক, এদের কী বলব?”
দীপ্ত বলল, “সব কিছু আমি বলে দেব তোমায়। কাকে কী বলতে হবে। এসব নিয়ে ভেবো না এখন। কেরিয়রে কনসেনট্রেট করো। খোলা মাঠ তোমার সামনে অলকা, তোমার সিনেমা আসছে, মানুষ তোমার অভিনয় দেখবে, আজ নাহয় কাল তোমার ইন্টারভিউ বেরোবে বড়ো বড়ো পত্রিকায়, তখন কোথাকার কোন রাস্তার কুকুর শুভ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবে তোমার সাকসেস। এইসব দিন মনে রাখতে নেই সোনা, বিশ্বাস করো। আমায় বিশ্বাস করো।”
দীপ্ত অলকাকে জড়িয়ে ধরল।
অলকা অস্ফুটে বলতে লাগল, “আমাকে ও মারতে এসেছিল।”

১৫
।। বুবকা।।

দুপুর বারোটা বাজে। বুবকা বৈভবীর বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে এসে দেখল বৈভবীর বাড়ির দরজায় তালা।
ফোন করল বৈভবীকে, ফোন রিং হয়ে গেল। বৈভবী ফোন ধরল না। বুবকা কিছুক্ষণ বৈভবীর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে বৈভবীর নাম্বারে বেশ কয়েকবার ফোন করে গেল। প্রত্যেকবারই পুরো রিং হয়ে গেল।
বুবকা বিড়বিড় করল, “কোথায় গেল, কোথায় চলে গেল!”
সে গাড়িতে গিয়ে বসল। আরও তিনবার বৈভবীকে ট্রাই করে না পেয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।
কিছুক্ষণ এদিক সেদিক গাড়ি চালিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে সাঁতরাগাছি হয়ে দিল্লি রোড ধরল। তার মাথা কাজ করছিল না। ফাঁকা রাস্তা, গাড়ির স্পিড ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগল বুবকা। ঘণ্টা দু-একের মধ্যে শক্তিগড়ের কাছাকাছি যখন সে চলে এল তখন তার ফোনটা বেজে উঠল, বুবকা গাড়িটা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের বাঁদিকে রেখে ফোনটা ধরল, বৈভবী। “কী হল, এতবার মিসড কল? কী ব্যাপার?”
বুবকা বলল, “কোথায় ছিলে তুমি? কোন চুলোয় গেছিলে?”
বৈভবী বলল, “আরে একটা স্ক্রিপ্ট শুনতে এসেছিলাম আগরওয়ালের এখানে। ফোনটা সাইলেন্ট ছিল বাবু।”
বুবকা বলল, “রাজীব আগরওয়াল? ওই শুয়োর প্রোডিউসারটা, যার নামে দিনে তিনটে করে অ্যাকট্রেস হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ ওঠে?”
বৈভবী কড়া গলায় বলল, “লোকের নামে না জেনে শুনে যা ইচ্ছা তাই বলতে শিখিয়েছেন বুঝি তোমায় বাণী মিত্র?”
বুবকা বলল, “বাণী মিত্র কোত্থেকে এল এখানে?”
বৈভবী বলল, “গায়ে লাগল?”
বুবকা বলল, “তুমি আমাকে বলোনি কেন যে তুমি রাজীব আগরওয়ালের ওখানে গেছ?”
বৈভবী বলল, “আমায় কে খাওয়াবে বুবকা? আমায় তো অভিনয় করেই খেতে হবে।”
বুবকা চেঁচিয়ে উঠল গাড়ির ভিতরে, “আমি খাওয়াব। কত টাকা লাগবে তোমার?”
বৈভবী বলল, “বাণী মিত্রের টাকায় আমাকে খেতে হবে? এত খারাপ সময় এসেছে বুঝি?”
বুবকা বলল, “বাণী মিত্রের টাকায় খাওয়াব কেন? আমি রোজগার করে খাওয়াব তোমায়।”
বৈভবী বলল, “কীভাবে রোজগার করবে?”

বুবকা বলল, “সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু ওই শুয়োরটার ওখানে যাবে না।”
বৈভবী ক্লান্ত গলায় বলল, “আচ্ছা, আর যাব না। চলে আস এবার। আমি বাড়ি যাচ্ছি।”
বুবকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “কোথায় বলো তো আমি এখন?”
বৈভবী বলল, “কোথায়? বাড়ি চলে গেছ?”
বুবকা বলল, “আমি এখন শক্তিগড়ে। তুমি ফোন না করলে ঠিক করেছিলাম যেদিকে চোখ যায় চলে যাব।”
বৈভবী অবাক হয়ে বলল, “শক্তিগড়ে! সে কী! ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। এ আবার কী পাগলামি শুরু করলে তুমি?”
বুবকা বলল, “তুমি এরকম করো আমার সঙ্গে। আমি সত্যিই কোনও দিন কোথাও একটা চলে যাব। আমাকে কোথাও খুঁজে পাবে না।”
বৈভবী বলল, “চলে এসো, প্লিজ, আমি আর এরকম করব না, বিশ্বাস করো।”
বুবকা বলল, “ওকে, লাঞ্চ করেছ?”
বৈভবী বলল, “না, রান্না করে গেছি।”
বুবকা বলল, “কী রান্না করেছ?”
বৈভবী বলল, “ভাত আর মাছ। আর কিছু না।”
বুবকা বলল, “ওকে, বাড়ি যাও, আমি আসছি।”
বৈভবী বলল, “আর শোনো, প্লিজ, এরকম পাগলামি আর কোনও দিন কোরো না বুবকা। কথা দাও।”
বুবকা বলল, “তুমিও কোনও দিন আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না, বলো। আমিও আর কোনও দিন এরকম করব না।”
বৈভবী হাসল, “আচ্ছা, বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে কী সমস্যায় পড়লাম বলো তো?”
বুবকা বলল, “বাড়ি যাও বাড়ি যাও। আমি আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।”
বৈভবী বলল, “এসো। পাগল কোথাকার!”

১৬
।। তথাগত।।

অফিসের কার পার্কিংয়ের দিকে এগোচ্ছিল এই সময় তথাগতর ফোনটা বেজে উঠল, সে দেখল মা ফোন করছে, ফোনটা তুলল, “বলো মা।”
“তুমি কোথায়? অফিসে এখনও?”
“হ্যাঁ। কেন বলো তো?”
“বেরোবে কখন?”
“এই তো গাড়িতে উঠব। কেন বলো তো?”
“বাড়িতে এসো, কথা আছে।”
“স্টুডিও যাওনি?”
“যাব। তোমার সঙ্গে কথা বলে তারপরে।”
“আচ্ছা। আসছি।”
বাড়ি পৌঁছোতে বেশিক্ষণ লাগল না তার। সেক্টর ফাইভ থেকে তাদের বাড়ি বেশিক্ষণের না। ড্রয়িং রুমে পৌঁছে দেখল মা সোফাতে থমথমে মুখে বসে আছে।
সে বলল, “ফ্রেশ হয়ে নি?”

বাণী মিত্র বললেন, "বসো। আমি কথা বলে বেরোব।"
তথাগত বলল, "এনিথিং সিরিয়াস? প্রীতিকার ব্যাপারে?"
বাণী মিত্র বললেন, "না। বুবকার ব্যাপারে।"
তথাগত সোফায় বসে বলল, "বুবকার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি মা? তুমি তো জানোই ও আমার কথা শোনে না কিছুই।"
বাণী মিত্র বললেন, "তুমি ওকে মাঝে মাঝে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দাও। সে সময়টা তো কিছুটা কথা বলো।"
তথাগত বলল, "দিতাম। রিসেন্টলি সেটাও বন্ধ করে দেওয়ায় খুব অসভ্যতা করেছে। প্রীতিকার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমার নামে উলটোপালটা বলেছে।"
বাণী মিত্র বললেন, "তবু। আমার মনে হয় আমাদের বাড়িতে বুবকা কিছুটা হলেও তোমার কথা শুনতে পারে।"
তথাগত বলল, "ওকে। বলো কী ব্যাপার।"
বাণী বললেন, "বুবকা দীপ্ত রায়ের প্রোডাকশনে সিনেমা করছে।"
তথাগত বলল, "করুক না, কী প্রবলেম তাতে?"
বাণী কয়েক সেকেন্ড তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রবলেম কী? যদি সিনেমাটা ছেড়ে দেয় তখন তো এই দীপ্ত রায়ই বলবে আমরা সাবোতাজ করেছি। ওর তো পুরোটাই উইন উইন সিচুয়েশন হয়ে গেল। সিনেমাটা না হলেও ওর লাভ, হলেও ওর লাভ।"
তথাগত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর বলল, "তুমি কী চাইছ?"
বাণী মিত্র বললেন, "সিনেমাটাতে বৈভবীও আছে।"
তথাগত বলল, "ওহ্। ওর জন্যই ও সিনেমাটা করছে তার মানে।"
বাণী মিত্র বললেন, "হ্যাঁ। রেজারেকশন অফ বৈভবী মুখার্জি। বেশ গালভরা ব্যাপারটা।"
তথাগত বলল, "হোক না রেজারেকশন। তাতেও সমস্যা কী?"
বাণী মিত্র এবার রাগলেন, বললেন, "তোমার মাথাটা কি এইসব চাকরি করে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে? বুবকা ওর থেকে একটা বারো বছরের বড়ো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে, ওর জন্য নিজের কেরিয়র পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে, তুমি এখন বলছ সমস্যা কী! যেটুকু সোশ্যাল প্রেস্টিজ ছিল, এর পরে কি সেটাও থাকবে?"
তথাগত বলল, "বুঝেছি। আমাকে কী করতে হবে?"
বাণী মিত্র বললেন, "শেষ চেষ্টা।"
তথাগত হাসল, বলল, "আমার তো বৈভবীকে মার্ডার করা ছাড়া আর কোনও সলিউশন মাথায় আসছে না।"
বাণী মিত্র বললেন, "ওসব ভাববে না। আমিও ভাবি না। ভায়োলেন্স কোনও কিছুর সলিউশন না। এমন কিছু ভাবো যেটা বৈভবীর থেকে বুবকাকে আলাদা করে দেবে।"
তথাগত বলল, "ভাবছি। আপাতত মাথা কাজ করছে না মা। অফিস থেকে ফিরলে আমার মাথা কাজ করে না। কাল ভোরে উঠে ভাবব।"
বাণী মিত্র বললেন, "ভাবো। তবে বেশি ভেবো না। সময় কম। বাই দ্য ওয়ে, প্রীতিকার গয়নাগুলো কেমন লেগেছে কিছু বলল?"
তথাগত বলল, "হ্যাঁ, ভীষণ ভালো লেগেছে। কেন তোমাকে মেসেজ করেনি?"
বাণী বললেন, "হ্যাঁ করেছে। আচ্ছা আমি তবে এবার উঠি।"
তথাগত বলল, "এই কথাগুলো তো ফোনেও বলা যেত মা।"
বাণী বললেন, "না যেত না। কিছু কিছু কথার আলাদা গুরুত্ব থাকে।"
তথাগত বলল, "আচ্ছা।"

বাণী বেরোলে তথাগত ফোনটা বের করে ইদ্রিশকে ফোন করল। ইদ্রিশ একবার রিং হতেই ফোন তুলে নিল, “বলুন দাদা, কী খবর?”
তথাগত বলল, “আমার একটা ইনফরমেশন চাই ইদ্রিশ। দিতে পারবে?”
ওপাশ থেকে ইদ্রিশের হাসি হাসি গলার স্বর ভেসে এল, “চেষ্টা করব দাদা। বলুন।”
তথাগত বলল, “দীপ্ত রায়ের সিনেমায় বুবকা অভিনয় করছে, বৈভবীর সঙ্গে?”
“হ্যাঁ দাদা, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল আপনি এই প্রশ্নটা করতে ফোন করবেন।”
তথাগত বলল, “কথাটা সত্যি?”
“হ্যাঁ দাদা। ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। সাউথের রিমেক।”
তথাগত থমকাল, “ত্রিকোণ প্রেম? আর-একজন হিরো কে?”
ইদ্রিশ হাসল, “না না, দুজন হিরো না দাদা, একজন হিরো দুজন হিরোইনের সিনেমা। বুবকাদা আর বৈভবী ম্যাডাম ছাড়াও এক নতুন মেয়েকে দীপ্ত রায় ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছেন এবং এ ব্যাপারে দীপ্ত রায় ভীষণ সিরিয়াস। মেয়েটা অবশ্য একেবারে নতুন না, সিরিয়াল করেছে দু-একটা। অলকানন্দা নাম। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে মেয়েটা দীপ্ত রায়ের কেপ্ট।”
তথাগত বলল, “আচ্ছা। থ্যাংকস ফর দ্য ইনফরমেশন।”
ফোনটা রেখে মাকে ফোন করল সে। বাণী ফোনটা ধরে বললেন, “বল।”
তথাগত বলল, “মা, বুবকার সিনেমা বন্ধ হলে দীপ্ত রায়ের একেবারে যে উইন উইন সিচুয়েশন তা না। খানিকটা লস হলেও হতে পারে।”
বাণী বললেন, “কীরকম?”
তথাগত বলল, “সিনেমায় বুবকা ছাড়াও আর-একটা মেয়ে আছে, যাকে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য দীপ্ত রায় ভীষণ ডেসপারেট। সিনেমাটা না হলে দীপ্ত রায়ের খুব একটা লাভ হবে না। বরং ক্ষতিই হবে।”
বাণী বললেন, “মেয়েটার নাম কী অলকানন্দা?”
তথাগত বলল, “ঠিক বলেছ, কী করে বুঝলে?”
বাণী মিত্র ঠান্ডা গলায় বললেন, “দেখেছি আমি ওকে। নাম আর চেহারা আমি সহজে ভুলি না। তোমরা জানো তো!”

১৭
।। শুভ।।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে তুমুল। শুভ রাস্তার পাশের এক বাসস্ট্যান্ডে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পেটে ব্যথা করছে। ঘাড়েও। জামাটা কলারের কাছে হালকা ছিঁড়েছে। তবে সে ব্যথাটা গায়ে লাগছে না তেমন। মাথা কাজ করছে না তার।
খানিকক্ষণ আগে তার মনে পড়েছে বাড়িতে আলমারিতে খুব বেশি হলে আড়াইশো টাকা আছে। অলকার কিছু গয়নাও আছে। সেগুলোকে বেঁচে দেবে? তাহলে হয়তো কদিন খাবার টাকা উঠে আসবে।
তারপরে কী করবে?
শুভ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। যারা গাড়ির ভেতর আছে, বাড়ির ভেতর আছে, কী সুন্দর বৃষ্টি উপভোগ করছে, আর যাদের মাথার ওপরে ছাদ নেই তারা কোনওমতে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে টিকে আছে। জীবনটাই তাই, যতক্ষণ আর্থিক নিরাপত্তা আছে ততক্ষণ সব কিছুই ভালো লাগে। পেট কীভাবে চলবে যাদের চিন্তা করতে হয় না, তারা আর সব কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারে। আর যাদের চলে না, তাদের

পেটের চিন্তাতেই দিন কাটিয়ে দিতে হয়।
"কি রে শুভ, এখানে কী করছিস?"
শুভ মুখ ফিরিয়ে দেখল কখন পিকলু এসে দাঁড়িয়েছে।
সে বলল, "কিছু না ভাই, বাড়ি ফিরব এখন।"
পিকলু বলল, "বাড়িতে কী কাজ?"
শুভ বলল, "কোনও কাজ নেই। কেন বল তো?"
পিকলু বলল, "আমার বাড়ি চ। বাংলা খাওয়াব।"
শুভ বিমর্ষ মুখে বলল, "আজ টাকা নেই ভাই। অবস্থা খুব খারাপ।"
পিকলু বলল, "টাকা নেই তাতে কী হয়েছে? আমি আছি তো। পরে একদিন তুই খাইয়ে দিবি!"
শুভ ম্লান হাসল, "ওই পরের দিন যে কবে আসবে ভাই সেটা আমিও জানি না।"
পিকলু ইয়ার্কি মেরে বলল, "কেন বে, বউ ভেগেছে?"
শুভ কয়েক সেকেন্ড পিকলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ ভাই।"
পিকলু শুভর পেটে খোঁচা মেরে বলল, "শালা তুইও আজকাল ইয়ার্কি করিস।"
শুভ বলল, "না রে ভাই, সত্যি ভেগেছে।"
পিকলু অবাক চোখে শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, "মাইরি?"
শুভ বলল, "মাইরি। দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে চলে গেছে মাগি।"
পিকলু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "ছি ছি ভাই, ঘরের কথা এরকম বাইরে সবাইকে বলে বেড়াতে নেই। ঘরের বউ না?"
শুভ বলল, "বালের বউ বাঁড়া। ছেনাল খানকি মাগি। পরের সঙ্গে শুয়ে বেড়ায়।"
বাসস্ট্যান্ডে কয়েকজন যুবতি দাঁড়িয়েছিল। তারা কড়া চোখে শুভর দিকে তাকাল।
পিকলু শুভকে হাত ধরে টেনে বাসস্ট্যান্ডের বাইরে নিয়ে এল, "ভাই মার খাওয়াবি নাকি রাস্তাঘাটে?"
দুজনেই ভিজছিল। শুভ বলল, "আর ভাই মার তো খেয়েই এসেছি। পেটে লাথি মেরেছে ওর নাং। বিচি ফেটে যেত আর-একটু নিচে মারলে। বাল মার খেয়ে এলাম, আর বেঁচে থেকে কী হবে? ওই খানকির ছেলেকে গাঁড় পেঁচিয়ে দুটো লাথি মারলে তো শান্তি পাওয়া যেত!"
পিকলু শুভকে সামলাচ্ছিল। বলল, "ভাই, তুই ছিলি আমাদের মধ্যে সবথেকে ঠান্ডা মাথার ছেলে। তোর এরকম মাথা গরম হলে কি ভালো লাগে বল? কোন বাড়ির ছেলে তুই সেটা দেখ। আমাদের মতো বস্তির মাল তো তুই না।"
শুভর চোখ লাল হয়ে গেছিল, সে বিড়বিড় করে বলল, "আমি বস্তিরই ছেলে ভাই। ভদ্রঘরের লোকেদের বউ বরকে নাঙের ঘরে ডেকে শাড়ির কুঁচি ধরতে বলে কোনও দিন দেখেছিস?"
পিকলু বলল, "তুই যেতে গেলি কেন? পরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেই পারতিস।"
শুভ বলল, "হাতেনাতে ধরতে গেছিলাম মাগিকে। হাতেনাতে ধরেছি। খাটের ওপর চাদর পড়ে আছে, দেখে বোঝাই যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে লাগিয়ে উঠেছে, আমার ঘরের বউ, আমার বাড়িতে শাখা সিঁদুর পরে অন্য লোকের সঙ্গে শুতে যায়। মেরেই ফেলতাম আজ ওকে। ওই শুয়োরের বাচ্চা চলে এল বলে বেঁচে গেল মাগি।"
পিকলুর ঘর চলে এসেছিল। পিকলু শুভকে জোর করে স্নান করিয়ে জামা কাপড় পালটিয়ে নিজের লুঙ্গি আর গেঞ্জি দিল।
পিকলুর বউ ঘরে ছিল না। খাটের তলা থেকে বাংলার বোতল বের করে গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়ে শুভকে খাওয়াল।
শুভ খেয়ে ক্রমাগত অলকাকে গালাগালি দিয়ে যেতে লাগল।

পিকলু চুপচাপ বসে শুনতে লাগল।
দরজায় তিনটে নক হল। পিকলু শুভকে বলল, "তুই বস, কেউ এসেছে বোধ হয়।"
পিকলু বাইরে গিয়ে ইদ্রিশকে নিয়ে ঘরের ভিতরে এল।
ইদ্রিশ শুভকে দেখিয়ে বলল, "মালটা কে রে?"
পিকলু বলল, "আমার বন্ধু।"
শুভ বলল, "শুধু বন্ধু বলছিস কেন? বল আমার বউকে নিয়ে দীপ্ত রায় শোয়। সবাইকে বল।"
ইদ্রিশের কান খাড়া হল, পিকলুকে বলল, "ওর বউকে নিয়ে দীপ্ত রায় শোয়, মানে?"
শুভ বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস কর না ভাই, আমি বলছি, ওই মাগিটাকে দেখিসনি, ওই যে কী বালের সিরিয়াল করে, মুখার্জি বাড়ির বউ, দেখেছিস তো?"
ইদ্রিশ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি তো।"
শুভ বলল, "ওই মাগিই তো আমার বউ বে। পালিয়েছে।"
পিকলু মাথা নিচু করে বসে ছিল।
ইদ্রিশ হেসে বলল, "উফ ভাই পিকলু, তোর বন্ধুর জন্য আর-এক বোতল মদ নিয়ে আয়। আনতে এসেছিলাম একটা খবর, এ তো ধমাকা লাগিয়ে দিলি ভাই।"

১৮

।।বুবকা।।

বুবকার ঘুম ভাঙাল বৈভবী। বুবকা বলল, "কী হল, এত সকালে জাগাচ্ছ কেন?"
বৈভবী থমথমে গলায় বলল, "আমরা আজ পেজ থ্রি নিউজ বুবকা।"
বুবকা উল্লসিত গলায় বলল, "বাহ্, এ তো দারুণ খবর।"
বৈভবী বলল, "খবরটা পড় আগে।"
কাগজটা বুবকার খাটে দিল বৈভবী। বুবকা উঠে খবরটা পড়ল। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে বলল, "তিলক শর্মা! কোথায় থাকে এই মালটা? এই নিউজটা করার মানে কী?"
বৈভবী ক্লান্ত গলায় বলল, "দীপ্ত রায়ের রক্ষিতা আর আমাকে একই লাইনে বসিয়ে দিল?"
বুবকা জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "এত খবর লোকটা পেল কোত্থেকে?"
বৈভবী বলল, "তুমি মাথা ঠান্ডা করো। ইম্পালসিভ হয়ে কিছু করে বোসো না প্লিজ।"
বুবকা বলল, "মাথা ঠান্ডা করব মানে? মানেটা কী? তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কোন দিকে গেছে?"
বৈভবী বলল, "কী করবে তাহলে?"
বুবকা ফুঁসছিল। বলল, "আমাকে ফোনটা দাও তো।"
বৈভবী বলল, "কাকে ফোন করবে?"
বুবকা বলল, "দীপ্তদাকে।"
বৈভবী বলল, "কেন?"
বুবকা বিরক্ত হল, "আহ্, দাও না।"
বৈভবী ফোনটা দিল। বুবকা দীপ্তকে ফোন করল। দীপ্তও ঘুমাচ্ছিল। ফোনটা ধরে বলল, "বলো বুবকা।"
বুবকা বলল, "তোমার ফ্ল্যাটে কি কোনও ঝামেলা হয়েছে কাল? ওই মেয়েটার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তোমার?"
দীপ্ত ঘুমের মধ্যেই অবাক গলায় বলল, "তুমি কী করে জানলে?"
বুবকা বলল, "কাগজে বেরিয়েছে তো। পেজ থ্রিতে, টাইমসে।"

দীপ্ত বলল, "ওয়েট ওয়েট। সবে তো কালই হল ঝামেলাটা। মিডিয়া জানল কী করে?"
বুবকা বলল, "সেটা আমি কী করে জানব? কিন্তু বাজে ব্যাপারটা হল এরা তোমার সঙ্গে আমার আর বৈভবীর রিলেশনটাও জড়িয়েছে। আমরা যারা সিনেমাটা করছি, তারা সবাই বিতর্কিত লোকজন, সে ব্যাপারে একটা নোংরা ইঙ্গিত আছে।"
দীপ্ত কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। আজ পার্টি। তোমার ফেবারিট স্কচ খাওয়াব আজ।"
বুবকা অবাক হয়ে বলল, "মানে? কেন?"
দীপ্ত বলল, "কেউ আমাদের কাঠি করতে গিয়ে আমাদের প্রচার করে দিয়েছে বুবকা। বুঝতে পারছ না?"
বুবকা বলল, "লোকে আমাদের নিয়ে উলটোপালটা লিখবে সে আনন্দে মদ খাব?"
দীপ্ত বলল, "হ্যাঁ। খাবে। পেপারে একটা সিনেমার অ্যাড দিতে কত টাকা খরচ হয় সে সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে? আমরা শুরু করতে পারলাম না আর এরা ফ্রিতে আমাদের অ্যাড করে দিয়েছে। চলে এসো, দেরি কোরো না।"
ফোনে একটা শব্দ হচ্ছিল। বুবকা দেখল দাদা কল ওয়েটিং-এ আছে। সে বলল, "আমি ফোনটা রাখছি। বাড়ি থেকে ফোন করছে।" বলে দীপ্তর কথার অপেক্ষা না করেই বুবকা দাদার ফোনটা ধরল, "বল।"
তথাগতর গলা গম্ভীর, "তুই বৈভবীর ওখানে?"
বুবকা বলল, "অত সাসপেন্স রাখতে হবে না। খবরটা পড়েছি। কী বলবি বল।"
তথাগত বলল, "মা খবরটা পড়ে ফায়ার হয়ে আছে।"
বুবকা ঘড়ি দেখে অবাক গলায় বলল, "মা এত সকালে উঠল কী করে? নিশ্চয়ই কেউ কাঠি করেছে। তুই?"
তথাগত বলল, "আমি কেন হব। আমি তো বাইরের ঘরে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি মা এসে বলছে কাগজটা কোথায়। এখন তোকে নিয়ে মা বাবার মিটিং চলছে।"
বুবকা বলল, "না মামা, মুরগি কোরো না। তোমাকে আমি আজ থেকে চিনি না। তুমি হলে সাত সেয়ানার এক সেয়ানা। আজকের হারামি তুমি? আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা তোরই সাজানো। ঠিক বলছি?"
তথাগত বলল, "তোকে তো হেল্প করতে যাওয়াটাও প্রবলেম। তোর ভালোর জন্য বলছি তুই বাড়ি চলে আয় যত তাড়াতাড়ি পারিস।"
বুবকা বলল, "আমি তো যাব না ভাই। আমার এখন একটা পার্টিতে যেতে হবে।"
তথাগত অবাক গলায় বলল, "পার্টিতে যাবি? এই সাতসকালে?"
বুবকা বলল, "হ্যাঁ। আমাদের সিনেমার প্রি-শ্যুটিং সাকসেস পার্টিতে।"
তথাগত বলল, "তুই যা করছিস সব ভেবে করছিস তো বুবকা?"
বুবকা বলল, "তুই যা যা করছিস সেটা ভেবে করছিস তো দাদা?"
ফোনটা কেটে গেল।
বুবকা হাসতে লাগল।
বৈভবী বলল, "কী হল?"
বুবকা হাসতে হাসতে বলল, "খেলতে রহো খেলতে রহো।"

১৯

তিন্নি বাপের বাড়ি এসেছে। তিন্নি অন্তঃসত্ত্বা। তিন্নির মা তিন্নির সাধ দিচ্ছে।
তিন্নির হিংসুটে বউদি তিন্নির দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।
তিন্নি সেটা খেতে যাবে।
তখনই তিন্নির বিড়াল এসে দুধের বাটি উলটে দেবে।
...
সিনটা এই লিখেছিল রিখিয়া। সমস্যা দেখা গেল শ্যুটের সময়। ডিরেক্টর তরুণ দাস স্ক্রিপ্টটা দেখে রেগে গেছেন। রিখিয়া ফ্লোরে এসেছিল। তাকে দেখে বললেন, "এই যে ম্যাডাম, একটু রিয়েলিস্টিক ভাবলে হত না? বিড়াল পাব কোত্থেকে? তাও এরকম ট্রেইন্ড বিড়াল।"
বাণী তখন ফ্লোরে ঢুকছিলেন, তরুণকে বললেন, "বিড়াল বাদ দিয়ে দিন, তিন্নির মাকে খাইয়ে দিন দুধটা। একজন কমে যাবে, আমাদের বাজেটও রিডিউস হবে, আবার তিন্নির কান্নাকাটির ফলে শো টিআরপি-ও বাড়বে।"
রিখিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলল, "কিন্তু দিদি, তিন্নির মাকে মারলে অসুবিধা আছে। তিন্নির মার সঙ্গে তিন্নির শ্বশুরের এককালে প্রেম ছিল। সেটা নিয়ে একটা সিন ভেবে রেখেছি।"
বাণী মিত্র বিরক্ত হয়ে বললেন, "তিন্নির মার সঙ্গে তিন্নির শ্বশুরের কবে প্রেম ছিল?"
রিখিয়া আহত গলায়, "আপনি দেখেননি দিদি? শুরুতেই তো আভাস দিয়েছিলাম।"
বাণী বললেন, "আমার মেমোরি তো এত খারাপ না। তাহলে কোনও কারণে মিস করে গেছি হয়তো। শোন, তিন্নির মাকে মেরে দে, বলছি তো, ওই ফ্ল্যাশব্যাকগুলো দিবি, খারাপ হবে না।"
রিখিয়া বলল, "দিদি, তিন্নি বাপের বাড়ি এলে সমস্যা হয়ে যাবে তো, সিরিয়ালের ব্যালান্সটা নষ্ট হয়ে যাবে না?"
বাণী একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "তাহলে দুধ দেবার দরকার কী আছে?"
রিখিয়া বলল, "দুধের সিন তো আগের এপিসোডে শুরু হয়ে গেছে।"
বাণী বললেন, "তোর হঠাৎ বিড়ালের কথা মাথায় এল কেন? এতদিন ধরে লিখছিস, মাথাটা গেছে নাকি?"
রিখিয়া বলল, "ছেড়ে দাও, তিন্নির হাত থেকে বাটিটা পড়ে গেছে, এভাবেই দেখিয়ে দাও।"
বাণী তরুণকে বললেন, "এবার ঠিক আছে?"
তরুণ খুশি হয়ে চলে গেলেন। শ্যুট শুরু হবে একটু পরে। ফ্লোর রেডি হচ্ছে। বাণী অফিসের দিকে রওনা হলেন।
আহেলী মিত্র তিন্নির পার্টটা করছে। স্টুডিওতে ঢুকছিল। তাঁকে দেখে তটস্থ হল। বাণী মিত্র হালকা হেসে বেরিয়ে গেলেন।
তথাগত ফোন করছিল। তিনি ধরলেন, "হ্যাঁ বলো। অফিস থেকে বেরিয়েছ?"
"হ্যাঁ মা। আমি অফিসে এলাম তো।"
"অফিসে এলে মানে? বুঝলাম না।"
"মানে তোমার অফিসে এলাম।"
বাণী অবাক হলেন, "কেন, কী হল?"
তথাগত বলল, "এসো, বলছি।"
স্টুডিওর পাশেই অফিস। বেশিক্ষণ লাগল না। তথাগত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বাণী বললেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"
তথাগত বলল, "তোমার অপেক্ষা করছিলাম।"
বাণী অফিসে ঢুকলেন, নিজের ঘরটা বাণী খুব যত্ন নিয়ে সাজিয়েছেন। একদিকে গল্প শোনার জন্য সোফা,

তাকিয়া সব আছে। অন্য দিকে টেবিল। বাণী সোফায় বসে বললেন, “বলো, বাড়িতে না গিয়ে অফিসে এলে কেন?”
তথাগত একটু ইতস্তত করে বলল, “মা, আমি আসলে একটা জিনিস ভাবছিলাম।”
বাণী বললেন, “কী?”
তথাগত বলল, “আমি ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দি।”
বাণী বললেন, “তারপরে?”
তথাগত বলল, “তোমাকে জয়েন করি। আজকাল চাকরিটা ভালো লাগছে না ঠিক, তা ছাড়া হাউস বড়ো হচ্ছে, তুমি একা পড়ে যাচ্ছ।”
বাণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, “কথাটা তোমার বাবাও আমাকে বলেছে অনেকবার। আমি নিজে থেকে কিছু বলিনি কোনও দিন। ভেবেছি তুমি একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। ডিসিশনটা তুমিই নাও। আজ যখন বললে আমি অনেকদিন পর খুশি হলাম। বুবকার ওপর আমি আর কোনও আশা করি না। বাই দ্য ওয়ে, প্রীতিকাকে বলেছ এই ব্যাপারে কিছু?”
তথাগত মাথা নাড়ল, “ওকে হিন্ট দিয়েছি। ডিসিশনটা জানাইনি।”
বাণী বললেন, “ইজ শি হ্যাপি?”
তথাগত বলল, “আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি মা। তা ছাড়া ও হ্যাপি হোক বা আনহ্যাপি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমার কাছে তুমি খুশি কি না সেটাই ম্যাটার করে।”
বাণী খুশি হলেন। বললেন, “আমি এখনও বলব তুমি সাতদিন সময় নাও। ভাবো, তারপর সাতদিন পর আমায় আবার ডিসিশনটা জানাও।”
তথাগত বলল, “আমি ঠিক করে নিয়েছি মা।”
বাণী মাথা নাড়লেন, “না, তুমি তো জানোই, একদিনে আমি কোনও ডিসিশন নিই না। এটা তোমার লাইফের ডিসিশন, টেক ইওর টাইম।”
তথাগত বলল, “বেশ। তাই হোক।”
বাণী বললেন, “কী খাবে? অফিস থেকে বেরিয়ে তো খাওনি কিছু। চাইনিজ আনাই?”
তথাগত বলল, “আচ্ছা।”
বাণী বললেন, “বুবকাকে আর ফোনে পেয়েছিলে?”
তথাগত মাথা নাড়ল, “না, ও বলছিল দীপ্ত রায়ের বাড়িতে প্রি-শ্যুটিং সেলিব্রেশন আছে।”
বাণী মাথা নিচু করে কিছু একটা ভাবছিলেন। তথাগতর কথার উত্তর দিলেন না।

২০

।।বুবকা – অলকা।।

আউটডোর। শান্তিনিকেতনে। পরের দিন থেকে শ্যুটিং শুরু। তারা দুপুরে এসে পৌঁছেছে।
বুবকার বিরক্ত লাগছিল। বৈভবী আসেনি। দীপ্ত রায়ও। এখানে শুধু তার আর অলকার শ্যুট।
একটা রিসর্ট ভাড়া করা হয়েছে। গোটা ইউনিটটা সেখানেই আছে।
বুবকা একা একা হাঁটতে বেরিয়েছিল। বিকেল হয়েছে। আজ হাটবার না। ভিড় নেই। অনেকটা হাঁটল। খানিকক্ষণ পর বৈভবী ফোন করল, “কী খবর?”
বুবকা বলল, “ভালো লাগছে না ধুস। তুমি চলে আস।”

বৈভবী বলল, “বাচ্চাদের মতো কোরো না তো, তিন দিনের তো ব্যাপার। তারপর তো ইনডোর শুরু। তিন দিন কোনওমতে কাটিয়ে দাও।”
বুবকা বলল, “কাল ভোর সাড়ে চারটে থেকে শ্যুট শুরু বুঝলে? নইলে আজ কলকাতায় থেকে সকালে চলে এলেই হত। ”
বৈভবী নরম গলায় বলল, “সে জানি তো। আচ্ছা, আমি ফোন করে তুলে দেব?”
বুবকা বলল, “থাক। আমার ফোনে অ্যালার্ম আছে। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।”
বৈভবী হাসল, “ধরে নাও না, তোমার কেরিয়র আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। ধরে নাও, এটা তোমার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ। তুমি কনসেন্ট্রেট করো। আর আজ রাতে দয়া করে বোতল খুলে বোসো না।”
বুবকা বলল, “বোর লাগছে তো।”
বৈভবী বলল, “তোমাদের শান্তিনিকেতনে বাড়ি আছে না?”
বুবকা বলল, “আছে।”
বৈভবী বলল, “সেখান থেকে ঘুরে এসো।”
বুবকা বলল, “না, ওখানে আমি যাব না।”
বৈভবী বলল, “আচ্ছা যেয়ো না। এখন কী করছ?”
বুবকা বলল, “প্রকৃতির মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছি।”
বৈভবী হাসল, “বাবা, রাবীন্দ্রিক ভাষা তো পুরো। আচ্ছা, তুমি হাঁটো, কোনওরকম সমস্যা হলে ফোন কোরো। তবে ভুলেও কলকাতা আসার কথা ভেবো না কিন্তু।”
বুবকা বলল, “আচ্ছা। ভাবব না। তবে পরের বার আউটডোরে তুমি না এলে আমিও নেই মনে রেখো।”
বৈভবী বলল, “আচ্ছা। রাখো এবার, পাগল কোথাকার।”
বুবকা ফোনটা রাখল। লালমাটির পথ ধরে অনেকটা হেঁটে ফেলেছিল সে। প্রথম প্রথম ভালো লাগছিল না। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল সোনাঝুরি গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবার মধ্যেও একটা নেশা ধরা ব্যাপার আছে। চারপাশে কেউ নেই। বুবকা গলা ছেড়ে গান ধরল। অনেকক্ষণ গাইবার পর বুঝল অদ্ভুত ভালো লাগছে তার। মনের মেঘটা কোথায় যেন কেটে যাচ্ছিল।
“আপনি বেশ ভালো গান।”
বুবকা চমকে তাকাল। অলকা কখন চলে এসেছে খেয়াল করেনি।
বলল, “আপনি কখন এলেন?”
অলকা বলল, “আমি অনেকক্ষণ এসেছি। গাছের আড়ালে চুপচাপ বসে ছিলাম।”
বুবকা বলল, “সে কী কেন? সবাই তো আপনাকে খুঁজবে?”
অলকা বলল, “খুঁজবে না। আমাকে কেউ খোঁজে না।”
বুবকা বলল, “কী যে বলেন! আপনি লিড অ্যাক্ট্রেস।”
অলকা বলল, “হ্যাঁ, শ্যুটিংয়ের সময় খুঁজবে হয়তো। আচ্ছা যেটা বলছিলাম, আপনি গান শিখেছেন?”
বুবকা হাসল, “হ্যাঁ, ছোটোবেলায়। খুব বেশি দিন না। আসলে চিরকালই দুরন্ত ছিলাম তো। গানের মাস্টারমশাই এলে ওঁর কাঁধে চেপে বসে থাকতাম।”
অলকা হাসল অনেকক্ষণ ধরে। বুবকা বলল, “আপনি গান জানেন?”
অলকা বলল, “না।”
বুবকা বলল, “নাচ?”
অলকা বলল, “ছোটোবেলায় শিখেছিলাম। ক্লাস সেভেনে উঠলে বাবা বলল, মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে। নাচ বন্ধ। ব্যস, সেই যে বন্ধ হল আর শেখা হল না।”
বুবকা বলল, “সেটা নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আবার শুরু করলেই হয়।”

অলকা বলল, "স্বাধীন হলেই কি সময়টা আর ফিরে পাওয়া যায়? ক্লাস সেভেনে যে জিনিসটা সবথেকে বেশি ভালোবাসতাম, সেটা বন্ধ করে দেবার পর যে কষ্টটা হয়, সে কষ্টটা কি এখন আর উশুল হয়?"
বুবকা বলল, "বাহ, আপনি বেশ ভালো কথা বলেন তো। আপনার দেখছি স্ক্রিপ্ট রাইটার লাগে না।"
অলকা হাসল, "তা হবে। নিজের কথা বলতে স্ক্রিপ্ট রাইটার লাগে না তো।"

বুবকা বলল, "তা ঠিক। আসলে স্ক্রিপ্ট শুনে শুনে সব কিছুই আজকাল স্ক্রিপ্টেড মনে হয়। দেখুন না আমাদের সিনেমাটা যাতে না হয় তার জন্যও কত স্ক্রিপ্ট রেডি করে রাখা ছিল। অবশ্য এখনও চেষ্টা চলছে। একটা সিনেমার তো শ্যুটিংটা বড়ো কথা না। পোস্ট প্রোডাকশনেও অনেক চেষ্টা হবে হয়তো।"

অলকা বলল, "কারা করছে সেসব?"

বুবকা হাসল, "কাছের লোকেরাই।"

অলকা কয়েক সেকেন্ড বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কাছের লোকেরাই বোধহয় আঘাত দিতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তাই না?"

বুবকা বলল, "এইজন্য আমি সবাইকে দূরের মানুষ করে রেখে দি।"
বুবকার ফোন বাজছিল। বুবকা দেখল মা ফোন করছে। বলল, "দেখেছেন, কাছের মানুষের কথা বলতে বলতে মা ফোন করে দিল।"
অলকা হাসল। বুবকা ফোনটা ধরল, "বলো।"
"তুমি কোথায়?"
"জানো না? তোমায় তোমার গোয়েন্দা বলেনি?"
"আমার গোয়েন্দা? কে?"
বুবকা হাসতে হাসতে বলল, "কেন? শ্রীযুক্ত তথাগত মিত্র। তিনি তো এখন অফিসের থেকে আমার আর বৈভবীর মধ্যেই বেশি ইন্টারেস্ট খুঁজে পাচ্ছেন।"
"বাজে কথা বোলো না বুবকা। তোমার দাদা তোমাকে যথেষ্ট কেয়ার করে। তুমি যদি তোমার ইন্টারেস্টে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখো তাহলে আমাদের কী করার আছে? যাই হোক, কোথায় আছ এখন?"
"বোলপুরে। শ্যুটে এসেছি।"
"হুঁ। দীপ্তর সিনেমায়?"
"হ্যাঁ।"
"আমাদের কেয়ারটেকার ঘর ঠিক করে রেখেছে তো?"
"আমি তো আমাদের বাড়িতে উঠিনি। এখানে সবার সঙ্গে রিসর্টে উঠেছি।"
ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর বাণী বললেন, "বেশ।"
"কেন ফোন করেছ?"
"তোমাকে কি ফোন করার জন্যও কারণ লাগবে এখন?"
"কারণ ছাড়া তো ফোন করো না।"
"তিন দিন ধরে বাড়ি আসনি। বাবা মায়েরও তো জানতে ইচ্ছা করে ছেলে কোথায় আছে, কী করছে, সেটা বোঝো?"
"বললাম তো আমি এখন বোলপুরে আছি। আর তোমাদের জেনেও ভালো লাগবে, এখানে বৈভবী আসেনি।"
ফোনটা কেটে গেল। বুবকা সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কত চিন্তা এদের।"
অলকা একটু দূরে চলে গেছিল। বুবকা ডাকল, "আপনি কি রিসর্টে যাচ্ছেন?"
অলকা বলল, "না না, আপনি ফোন করছিলেন তাই আপনাকে একটু স্পেস দিলাম।"

বুবকা বলল, “স্পেস দিলেন! না না, আমার স্পেসের কোনও দরকার নেই। আমি ট্রান্সপারেন্ট। একবার দেখলেই সব বুঝে যাবেন।”

অলকা বলল, “আমার এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে। অদ্ভুত একটা শান্তি আছে। আমার আর কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না।”

বুবকা বলল, “আমার উলটোটা। কলকাতা ছাড়া আমার আর কিছু ভালো লাগে না। কেন জানি না, কলকাতার ওপর আমার অদ্ভুত একটা টান কাজ করে। অন্য কোথাও গেলেও সবসময় মনে হয় কখন ফিরি কখন ফিরি। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। ছোটোবেলায় যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম, বাবা মাকে অস্থির করে দিতাম বাড়ি যাব বলে। সে এক সময় ছিল। আমাদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বাবার প্রাইভেট চাকরি, মা পার্টটাইম প্রফেসর। অথচ সেই সময়টাই যেন ভালো ছিল।”

অলকা বলল, “আপনি কিন্তু এখন স্ক্রিপ্ট ছাড়া ভালো কথা বলছেন, আপনি যে এরকম কথা বলতে পারেন সেটাই ভাবতে পারিনি কোনও দিন। আপনাকে দেখে বরাবরই বড়োলোকের বখাটে ছেলে মনে হয়েছে।”

বুবকা বলল, “আমি তো তাই। সে ব্যাপারে আপনার কোনও সন্দেহ আছে নাকি? আমার তো নেই। মানুষ যা বলে সেটাই চোখ বুজে বিশ্বাস করবেন। ঠকতে হবে না।”

অলকা বলল, “তাহলে তো আমার ব্যাপারেও কেউ খুব একটা ভালো কথা বলে না। সেগুলো কি আপনিও ভাবেন?”

বুবকা বলল, “রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস আর ক্যারেকটার সম্পর্কে? একটু মুখ খারাপ করছি কিছু মনে করবেন না, সত্যি বলতে কী, আমার তাতে বাল ছেঁড়া যায়। আমার সম্পর্ক, আমার থেকে বারো বছরের বড়ো বৈভবীকে নিয়ে লোকে কী বলল না বলল, তাতে আমার সত্যি কিছু যায় আসে না।”

অলকা বলল, “আমার প্রথম প্রথম যায় আসত। তারপর দীপ্ত শেখাল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বলে যাও, তুমি প্রস, তুমি প্রস, তুমি প্রস, দেখবে একসময় আর সেটা মনে হবে না। আমার কিন্তু সত্যি আজকাল আর কিছু মনে হয় না।”

বুবকা কয়েক সেকেন্ড অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি সত্যি বলেন এটা?”

অলকা হাসল, “সত্যি। রোজ বলি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, মেকআপ রুমে একা থাকলে, রাতে ঘুমাতে যাবার সময়। ভালো লাগে বলার পর আজকাল। বিশ্বাস করুন।”

২১

চাঁদ উঠেছে। বুবকা প্রোডাকশন থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বোলপুর থেকে একটা স্কচের বোতল নিয়ে এসে খোয়াইয়ের তীরে গাড়ির সামনের সিটেই বোতল খুলে বসেছে। অলকাও তার সঙ্গে আছে।

অরিত্র একটু গাঁইগুঁই করছিল। বুবকা বলে দিয়েছে সকালে উঠতে কোনও সমস্যা হবে না। দু পেগ মতো চুপচাপই খেল তারা। খানিকক্ষণ পরে বুবকা বলল, “এই এখানে যে আমরা মদ খাচ্ছি, আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে।”

অলকার হালকা লাগছিল ভিতরটা। সে বলল, “কী দায়িত্ব বলুন তো?”

বুবকা বলল, “জায়গাটা নোংরা করলে চলবে না। এই বনের ভিতরে এই চাঁদ যেমন সুন্দর, জায়গাটাকেও তেমন সুন্দর রাখা উচিত।”

অলকা বলল, “মানুষ তো সুন্দর জিনিসকেই নোংরা করতে চায় সবার আগে।”

বুবকা বলল, “যেমন?”

অলকা বলল, “সম্পর্কগুলো। কত তাড়াতাড়ি আমরা সেগুলো নষ্ট করে ফেলি।”

বুবকা মুগ্ধ হয়ে চাঁদ দেখছিল, অন্যমনস্ক হয়ে বলল, “সম্পর্ক? মানে?”

অলকা বলল, “সম্পর্ক মানে মানুষে মানুষের সম্পর্ক।”

বুবকার সংবিৎ ফিরল, “ওহ, সরি সরি। হ্যাঁ। নষ্ট করি তো। আমি যেমন নষ্ট করে ফেললাম। বাবা মার সঙ্গে সম্পর্কটাই। কী করব বলুন? কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়ে যাচ্ছিল তো! আপনি কার সঙ্গে নষ্ট করলেন সম্পর্ক?”
অলকা হেসে বলল, “আমি তো নষ্ট মেয়েই। অপয়াও। বিয়ে করার পরই বরের চাকরি চলে গেল।”
বুবকা বলল, “ছাড়ুন তো, ওসব ফালতু কথা। কিছু হলেই মেয়েদের দোষ। আমার এক পিসি আছে, দেখি তো, পেটে গ্যাস হলেও মুখ চুন করে বলবে নিশ্চয়ই ওই অপয়া বউটা দুপুরে ভাত খাবার সময় নজর দিয়েছে তাই গ্যাস হয়ে গেছে।”
অলকা বলল, “মেয়েরাই তো অপয়া। ছেলেরা অপয়া হয় নাকি?”
বুবকা বলল, “হয় না আবার? আমাদের পাড়ায় এক দাদু আছে। ওঁর মুখ দেখে সকালে বেরিয়েছেন কি আপনি মরেছেন। মরেই গেছেন। কেউ বাঁচাতে পারবে না, এত অপয়া।”
অলকার ফোন বাজছিল। বুবকা বলল, “ফোনটা ধরুন।”
অলকার সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ ছিল। সেটার ভিতর থেকে ফোনটা সশব্দে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছিল। ফোনটা বের করে অলকা দেখল দীপ্ত ফোন করছে। ফোনটা ধরল সে, “হ্যাঁ বলো।”
“তুমি কোথায়?” দীপ্তর গলা থমথমে।
অলকা বলল, “কেন বলো তো?”
“অরিত্র ফোন করেছিল। তুমি বুবকার সঙ্গে বেরিয়েছ?”
“হ্যাঁ। কী করব একা একা?”
“ওরে খানকি, তোকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছি আমি। আর যেই নতুন কচি ছেলে দেখলি মাথা চিবোতে চলে গেলি? কোন হোটেলে, কবার হল?” হিসহিস করে উঠল দীপ্তর গলা।
অলকা হাসল, “বাহ, তোমাদের গলাগুলো কী সুন্দর সব এক হয়ে যায়।”
“কী বলতে চাইছিস?”
“আমার বর, তুমি, কত সুন্দর তোমরা একভাবে ভাবতে পারো সেটাই বলছি।”
দীপ্ত সামলাল নিজেকে, “শোনো, আমি তো তোমার ভালোর জন্যই বলছি। কাল ভোরবেলা শ্যুট। কেন রাতে বেরিয়েছ? তোমার ভালো ঘুম দরকার বেবি।”
অলকা বলল, “তুমি অভিনয় করো না কেন? করতে পারতে। অনেককে হারিয়ে দেবে, বিলিভ মি।”
দীপ্ত বলল, “আমি তোমার কথা ভেবেই তো অস্থির থাকি সারাদিন। আচ্ছা, তুমি রিসর্টে ফিরে যাও আর আধঘণ্টার মধ্যে।”
অলকা ঠান্ডা গলায় বলল, “আমার সময় হলে আমি যাব। তোমার কাছে যদি আমি ইম্পরট্যান্ট হতাম তাহলে কলকাতায় কাজের অজুহাত দেখিয়ে থেকে যেতে না, নিজেও আসতে।”
দীপ্ত বলল, “তুমি এই কথা বলছ? আচ্ছা তুমি জানো না এই সিনেমাটায় আমি কেন টাকা ঢালছি? শুধু তোমার জন্য, ভুলে যাচ্ছ?”
অলকা বলল, “ওহ, আমার জন্য শুধু? বাণী মিত্রর ফ্যামিলি ভাঙা-টাঙার কোনও ব্যাপার নেই বলো?”
দীপ্ত কঠিন গলায় বলল, “তোমার সামনে বুবকা আছে?”
অলকা বলল, “না, দূরে আছে।”
দীপ্ত বলল, “ওর সামনে এসব কথা কেন বলছ? জানো না এর ফলাফল কী হতে পারে? তোমার থেকে অনেক ম্যাচিওরড বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করি আমি।”
অলকা বলল, “আচ্ছা। তুমি চিন্তা কোরো না। অনেক ম্যাচিওরড বিহেভিয়ারই করব আমি। আর শোনো, বুবকার সঙ্গে আমি শুইনি।”
দীপ্ত বলল, “ওহ, আবার উলটো কথা।”

অলকা বলল, “তুমিই তো শুরু করেছিলে তাই না?”
দীপ্ত বলল, “আচ্ছা। তুমি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যেয়ো, তাহলেই হবে। বাই।”
ফোনটা কেটে গেল। বুবকা বনের মধ্যে হাঁটছিল। অলকা ডাকল, “আমাকে আর-একটা বানিয়ে দেবেন?”
বুবকা এসে বলল, “দীপ্তদা ফোন করেছিল?”
অলকা বলল, “হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করল আমার সঙ্গে কতবার শুয়েছেন?”
বুবকা অবাক হয়ে বলল, “সিরিয়াসলি?”
অলকা হাসল, “না না ইয়ার্কি মারছি।”
বুবকা বলল, “বলা যায় না, বলেছে হয়তো, প্রেমিকরা রাগের মাথায় যা ইচ্ছা বলতে পারে।”
অলকা বলল, “হ্যাঁ, প্রেমিকদের কোনও দোষ নেই তো, তারা নির্দ্বিধায় প্রেমিকার চরিত্রকে কাঠগড়ায় তুলতে পারে। প্রেমিকরা তো ঈশ্বরের অপর নাম। তাদের কোনও দোষ থাকবে কেন?”
বুবকা ঘড়ি দেখল, “সাড়ে এগারোটা বাজে। ফিরবেন?”
অলকা বলল, “আমি পারলে এখানেই থেকে যেতাম।”
বুবকা বলল, “পুলিশের গাড়ি টহল দেওয়ার কথা বলেছিল একজন। বেকার ঝামেলায় জড়ানো ভালো হবে না বোধহয়। ফিরি চলুন।”
অলকা বলল, “অগত্যা। চলুন।”
বুবকা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।
অলকা বলল, “আপনি আপনার প্রেমিকাকে খুব ভালোবাসেন? তাকে প্রস বলেন?”
বুবকার মাথা ঝিম ঝিম করছিল নেশায়, অলকার প্রশ্ন শুনে একটু ভেবে নিয়ে বলল, “এখনও অবধি বলিনি।”
অলকা বলল, “বলবেন কোনও দিন বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে?”
বুবকা বলল, “জানি না।”
অলকা বলল, “ছোটোবেলায় এক স্যারের কাছে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটো ছেলে মারা যাবার পর রবীন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে গানটা লিখেছিলেন। (তথ্যটা ভুল। শমীর মৃত্যু ২৪ নভেম্বর, ১৯০৭। প্রায় ২৫ বছর পর মীরা দেবীর ছেলের মৃত্যুর পর চিঠিতে লেখেন সেদিন ট্রেন থেকে জ্যোৎস্না দেখার কথা। সেই সূত্রে এই গানটি ঘিরে মিথ প্রচলিত হয়ে গেছে। এই গানটি লেখা হয়েছিল ১৯১৪ সালে, ২২ চৈত্র, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।) ছেলে মারা যাবার পর ওঁর মনে হয়েছিল আমার দুঃখে তো এই জ্যোৎস্নার কোনও পরিবর্তন হবে না। আর বাকি প্রকৃতির তো কিছুই হবে না। এখন চারদিক দেখে আমার সেটাই মনে হচ্ছে। এত ভালো পরিবেশ, আমার দুঃখে একটুও কান্না নেই কারও দেখুন।”
বুবকা বলল, “আপনি গানটা জানলে করতে পারেন তো।”
অলকা বলল, “আমি গান জানি না।”
বুবকা খোলা গলায় গান ধরল গাড়ি চালাতে চালাতে।
গানের মাঝপথে গিয়ে সে বাধা পেল। ফোন আসছে। সে তখনও লালমাটিতেই ছিল। গাড়িটা দাঁড় করাল। তথাগত। একটা খিস্তি মেরে ফোনটা ধরল সে, “কী বে, এখনও কাঠি করে যাচ্ছিস? বল এত রাতে কী ছিঁড়তে ফোন করেছিস।”
“বুবকা একটা খারাপ নিউজ আছে।”
“ভালো নিউজ দেওয়ার জন্য তো ফোন করিসনি। কী হয়েছে?”
“বৈভবী...”
“বৈভবী কী?”
“রাজীব আগরওয়ালের সঙ্গে মন্দারমণি যাচ্ছিল, বম্বে রোডে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, দুজনেই স্পট

ডেড।”
বুবকা ফোনটা কেটে বাইরের দিকে তাকাল।

জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে...

দ্বিতীয় পর্ব

১
।। রিমি।।

সকাল দশটা নাগাদ এনজেপি স্টেশনে পৌঁছল তারা। রিমি অনির্বাণের কানে কানে বলল, “আগে বিয়েটা করে নিলে হত না?”
অনির্বাণ রিমির কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, “বিয়ে তো করে নিয়েছি কবেই সোনা, আমরা তো মানসিকভাবে বিবাহিতই। আবার বিয়ে করার কী দরকার?”
রিমির স্বপ্নের মতো লাগছিল সবকিছু।
দূরে একটা আবছায়ার মতো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। অনির্বাণ বলল, “তোমার বাবাকে জানাওনি তো?”
রিমি বলল, “তোমাকে বললাম না বাবা বাইরে গেছে? আর মা তো জানে বন্ধুদের সঙ্গে পুরী যাচ্ছি। তুমি বোলো কখন বাবাকে ফোন করব, তখনই জানাব।”
অনির্বাণ বলল, “সিকিমে পৌঁছে জানিয়ো। জানি না, শুনলে কী ভাববে তোমাদের বাড়ির লোক।”
রিমির মুখটা শুকিয়ে গেল, “বাবা কোনও দিন মানবে না। খুব ঝামেলা হবে।”
অনির্বাণ হাসার চেষ্টা করল, “চিন্তা কোরো না, কিছু তো করারও থাকবে না।”
রিমি বলল, “জানি না কী হবে, আমার খুব ভয় লাগছে।”
অনির্বাণ রিমির হাত ধরল, “কিচ্ছু হবে না, আমি আছি তো।”
পেলিং যাবার গাড়ি শুরুতে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে একটা সুমো পাওয়া গেল। রিমির একটা কিটব্যাগ আর অনির্বাণের একটা স্যুটকেস। পিছনের সিটে সেগুলো রেখে পাশাপাশি বসল তারা। ভালোই গরম আছে। অনির্বাণ ড্রাইভারকে বলল, একটা মন্দিরে দাঁড়াতে।
ঘণ্টাখানেক পর তারা সেবক কালীবাড়ি পৌঁছে দেখল ভীষণ ভিড়। অনির্বাণ একটা দোকান থেকে সিঁদুর কিনে রিমির সিঁথিতে পরিয়ে দিল।
রিমি অবাক হয়ে বলল, “এভাবেই?”
অনির্বাণ বলল, “আর কী দরকার বলো? মন্ত্রের কি সত্যি কোনও দরকার আছে? মাকে প্রণাম করি চলো। তারপর বেরিয়ে যাই। অনেকটা রাস্তা শুনলে না? এখানে অপেক্ষা করলে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে।”
তারা দুজনে প্রতিমা প্রণাম সেরে বেরিয়ে এল। গাড়িটা যখন পেলিং-এর রাস্তা ধরল তখন দুপুর একটা। রিমির ভীষণ লজ্জা লাগছিল। তার সঙ্গে একরাশ ভালো লাগা আর খারাপ লাগা। ছোটোবেলা থেকে তার স্বপ্ন ছিল খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে। এভাবে লুকিয়ে বিয়ের কথা ভাবেনি কোনও দিন। কিন্তু কিছু করারও ছিল না।
তার বাবা এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই তার বিয়ে দিত না। অনির্বাণের সঙ্গে ফেসবুকে ছমাস হল আলাপ। সেখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে কলেজের ফাঁকে দেখা, সেখানেই প্রেম। কথা থেকে কথা, রাত জাগা

থেকে একসময় প্রেমটা শরীরে প্রবেশ করল।
দুজনেই বুঝতে পারছিল তাদের শরীর পরস্পরকে চাইছে। অনির্বাণ একসময় প্রস্তাবটা দেয়। রিমি আর দ্বিতীয়বার ভাবেনি। একটা অদ্ভুত টান আছে অনির্বাণের মধ্যে। সে টানকে অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব না।

"হোটেলে সন্দেহ করবে না তো?"
ড্রাইভারকে আড়চোখে দেখে অনির্বাণকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল রিমি। রাস্তার পাশ দিয়ে তিস্তা তাদের সঙ্গে চলছে। অনির্বাণ বলল, "আমার আই কার্ড আছে তো। সব নিয়ে এসেছি। অত সন্দেহ করে না এখানে। তা ছাড়া এক পরিচিতর হোটেল আছে পেলিং-এ। চিন্তা কোরো না।"
রিমি বলল, "তারা জানলে বাজে ব্যাপার না?"
অনির্বাণ বলল, "কীসের বাজে ব্যাপার সোনা? আজ থেকে তো আমরা স্বামী স্ত্রী। লোকে জানলে জানবে! তুমি কি ভয় পাচ্ছ নাকি এখনও?"
রিমি মাথা নাড়ল, "আমি অত ভাবছি না। আসলে ভাবতে পারছি না।"
অনির্বাণ ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে কামিজের ভিতর থেকে রিমির কোমরে আদর করতে করতে বলল, "তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না সোনা, সব ভাবনা আমার আজ থেকে।"
রিমির ভালো লাগছিল অনির্বাণের স্পর্শ। সে চুপ করে বসে রইল।
রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ। কোনও কোনও জায়গায় রাস্তাই নেই। কোনওমতে জেসিবি দিয়ে মাটি কেটে রাখা। তারা যখন পেলিং পৌঁছল তখন রাত নটা। অনির্বাণ তার পরিচিত হোটেলের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভারকে। রিসেপশনে অনির্বাণই নাম ধাম লিখল।
রিমি ফোন অফ করে দিয়েছিল।
রুমে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে তারা আর কোনও দিকে তাকাল না। রিমি ডুবে যাচ্ছিল অনির্বাণের শরীরে। অদ্ভুত এক ভালো লাগা জয় করে নিচ্ছিল তাকে।
শীত ছিল। তবু শীত লাগছিল না তাদের। শরীর আবিষ্কারের খেলায় দুজনে মগ্ন হয়ে থাকল সারারাত।
পরদিন রিমির ঘুম ভাঙল সকাল এগারোটায়। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে।
মুগ্ধ চোখে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখল সে বেশ খানিকক্ষণ। এই তো চেয়েছিল সে। তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে স্বপ্নের পাহাড়ে আসবে কোনও দিন।
অনির্বাণ ঘরে ছিল না। বাথরুমেও নেই। রিমি ভাবল হয়তো ব্রেকফাস্ট আনতে গেছে।
সে ফোন অন করে অনির্বাণের মোবাইলে ফোন করল।
ফোন সুইচড অফ বলছিল।
প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ঘরেই চুপচাপ বসে রইল সে। এর মধ্যে বাড়ি থেকে তিরিশের বেশি মিসড কল এসে গেছে।
আড়াইটা নাগাদ রুমে কেউ নক করছিল। রিমি তড়িঘড়ি দরজা খুলল।
তিন-চারজন পুরুষ তাকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল।

২

।।তথাগত।।

“কোরাপশন করতে ধক লাগে জানেন তো? সবার দ্বারা কোরাপশন হয় না। বুকের পাটা দরকার দুর্নীতি করতে। আর কোরাপশন মানে কি শুধু টাকার লেনদেন নাকি? ভাবলে ভুল হবে। সুযোগ সুবিধা নেওয়াও কিন্তু কোরাপশনের মধ্যে পড়ে। এই যে আমি আমার দু-চারটে ছেলে মাঝে মাঝে আপনাদের ইউনিটে ঢুকিয়ে দি, এটাও কোরাপশনের মধ্যে পড়ে। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো, কত সুবিধা হয় ছেলেগুলোর।”

মল্লিক ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কথাগুলো বলল। মল্লিকের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি। গলায় মোটা সোনার চেন। কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত অবজ্ঞা কাজ করে। তথাগতর বিরক্ত লাগছিল। কিন্তু শুনতে হচ্ছিল। এর এক অঙ্গুলিহেলনে শ্যুটিং যে-কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইউনিয়নবাজির চূড়ান্ত হয়, অযোগ্য লোকের জন্যও টাকা গুনতে হয়, কিন্তু কিচ্ছু করার থাকে না।

সে হাসি হাসি মুখ করে বসে ছিল। মল্লিক বলল, “আমরা ইউনিয়নে আলোচনা করেছি বুঝলেন মিত্রদা, এবার আপনাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতেই হবে। এত কম টাকায় কী করে ছেলেগুলো কাজ করবে সেটা তো বুঝতে হবে।”

তথাগত বলল, “আপনাকে তো আমাদের দিকটাও দেখতে হবে দাদা। ম্যান পাওয়ার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। আনস্কিলড। আপনারা বলেছেন বলেই নিয়েছি। এবার কীভাবে সব কিছু সামলানো যায় বলুন তো? একটা সমঝোতায় তো এলে ভালো হয়, তাই না?”

মল্লিক মোবাইলটা বের করে খুট খুট করতে করতে বলল, “কীরকম সমঝোতা চাইছেন একটু বলুন।”

তথাগত বলল, “যে রেটটা আপনারা বলছেন সেটা দেওয়া যে ইম্পসিবল সেটা বুঝতে পারছেন তো?”

মল্লিক তথাগতর দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনাদের তিনটে সিরিয়ালই এখন বেস্ট যাচ্ছে। টাকা তো কম পাচ্ছেন না।”

তথাগত অনেক কষ্টে রাগ চাপতে চাপতে বলল, “সেটা তো আপনিও জানেন এই রেটিং প্রতি উইকে চেঞ্জ হয়। তা ছাড়া বাকি প্রোডাকশনগুলোও তো আমাদের রেটই দিচ্ছে এখন।”

মল্লিক বলল, “ম্যাডামের সব কাজই কি আপনি দেখছেন এখন?”

হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ ওঠায় তথাগত খানিকটা থতোমতো খেল, “হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।”

মল্লিক চোখ ছোটো ছোটো করে বলল, “আপনার নামে বাজারে অনেক কিছু শুনি মিত্রদা।”

তথাগত একটু হাসার চেষ্টা করল, “সে তো আপনার নামেও কম কিছু শুনি না। তাতে কি কাজ আটকে থাকে বলুন?”

মল্লিক বলল, “বলুন বলুন কী শোনেন?”

তথাগত বলল, “সেসব কি বলা যায়?”

মল্লিক বলল, “বলুন না, শুনি। খারাপ লাগে না। কোনটা বলতে চাইছিলেন? আমি মেয়েছেলের দালালি করি?”

তথাগত বলল, “আপনি কি রেগে যাচ্ছেন?”

মল্লিক হাসল, “দূর মশাই, এই কথায় রাগার কী হল? মেয়েছেলের দালালি পৃথিবীর সবথেকে পুরোনো ব্যবসা জানেন না? করলে তো একটা ঐতিহ্য ফলো করি! এতে রেগে যাবার কী আছে?”

তথাগত বলল, “টপিকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে।”

মল্লিক বলল, “কিচ্ছু চেঞ্জ হচ্ছে না। সব কথাই টপিকে হচ্ছে। আচ্ছা এবার আসল কথাটা বলি। শুনুন মিত্রদা, ম্যাডাম তো এখনও প্রোডাকশনের মাথায় আছেন। তা কথা যা বলার সেটা যদি আপনার সঙ্গে বলতে হয়, বুঝতেই পারছেন আমারও, হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারি আমি ছোটো নেতা, কিন্তু আমারও তো সম্মান বলে একটা ব্যাপার আছে।”

তথাগতর চোয়াল শক্ত হল, “মানে মার সঙ্গে ছাড়া আপনি আর কারও সঙ্গে কথা বলবেন না?”

মল্লিক বলল, "আপনি রাগ করছেন মিত্রদা। এইসব লাইনে আপনি কেন এলেন? ভালোই তো ছিলেন।"
তথাগত উঠল, "আমি এলাম। মাকে বলছি আপনাকে ফোন করতে।"

মল্লিক বলল, "আপনার ভাই এখন কোথায় মিত্রদা?"

তথাগত মল্লিকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "জানি না।"

মল্লিক বলল, "বৈভবী ম্যাডাম মানুষটা ভালো ছিলেন মিত্রদা। ওটা অ্যাক্সিডেন্ট না খুন সেটা জানতে পারলেন?"

তথাগতর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। সে বলল, "সেটা পুলিশ দেখছে। আমি এ ব্যাপারে কী বলি বলুন?"

মল্লিক হাসল, "ওই যে আপনাকে বললাম না শুরুতে। কোরাপশন অনেকরকম হয়। আচ্ছা, আপনি আসুন। ম্যাডামকে ফোন করতে বলবেন।"

তথাগত বেরিয়ে এল। মাথাটা রাগে আগুন হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল মল্লিককে জুতোপেটা করে। দু টাকার বিদ্যে নেই পেটে, কোনওমতে নেতাগিরি করতে পেরে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

ফোনটা সাইলেন্ট করা ছিল। দেখল প্রীতিকার দুটো মিসড কল। কল ব্যাক করল।

"ফোন ধরছিলে না কেন?" প্রীতিকার গলা ঠান্ডা।

তথাগত বলল, "তোমাকে বলেছিলাম না একটা মিটিং আছে, ইউনিয়ন লিডার এটসেট্রা।"

প্রীতিকা বলল, "ওহ্ ভুলে গেছিলাম, মিটল সব কিছু?"

তথাগত বলল, "না, মেটেনি। বলো কেন ফোন করছিলে?"

প্রীতিকা বলল, "তোমার ভাই এসেছে।"

তথাগত সচকিত হল, "কখন?"

প্রীতিকা বলল, "ঘণ্টাখানেক হল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। একবার ডেকেছি, ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলেছে ডু নট ডিস্টার্ব।"

তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, "ওকে ডাকতে গেলে কেন? ডাকার কী দরকার ছিল?"

প্রীতিকা থমথমে গলায় বলল, "জানি, ভুল হয়ে গেছে। আর ডাকব না।"

ফোনটা কেটে গেল।

তথাগতর ইচ্ছা হচ্ছিল ফোনটা ছুড়ে মারে। দিনটা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে সকাল থেকে। একটা কাজও ঠিকঠাক হচ্ছে না।

৩

মাঝে মাঝে অলকা ভাবে দুটো বাড়ির জীবন কতটা আলাদা হতে পারে। শুভর কাছে থাকাকালীন শ্যাম্পু থেকে সাবান, ফিনাইল থেকে কাপড় কাচার সাবান, সব কিছু কেনার সময় হাজার হিসেবনিকেশ মাথায় রাখতে হত। শুভকে টাকা দিয়ে যেত লিস্ট করে। শুভ সেখান থেকে কিনে আনত।

পাড়ার দোকানে মাসকাবারি ব্যবস্থা ছিল একসময়। অলকা হিসেব করে দেখেছিল মাসের শেষে টাকা দিলে আদতে তাদেরই ক্ষতি হয়।

তারপর থেকে নগদে কেনা শুরু করে। অবশ্য একটা সময় টাকার যখন টানাটানি ছিল তখন পাড়ার দোকানই বাঁচিয়েছে তাদের। ধারে চাল ডাল ডিম আনা যেত।

দীপ্তর কাছে আসার পরে জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তার দুটো কার্ড হয়েছে। একটা ডেবিট আর একটা ক্রেডিট। যখন যা ইচ্ছা কিনে আনতে পারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে। কিনতে কিনতে মাঝে মাঝেই অলকার শুভর মুখটা মনে পড়ে। পাড়ার দোকান থেকে কিছু আনার সময় শুভ প্রায়ই বায়না ধরত বেশি বাদামওয়ালা চানাচুরটা নিয়ে আসতে। ননীদার দোকানে কাচের বয়ামে থাকত সে চানাচুর। পাঁচ টাকায় ছোটো ঠোঙার খানিকটা ভরত। শুভ বাদাম বেছে বেছে তাকে দিত। সন্ধেবেলা মোটা মুড়ি সর্ষের তেল দিয়ে মাখা, তাতে এই চানাচুর দেওয়া।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাচের বয়ামে চানাচুর থাকে না। তার পরিবর্তে দামি কোম্পানির চানাচুরের প্যাকেট। অলকা খেয়ে দেখেছে দামি চানাচুরে সেই চানাচুরের স্বাদ পাওয়া যায় না।

গ্রামের দিকে আউটডোর শ্যুটিং থাকলে সে গাড়ি থামিয়ে গ্রামের দোকান থেকে বয়াম থেকে চানাচুর কিনে খায়। প্রোডাকশনে তার আলাদা সম্মান। দীপ্ত রায়ের ঘরের লোক বলে কথা। তাকে গাড়ি থেকে নামতে হয় না। ওরাই এনে দেয়।

আগের দিন শ্যুটিং ছিল না। বিরল দিনগুলোর মধ্যে একটা। মেগা সিরিয়ালে প্রায় রোজই কিছু না কিছু কাজ থেকেই যায়।

অভ্যাসমতো অনেক রাত অবধি জেগে ছিল অলকা। তবু ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল তার। বাইরে গরম হলেও ঘর এসির কল্যাণে হিমশীতল। রাতে কম্বল লাগে। আগের বাড়িতে অনেক কষ্টে একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কেনা গেছিল। তাতেও গরম কমত না। ছটফট করতে হত বিছানায় শুয়ে।

অলকা কাচের জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছিল। অনেকেই হাঁটতে বেরিয়েছে। শহরের ঘুম ভাঙছে ধীরে ধীরে।

“না ঘুমালে ডার্ক সার্কেল সামলাতে পারবে?”

দীপ্ত ঘুমের ঘোরে কথাগুলো বলল।

অলকা বলল, “ঘুম ভেঙে গেল।”

দীপ্ত বলল, “কেন? দুঃস্বপ্ন দেখছিলে?”

অলকা বলল, “না। এমনিই।”

দীপ্ত বলল, “আজকে তোমায় কটায় বেরোতে হবে?”

অলকা বলল, “সন্ধে।”

দীপ্ত বলল, “ঘুমিয়ে পড়ো।”

অলকা বলল, “তুমি চা খাবে?”

দীপ্ত বলল, “না। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।”

অলকা বলল, “কী?”

দীপ্ত বলল, “রাগ করবে না তো?”

অলকা বলল, “না না, রাগ করার কী হল, বলো।”

দীপ্ত বলল, “তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আমাকে শিলিগুড়ি যেতে হবে। কালকেই চলে আসব।”

অলকা বলল, “ওহ্‌। তা যাবে।”

দীপ্ত বলল, “ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়েই যাব। তারপর শ্যুটিংয়ের কথা মনে পড়ে গেল।”

অলকা বলল, “আমি গিয়েই বা কী করতাম। কী ব্যাপারে যাচ্ছ?”

দীপ্ত বলল, “একজন টাকা ঢালতে চায় একটা প্রোজেক্টে। ফিল্ম সিটি সহ আর কী সব বানাবে। ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। ওখানকার বিজনেসম্যান। তার সঙ্গেই মিট করতে যাব।”

অলকা বলল, “শিলিগুড়ি আমার মামাবাড়ি। ছোটোবেলা গরমের ছুটি পড়লেই যেতাম। এখন বোধহয় আমাকে দেখলে ...”

দীপ্ত উঠে বসল, “এক-দুটো বছর যেতে দাও। একটা ন্যাশনাল পাও, আর-একটু নাম যশ হোক, তারপর দেখবে শিলিগুড়ি কেন, আরও কত কত জায়গা থেকে তোমার কত মামা কাকা পিসি জন্ম নেবে। তোমাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পাগল হয়ে যাবে। তুমি বরকে ছেড়েছ, কার সঙ্গে শুচ্ছ, এগুলো কোনও কিছুই ম্যাটার করে না, সাকসেস ম্যাটারস।”

অলকা বলল, “আমি এখনও তোমার শোয়ার পার্টনার বলো?”

দীপ্ত অলকার হাত ধরে নিজের পাশে এনে বসাল, “তোমার কী মনে হয়? এখনও এই কথাগুলো মনে হয়?”

অলকা বলল, “কী জানি, ক্রীতদাসী হয়তো। মাঝে মাঝে যেসব ভাষা বলো।”

দীপ্ত বলল, “নিজের লোকেদেরই তো এরকম ভাষা বলা যায়, সন্দেহ করা যায়। সবাইকে কি এগুলো বলা যায়?”

দীপ্তর হাত অলকার শরীরে খেলা করছিল। অলকা ছাড়িয়ে নিল না।

বলল, “তোমরা কীভাবে কল্পনা করে নাও কারও সঙ্গে কথা বললেই মেয়েরা তার সঙ্গে শুয়ে পড়বে? ভাবো কীভাবে? আমি নাহয় নষ্ট মেয়ে, বাকি মেয়েদেরও তাই ভাবো না তোমরা?”

দীপ্তর অস্বস্তি হচ্ছিল, সে কাটাতে চাইল, “সকাল সকাল এসব কথা না বললে হয় না?”

অলকা বলল, “তুমি শুনতে চাও না সকাল সকাল এসব কথা?”

দীপ্ত বলল, “না, সকাল সকাল আদরের কথা বলতে হয়, তোমার শরীরের কথা বলতে হয়।”

অলকা বলল, “শরীরের কথা বলবে? আচ্ছা! তাহলে জেনে রাখো। শরীরে একজন নতুন কেউ আসছে, এইমাত্র দেখলাম, টেস্ট পজিটিভ।”

দীপ্ত চোখ ছোটো ছোটো করে অলকার দিকে তাকিয়ে থাকল।

৪

বাণী ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে দেখলেন বুবকা চুপচাপ বসে আছে। প্রীতিকা খাবার দিচ্ছিল। তিনি বললেন, “বুবকাকেও দিস।”

বুবকা বলল, “এখন খেতে ইচ্ছা করছে না। পরে খাব।”

প্রীতিকা বললেন, “কাল রাতেও তো কিছু খেলে না।”

বুবকা বলল, “খিদে পাচ্ছে না কী করব?”

বাণী বললেন, “বউদির সঙ্গে এভাবে কথা বলে না বুবকা।”

বুবকা মাথা নিচু করে বসে ছিল। সেভাবেই বলল, "সরি।"
বাণী প্রীতিকাকে ইশারা করলেন বুবকাকে খাবার দিতে। প্রীতিকা একটা স্যান্ডউইচ দিল বুবকার সামনের প্লেটে। বুবকা স্যান্ডউইচটা ধরে বসে থাকল।
বাণী বললেন, "তোমার কি খেতে ইচ্ছা করে না? বমি ভাব নেই তো? ডাক্তার সেনকে খবর দেব?"
বুবকা বাণীর দিকে তাকিয়ে স্যান্ডউইচে একবার কামড় দিয়ে সেটাকে প্লেটে রেখে বলল, "না। দরকার নেই।"
বাণী বললেন, "কোথায় কোথায় গিয়ে থাকো, ফোন তোলো না, তোমার কোনও খোঁজ খবর পাই না। এতদিন পরে বাড়ি এলে কাল। এভাবে ঠিক কী চাইছ তুমি?"
বুবকা হাসল। অনেকক্ষণ পরে। তারপর বলল, "আমিও তো বুঝলাম না বৈভবীকে যারা মারল তারা ঠিক কী চাইল!"
বাণী প্রীতিকার দিকে তাকালেন। প্রীতিকা অন্য ঘরে চলে গেল।
বাণী গলা নামিয়ে বললেন, "তুমি একটা অ্যাক্সিডেন্টের দায় বারবার আমার ঘাড়ে কেন ফেলছ বুবকা? আমি কেন এই কাজটা করব? হতে পারে তোমার সঙ্গে ওর রিলেশনে আমাদের ফ্যামিলিতে একটা এফেক্ট পড়ত, কিন্তু তা বলে এরকম কাজ করার কি সত্যি কোনও দরকার পড়ে আমার? বারবার তুমি একটা বাইরের মেয়ের সামনে সিন ক্রিয়েট করছ..."
বুবকা বাণীকে থামিয়ে বলল, "বাইরের লোক মানে? বউদি তো ঘরেরই লোক হয়।"
বাণী বললেন, "শুধু প্রীতিকার সামনে তো তুমি এগুলো বলছ না। গোটা পৃথিবীর লোককে এসব বলে বেড়াচ্ছ। তোমার মাকে দাদাকে তুমি এই চিনেছ? আমার আজকাল ভীষণ ডিপ্রেশন আসে বুবকা, এত পরিশ্রম সব বিফলে যাচ্ছে বলে মনে হয়।"
বুবকা বলল, "কেন? তোমার বড়ো ছেলে আছে তো! একার হাতে সব সামলাচ্ছে তো।"
বাণীর সামনে বুবকা বসে ছিল। বাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে বুবকার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।
কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বললেন, "তুমিও ভালো করে জানো, আমিও ভালো করে জানি, তোমার দাদা এই লাইনের ছেলে নয়। ও পারছে না। একটা মেগা শুরু করল, ওকে আমি ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছিলাম, এখন কয়েকটা উইকেই সেটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওর চাকরি ছাড়ার ডিসিশনটা একটা ব্লান্ডার ছিল সেটা আমার থেকে ভালো করে কেউ বুঝতে পারছে না। দীপ্তরা সব একের পর এক নতুন প্রোডাকশন নামাচ্ছে। যে তিনটে মেগা এখন আমার চলছে সেগুলোও শেষ করতে হবে। তারপর? তুমি যদি প্রোডাকশন না দ্যাখো তাহলে কে দেখবে বুবকা?"
বুবকা বাণীর দিকে তাকাল না। স্যান্ডউইচটা হাতে নিয়ে আবার এক কামড় দিয়ে প্লেটে রেখে বলল, "বৈভবীকে মারল কারা?"
বাণী বুবকার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, "তোমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে তোমার মা মার্ডার করাতে পারে?"
বুবকা বলল, "তুমি সব নাও জানতে পারো। সব কিছু তো স্ট্রেট লাইনে হয় না। ভিতরের গল্পটা আমি যতক্ষণ না জানতে পারছি ততক্ষণ তো কাউকেই বিশ্বাস করতে পারব না।"
বাণী বললেন, "তোমাকে আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, এভাবে কেরিয়ারটাকে নষ্ট কোরো না, যতক্ষণ না তুমি কাজের মধ্যে ডুবে যাবে ততক্ষণ যত উলটোপালটা চিন্তা তোমার মাথায় খেলে যাবে।"
বুবকা হঠাৎ করে উঠে পড়ল। বাণী বললেন, "কোথায় যাচ্ছ?"
বুবকা বলল, "জানি না।"
বুবকা বেরিয়ে গেল।
বাণী মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। প্রীতিকা এসে বাণীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বাণী

হতাশ গলায় বললেন, "চলে গেল।"
প্রীতিকা বলল, "ওর বিয়ে দিয়ে দাও মা।"
বাণী অবাক চোখে প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কি পাগল হয়ে গেলি? একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেব নাকি?"
প্রীতিকা বলল, "তিন্নির সংসারেই তো দেখলাম বখাটে ছেলে বউ আসার পর ভালো হয়ে গেল।"
বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "তুই আবার বাংলা সিরিয়াল কবে থেকে দেখছিস?"
প্রীতিকা অপ্রস্তুত হল, বলল, "মা দ্যাখে তো। বাড়ি থাকলে না চাইতেও দেখা হয়ে যেত।"
বাণী বললেন, "সিরিয়ালের সঙ্গে জীবন মেলে নাকি! আর সেসব মান্ধাতা আমলের ধারণা। এটা ফোর নাইনটি এইটের যুগ। নিয়ে এলাম একটা মেয়েকে, তারপর দিল ঠুকে একটা। হয়ে গেল।"
প্রীতিকা বলল, "গ্রামের মেয়ে নিয়ে এসো।"
বাণী বললেন, "তুই সিরিয়াসলি সিরিয়াল দেখা বন্ধ কর। এসব মাথাতেও আনিস না এখন। বুঝতে পারছিস একে বুবকা এভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, আর-একটা মেয়ে এলে সমস্যাটা কোন জায়গায় চলে যেতে পারে?"
প্রীতিকা থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেল।
বাণী ফোন বের করে তথাগতকে ফোন করলেন। তথাগত ফোন ধরলেই বাণী বললেন, "তুমি কোথায় এখন?"
তথাগত বলল, "ফ্লোরেই আছি। আজ তো অনেকক্ষণের কাজ, কাল তোমায় বললাম না?"
বাণী বললেন, "বুবকা আবার চলে গেছে।"
তথাগত কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, "ওকে, দেখছি।"
বাণী বললেন, "আমি অফিস আসছি। অপেক্ষা করো।"
তথাগত বলল, "আচ্ছা।"
ফোনটা রেখে বাণী প্রীতিকাকে বললেন, "আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না। টিফিন করে দে। নিয়ে যাই।"

৫

অলকার যখন শ্যুট শেষ হল তখন রাত দেড়টা বাজে। গাড়িতে উঠে অলকা ব্যাগ থেকে ফোন বের করে দেখল দীপ্তর দুটো মিসড কল। দুটোই সাড়ে বারোটা নাগাদ।
কল ব্যাক করল সে। দীপ্ত ফোন তুলে বলল, "বিজি ছিলে?"
অলকা বলল, "শ্যুট ছিল তো। তুমি ফিরেছ?"
দীপ্ত বলল, "আমি ভেবেছিলাম স্টুডিও হয়ে ফিরব, কিন্তু খুব টায়ার্ড ছিলাম। হ্যাঁ, ফিরেছি খানিকক্ষণ হল।"
অলকা বলল, "আচ্ছা। বেশিক্ষণ লাগবে না, চলে এসেছি প্রায়।"
দীপ্ত হাসল, "এসো, একটা সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্য।"
অলকা হাই তুলতে তুলতে বলল, "আবার একটা নেকলেস কিনে এনেছ?"
দীপ্ত বলল, "না না, সেসব না। এসো।"
অলকা বলল, "আচ্ছা। আসছি।"
ফোনটা রেখে অলকা জানলার কাচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।
রাতের কলকাতা আর সকালের কলকাতার মধ্যে অনেক তফাত। একটা কাচের নিরাপত্তার আবরণীর মধ্যে থাকা আর বাইরে থাকার মধ্যে কতটা তফাত সেটা একটা মেয়ে না হলে বোঝা সম্ভব না। একটা রাস্তার

ওপরে ঝলমলে পোশাক পরা মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে। ট্যাক্সিতে কয়েকটা ছেলে। মেয়েটাকে ডাকল, মেয়েটা কেমন নেশাগ্রস্তের মতো হাসতে হাসতে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। কোন এক অজানা গন্তব্যে চলে যায় তারা। অলকা রোজ দ্যাখে দৃশ্যগুলো। মন দিয়ে। শরীর কেনা বেচা কেমন অবলীলায় হয়ে যায়। মেকআপে ঢেকে থাকে মেয়েগুলোর অতীত, বাড়ির অবস্থা।

দীপ্ত ছুড়ে ফেলে দিলে কী করত সে? এই মেয়েগুলোরই একজন হয়ে যেতে হত তাকে। মাথাজোড়া অস্বস্তি মেঘের মতো এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করে তাকে প্রতিদিন।

বড়ো বড়ো শপিং মল, দোকানপাট, সব বন্ধ, শুধু বিজ্ঞাপনের আলো জ্বলছে। শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় কয়েকজন যুবকের বাইক, অলকা দেখতে পায় ছেলেগুলোর মধ্যে কী অদ্ভুত উন্মাদনা কাজ করে যায় প্রতিদিন। একে অপরকে হারানোর তীব্র নেশা, প্রবল গতিতে উল্লাস করতে করতে তাদের যাওয়া দেখতে দেখতে অলকার মনখারাপ হয়ে যায়। মেয়ে হয়ে জন্মানো বোধহয় একটা অভিশাপ। এটা কোরো না, সেটা কোরো না, ওখানে যেয়ো না, এখানে যেয়ো না, সন্ধের পরে তো বাইরে বেরোনোর প্রশ্নই নেই। নাচা যাবে না সবার সামনে, তা নাকি আসলে অঙ্গ প্রদর্শনী। অলকার মাঝে মাঝে জীবনের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য জন্মায়।

অ্যাপার্টমেন্টের লিফটে যখন উঠল তখন তার ঘুমে চোখ বুজে আসছিল। কোনওমতে ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে বেল বাজাল। দীপ্ত দরজা খুলল। সিগারেট খাচ্ছিল। অলকা জুতো খুলতে খুলতে বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

দীপ্ত বলল, "নাহ।"

অলকা ড্রয়িং রুমে ঢুকে অবাক হল। একটা মেয়ে চুপচাপ বসে ছিল। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। সে অবাক চোখে দীপ্তর দিকে তাকাল। দীপ্ত বলল, "সারপ্রাইজ।"

অলকা মেয়েটাকে দেখল। কেমন একটা উগ্র সাজ, কিন্তু চোখ মুখে এক অদ্ভুত সারল্য খেলা করছে। সে দীপ্তকে বলল, "বুঝলাম না এখনও।"

দীপ্ত সিগারেটে একটা টান মেরে বলল, "তেমন কিছু না, ওর নাম রিমি, শিলিগুড়ি থেকে ওকে নিয়ে এসেছি। এখানে কদিন থাকবে।"

অলকা বলল, "থাকবে মানে?"

দীপ্ত হাসল, "ওই যে তোমায় বলেছিলাম না খুব প্রভাবশালী একজনের সঙ্গে মিটিং ছিল, তিনিই রিমিকে গিফট দিয়েছেন আমাকে কয়েকদিনের জন্য।"

অলকার মাথা কাজ করছিল না। সে বলল, "তাহলে আমি এখন কী করব? চলে যাব?"

দীপ্ত বলল, "তুমি চলে যাবে কেন? কদিন অন্য বেডরুমটায় শোবে। বা আমরা একটা খাটেই তিনজন শোব। খুব কষ্ট হবে?"

অলকা কয়েক সেকেন্ড দীপ্তর দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

দীপ্ত বলল, "চেঞ্জিং সেক্স পার্টনার ইজ নেসেসিটি অলকা। এর মধ্যে অবাক হবার কী আছে। তুমি আবার টিপিক্যাল বাঙালি বউদের মতো রিঅ্যাক্ট করছ কেন?"

অলকা সোফায় গিয়ে বসল মেয়েটার পাশে। মেয়েটা কী একটা পারফিউম দিয়েছে। গন্ধটা মিষ্টি। অলকা বলল, "তুমি কি এই একটা ড্রেস পরেই এসেছ?"

মেয়েটা বলল, "আমার আরও ড্রেস আছে।"

অলকা বলল, "আমার কিছু শাড়ি আছে, চাইলে পরতে পারো।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল।

অলকা দীপ্তকে বলল, "আমি অন্য বেডরুমে শিফট করে যাচ্ছি।"

দীপ্ত কয়েক সেকেন্ড অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি রাগ করেছ?"

অলকা ম্লান হাসল, “রাগ করার অধিকার প্রসদের নেই। আমারই ভুল ছিল। অনেকদিন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি প্রস আমি প্রস বলা হয়নি। খুব ভুল করে ফেলেছি। তাহলে এখন এই শকটা লাগত না হয়তো।”
দীপ্ত বলল, “তুমি আবার সেই বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে বসে আছ?”
অলকা বলল, “খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিই। তুমি খেয়ে এসেছ?”
দীপ্ত বলল, “না। রিমিও খাবে কিন্তু।”
অলকা উঠল, “হয়ে যাবে।”
অলকার হাসি কান্না কিছুই পাচ্ছিল না। সে রোবটের মতো খাবার সার্ভ করছিল। মেয়েটা কেমন ভয় ভয় চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।
অলকার হঠাৎ মেয়েটার জন্য এক অদ্ভুত মায়া হল। কেন হল, সে নিজেও বলতে পারবে না হয়তো।

৬

খাসির চর্বি আনা হয়েছে। সেটাকে ঝাল ঝাল করে পেঁয়াজ দিয়ে বড়া বানানো চলছে। এক-একটা ইনস্টলমেন্টে চারটে করে বড়া দিয়ে যাচ্ছে শেফালি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।
পিকলু পেগ বানাচ্ছে। ওল্ড মংক। একটা সাড়ে সাতশোর বোতল আনা হয়েছে।
সেটা থেকে একটু একটু করে মদ ঢেলে দিচ্ছে সে।
বুবকা চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। শুভ পিকলুর চৌকিতে টানটান হয়ে শুয়ে আছে। টিভিতে বাংলা সিনেমার গান চলছে। বুবকা মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করে গালাগাল করছে।
ঘরটা ছোটো। পাশেই রান্নাঘর। খানিকক্ষণ পরে খাসির মাংস বসবে।
শুভ বলল, “কে খাওয়াচ্ছে আমায় আমিই জানি না। পিকলু তোর খাতায় কত টাকা হল বল তো?”
পিকলু বলল, “তুই খা ভাই। কেন এসব কথা তুলিস। বুবকাদা যতদিন আছে, এই ঠেকে টাকার অভাব নেই।”
শুভ বলল, “বুবকাদা, আপনি আমার সেলাম নেবেন। উইথ সংগ্রামী অভিনন্দন।”
বুবকা বলল, “ওরকম শুয়ে না থেকে বসে খাও না। এভাবে জমে নাকি?”
শুভ বলল, “কী করব গুরু, মদ খেলেই আমার হেব্বি ঘুম পায়। কিছুতেই জেগে থাকতে ইচ্ছা করে না।”
বুবকা বলল, “তুমি শালা আমার মতোই মরা মাল। বেঁচে থাকলেও হয় না থাকলেও হয়।”
শুভ বলল, “তা যা বলেছ। আমার বউ দীপ্ত রায় তুলে নিয়ে গেছে আর তোমার বউ মরেই গেছে।”
পিকলু শুভকে ইশারায় এই নিয়ে কিছু বলতে বারণ করল, শুভ তাতে রেগে গিয়ে বলল, “তুই আবার আমাকে ইশারা করছিস কেন ভাই? মালের ঠেকে আবার সেন্সর বসাবি নাকি? তুই জানিস বউ চলে যাবার পর আমার বাড়িতে কী অশান্তি রোজ! রাস্তায় বেরোতে পারি না, পাড়ায় কোথাও যেতে পারি না। সব বানচোদ এমনভাবে আমার দিকে তাকায় মনে হয় পায়ের জুতো খুলে মারি সবকটাকে। বাঁড়া বউ সামলাতে পারি না, সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে পারলে আমার বাঁড়াটাকে পরীক্ষা করে। বউকে ঠান্ডা করতে পারে না নিশ্চয়ই যন্তরটা!”
পিকলু সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, “আহ, কী সব বলছিস ভাই।”
বুবকা চর্বির বড়া খেতে খেতে হাত দিয়ে পিকলুকে ঠেকাল, “ওকে বলতে দে। বললে কষ্ট কমে।”
শুভ উঠে বসল, “কী বললে? কষ্ট? কষ্ট কোথায়? ও খানকি গেছে, আমার কোনও কষ্ট নেই। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সারাদিন খুব গরমের পর বৃষ্টি নামলে মনটা ওর জন্য খারাপ হয় বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তখন তো পিকলুর থেকে টাকা ধার নিয়ে ওই নেপালি মেয়েটার কাছে চলে যাই। কিন্তু ভাবো, কত বড়ো অপমান!

বাঁড়া বর আছে ওদিকে মাগি অন্য লোককে লাগাতে চলে যাচ্ছে!"
শেফালি বড়া নিয়ে এসেছিল। শুভ ঠোঁটে আঙুল দিল। শেফালি বড়াগুলো প্লেটে ঢালতে ঢালতে বলল, "শুভদা, তুমি বরং একটা বিয়ে করে নাও। এভাবে একা একা কতদিন ঘুরবে বলো তো?"
শুভ বলল, "কে বিয়ে করবে আমায় বউদি? চাকরি নেই বাকরি নেই, নিজের খাওয়া জোটানোর ক্ষমতা নেই। বউয়ের টাকায় খেতাম। আমায় কেউ মেয়েও দেবে না, কোনও মেয়ে বিয়েও করবে না।"
শেফালি বলল, "এ কেমন কথা বল তো! পুরুষমানুষ, এত পরের উপর তাকিয়ে থাকলে চলে? কত দিন লাগবে তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে?"
শুভ হাসতে লাগল। হাসিটা সুস্থ মানুষের নয়। হাসতে হাসতে বলল, "পা ভেঙে গেছে আমার। নিজের পায়ে আর দাঁড়ানো হবে না।"
শেফালি রান্নাঘরে চলে গেল। শুভ বলল, "ভাই পিকলু, ওই টিভিটা বন্ধ কর তো। এই টিভিটাই সব কিছু খেয়ে নিচ্ছে। মানুষের ঘর সংসার সব খেয়ে নিল হারামজাদা।"
বুবকা বলল, "হ্যাঁ বন্ধ করে দে। ও চলার দরকার নেই। আমারও বিরক্ত লাগছে।"
পিকলু টিভি বন্ধ করে দিল। শুভ বলল, "বুবকাদা, তুমি বরং একটা বিয়ে করে নাও।"
বুবকা শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, "বিয়ে করে কী করব?"
শুভ বলল, "কেন? সংসার করবে! তোমার কী গেছে? কিছুই যায়নি। মেয়ে আসে, মেয়ে যায়। এই বয়সে ওইসব ভাবলে হবে বলো?"
বুবকা কিছুক্ষণ জ্বলন্ত চোখে শুভর দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর তার দৃষ্টি নরম হয়ে এল। পিকলু ভয়ে ভয়ে বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর কথায় কিছু মনে কোরো না গুরু, খ্যাপা তো একটা।"
বুবকা হাসল, "সবাই আমাকে জ্ঞান দেবার সময় এই একই কথা বলে কেন?"
শুভ বলল, "কথাটা সত্যি বলে। আমি তো তোমার জায়গায় থাকলে বিয়ে করে নিতাম।"
বুবকা বলল, "আমি যদি তোমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দি, পেট চালানোর ব্যবস্থা করে দি, তাহলে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করবে?"
শুভ চোখ পিটপিট করে বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই তো কঠিন প্রশ্ন করে দিলে।"
বুবকা গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, "বলো বলো, কঠিন প্রশ্ন কেন হবে। সোজা প্রশ্ন তো। সলিউশনটা তো তুমিই বলেছিলে ভুলে গেলে?"
শুভ বলল, "আমি যেদিন ওই দীপ্ত রায়ের মাথা ফাটাব, শুয়োরের বাচ্চাকে ধরে রাস্তায় ফেলে গাঁড় ক্যালানি দেব, তারপর আমার শান্তি হবে। তার আগে না।"
বুবকা বলল, "আহ, তুমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ তো। প্রশ্নটা তো এটা ছিল না। শুধু বলো বিয়ে করবে, না করবে না?"
শুভ কয়েক সেকেন্ড বুবকার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি গুরু জাতে মাতাল তালে ঠিক। একদম যন্তর পিস আছ।"
বুবকা বলল, "করবে না করবে না?"
শুভ বলল, "ভেবেছিলাম ওর গয়নাগুলো বিক্রি করব। রোজ আলমারি খুলি, মনে পড়ে যায় কোথাও বিয়েবাড়ি থাকলে কী যত্ন করে সেগুলো পরত। আবার লকারে রেখে দি সেগুলো। চুরি হয়ে যাক বরং। আমি আর ওগুলো বিক্রি করতে পারব না!"
বুবকা হাসতে হাসতে উঠল। পিকলু অবাক হয়ে বলল, "কোথায় যাচ্ছ? মাংস খেয়ে যাবে না?"
বুবকা বলল, "আগে যাবার জায়গা ছিল। এখন নিজেই জানি না কোথায় যাব!"

নতুন সিরিয়ালের প্লট খোঁজা হচ্ছে। একজন নতুন গল্পকার সম্প্রতি রিক্রুট হয়েছে। তথাগত তার সঙ্গে বসেছে। অফিসে তার একটা চেম্বার হয়েছে।
ছেলেটা নতুন এসেছে লাইনে। তথাগত বলল, "তাহলে তুমি পারিবারিক গল্প ভাবছ না?"
ছেলেটা বলল, "না। পারিবারিক গল্প বা এই লাইনের বাইরে নতুন কিছু ভাবলে হয়তো ব্যাপারটা ভালো দাঁড়াবে। একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে এই ডেইলি সোপের গল্পগুলো।"
তথাগত উৎসাহিত হল, "কেমন লাইনে ভাবছ একটু বলো তো।"
ছেলেটা বলল, "আমি একটু ইংলিশ টিভি সিরিজগুলোর থেকে ইনস্পিরেশন নিয়ে নতুন কিছু কাজ করার কথা ভাবছি।"
তথাগত চোখ বড়ো বড়ো করল, "গেম অফ থ্রোনস?"
ছেলেটা হাসল, "না না, খেপেছেন? লোক হাসাতে কে চায়? আমি ভাবছি ধরুন টু অ্যান্ড হাফ মেন সিরিজটা। বিপত্নীক বাবার সঙ্গে থাকে ছেলে, আর কাকা। বাবা, কাকার দুজনেরই ছুকছুক আছে। এদিকে ছেলেও ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। এই কনসেপ্টে গল্পটা এগোবে।"
তথাগতর মুখে হাসি ফুটল, "সাউন্ডস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। আমার বেশ ভালো লাগছে। তুমি একটা পার্ট আমাকে লিখে দেখাতে পারবে?"
ছেলেটা মোবাইল বের করে বলল, "বলছি।"
তথাগত বলল, "হ্যাঁ বলো।"
দরজায় কে নক করল। তথাগত বলল, "কে?"
তরুণ দাস। ডিরেক্টর। তথাগত খুশি হল, "ওহ, কাকু, ভালো সময়ে এসেছ। বসো বসো, একটা নতুন গল্প শোনো।"
তরুণবাবু ছেলেটিকে দেখতে দেখতে বসলেন। তথাগত বলল, "দ্যাখো কাকু, অনেক তো ফ্যামিলি ড্রামা হল। ওর নাম দীপ্তানুজ, একটা দারুণ আইডিয়া নিয়ে এসেছে। বলছে অনেক তো ফ্যামিলি ড্রামা হল, এবার নতুন কিছু হোক।"
তরুণ বললেন, "নতুন কিছু মানে?"
তথাগত বলল, "মানে ফ্যামিলি না। ধরো এই যে ও যে কনসেপ্টটা বলছে। একজন বিপত্নীক বাবা এবং তার ছেলে, ভদ্রলোকের ভাই, এই নিয়ে একটা পরিবার। এবার বাবা কাকা দুজনে প্রেমে পড়বে, ছেলে সেই প্রেমগুলোর বারোটা বাজাবে, এরকম কনসেপ্টে একটা সিরিজ চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে।"
তরুণ ছেলেটার দিকে একবার, তথাগতর দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "ফ্যামিলি এস্টাব্লিশ না করতে পারলে বাঙালি মা বোন ওই জিনিস দেখবেই না। মনে রেখো আমাদের দর্শক ওরাই। ওই একই মেলোড্রামার বাইরে যখনই তুমি যাবে, তারা চ্যানেল ঘুরিয়ে দেবে। কত সিরিয়াল চলে রোজ। ওই একই সময়। তারা কেন তোমার চ্যানেল দেখবে?"
তথাগত বলল, "দেখবে মানে? আমরা তো একই জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে তাদেরও হেজিয়ে দিচ্ছি। চেষ্টা তো একটা করতেই পারি।"
তরুণ বললেন, "চেষ্টা করতে গিয়ে মার্কেটটা যদি হাত থেকে চলে যায়? কই, বাকি কোনও প্রোডাকশন হাউজ কি এই চেষ্টা করছে? দীপ্ত রায় এখন তোমার মতো রিস্ক নেবে? মনে তো হয় না!"
তথাগত বলল, "যদি হিট করে যায়? তখন?"
তরুণ মাথা নাড়লেন, "কিছুতেই হিট করবে না। পাবলিক ওই প্যানপ্যানানিই খাবে। চেষ্টা তো একটা হয়েছিল কমেডি শো-র। তুমি তো নতুন কিছু করছ না। দাঁড়াল কই? এক মাসও চালানো গেল না। কেউ দেখলও না। মানুষ যতক্ষণ না নিজের সঙ্গে রিলেট করতে পারে, ততক্ষণ সে জিনিস দ্যাখে না। কারা

তোমার দর্শক সেটা তো তোমাকে আগে ঠিক করতে হবে।”
তথাগত বলল, “অন্য সময় দেখাব। ধরো রাত দশটায়। বাড়ির সবাই মিলে টিভির সামনে তখন।”
তরুণ হাসলেন, “তুমি চাইলেই যে-কোনো সময় স্লট পেয়ে যাবে?”
তথাগত আমতা আমতা করতে করতে বলল, “চেষ্টা করব।”
তরুণ বললেন, “তোমার মার সঙ্গে কথা বলো বুঝলে? এখন এসব রিস্ক নিতে যেয়ো না। সেই একই গল্প, বাড়িতে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে আর দেওর ননদ সব চেষ্টা করছে সে রান্না নষ্ট করতে, ওই গল্পই চালিয়ে যাবার গল্প লিখতে বলো। আমারও বোর লাগে, আমারও বিরক্তি আসে। কিন্তু আমিও জানি, ওর বাইরে গেলেই হাতের রিমোটটি নিয়ে ঠিক চ্যানেল চেঞ্জ করে দেবে দর্শক। আচ্ছা আমি যাই, ফ্লোর রেডি হয়ে গেছে এতক্ষণে।”
তরুণ আর বসলেন না। তথাগত তরুণের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল গম্ভীর মুখে।

৮

অলকার ঘুম ভাঙল দীপ্ত দরজা নক করার পর। তখন সকাল নটা বেজে গেছে। অনেকদিন একা শোয়ার অনভ্যাসে প্রথম দিকে ঘুম আসছিল না। শেষরাতে ঘুম এল। ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেখল দীপ্ত বাইরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অলকা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। আফটারশেভ লোশনের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। দীপ্ত ঘরে ঢুকে বলল, “দিস রুম নিডস প্রপার ক্লিনিং। অনেক দিন আসা হয় না।”
অলকা বলল, “করে নেব। তুমি কোথায় যাচ্ছ?”
দীপ্ত বলল, “আমাকে এখনই সল্টলেক যেতে হবে। একটা মিটিং আছে। তুমি কখন বেরোবে?”
অলকা বলল, “বিকেলে।”
দীপ্ত এসে অলকাকে জড়িয়ে কানে কানে বলল, “দ্যাট গার্ল ইজ গুড, বাট নট অ্যাজ গুড অ্যাজ ইউ। ইউ আর দ্য বেস্ট।”
অলকা দীপ্তকে ছাড়িয়ে নিল না। সে বলল, “জানি। আই অ্যাম দ্য বেস্ট প্রস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। তাই না?”
দীপ্ত অলকাকে ছেড়ে দিল। বলল, “একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। ক্লিনিক ঠিক হয়ে গেছে। ডাক্তারও। মেডিসিনে অ্যাবর্ট করা যায় নাকি প্রথমে দেখা যাবে। নইলে ছোট্ট একটা প্রসেস। একটু কষ্ট হবে। একদিনে ফিট হয়ে যাবে।”
অলকা দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, “আচ্ছা। বোলো কবে যেতে হবে। কত সহজ সবকিছু, বলো?”
দীপ্ত অলকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, “এলাম। তুমি যখন শ্যুটে বেরোবে সে সময়টা রিমি ফ্ল্যাটেই থাকবে। তালা দিয়ে যাবার দরকার নেই।”
দীপ্ত বেরিয়ে গেল।
অলকা ঘর থেকে বেরোল। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করল। একটু ইতস্তত করে দীপ্তর বেডরুমে ঢুকল।
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ঘরটাকে হিমশীতল করে রেখেছে। মেয়েটা ঘুমাচ্ছে চাদর মুড়ি দিয়ে। মাঝে মাঝে শিউরে শিউরে উঠছে। অলকা এসির তাপমাত্রা বাড়াল। মেয়েটার ঘুম ভেঙে গেল। তাকে দেখে প্রথম কথা বলল, “তোমাকে না আমি চিনি। সিরিয়ালে দেখেছি।”
অলকা হাসল, “রাতে ঘুম হয়নি?”
রিমি উঠে বসে আবিষ্কার করল সে কিছু পরে নেই। অলকা দেখল মেঝেতে মেয়েটার সব পোশাক পড়ে আছে। সে কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটাকে দিল। রিমি কোনওমতে উর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে বলল, “শেষরাতের দিকে ঘুমাতে পারলাম।”

অলকা বলল, "তুমি ঘুমের ঘোরে শিউরে উঠছিলে কেন?"
রিমি অবাক হয়ে বলল, "শিউরে উঠছিলাম?"
অলকা বলল, "হ্যাঁ।"
রিমি জানলার বাইরে তাকাল, "একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা ঘরে আমাকে জোর করে তিন-চারজন ঢুকিয়ে দিল... স্বপ্ন না অবশ্য, এখন ওই সব কিছুই স্বপ্নে ফিরে আসে রোজ।"
অলকা বলল, "কী হয়েছিল তোমার?"
রিমি অনির্বাণের ঘটনাটা জানাল। অলকা বলল, "তোমার বাড়ি কলকাতাতেই?"
রিমি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"
অলকা বলল, "বাড়ি গেছিলে?"
রিমি বলল, "হ্যাঁ। অনেক কষ্টে ফিরেছিলাম। মা কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দিল না।"
অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "মেয়েদের কোনও বাড়ি নেই। বাড়ি হয় না। তোমাকে কি রোজই কারও না কারও সঙ্গে শুতে হয়?"
রিমি হাসল, "এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাকেও শুতে হয়?"
অলকা রিমির দিকে তাকাল। রিমির মুখটা কেমন সহজ সরল। সে বলল, "এখনও হয়নি। হবে হয়তো। ওই যে বললাম না, মেয়েদের কোনও ঘর হয় না।"
রিমি বলল, "তুমি এখানে থাকো?"
অলকা বলল, "আপাতত।"
রিমি বলল, "আমাকে রুবেলদা বলেছে ইনি নাকি বিরাট ক্ষমতাবান লোক। ইনি কি কোনও নেতা?"
অলকা হাসল, "ক্ষমতাবান হবার জন্য সবসময় নেতা হবার দরকার পড়ে না। অনেকে অনেকভাবেই ক্ষমতাবান হতে পারে। রুবেলদা কে?"
রিমি বলল, "দালাল। এই ভদ্রলোক যেখানে গেছিলেন আমি সেখানে ছিলাম। ওখান থেকেই আমাকে নাকি ওঁকে গিফট করা হয়। কতদিন কলকাতায় থাকতে হয় কে জানে। আমার কলকাতায় থাকতে ভালো লাগে না। এখানে থাকলেই শুধু বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে। কতবার হয়েছে বারবার বাড়ির সামনে দিয়ে ট্যাক্সি করে গেছি কিন্তু গাড়ি থেকে নামতে পারিনি।"
অলকা বলল, "বাড়ি গিয়ে কী করবে?"
রিমি বলল, "ছোটোবেলায় যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম, প্রথম প্রথম ভীষণ উৎসাহ নিয়ে যেতাম। তারপর যত দিন এগোতে থাকত, বাড়ির জন্য ভীষণ মনখারাপ শুরু হত। শুধু ভাবতাম কখন গিয়ে নিজের ঘরে পৌঁছোতে পারব। এখন সেই ঘরটাই নেই।"
অলকা বলল, "ছেলেটার সঙ্গে কোনও দিন দেখা হয়েছিল?"
রিমি বলল, "হ্যাঁ। দার্জিলিং গেছি এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ষাটের ওপর বয়স। মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি একা একা ঘুরছি, হঠাৎ ম্যালে দেখা। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর যা একটা দৌড় দিল, আমি কোনও দিন ভুলব না।"
রিমি হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতেই কেঁদে দিল।
অলকা রিমির কাছে গিয়ে ওর হাত ধরল, "চলো খেয়ে নেবে। কেঁদো না। যার তার জন্য চোখের জল নষ্ট করতে নেই।"

বাণী অফিসে এসে ফ্লোরে যাবার জন্য বেরোচ্ছিলেন। তথাগত এসে বলল, "একটু কথা আছে।"
বাণী বললেন, "চলো। ফ্লোরে যেতে যেতে শোনা যাক।"
তথাগত বলল, "এখানে বলে নিই।"
বাণী দেখলেন তথাগতর মুখ থমথমে। বললেন, "কী হল? আবার কিছু হয়েছে নাকি? বুবকার খোঁজ পেয়েছ?"
তথাগত বলল, "না, বুবকা রিলেটেড না।"
বাণী বললেন, "বুবকার খোঁজ পেয়েছ?"
তথাগত মুখ কুঁচকাল, "হ্যাঁ, কোন এক বস্তিতে মদ খেয়ে পড়ে আছে।"
বাণী বললেন, "ওকে বাড়ি আনার কী ব্যবস্থা করেছ?"
তথাগত বলল, "কীভাবে বাড়ি আনব ওকে? এখন একটু ডিস্টার্বড আছে। আবার নেশা কাটলেই চলে আসবে!"
বাণী বললেন, "ওর কাছে টাকা আছে তো?"
তথাগত অবাক হয়ে বলল, "টাকা দিয়ে কী করবে ওকে? যত টাকা দেবে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে।"
বাণী ঠান্ডা গলায় বললেন, "উড়াক, ওর যেন টাকার সমস্যা না হয়।"
তথাগত বলল, "কী যে বলো আমি বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে।"
বাণী বললেন, "বুঝতে হবে না। তোমার কথা হয়ে গেছে? আর কিছু বলবে?"
তথাগত বলল, "আমি তো বুবকাকে নিয়ে কিছু বলতে ডাকিনি তোমায়।"
বাণী বললেন, "তবে? কী ব্যাপারে ডাকলে?"
তথাগত বলল, "দীপ্তানুজকে চেনো তো! যাকে রিক্রুট করা হল।"
বাণী বললেন, "হ্যাঁ। কী হল ওর?"
তথাগত বলল, "ও একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছিল।"
বাণী বললেন, "ভালো তো তরুণকে শোনাও।"
তথাগত বলল, "সেটা বলতেই তো গেলাম। আমার মনে হয় ওঁকে এবার রিপ্লেস করার সময় হয়ে এসেছে।"
বাণী বললেন, "কাকে? দীপ্তানুজকে?"
তথাগত একটু ইতস্তত করে বলল, "না। তরুণ কাকাকে।"
বাণী কয়েক সেকেন্ড তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ তুমি কী বলছ? এই সময়ের সবথেকে সফল মেগা ডিরেক্টরকে রিপ্লেস করার কথা বলছ? তুমি কি ভেবেছ ওঁর কাজের অভাব হবে? দীপ্ত রায় তো লুফে নেবে।"
তথাগত অধৈর্য গলায় বলল, "নিক না লুফে। লুফে নিক। কী হবে? সেই তো একই বোরিং সিরিয়াল আর একইভাবে সব চালিয়ে যাচ্ছে। কোনও ক্রিয়েটিভিটি নেই, কিচ্ছু নেই। দ্যাখো না, আমি তো ভেবেই রেখেছি, একদম ফ্রেশ ব্লাড নিয়ে আসব।"
বাণী ঠান্ডা গলায় বললেন, "তুমি আগে প্রসেসটা বোঝার চেষ্টা করো। শুরুতেই সব চেঞ্জ করার কথা ভেবো না।"
তথাগত বলল, "আর কদিন লাগবে বুঝতে? ছমাস হল তো!"
বাণী বললেন, "ষোলো বছরে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না আর তুমি ছমাসেই শিখে যাবে?"
তথাগত বলল, "কেন পারব না? আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ-ও করেছি। তোমাদের আগে ধরতে পারব এটাই তো ন্যাচারাল, তাই না?"

বাণী কয়েক সেকেন্ড তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহ। তা নিজে থেকে একটা কিছু সেট আপ করার চেষ্টা করলেই তো পারতে। একটা অলরেডি এস্টাব্লিশড এস্টাব্লিশমেন্টকে এদিক সেদিক করার জন্য তো ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানেজমেন্ট না পড়লেও হয়।"
তথাগত বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না, তরুণকাকা খুব কনজারভেটিভ মাইন্ডেড লোক। ওঁকে দিয়ে হবে না।"
বাণী বললেন, "আমি সব বুঝতে পারছি। এতদিন ওঁকে দিয়েই তো হয়ে এসেছে। আমি কতটা দেখি? আজ ভেলভেট পিকচারস যে জায়গায় এসেছে তা উনি ছিলেন বলেই। জায়গাটা ধরে রাখতে শেখো।"
তথাগতর জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। সে আর কিছু বলছিল না।
বাণী বললেন, "তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে?"
তথাগত মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"
বাণী বললেন, "আগে সবকিছু শেখো। স্ক্রিপ্ট রাইটিং থেকে লাইট, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যা যা লাগে। তারপর পরের ধাপ ভাবো। তোমার থেকে আমি অনেক ঠান্ডা মাথা এক্সপেক্ট করেছিলাম। তুমি যে কাজগুলো এখন করছ সেগুলো তো বুবকা করত। তুমি হঠাৎ করে ওর মতো বিহেভ করছ কেন? ফিলিং আনকমফরটেবল? এখন কি চাকরি ছাড়ার জন্য মনখারাপ লাগছে? যাই হোক, যা করবে ভেবে করবে। ঠান্ডা মাথায় করবে। আমি এলাম।"
বাণী বেরোলেন।
তথাগত গম্ভীর মুখে বসে রইল।

১০

"খুব মাথা ধরেছে, কী করা যায়?"
"গেলো আরও। গিলে যাও।"
"কী করব? অভ্যাস হয়ে গেছে কেমন একটা। তোমাকে আদর করাটাও যেমন একটা অভ্যাস।"
"বুঝেছি, বুঝেছি। এসো। এখানে শোও। মাথা টিপে দিচ্ছি।"
"এটাই তো চেয়েছিলাম। এর জন্যই মনে হয় আরও আরও মদ খেয়ে তোমার কাছে আসি।"
"বেশি শয়তানি করলে কিন্তু মাথার জায়গায় গলাটা টিপে দেব, বুঝলে?"
"তাই দাও। তোমার হাতে মৃত্যুও সুন্দর।"
"পাগল।"
কে একজন ডাকছে। বুবকার ঘুম ভেঙে গেল।
চোখ খুলে বুঝল এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল।
শেফালি তাকে ডাকছিল।
সে বিরক্ত গলায় বলল, "ডাকাডাকি শুরু করলে কেন হঠাৎ করে? কী হল?"
শেফালি বলল, "কে এসেছে দ্যাখো।"
শেফালির গলা সন্ত্রস্ত।
বুবকা উঠল। বলল, "কে এসেছে? এই ঘরে নিয়ে এসো।"
শেফালি বলল, "বাইরে যাও।"
বুবকা বলল, "আরে আনো তো। কিচ্ছু হবে না।"
শেফালি বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পরে বাণী ঢুকলেন। বাণীর পিছনে ইদ্রিশ দাঁড়িয়ে। বুবকা অবাক হয়ে বলল, "যাব্বাবা। তুমি এখানে কেন এলে?"

বাণী পিকলুর ঘরটা দেখছিলেন। খাটের একদিকে শুভ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। বুবকা উঠে বসে আছে। ঘরের এক কোণে ফাঁকা মদের বোতল। ঘরময় সিগারেট, মদ আর মাংসের গন্ধ। বাণী সবটা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুবকাকে বললেন, "তোমাকে নিতে এলাম।"

বুবকা বলল, "সে তো একটা ফোন করলেই হত। এখানে আসার কী দরকার ছিল?"

বাণী বললেন, "দেখতে এলাম বাড়ি না গিয়ে তুমি কোথায় কোথায় পড়ে থাকো।"

বুবকা ঘড়ি দেখল। রাত দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। বলল, "স্টুডিও থেকে এলে?"

বাণী বললেন, "হ্যাঁ।"

বুবকা বলল, "এ জায়গার সন্ধান তোমায় কে দিল? দাদার খোচর?"

ইদ্রিশ কথাটা শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাণী সেদিকে না তাকিয়েই বললেন, "ধরে নাও তাই।"

বুবকা বলল, "বাহ। সকাল বিকেল আমাকেই নজর রেখে চলেছে সব। নিজেকে ভিআইপি মনে হচ্ছে তো।"

বাণী বললেন, "এখানেই সব কথা বলবে? তুমি কি চাও এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকি? বাড়ি চলো।"

বুবকা বলল, "আমি কোথায় থাকি দেখতে যখন এসেছ তখন থাকতে সমস্যা কী?"

বাণী বললেন, "কোনও সমস্যা নেই। তুমি ভুলে গেছ আমরা একসময় কোথায় কীভাবে থাকতাম?"

বুবকা বলল, "কেন ভুলব? আমার তো মনে হয় তোমরাই সব ভুলে গেছ।"

বাণী বললেন, "আমার স্মৃতিশক্তি অতটা খারাপ না বুবকা। তুমি বরং সেটা মনে করে দেখো।"

বুবকা বলল, "তুমি কি সেই বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছ?"

বাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেই বাড়িতে যদি যাওয়া যেত তাহলে হয়তো আমিও সেখানেই ফিরে যেতাম।"

বুবকা উঠল, "চলো, বাড়িই যাই। নিতে এসেছ এটাই বিরাট ব্যাপার।"

বুবকা খাট থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বাণী এগিয়ে এসে বুবকাকে ধরলেন।

বুবকা বাধা দিল, "ধরতে হবে না। পড়তে পড়তে ওঠার অভ্যাস হয়ে গেছে কাউকে ছাড়াই।"

পিকলু এসে গেছিল, বাণীকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল। বুবকা বলল, "আসছি ভাই। পরে আবার আসব।"

বাণী পিকলুকে দেখলেন। কিছু বললেন না।

পিকলুদের বস্তি থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা রাস্তা হাঁটতে হয়। পিকলু গোটা পথ তাদের সঙ্গে এল। তারা গাড়িতে উঠলে গাড়ি স্টার্ট দিল।

বুবকা বলল, "তুমি শুধুই দেখতে এসেছিলে আমি কোথায় পড়ে থাকি?"

বাণী বললেন, "আরও একটা কারণ আছে।"

বুবকা বলল, "কী? সেটাই তো জানতে চাইছি।"

বাণী বললেন, "সিপির সঙ্গে দেখা করেছি আমি। স্পেশাল রিকোয়েস্ট করেছি বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টটার যেন নতুন করে ইনভেস্টিগেশন হয়।"

বুবকা বলল, "হঠাৎ? এত তৎপরতা? কেন?"

বাণী বললেন, "তুমি আমার ছেলে বলে।"

বুবকা বলল, "হঠাৎ করে বেশি কনসার্ন দেখালে বুঝতে হয় কিছু না কিছু ব্যাপার আছে, তাই না?"

বাণী বললেন, "বেশি কনসার্ন না দেখালে সমস্যাটা বাড়ছে যে, সেটা মেনে নি কী করে?"

বুবকা বলল, "এতদিন পরে তোমার হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

বাণী বললেন, "তোমার হচ্ছে বলে।"

বুবকা বলল, "এর বিনিময়ে আমাকে কী করতে হবে?"

বাণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "কাল থেকে অফিসে আসতে হবে। ফ্লোরের কাজ দেখতে

হবে। এবং আমাদের আপকামিং মেগায় লিড রোল করতে হবে।”
বুবকা উত্তর দিল না। চুপ করে থাকল।

১১

“কত দিন পর আমরা বাইরে বেরোলাম?”
প্রীতিকা ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করল।
তথাগত অর্ডার দিচ্ছিল। ওয়েটার চলে যেতে বলল, “ভুলে গেছি।”
প্রীতিকা বলল, “সবই ভুলে যাচ্ছ বোধহয়। তারপর, চাকরি ছাড়ার পর কেমন লাগছে মিস্টার মিত্র?”
তথাগত মুখ বিকৃত করল, “জঘন্য। মনে হচ্ছে বিরাট একটা ভুল করে ফেললাম, মার পাশে থাকার মতো এখানে অনেক লোক আছে। ক্রাউড বাড়ানো ছাড়া কিছুই করলাম না মনে হচ্ছে।”
প্রীতিকা একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলল, “তরুণ দাস?”
তথাগত অবাক হল, “তুমি কী করে জানো?”
প্রীতিকা বলল, “শুনেছি অনেক কিছু।”
তথাগত বলল, “শুনেছ মানে? কী শুনেছ?”
প্রীতিকা বলল, “তোমার শুনতে ভালো লাগবে না, কী দরকার শুনে? বাদ দাও।”
তথাগত বলল, “কেন ভালো লাগবে না? আর ভালো না লাগার মতো কী থাকতে পারে যেটা আমি জানি না?”
প্রীতিকা বলল, “নাহ। তোমার শুনে কাজ নেই। একটা স্কচ নাও তো।”
তথাগত বলল, “আমি কিচ্ছু নেব না যতক্ষণ তুমি যেটা বলতে চেয়েছিলে বলবে।”
প্রীতিকা বলল, “বুবকার প্রতি তোমার মা হঠাৎ এত সফট হয়ে পড়লেন কেন?”
তথাগতর চোয়াল শক্ত হল, “জানি না।”
প্রীতিকা বলল, “বুবকার ধারণা তুমি আর মা মিলে বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টটা করিয়েছ।”
তথাগত প্রীতিকার দিকে তাকাল, “তোমাকে বুবকা বলেছে?” সে স্কচ অর্ডার করল।
প্রীতিকা বলল, “সরাসরি কিছু বলেনি। যা বোঝার বুঝে গেছি অবশ্য।”
তথাগত বলল, “মা হঠাৎ করে বুবকাকে এত অ্যাটেনশন দিচ্ছেন কি সেটা বুঝেই?”
প্রীতিকা কাঁধ ঝাঁকাল, “আমি কী জানি! কাল তো কোন বস্তি থেকে নিয়ে এলেন। আজ সকালে দেখলাম বুবকার ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় পুরো দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন। আমি একটা জিনিস অবশ্য বুঝলাম।”
তথাগত বলল, “কী?”
প্রীতিকা হাসল, “তোমার মা তোমার থেকে বুবকাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন।”
তথাগত গম্ভীর হল, “জানি।”
প্রীতিকা বলল, “জানো যখন, তখন চাকরিটা ছাড়লে কেন?”
তথাগত বলল, “এখনও যেতে পারি। সেই কন্ট্যাক্টস আমার আছে। ইন ফ্যাক্ট আমার আগের কোম্পানির বস কালকেও বললেন আমার জন্য কোম্পানির দরজা সবসময় খোলা, ভাবো জাস্ট, এই রিসেশনের সময়েও। আর এরা আমায় এমনভাবে ট্রিট করে যেন আমি একটা কচি খোকা!”
প্রীতিকা বলল, “তুমি বোঝো কী করবে। আমি কিছু বলব না। আমার কথা যখন শোনোনি আগে, এখনও কিছু বলব না।”
স্কচ এসে গেছিল। তথাগত প্রীতিকার গ্লাসে সোডা ঢেলে দিল, “আমারও মনে হচ্ছে সেটা। শুধু একটা কথা ভেবেই থেকে যাচ্ছি। এখন গেলে কিন্তু শুনতে হবে পালিয়ে গেলাম।”

প্রীতিকা গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। বলল, "উফ, কতদিন পর। এখন বুঝতে পারছি আই নিডেড ইট ব্যাডলি।"
তথাগত বলল, "বাড়িতে বললেই পারতে, এনে দিতাম।"
প্রীতিকা ঠোঁট উলটাল, "থাক। ওটা তো শান্তির ধাম। ইমেজ রক্ষার দায় কী, তুম ক্যা জানো রমেশবাবু?"
তথাগত বলল, "রাখো তোমার ইমেজ। মা যেন জানে না তুমি ড্রিংক করো।"
প্রীতিকা বলল, "জানুন না। কিন্তু ঘরে ওই কিছু না জানা ভোলাভালা অবতারই রাখব আমি। ওতে অনেক সুবিধা আছে। তুমি বুঝবে না। তোমার মার অনেকগুলো কনজারভেটিভ ভিউজ আছে। ওটা হার্ট হলে ক্ষতিটা আমারই।"
তথাগত বলল, "তা হবে। আমি অত বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি ভেলভেট পিকচারসে আমি না থাকলেও কারও কিছু যায় আসে না। দ্যাট ওল্ড শিট তরুণ দাস!"
প্রীতিকা বলল, "কী বলেছে সে?"
তথাগত বলল, "কী বলবে? এমন একটা হাবভাব করে ঘুরে বেড়ায় যেন ও-ই সব! আর মা-ও তো..."
প্রীতিকা বলল, "হুঁ।"
তথাগত বলল, "কী বলছিলে যেন তখন এই মালটার ব্যাপারে?"
প্রীতিকা বলল, "নিতে পারবে না।"
তথাগত মুখ বিকৃত করল, "ধুস, খামোখা সাসপেন্স না রেখে বলো তো। না নেবার কী আছে? আমরা কি বাচ্চা নাকি?"
প্রীতিকা কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, "ইন্ডাস্ট্রিতে রিউমার আছে বাণী মিত্র আর তরুণ দাসের মধ্যে একটা এক্সট্রাম্যারিট্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে অ্যান্ড ইটস ওপেন সিক্রেট।"
তথাগত গম্ভীর মুখে প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে থাকল।
প্রীতিকা বলল, "দেখলে, এইজন্য তোমাকে বলতে চাইনি।"
তথাগত বলল, "তুমি তো ইন্ডাস্ট্রির লোক নও। দেন? এটা কি তোমার ওয়াইল্ড গেস?"
প্রীতিকা বলল, "তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি জানতে?"
তথাগত বলল, "প্লিজ লিভ ইট। বিরক্ত লাগছে আমার।"
খাবার এসে গেছিল। ওয়েটার সার্ভ করে চলে গেলে প্রীতিকা বলল, "তোমাকে আর-একটা খবর দি।"
তথাগত বলল, "কী?"
প্রীতিকা বলল, "বুবকা ভেলভেট পিকচারসের আপকামিং মেগায় লিড রোল করবে।"
তথাগত বলল, "আড়ি পেতে শুনেছ?"
প্রীতিকা মোবাইলটা বের করতে করতে বলল, "আজকাল আড়ি পাতার দরকার পড়ে না। তোমার তো এইসব নেটওয়ার্ক ভালো ছিল। আজকাল কি সব ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে? ড্রাইভারকে হাতে রাখতে হয় এইজন্য। বাই দ্য ওয়ে, ফ্লোর সামলাতেও সেই বুবকারই শরণাপন্ন হয়েছেন তোমার মা।"
তথাগত প্রীতিকার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল।

১২

দুপুর সাড়ে এগারোটা।
দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের একপাশে বুবকার গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশের সিটে শুভ বসে বোতলে মদ মিক্স করছে।
বুবকা বলল, "এই গাছগুলোর থেকে কেমন একটা সাউন্ড হচ্ছে না?"
শুভ বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তার পাশের গাছগুলো থেকে সত্যিই একটা শব্দ আসছে।

সে অবাক গলায় বলল, "কী হয়েছে বুঝতে পারছ? শেষের সে দিন চলে এসেছে। সব শেষ হতে আর বেশি দিন নেই। গাছ কথা বলছে, ইয়ার্কি?"
বুবকা বলল, "আমার মনে হয় এই যে এত গাড়ি যাতায়াত করছে সেখান থেকে সাউন্ডটা কোনওভাবে এরকম কিছু হচ্ছে।"
শুভ বলল, "যা হবে হবে। পৃথিবী শেষ হলেই বা আমার কোন ইয়েটা ছেঁড়া যায়!"
বুবকা অন্যমনস্ক গলায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেই।"
শুভ বলল, "ছোটোবেলায় আমি কী ভাবতাম জানো? আমার শুধু মনে হত আমি যখন ঘুমাই সব গাছ আকাশে উড়ে চলে যায়। আবার ঘুম ভাঙলে নেমে আসে।"
বুবকা অবাক হয়ে বলল, "সিরিয়াসলি? আমাকে মা ছোটোবেলায় একজ্যাক্টলি এরকমই কিছু একটা বলেছিল। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"
শুভ বলল, "গুরু, গাছ কিন্তু ভেলকি দেখাবারই জিনিস। ছোটোবেলায় একটা গাছের কথা পড়েছিলাম, মনে আছে? পতঙ্গভুক? পোকামাকড়ের গা থেকে রক্ত চুষে ছিবড়ে করে ছেড়ে দেয়? সত্যজিৎ রায়ের একটা গল্পও তো পড়েছিলাম মানুষখেকো গাছের। কী যেন নাম...?"
শুভর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বুবকা মদ গলায় ঢালতে ঢালতে বলল, "সেপ্টোপাসের খিদে। ঘটনা হল, তুমি তো ঠিক পিকলু মেটিরিয়াল না বস। পড়াশোনা করা পাবলিক। কত অবধি পড়েছ তুমি?"
শুভ বলল, "সেসব আর শুনে কী করবে? নিজেই আজকাল ভুলে গেছি।"
বুবকা বলল, "অলকা এখন ফিরে এলে কী করবে?"

শুভ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বাড়ির সামনে একটা টগর গাছ পুঁতেছিল যাবার কদিন আগে। গাছটায় জল দেওয়া হয় না। তাও বড়ো হচ্ছে। দত্তক নেওয়া গাছ সন্তান।"

বুবকা বলল, "আমার আর বৈভবীর বাড়ি যাওয়া হয়নি। ওরও অনেক গাছের শখ ছিল। ছাদে একটা বাগান করেছিল। ভেবেছিলাম যাব। আর কোনও দিন যাওয়া হয় না।"

বুবকার ফোন বাজছিল। শুভ বলল, "ফোন ধরো গুরু।"

বুবকা বলল, "কী হবে ধরে? মা ফোন করছে আর কি! স্টুডিওতে কে যাবে এখন?"

শুভ বলল, "বড়ো মড়াখেকো জায়গা গুরু। কত লোকের বউ টেনে নিল, কত আস্ত আস্ত লোককে সাবাড় করে দিল, ওই জায়গাটা হল সেই বজ্জাত মাগিটার মতো যার জন্য সবাই নিজের ঘর সংসার ভুলে সকাল বিকেল ওর কাছেই পড়ে থাকে।"

বুবকা বলল, "স্টুডিওতে দাঁড়ালে আমার কেমন নেশার মতো লাগে। চারদিক আমি ভুলতে শুরু করি। এ এক অদ্ভুত নেশা। প্রথম প্রথম কোনও নেশায় এত মজা পাইনি, অ্যাক্টিং করে যা পেয়েছি।"

শুভ বলল, "তাহলে এখন এত দূরে দূরে থাকো কেন?"

বুবকা শুভর দিকে তাকাল, "বৈভবীর পরে আমি যাকে ভালোবাসি তা হল অ্যাক্টিং। এতদিন ভুলে ভুলে ছিলাম। পরশু রাতে মা বলার পর থেকে একটা অ্যাড্রিনালিন রাশ হচ্ছে। আমি জানি আমাকে ভেলভেট পিকচারস থেকে এখন দূরে থাকতে হবে, কিন্তু পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, যাই একবার ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়াই। শুরু থেকে শুরু করি সব কিছু। শেষমেশ নিজেকে সামলাতে না পেরে এত দূরে চলে এলাম।"

ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

শুভ বলল, "যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে পালিয়ে গিয়ে কী হবে? ফেস করলে হয় না? আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম প্রথম একদিন স্কুল পালালাম। বাড়ি থেকে স্কুলের নাম করে বেরোলাম, কিন্তু আর স্কুলে গেলাম না। হাইওয়ের ধারে বসে থাকলাম সারাটা দিন। একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়েছিল জানো তো গুরু,

প্রথমে মনে হল ভালোই হল স্কুল থেকে পালিয়েছি, বেঁচে গেছি। তারপর একটা অপরাধবোধ আসা শুরু করল। যতক্ষণ যেতে লাগল শুধু মনে হতে লাগল এটা একটা বিরাট বড়ো অপরাধ করে ফেলেছি। তোমাকে দেখে আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কেন জানি না।”

বুবকা বোতলটা থেকে যতটা পারল মদ গলায় ঢালল। তারপর বলল, “ফেস করতে হবে? বলছ? চলো তাহলে তাই করা যাক। এখনই করা যাক।”

গাড়িটা স্টার্ট দিল বুবকা। রাস্তার অভিমুখ পরিবর্তন করে প্রবল গতিবেগে গাড়ি ছুটল কলকাতার দিকে।

#

তিন্নির সংসারের শেষ সপ্তাহ। স্টুডিওতে শ্যুটিং চলছিল। তথাগত ফ্লোরে বিরক্ত মুখে তরুণ দাসের কাজ দেখছিল।
ফোনটা বেজে উঠল, তথাগত দেখল বাণী ফোন করছেন, সে ফোন তুলল, “বলো।”
বাণী থমথমে গলায় বললেন, “বুবকা স্টুডিওতে গেছে?”
তথাগত বলল, “না। কেন বলো তো?”
বাণী বললেন, “ও তো বাড়িতে নেই। আবার কোথাও একটা চলে গেছে।”
তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, “আমি তো বলেছিলাম ওর পেছনে টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। বরং দ্যাখো, পারলে কোনও রিহ্যাবে দাও। নিশ্চয়ই আবার কোনও বস্তিতে বসে মদ খাচ্ছে। ওয়ার্থলেস ছেলে একটা।”
তথাগতর কথা শেষ হতেই ফ্লোরে বুবকা ঢুকল।
তথাগত অবাক গলায় বলল, “তাই তো, বুবকা এসেছে ফ্লোরে।”
বাণী শান্ত গলায় বললেন, “জানতাম।”
ফোনটা কেটে গেল।

১৩

“তোমার কি এই প্রথম?”
রিমি জিজ্ঞেস করল। অলকা শুয়ে শুয়ে জানলার বাইরে বৃষ্টি দেখছিল। বলল, “হ্যাঁ।”
রিমি বলল, “আমার দুবার হয়ে গেছে।”
অলকা বলল, “মেডিসিনে?”
রিমি মাথা নাড়ল, “না। অপারেশন। বড্ড লাগে।”
অলকা কয়েক সেকেন্ড রিমির দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার কলকাতার বৃষ্টি ভালো লাগে না। জল জমে যায়। বিচ্ছিরি।”
রিমি বলল, “পাহাড়ের বৃষ্টি কিন্তু সুন্দর।”
অলকা বলল, “অনেক দিন হয়ে গেল পাহাড়ে যাই না।”
রিমি বলল, “এখান থেকেই পাহাড় ভালো লাগে। দিনের পর দিন থাকতে হলে ভালো লাগে না। এবছর শীতকালে আমাকে একটানা দশদিন পাহাড়ে একটা অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হয়েছিল। কী ঠান্ডা, নড়তেচড়তে পারছি না, অথচ লোকটার সে কী উৎসাহ।” রিমি হাসতে লাগল, “আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল।”
অলকা বলল, “তোমার যখন ইচ্ছা করে না তখন তুমি কী করো?”
রিমি বলল, “আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে তো কিছু হয় না। ইচ্ছা করতেই হবে। নইলে অনেক ব্যবস্থা আছে।”
অলকা বলল, “অভিনয় করো?”

রিমি আবার হাসল, "হ্যাঁ। অনেকটা তাই।"
অলকা বলল, "তাহলে তো তুমি খুব ভালো অভিনেত্রী। আমার থেকেও ভালো।"
রিমি বলল, "কেন, তুমি অভিনয় করো না?"
অলকা বলল, "আমি ভাবতাম আমি একাই বোধহয় অভিনয়টা পারি। তোমার অভিনয়টা তো আরও কঠিন। আরও চ্যালেঞ্জিং।"
রিমি বলল, "চ্যালেঞ্জিং কিছুই না। অভ্যাস হয়ে গেছে। যদিও এসকর্ট সার্ভিস তবু অনেক ভালো। রাস্তায় রং মেখে দাঁড়াতে হচ্ছে না। কোনও দিন সেটাও করতে হতে পারে। আচ্ছা আমাকে শ্যুটিং দেখাবে? আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।"
অলকা বলল, "আমার সঙ্গে যেয়ো।"
রিমি একটু সংকুচিত হল, "উনি যদি রাগ করেন?"
অলকা বলল, "ওঁকে বলেই যেয়ো নাহয়। ফেরার সময় উনি তোমাকে নিয়ে ফিরবেন। আমার তো ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়।"
রিমি বলল, "আচ্ছা, তোমার বর কোথায় থাকে?"
অলকা রিমির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "ওর বাড়িতে।"
রিমি বলল, "দেখা হয়?"
অলকা বলল, "নাহ, অনেক দিন হয়নি।"
রিমি বলল, "দেখা হলে কী বলবে?"
অলকা অবাক হল, "কী বলব?"
রিমি বলল, "অনেক কিছুই তো বলা যায়।"
অলকা একটু ভেবে বলল, "কিছুই বলব না।"
রিমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাও তোমার একটা লোক ছিল। আমার জন তো ফ্রড। মাঝে মাঝে মনে হয় এখনও যদি এসে কেঁদে বলে চলো আমরা সংসার করি, তাহলে হয়তো এখনও লোকটাকে বিশ্বাস করে চলে যাব। আমার তো বেশ কিছুদিন ধারণা ছিল ওকে হয়তো কেউ মেরেধরে লুকিয়ে রেখেছে। দার্জিলিংয়ে দেখার পরে ধারণাটা ভেঙেছিল। ওর চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, সব কিছুর পিছনে আসলে ও-ই ছিল। কী বোকাই না ছিলাম। কতবার বাবা বলেছে মানুষকে বিশ্বাস করিস না, আমি তখন বাবাকেই বিশ্বাস করিনি।"
অলকা উঠল, "চলো, তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ি যাই।"
রিমি বলল, "তুমি খেপেছ? এই শরীরে কোথায় যাবে?"
অলকা বলল, "কোন শরীর? অত ভাবলে হবে না। আমি ঠিকই আছি।"
রিমি বলল, "বাড়ি গিয়ে কী হবে? ঢুকতে তো পারব না।"
অলকা বলল, "বাইরে থেকে দেখিয়ে দাও। আমি ছুতোনাতা করে ঘুরে আসি।"
রিমি বলল, "খুব বাজে আইডিয়া। তার চেয়ে ঘরেই থাকি। এই ভালো। বৃষ্টি দেখি।"
অলকা বলল, "এভাবে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে?"
রিমি বলল, "হ্যাঁ। আমাকে সারাদিন ঘরে বসে থাকতে বললে আমি তাই থাকব। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।"
অলকা বলল, "আজ আমার শ্যুটিং নেই। খুশি হবার কথা। হতে পারছি না।"
রিমি বলল, "মনখারাপ হচ্ছে?"
অলকা ম্লান হেসে বলল, "শুভর সঙ্গে বসে কত প্ল্যানিং করতাম। ছেলে হলে কী নাম রাখব, মেয়ে হলে কী, আমি তো জানতেই পারলাম না যাকে নষ্ট করলাম সে ছেলে ছিল না মেয়ে।"

বেল বাজল। অলকা বলল, “যাও। দীপ্ত এসে গেছে হয়তো। দরজা বন্ধ করে যেয়ো।”

১৪

এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেকিং হয়ে গেছিল। তথাগত বলল, “কফি খাবে?”
প্রীতিকা বলল, “আমার ফ্লাইটে ওঠার আগে খুব টেনশন হয়। মনে হয় যদি ক্র্যাশ করে যায়! হাইজ্যাকিং-এর ভয়ও পাই।”
তথাগত বলল, “ধুস, এক ঘণ্টার ফ্লাইট। শুরু হবে আর শেষ হয়ে যাবে।”
প্রীতিকা বলল, “তোমার হঠাৎ কালিম্পং যাবার ইচ্ছা হল কেন? এবার তো সত্যিটা বলো। শুধুই সারপ্রাইজ হানিমুন ছিল মাথায়?”
তথাগত বলল, “দীপ্তানুজ আজকেই পৌঁছে গেছে তো। তোমাকে বললাম না একটা হরর ফিল্ম করার কথা ভাবছি।”
প্রীতিকা চোখ নাচাল, “ওহ, এক ঢিলে দুই পাখি মারবে। হানিমুনও হল, আবার লোকেশনও দেখা হল।”
তথাগত বলল, “আর-একটা পাখি কাউন্ট করো।”
প্রীতিকা অবাক হল, “কী?”
তথাগত বলল, “স্ট্রেসটা আর নিতে পারছিলাম না।”
প্রীতিকা বলল, “ওহ, বুঝেছি, বুবকা আসার পর, তাই তো?”
তথাগত মুখ বিকৃত করল, “বুবকাকে আমি কেন ভয় পেতে যাব?”
প্রীতিকা বলল, “সেটা তুমিই ভালো জানো।”
তথাগত বলল, “তোমাকে ভূতের গল্পটা বলেছি? মানে যেটা দীপ্তানুজ লিখেছে?”
প্রীতিকা বুঝল তথাগত এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছে, সে বলল, “না তো।”
তথাগত বলল, “এক কাজ করব, গল্পটা লোকেশনে গিয়েই শুনব। সাহেবের ভূত বাংলো, পাহাড়ের বৃষ্টি, সঙ্গে কফি, কী বলো?”
প্রীতিকা বলল, “আমার কোনও চাপ নেই। আমি ভূতের ভয়-টয় পাই না। তার থেকে টেক অফের টাইমে ঢের বেশি ভয় পাই। আর এয়ারপকেটে পড়লে তো কথাই নেই। শুধু মনে হয় এই বুঝি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। এর থেকে ট্রেন অনেক ভালো।”
তথাগত বলল, “ট্রেনেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেটা খেয়াল আছে তো?”
প্রীতিকা বলল, “দ্যাখো, ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট হলেও সেটা ডাঙায় চলে। অ্যাটলিস্ট বাঁচার পারসেন্টেজটা বেশি। আকাশপথে হলে তো সেটুকুও নেই।”
তথাগত বলল, “অত কিছু ভাবলে হয় না। বৈভবীও তো ডাঙায় ছিল।”
প্রীতিকা অবাক গলায় বলল, “এর মধ্যে বৈভবী এল কোত্থেকে?”
তথাগত বলল, “কেন আসবে না? ইন ফ্যাক্ট ওর একজ্যাম্পল এর মধ্যে না এলে অবাক হতাম না বেশি?”
প্রীতিকা বলল, “আমার কেন জানি না বৈভবীকে ঠিক সহ্য হয় না। বুবকা সেই কথাটা বলার পর থেকে।”
তথাগত বলল, “কোনটা?”
প্রীতিকা তথাগতর চোখের দিকে তাকাল, “সেই যে ও বলেছিল না, বৈভবীর সঙ্গে নাকি তোমার কিছু ছিল।”
তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, “তুমি বুবকাকে এখনও চিনতে পারোনি? সোজা সোজা ব্যাপারগুলোকে গুলিয়ে দিতে ওর থেকে ভালো আর কে বলে? সেদিন ওকে টাকা দিইনি বলে এই গেমটা ও আমাদের সঙ্গে খেলেছিল। কথাটা এখনও তুমি মনে রেখে দিয়েছ?”

প্রীতিকা বলল, “কী জানি, কোন কথাটা মনে রাখা দরকার আর কোন কথাটা ভুলে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে বৈভবীর রিলেশন থাকলেই বা কী হত, শি ইজ হিস্ট্রি নাও।”
তথাগত বলল, “এই কথাটা তো তোমার বোঝা উচিত ছিল। সহ্য করা না করার মধ্যেও তো এখন বৈভবী নেই।”
প্রীতিকা বলল, “আগরওয়ালের সঙ্গে বৈভবী কোথায় যাচ্ছিল?”
তথাগত বলল, “কোথায় আর যাবে, জানোই তো, মন্দারমণিতে। বুবকা ছাড়া সবাই বুঝতে পেরেছে বৈভবী ওখানে আগরওয়ালের সঙ্গে কী করতে গেছিল। নষ্ট মেয়েছেলে একটা। বুবকাকে ইউজ করে যাচ্ছিল।”
প্রীতিকা বলল, “বুবকা কেন, অনেকেই বিশ্বাস করে না সেদিন বৈভবী অন্য কিছু করতে গেছিল।”
তথাগত বলল, “তুমি কিছুই জানো না। তুমি কি জানো এককালে বৈভবী এসকর্ট সার্ভিসে ছিল?”
প্রীতিকা বিস্ফারিত চোখে তথাগতর দিকে তাকাল।
তথাগত বলল, “ওভাবে তাকিয়ো না। ইন্ডাস্ট্রির হাতেগোনা কয়েকটা লোক জানে। এটা পরে যাচাই করে নিতে পারো।”
প্রীতিকা বলল, “হতে পারে। আর্লি লাইফে স্ট্রাগল করার সময়। সেটার সঙ্গে পরের লাইফ গুলিয়ে না দিলেই ভালো হয়। বাই দ্য ওয়ে, ও যখন এসকর্ট ছিল, তোমার সঙ্গে কি ওর দেখা হয়েছিল?”
তথাগত রাগি চোখে প্রীতিকার দিকে তাকাল।
প্রীতিকা হেসে ফেলল, “ওহ, ইয়ার্কিও বোঝো না।”
তথাগত বলল, “এসব ব্যাপারে ইয়ার্কি আমার ভালো লাগছে না। এমনিতেও আমি একটা জিনিস ঠিক করেছি।”
প্রীতিকা বলল, “কী?”
তথাগত বলল, “আমি মাকে পরিষ্কার বলে দেব, বুবকার সঙ্গে আমি কোনওমতেই কাজ করতে পারব না। ও সিরিয়ালের জায়গাটা দেখুক, আমি নাহয় সিনেমাটা দেখি।”
প্রীতিকা বলল, “গুড আইডিয়া। মা-ও হয়তো মেনে নেবে এটা।”
তথাগত বলল, “মেনে নিলে ভালো। নইলে আমি প্যাভিলিয়নে ফিরে যাব। বুবকার সঙ্গে কাজ করা আমার সঙ্গে সম্ভব না। কাল জানো সঙ্গে করে একটা মালকে নিয়ে এসেছে, মালটা মা আড়াল হতেই ফ্লোরে বসে জয়েন্ট বানানো শুরু করে দিয়েছে। জাস্ট ভাবো দৃশ্যটা।”
প্রীতিকা হেসে দিল, “এতে রেগে যাওয়ার কী আছে?”
তথাগত বলল, “রাগব না? অত সিনিয়র আর্টিস্টরা সবাই ছিলেন। পরে শুনলাম ওই মালটাই নাকি দীপ্ত রায়ের কেপ্টের এক্স হাজব্যান্ড।”
প্রীতিকা মনে করার চেষ্টা করল, “দীপ্ত রায়ের কেপ্ট? ওকে চিনি মনে হয়। গয়না কেনার সময় দেখা হয়েছিল। অসাধারণ স্কিন ভদ্রমহিলার। ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব মুখে কী মাখে।”
তথাগত মুখ বিকৃত করল, “কী আর মাখবে, দীপ্ত রায়ের ওটা মাখে। জঘন্য মেয়েছেলে।”
প্রীতিকা বলল, “বাহ, তোমার তো ভাষার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। এর থেকে তো অফিসে কাজ করাটাই ভালো ছিল মনে হচ্ছে এখন।”
তথাগত লজ্জা পেল, “সরি। রাগের মাথায় বেরিয়ে গেল। তুমি জানো না, দীপ্ত রায় একটা স্কাউন্ড্রেল।”
প্রীতিকা বলল, “তুমি প্রেশার চেক করাও। তোমার লক্ষণ আমার ভালো ঠেকছে না। কথায় কথায় রিঅ্যাক্ট করছ আজকাল। চলো, বোর্ডিং-এর হুকুম এসে গেছে। আমার টেনশন টাইম স্টার্টস।”

একটা ফাঁকা বাড়ি। পাহাড়ি রাস্তার মাঝখানে। শহর থেকে অনেক দূরে।

আর একটা ছোটো বাসে তিনটে ফ্যামিলি চলছে দূর কোনও শহরে। পাহাড়ের রাস্তায় বাসটা খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভার বলল, কিচ্ছু করার নেই। সকাল না হলে কিছু করা যাবে না।

বাসের মেয়েদের টয়লেট পেয়েছে। পুরুষেরা নেমে খানিকটা হেঁটে বাড়িটার কাছে পৌঁছল। দেখল বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু খুব কম পাওয়ারের কতগুলো আলো জ্বলছে। দরজাটা ধাক্কা মারতেই খুলে গেল। মেয়েদের ডাকা হল। সবাই মিলে বাড়িটায় ঢুকল।

বাড়িতে একটাই ঘর। সংলগ্ন টয়লেট আছে। একটা সাইনবোর্ডে বড়ো করে লেখা

"ট্রুথ হাউস। এই বাড়িতে মিথ্যা কথা বলেছেন তো মরেছেন।"

আসুন এবার বাড়িতে কারা কারা ঢুকল দেখে নি,

তিনটে ফ্যামিলি।

ফ্যামিলি ১– তিনজন

অমিত সরকার, বয়স ৫২, সরকারি চাকরি, এককালে নাটক করতেন।

বিদিশা সরকার, ওঁর ওয়াইফ, বয়স ৪৭, হাউজওয়াইফ।

রিমঝিম সরকার, বয়স ১৯, ফার্স্ট ইয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী।

ফ্যামিলি ২– দুজন

অনন্ত পাল, বয়স ৬২, রিটায়ার্ড কলেজ প্রিন্সিপাল।

সুলগ্না পাল, বয়স ৫৫, এক গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস

ফ্যামিলি ৩– দুজন হানিমুন কাপল

রাহুল পাত্র, বয়স ২৭, আইটি কোম্পানিতে চাকরি করে

অমৃতা পাত্র, বয়স ২২, আপাতত কিছু করে না, কম্পিটিটিভ একজামে বসছে।

সাইনবোর্ডটা দেখে রাহুল হাসতে লাগল। অমৃতা বলল, "ওয়াও, ট্রুথ হাউজ। আমাদের সবাইকে সত্যি কথা বলতে হবে। নইলে মরতে হবে। এটা জাস্ট দারুণ তো।"

সুলগ্না অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী, অমৃতার আগাপাশতলা দেখে বললেন, "২০১৭-য় এসে এইসবে বিশ্বাস করে নাকি কেউ?"

রিমঝিম বলল, "কেন আন্টি, হতেই তো পারে।"

অনন্তবাবু ঘরের এক কোণে মেঝেতেই বসে পড়লেন। বললেন, "মশা না জ্বালালেই হল। একটা রাত তো, ঠিক কাটিয়ে দেব। শীত তেমন নেই আজ।"

অমিত অনন্তবাবুর পাশে বসলেন। "যা বলেছেন।"

অমৃতা বলল, "আমার না ভীষণ এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে, ট্রুথ হাউস, ওয়াও, হোয়াট আ কনসেপ্ট। দ্যাখো আজ তো আমাদের কারও ঘুম হবে না, একটা কাজ তো করতে পারি, আমরা ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার খেলতে পারি।"

প্রস্তাবটা শুনে রিমঝিম লাফিয়ে পড়ল, "ইয়েস ইয়েস, দারুণ মজা হবে।"

অনন্তবাবু বললেন, "সে আবার কী? অন্ত্যাক্ষরী ভালো ছিল না?"

সুলগ্না বললেন, "নিয়মটা বোঝাও, ভালো লাগলে ট্রাই করা যাবে।"

অমৃতা উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে লাগল। যেটা ঠিক হল, গোল করে তিনটে ফ্যামিলির লোক বসবে। একটা বোতল ঘোরানো হবে। বোতলের মুখ যার দিকে থাকবে সে ভিক্টিম। শুধুমাত্র প্রথম জনই ট্রুথ নেবে না ডেয়ার নেবে সেটা ঠিক করবে। তারপর অল্টারনেটিভভাবে ব্যাপারটা এগোবে। প্রত্যেকেরই ফ্যামিলির লোক ট্রুথ অর ডেয়ারের সাবজেক্ট ঠিক করবে।

সবাই গোল করে বসল। বোতল ঘোরানো হল। সবার আগে বোতল রিমঝিমের দিকে গেল।

সবাই জিজ্ঞেস করল, ট্রুথ অর ডেয়ার?
রিমঝিম বলল, "ডেয়ার।"
রিমঝিমের মা বলল, "একটা গান কর।"
রিমঝিম একটা ইংরেজি গান গাইল।
গান শেষ হলে অমিত সরকার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কী যে দিনকাল পড়ল। কোন দুঃখে যে মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছিলাম। ওরে মা, এত বাংলা গান আছে, একটা তো করতে পারিস।"
রিমঝিম বিরস মুখে বসে থাকল।
আবার বোতল ঘুরল। এবার রাহুলের দিকে বোতল থামল।
অমৃতা বলল, "এই তো সোনা, ট্রুথ তোমাকে বলতেই হবে। বলো দেখি আমার বন্ধু সুনন্দাকে তুমি আমাকে লুকিয়ে টেক্সট করো কি না?"
সবাই হেসে উঠল।
রাহুল বলল, "আগে করতাম। রিসেন্টলি করছি না।"
সবাই আবার হেসে উঠল। অমৃতা রাহুলকে একটা চিমটি কাটল।
আবার বোতল ঘুরল। এবার সুলগ্নার কাছে গিয়ে বোতল থামল। স্বাভাবিকভাবেই ডেয়ার। অনন্তবাবু বললেন, "বেশি কিছু করতে হবে না, তুমি একটু নেচে দেখাও। মা রিমঝিম, ওই ইংরেজি গানটা আবার কর তো।"
সুলগ্না কটমট করে অনন্তবাবুর দিকে তাকালেন। মেয়েরা রে রে করে উঠল, "না না, একবার বেরিয়ে গেছে আন্টি, এটাই করতে হবে।"
সুলগ্না উঠে দাঁড়ালেন। রিমঝিম গানটা শুরু করল।
খানিকটা নাচার পর সবাই হইহই করে উঠল। সুলগ্না বসে অনন্তবাবুর দিকে কটমট করে তাকালেন।
বোতল আবার ঘুরল। এবার অমিতবাবুর দিকে। ট্রুথ।
বিদিশা বললেন, "তুমি কি সারাজীবন শুধু আমাকেই ভালোবেসেছ?"
অমিতবাবু বললেন "নিশ্চয়ই। আর কারও দিকে চোখ তুলেও তাকাইনি।"
বলার সঙ্গে সঙ্গে অমিতবাবু তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন, বললেন, "উফ, কী ব্যথা শুরু হল হঠাৎ করে।"
অমৃতা বোর্ডের দিকে হাত দিয়ে দেখাল, "ও মাই গড, ইট মিনস ইট ইজ ফলস। আঙ্কেল আপনি শিগগিরি সত্যিটা বলুন।"
অমিতবাবু কোনওমতে বললেন, "না না, আমি অন্তরাকেও ভালোবাসি, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দশ বছর হতে চলল।"
সঙ্গে সঙ্গে অমিতবাবুর ব্যথাটা কমে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বিদিশা দেবী গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাহুল গম্ভীর গলায় বলল, "মাই গড। ইট হ্যাজ টার্নড ইনটু আ ডেঞ্জারাস গেম নাও।"

দীপ্তানুজ এই অবধি গল্পটা বলেছিল। হোম স্টে-র ঘরে দীপ্তানুজের গল্প শুনছিল প্রীতিকা আর তথাগত। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।
প্রীতিকা হাততালি দিয়ে উঠল, "ওয়াও, হোয়াট আ স্টোরি।"
তথাগত স্কচে চুমুক দিয়ে বলল, "রিয়েলি দীপ্তানুজ, ইউ হ্যাভ মেড ইট। এই সাসপেন্সটা যে তুমি ক্রিয়েট করতে পেরেছ এটাই তো অসাধারণ। তবে একটা প্রবলেম আছে।"
দীপ্তানুজ বলল, "কী, বলুন।"

তথাগত বলল, "এটা তো এনসেম্বল কাস্টের মুভি হবে। এত স্টার কোথায় পাবে? সবাই তো বলবে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। কস্টটা হাই হয়ে যাবে না?"
দীপ্তানুজ বলল, "দেখুন, এই গল্পে কাস্টটা বড়ো কথা না। আপনি মুভির লোক না নিয়ে সিরিয়ালের লোক কাস্ট করুন না। সাসপেন্সটা তো একই থাকবে।"
তথাগত বলল, "গুড। আমি সিকোয়েন্সগুলো সাজাচ্ছি। নাও তুমি পরের পার্টটা বলো তো। এত উত্তেজনা আর রাখতে পারছি না বস। অনেক দিন পর বাংলা সিনেমা একটা ভালো গল্প পেতে চলেছে।"

১৬

"মেয়েমানুষ কোথায় সুন্দর বলো তো?"
দীপ্ত সিগারেট ধরিয়ে রিমিকে জিজ্ঞেস করল।
রিমি বলল, "কোথায়?"
দীপ্ত খালি গায়ে ছিল। উঠে একটা টিশার্ট গায়ে চড়িয়ে আবার খাটে এসে বসল, "খাটে। পৃথিবীতে মেয়েদের সবথেকে বেশি মানায় খাটে।"
রিমি কিছু বলল না। সে চুপচাপ শুয়ে ছিল।
দীপ্ত বলল, "আর খাটে কোন মেয়েদের ভালো লাগে জানো?"
রিমি বলল, "কাদের?"
দীপ্ত বলল, "ভদ্রঘরের মেয়েদের। প্রস্টিটিউট তো টাকা দিলেই শুয়ে পড়বে।"
রিমি বলল, "আপনি আমাকে কতদিন রাখবেন এখানে?"
দীপ্ত উত্তর না দিয়ে সিগারেটটা শেষ করল। বলল, "খারাপ লাগল কথাটা? বাট ইটস আ ফ্যাক্ট। যারা সহজলভ্য, তাদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং তো কোনও ব্যাপার নেই, আই হার্ড অ্যাবাউট ইওর হিস্ট্রি, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। ইউ আর গুড। বাট নট দ্য বেস্ট। তোমার এখনও অনেক শেখা বাকি। আমি কিন্তু তোমার ফেক অরগ্যাজম বুঝতে পারি।"
দীপ্তর আঙুল রিমির শরীরে খেলতে শুরু করল, "ইউ হ্যাভ ডিসেন্ট কার্ভস অ্যান্ড ইউ আর বিউটিফুল অলসো, বাট স্টিল, ইউ ল্যাক সামথিং, মে বি ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য এক্স ফ্যাক্টর। আই উইল শো ইউ দ্য ডিফারেন্সেস। একটা কাজ করো, কল অলকা।"
রিমি উঠে কাপড়টা পরতে যাচ্ছিল, দীপ্ত বলল, "কাপড় পরার দরকার নেই। তুমি এভাবেই যাও। তোমার কি এখনও লজ্জাবোধ আছে? রাস্তার মাঝখানে এভাবে যেতে বললে যেতে পারবে না? রিমেম্বার অলওয়েজ, ইউ আর আ প্রস্টিটিউট, আই শ্যাল বি হ্যাপিয়ার ইফ ইউ বিহেভ লাইক আ প্রস্টিটিউট ইন মাই হাউস।"
রিমি এবারও কোনও উত্তর দিল না। চুপচাপ দরজা খুলে পাশের ঘরে গেল। মিনিটখানেক পরে এসে বলল, "দিদি তো নেই।"
দীপ্ত রিমির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "নেই? ওয়াশরুম চেক করেছ?"
রিমি বলল, "হ্যাঁ। দরজা খোলা। বাইরের দরজাও খোলা।"
দীপ্ত উঠল। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখল পাশের ঘরটা ফাঁকা। সে রান্নাঘরটাও দেখল। কেউ নেই। ফোন বের করে অলকাকে ফোন করল।
রিং-এর শব্দ আসছিল। দীপ্ত অলকার ঘরে গিয়ে দেখল অলকার ফোনটা খাটের ওপরেই রাখা।
সে বলল, "স্ট্রেঞ্জ। কোথায় গেল?"
রিমি বলল, "ঘরেই তো ছিল।"

দীপ্ত টিশার্ট আর শর্টস পরা ছিল। ওই অবস্থাতেই লিফটে নিচে নেমে গেল। ফ্ল্যাটের সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কিছুক্ষণ আগে অলকা বেরিয়ে গেছে।
সে প্রবল রাগে ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতে একটা ঘুসি মারল।
ফোনটা বের করল, "হ্যালো, রাজু, শোন, অলকা সম্ভবত ওর বাড়ি গেছে। তুই ইমিডিয়েটলি গিয়ে ওকে বল আমাকে যেন ফোন করে।"
ফোনটা রেখে দীপ্ত নিচেই হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। উদ্দেশ্যহীনের মতো বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে শুরু করল।
লিফট ধরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল। রিমি ততক্ষণে শাড়ি পরে নিয়েছিল।
দীপ্ত রিমির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "তুই জানিস ও কোথায় গেছে?"
রিমি সভয়ে মাথা নাড়ল, "বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না।"
দীপ্ত আবার রাজুকে ফোন করল, রাজু জানাল অলকা শুভর বাড়ি যায়নি। দীপ্ত বলল, "ওখানেই থাকো। অন্তত দু ঘণ্টা নজর রাখো। তারপর ওখান থেকে যাবে।"
রিমি বলল, "আপনি চা খাবেন?"
দীপ্ত চেঁচিয়ে উঠল, "তোর এখন চায়ের কথা মনে পড়ছে? খানকি মাগি, শোয়া ছাড়া কিছু বুঝিস তুই? যা, সামনে থেকে যা, ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।"
রিমি চুপচাপ দীপ্তর বেডরুমে চলে গেল।
দীপ্ত কিছুক্ষণ ভেবে ট্রাউজারটা পরে আবার নিচে নামল। গাড়িটা বের করে স্টুডিও রওনা দিল।
অফিসে পৌঁছে নিজের ঘরে গিয়ে আবার রাজুকে ফোন করল, "হ্যাঁ রাজু, গেছে ওখানে?"
রাজু বলল, "না দাদা। এখনও তো আসেনি।"
দীপ্তর জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল।
সে অফিসের সবাইকে ডেকে ডেকে বকাঝকা করা শুরু করে দিল।

১৭

"একটা ট্রুথ হাউস থাকলে কত ভালো হত না?"
ডাইনিং হল থেকে খেয়ে বেরিয়ে হাঁটছিল তারা।
প্রীতিকার প্রশ্নের উত্তরে তথাগত অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "হুঁ। আজকের চিকেনটা ভালো ছিল। কিন্তু ননভেজ বলতে কি এরা চিকেন ছাড়া কিছু বোঝে না? ভেজ মানেও পনির। ব্যাপারটা একটু একঘেয়ে হচ্ছে না?"
প্রীতিকা বলল, "তুমি কি আমার কথাটা শুনতে পেলে না?"
তথাগত বলল, "খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে তো?"
প্রীতিকা বলল, "না। আমি বলছিলাম ট্রুথ হাউসের কথা। এখানের খাবার ভালো। কস্টলি, কিন্তু ভালো। ফ্রেশ খাবার।"
তথাগত বলল, "ট্রুথ হাউস? কী বলছিলে ট্রুথ হাউসের ব্যাপারে?"
প্রীতিকা বলল, "বললাম একটা ট্রুথ হাউস থাকলে কত ভালো হত। আমরা নিজেরাই বুঝে নিতাম কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে। নারকো টেস্টেরও দরকার পড়ত না। পুলিশ সাসপেক্টদের ট্রুথ হাউসে নিয়ে এলেই সত্যিটা বেরিয়ে যেত।"
তথাগত বলল, "পুলিশ যে সবসময় সত্যি কথা বলে সেটা তোমায় কে বলল? পুলিশও তো মানুষ।"
প্রীতিকা বলল, "তুমি কী বলতে চাও, পুলিশকে কেনা যায়?"
পাহাড়ের উপরের দিকে তাদের ঘর। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। তথাগত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমি কোথায় বললাম সেটা?"

প্রীতিকা বলল, "কথাটা তো সেদিকেই যায়।"
তথাগত হাঁটা শুরু করল, "এসব কথা বিতর্কিত। কিছু না বলাই ভালো।"
প্রীতিকা বলল, "এখানে তুমি আমি ছাড়া আছেটাই বা কে?"
তথাগত বলল, "তবু। বিতর্কিত কথা বলার অভ্যাসটা ছাড়তে হবে। কাজে দেয় সেটা।"
প্রীতিকা বলল, "ট্রুথ হাউস থাকলে সবার আগে তোমাকে ঢোকাতাম। মাঝে মাঝে ভীষণ সন্দেহ হয় আমার।"
তথাগত বলল, "সম্পর্কে সন্দেহ থাকাটা হেলদি।"
প্রীতিকা বলল, "একটা কথা, এখানে কিন্তু তোমাকে অনেকটা ফ্রেশ লাগছে। কলকাতায় থাকলে তোমাকে মাঝে মাঝে দেখলে ভয় লাগে। কেমন দুমড়ে মুচড়ে যাও মাঝে মাঝে। মে বি দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট ফর ইউ।"
তারা তাদের রুমে চলে এসেছিল। তথাগত চাবি দিয়ে ঘর খুলে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, "ছেড়ে পালিয়েও যাব না। কয়েকদিন দেখি আগে।"
প্রীতিকা বলল, "লিভ দিস ইস্যুস। ভাবলেই মজাটা কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি বলো এমন একটা প্রশ্ন, যেটার আমি সত্যি উত্তর দিতে বাধ্য।"
তথাগত বলল, "উফ, এসব আবার কী শুরু করলে?"
প্রীতিকা বলল, "বলো বলো। জাস্ট একটা একটা করে প্রশ্ন হবে। তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করবে, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।"
তথাগত বলল, "ওকে। প্রশ্ন করছি, কিন্তু কীভাবে বুঝব আমরা ঠিক বলছি কি না?"
প্রীতিকা বলল, "সেই বিশ্বাসটা তো রাখা উচিত, না? আফটার অল কিছু ট্রাস্ট তো করিই আমরা একে অপরকে।"
তথাগত সোফায় বসল, "ওকে, তা আমি আগে প্রশ্ন করব?"
প্রীতিকা বলল, "ইয়েস। গো অ্যাহেড।"
তথাগত বলল, "হ্যাভ ইউ এভার ফ্যান্টাসাইজড অ্যাবাউট বুবকা?"
প্রীতিকা চোখ বড়ো বড়ো করল, "এটা কী ধরনের প্রশ্ন হল? তুমি এসব ভাবো নাকি? শিট!"
তথাগত বলল, "জাস্ট আস্কড। আমি ভাবি না ভাবি না বড়ো কথা না, তুমি প্রশ্ন করতে বললে আমি করলাম। তুমি চাইলে উত্তর নাও দিতে পারো। আমার মাথায় এই মুহূর্তে এটাই এল।"
প্রীতিকা বলল, "আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না, তুমি এমন প্রশ্ন করবে। উত্তরটা অবভিয়াসলি নো। ইয়েস, আমার শাহরুখ খানকে নিয়ে ফ্যান্টাসি আছে। ওই একজনই। ইওর ব্রাদার ইজ এ স্পয়েল্ড ব্র্যাট। ওকে নিয়ে ভাবতে যাব কেন?"
তথাগত বলল, "শাহরুখ খান এখন ঘরের মধ্যে এলে আমাকে বের করে দেবে?"
প্রীতিকা বলল, "হ্যাঁ। যদিও একটা কোয়েশ্চেনের উত্তরে সত্যি বলতে হত, আমি এটারও সত্যিটা বলে দিলাম।"
তথাগত হাসতে লাগল, "নাও ইটস ইওর টার্ন। বলো।"
প্রীতিকা বলল, "বিয়ের আগে তুমি ভার্জিন ছিলে?"
তথাগত বিরক্তি প্রকাশ করল, "উফ। সেই..."
প্রীতিকা বলল, "তোমার প্রশ্নটার থেকে অনেক সোজা প্রশ্ন করেছি। বলো বলো।"
তথাগত বলল, "নাহ।"
প্রীতিকা বলল, "কে? বৈভবী?"
তথাগত বলল, "নো। বৈভবীকে নিয়ে তোমার সন্দেহটা একেবারেই ভিত্তিহীন।"

প্রীতিকা বলল, “তবে কে?”
তথাগত বলল, “কলেজের গার্লফ্রেন্ড। চিনবে না। এখন বিয়ে হয়ে গেছে। এনআরআই বর।”
প্রীতিকা বলল, “ফেসবুকে আছে?”
তথাগত বলল, “আছে।”
প্রীতিকা বলল, “দেখাও।”
তথাগত মোবাইলটা বের করতে করতে বলল, “একটা প্রশ্নের কথা ছিল, এবার র‍্যাপিড ফায়ার শুরু হয়েছে। এইজন্য আমি এই খেলাটা খেলতে চাইনি।”
প্রীতিকা থমথমে মুখে বলল, “লিভ ইট। দেখাতে হবে না।”
তথাগত বলল, “না, না, দ্যাখো দ্যাখো। দেখতে চেয়েছ, দেখে নাও।”
ফোনে ফেসবুকের আইকনে ট্যাপ করতে যাচ্ছিল তথাগত, ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল। মিনিটখানেক কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, “অলকানন্দা মুখার্জি, মিসিং।”
প্রীতিকা বলল, “অলকানন্দা মুখার্জি মানে? দীপ্ত রায়ের...?”
তথাগত মাথা নাড়ল। প্রীতিকা বলল, “মিসিং মানে কী?”
তথাগত বলল, “মিসিং মানে মিসিং। পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে। আজ আমাকে ইদ্রিশ এখন জানাচ্ছে। বাল একটা!”
প্রীতিকা বলল, “নিউজ দেখা হচ্ছে না আসলে আমাদের। যার ফলেই এই ল্যাগ। ইদ্রিশ ভেবেছিল হয়তো তুমি দেখে নিয়েছ।”
তথাগত বলল, “সবাই সব কিছু ভেবে নিয়ে বসে থাকলে কী করে হবে?”
প্রীতিকা বলল, “তুমি এত এক্সাইটেড হচ্ছ কেন?”
তথাগত প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, “শি নোজ সামথিং। শি নোজ সামথিং। উই কান্ট লুজ হার।”
প্রীতিকা বলল, “নোজ হোয়াট? ট্রুথ অ্যাবাউট বৈভবী?”
তথাগত কথাটা ঘোরাতে চাইল, “আমি কী করে জানব?”
প্রীতিকা অবাক হয়ে বলল, “তাহলে কথাটা বললে কেন! কী জানে ও?”
তথাগত বলল, “ফাক ইয়ার, ফাক, কী বুলশিট বকে যাচ্ছ তখন থেকে। শি ওয়াজ প্রেগন্যান্ট অ্যান্ড দীপ্ত রায় ট্রায়েড টু ফোর্সড হার টু অ্যাবর্ট হার চাইল্ড। এটা নিউজ হলে আমাদের কতটা লাভ হত বুঝতে পারছ?”
প্রীতিকা হাল ছেড়ে দিল, “আমি কিছুই জানি না। তুমি কিছুই বলছ না আমাকে আজকাল। এত কথা পেটে চেপে রাখো কীভাবে?”
তথাগত বলল, “কারণ আমি কাজে মন দিতে চেয়েছিলাম। নাও সব কিছু আবার ঘেঁটে গেল। শিট!”

১৮

“দীপ্ত রায়ের দুটো প্রোজেক্টের কাস্ট চেঞ্জ করতে হচ্ছে মাঝপথে”, রিখিয়া বলল।
বাণী বললেন, “তাতে আমাদের লাভ?”
রিখিয়া বলল, “আমাদেরই তো লাভ। টিআরপি ফল করবে ওদের।”
বাণী হাত দিয়ে কথাটা ওড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, “ওসব তো শর্ট টার্ম লাভ। টিআরপি দু-তিনটে উইক এফেক্টেড হবে। তারপর?”
রিখিয়া একটু ভেবে বলল, “সেটা তো ভেবে দেখিনি।”
বাণী বললেন, “দীপ্ত রায়ের লাভ লোকসান চিন্তা করলে হবে না রিখিয়া। আমরাও খুব একটা কমফরটেবল পজিশনে নেই এখন।”

রিখিয়া বলল, "বুবকাকে নিয়ে টেনশন করছ? ও কিন্তু শ্যুটের সময় যথেষ্ট সিরিয়াস থাকছে। এবং ঠিকঠাক কথাও শুনছে।"
বাণী বললেন, "চিন্তাটা বুবকাকে নিয়ে আমার সর্বক্ষণ থাকে। কিন্তু বুবকার থেকেও আমার বেশি চিন্তা ওর দাদাকে নিয়ে। হি ইজ স্ট্রাগলিং। এবং সেটা চোখে লাগছে।"
রিখিয়া বাণী মিত্রের দিকে তাকাল। কিছু বলবে নাকি একটু ভাবল। তারপর চুপ করে গেল।
বাণী বললেন, "অলকার কোনও খবর পাওয়া গেছে?"
রিখিয়া মাথা নাড়ল। তারপর একটু হেসেই সিরিয়াস হয়ে গেল।
বাণীর সেটা চোখে পড়ল। বললেন, "হাসলি কেন?"
রিখিয়া মাথা নাড়ল, "না না, তেমন কিছু না।"
বাণী বললেন, "গাঁট্টা খাবি রিখিয়া। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। বল।"
রিখিয়া এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে মিডিয়া গেছিল। দীপ্ত রায় সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। কোন মিডিয়া আবার বাজারে খবর ছেড়ে দিয়েছে, দীপ্ত নাকি অন্য কোনও মেয়েকে ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল। তা নিয়েই অলকার রাগ।"
বাণী বললেন, "ছিল নাকি অন্য কোনও মেয়ে? এটা কি সত্যি? খবরটা অবশ্য আমিও পাব অমিতকে ফোন করলেই। টিভিতে তো চ্যানেলগুলো খোলা যাচ্ছে না। সব চ্যানেলেই দীপ্ত অলকার রগরগে সব গল্প বেরোচ্ছে। বৈভবীর সময়েও বেরিয়েছিল।"
বাণী থেমে গেলেন।
রিখিয়া অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সে তো তিন-চার দিন। আবার নতুন কিছু না কিছু ইস্যু উঠে আসবে।"
বাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই সব কিছু জানে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিডিয়া যে নোংরামিগুলো করে সেগুলো ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। ওরাও যে পার্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি সেটা ওরা জানে না বোধহয়। বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টের সময় কোন একটা চ্যানেল মনে আছে ঘুরিয়ে আমার দিকেও একটা ইঙ্গিত করেছিল?"
রিখিয়া বলল, "ওরা তো পুলিশের আগেও তদন্ত করে ফ্যালে। রিডিকিউলাস।"
তরুণ দাস নক করলেন। বাণী বললেন, "এসো। হঠাৎ শ্যুটের মাঝে অফিসে এলে, কী ব্যাপার? এনিথিং সিরিয়াস?"
তরুণ চেয়ারে বসে একবার রিখিয়ার দিকে, আর-একবার বাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুবকার সঙ্গে যে ছেলেটি থাকে সে অলকার হাজব্যান্ড ছিল তুমি জানো বাণী?"
বাণী বললেন, "না। আমাকে তো কেউ বলেনি। তোমায় কে বলল?"
তরুণ বললেন, "আমি ভেবেছিলাম তুমি জানবে, তুমি তো সবই জানো।"
বাণী বললেন, "মাঝে মাঝে ইম্পরট্যান্ট ব্যাপারগুলোই মিস করে যাই। এটাও সেরকমই ধরে নাও।"
তরুণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "ছেলেটা আজ একটা কাণ্ড করেছে।"
বাণী বললেন, "কী?"
তরুণ বললেন, "দীপ্ত রায়ের গাড়িতে ইট মেরেছে।"
বাণী বললেন, "সে কী!"
তরুণ বললেন, "আজ্ঞে। এবং মেরে-টেরে ভদ্রলোক দিব্যি বুবকার সঙ্গে শ্যুটিংয়ে বসে আছে। এবার তিনি এখানে থাকলে মার্কেটে রটবে আমরা ওনাকে শেল্টার দিয়েছি, তেনাকে তাড়াতে গেলে তোমার ছেলেও যে-কোনো সময় বেঁকে বসবে। না পারছি রাখতে, না পারছি ওগরাতে। এবার তুমি বলো কী করবে?"
বাণী মাথায় হাত দিলেন। বললেন, "যেই ভাবলাম বুবকাকে একটু একটু করে আবার কাজে এনগেজ করে দেব, এদিকে এই একটা জট পেকে গেল ঠিক। বলছি না, খুব খারাপ সময় যাচ্ছে!"

রিখিয়া বলল, “একটা পুজো দিয়ো দিদি মায়ের কাছে।”
বাণী বললেন, “পুজো তো নাহয় দেব, কিন্তু এবার কী করব?” তরুণের দিকে ফিরলেন বাণী, “ছেলেটা কী করছে এখন?”
তরুণ বললেন, “দিব্যি ভালোমানুষের মতো শ্যুট দেখছে। দেখে মনেই হচ্ছে না এত কিছু করে এসেছে।”
বাণী বললেন, “আমি যদি পুলিশে খবর দি? ছেলেটাকে নিয়েও যাবে, বুবকাও কিছু করতে পারবে না। ভাববে ছেলেটাকে খুঁজতেই পুলিশ এসেছিল আসলে।”
তরুণ বললেন, “স্টুডিওতে পুলিশ আসাটা ভালোভাবে যাবে না। দীপ্ত রায় কন্ট্রোভার্সিতে আমাদের নাম জড়িয়ে যাবে। লোকজন এও ভাবতে পারে আমরাই অলকাকে গুম করেছি।”
বাণী উঠলেন, “এখানে বসে থাকলে হবে না। স্টুডিওতে চলো।”

১৯

“যাকে ভালোবাসি, যাকে ভেবেছিলাম সে আমায় ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে পারে না, যদি দেখতে পাই সে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, তখন সব কিছু শেষ হয়ে যায় গুরু। মনে হয় সবাইকে গুলি করে মেরে দি।”
শুভ বুবকার গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে ছিল।
রাত আড়াইটে। শহরের রাস্তায় গাড়ি সাইড করে মদ খাচ্ছে তারা।
বুবকা বলল, “তুমি ইটটা মারলে কোন বুদ্ধিতে? দীপ্ত রায়ের এতে কোন বালটা ছেঁড়া যাবে? গাড়ির তো ইন্স্যুরেন্স থাকে, তাও যদি গাড়ির ভিতর দীপ্তদা থাকত তাহলে একটা কথা ছিল। কী যে করো না!”
শুভ বলল, “গাড়িটা দেখেই মাথা গরম হয়ে গেল গুরু। যখনই মনে পড়ল ওই গাড়িটা করেই অলকাকে নিয়ে যেত শুয়োরের বাচ্চাটা! মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না।”
বুবকা বলল, “লাভ কী হল, এখন তো কদিন শ্যুটিং দেখতেও নিতে পারব না তোমায়।”
শুভ হাসতে লাগল, “কোনও চিন্তা নেই, আমি ওই সময় গাড়িতে বসে থাকব। আর মামা যদি ধরে নিয়ে যায়, তাহলে তো বেঁচেই গেলাম, কদিন ফোকটে সরকারি খানা খেয়ে আসা যাবে।”
বুবকা বলল, “ওই আনন্দেই থাকো। সরকারি ক্যাল তো আর খাওনি।”
শুভ বলল, “খেয়েছি একবার। কী কেস ভুলে গেছি, তবে খেয়েছিলাম লাঠির বাড়ি। ভুলিনি এখনও, বেজায় ব্যথা হয়েছিল। তবে যাই বলো গুরু, তোমার মা কিন্তু খুব ভালো, কী সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন এখন কদিন শ্যুটিংয়ে এসো না!”
বুবকা বলল, “যুক্তিটা তো বুঝিয়ে বলল। দাদা থাকলে আজ ঝামেলা হত যদি কিছু বলতে আসত। মা বলে কিছু বললাম না।”
শুভ বলল, “যাক গে, বলেছেন যখন, তখন মেনে নিলাম। যাব না স্টুডিওর ভিতর। তবে তুমি কিন্তু গুরু অ্যাক্টিংটা খাসা করো। যখন গিয়ে দাঁড়াও, তখন মনেই হয় না আঠেরো ঘণ্টা বাবার প্রসাদ আর মালের ভরসায় বেঁচে থাকো। আমি হলে তো ওই লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন শুনেই ভিরমি খেয়ে যেতাম। কেমন নেশার মতো হয়ে গেছিল শ্যুটিং দেখা।”
বুবকা হাসতে লাগল, “যাহ্‌শালা, এটা খিস্তি মারলে না ভালো বললে?”
শুভ বলল, “ভালো বললাম। তোমার গুরু রক্তে অ্যাক্টিং আছে।”
বুবকা বলল, “রক্তে আছে নাকি জানি না। বাপ ঠাকুরদা তো কেউ অ্যাক্টিং করেনি। যাই হোক, অলকার কোনও খোঁজ পেলে?”
শুভ বলল, “না গুরু, আমি ওর বাপের বাড়িতেও খোঁজ করেছিলাম, কোনও লাভ হল না। অবশ্য খোঁজ পেয়েই বা কী হবে? সে পাখি আর ঘরে ফিরবে না।”
বুবকা বলল, “কী করে জানলে? তুমি অন্তর্যামী নাকি?”

শুভ বলল, “গুরু যা করেছিলাম তারপর কি আর ফেরে? ওই দিনটার আগে গায়ে হাত তুলিনি কোনও দিন। ভাবতেই পারিনি। কী যে হল সেদিন, মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না!”

বুবকা বলল, “তোমাকে দোষও দেওয়া যায় না অবশ্য। মাথা গরম হবারই কথা।”

শুভ বলল, “নেতাগুলোও কম হারামি না গুরু। আমাকে রোজ টোন করত। মাথা গরম করাত। যেই দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে ঝামেলাটা করলাম, শালা যেতেই তাড়া দিয়ে দিল। গরিবদের জন্য কোনও নেতা আসে না আসলে। সব টাকার ভক্ত।”

বুবকা গাড়ি স্টার্ট দিল।

শুভ বলল, “কোথায় যাবে? বোতল তো ফাঁকা হতে বহু দেরি!”

বুবকা বলল, “দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে যাব।”

শুভ শুয়ে ছিল। উঠে বসল, “কী করতে?”

বুবকা বলল, “কথা বলব। তুমি শুধু মাথা গরম না করে চুপচাপ বসে থাকবে। একটা কথাও বলবে না।”

শুভ বলল, “মাথা গরম হয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে তো! তার চেয়ে এক কাজ করো, আমি গাড়িতে বসি, তুমি কথা বলো। তবে মালটা এখন ঘুমাচ্ছে তো। ওই ফ্ল্যাটে ঢুকতে তো দেবে না। তা ছাড়া, নিচে সিকিউরিটি আছে।”

বুবকা বলল, “অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের দেওয়াল টপকাব। ওদিকটার দেওয়াল নিচু। সিকিউরিটি বুঝবে না কিছু। তুমি গাড়িতে থেকো।”

শুভ বলল, “ওরে বাবা, সে তো কঠিন ব্যাপার। যদি ধরা পড়ো?”

বুবকা হাসল, “দেখাই যাক না।”

২০

সকাল সাড়ে এগারোটা। চা খেয়ে মুখ বিকৃত করলেন বরাট। থানার চা খেয়ে সুখ নেই। রোজই ভাবেন বাড়ি থেকে আসার সময় ফ্লাস্কে চা নিয়ে আসবেন, কিন্তু কোনও দিনই হয় না। তাড়াহুড়োয় ঠিক গোলমাল হয়ে যায়।

ফোনটা বাজছে। আননোন নম্বর, বরাট ফোন তুললেন, “কে বলছেন?”

“রনি বলছি স্যার থ্রি নিউজ থেকে। ভুলে গেলেন? সেদিন জাকারিয়া স্ট্রিটে কাবাব খাওয়ালেন?”

বরাটের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, “এটা আবার কোন নাম্বার থেকে ফোন করছ?”

“স্যার এটা জিও নাম্বার। ফ্রি পেয়েছি, যদ্দিন কথা বলা যায়।”

“উফ, তোমাদের এই জিও নাম্বারের জ্বালায় অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সবাই শুধু আননোন নাম্বার থেকে ফোন করে।”

“তা যা বলেছেন স্যার। আমারও এক অবস্থা।”

“এবার ঝোলা থেকে বেড়ালটা বের করো তো বাওয়া। ফোন করলে কেন? কোন খবর বের করতে চাও?”

“স্যার দুটো ব্যাপারে ফোন করছি।”

“হুঁ। বলে ফ্যালো।”

“এক, অলকানন্দা মুখার্জির কী হল?”

“ওহ, বুঝেছি, সকাল থেকে তুমি তিন নম্বর।”

“সে কী স্যার, সবাই সব কিছু জেনে গেল নাকি?”

“তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। কেউই কিছু জানতে পারেনি। কারণ আমিও অন্ধকারে এখনও।”

“একটাও কোনও ক্লু পাননি? কল লিস্ট চেক করেছিলেন ফোনের?”

“হ্যাঁ। আর পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক। ইন ফ্যাক্ট সেদিন কাউকে ফোনই করেনি দেখছি।”

“স্যার, আর-একটা প্রশ্ন করি?”

"হুঁ।"
"দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে একজন মহিলা ছিল। কে সে?"
"আরে ভাই, দীপ্ত রায় তো আমাদের বোন বলে পরিচয় করাল। দূর সম্পর্কের বোন, শিলিগুড়িতে থাকে নাকি!"
"হা হা। দেখেছেন স্যার, ঠেলায় পড়লে লোকে বেশ্যাকেও নিজের বোন বানিয়ে দেয়। মেয়েটা এসকর্ট সার্ভিসে কাজ করে।"
বরাট একটু নড়েচড়ে বসলেন, "তুমি এত জানলে কী করে?"
"স্যার আমাদের কাজই তো জানা। ইনফরমেশন টেকনোলজি।"
বরাট বললেন, "হুঁ, সে জেনেছ ভালো করেছ, কিন্তু অলকানন্দা মিসিং-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে নাকি প্রশ্ন সেটাই। না হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ এই সার্চে সবথেকে বেশি জোর আমায় দীপ্ত রায়ই দিচ্ছে। খুব আপসেট হয়ে পড়েছে।"
"ফেক নয় তো?"
"না। হলে বুঝতাম। ইয়ে পেকে গেল ভাই এই কাজ করতে করতে।"
"আচ্ছা স্যার, এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা করি?"
"ও বাবা, এতক্ষণে শুধু প্রথম প্রশ্নটা করলে?"
"স্যার, আপনি আমার জীবনের দেখা প্রথম এবং শেষ পুলিশ যে রিপোর্টারকে নিজের টাকা খরচ করে কাবাব খাওয়ায়। আপনার ওপর তো একটু বেশি আশা থাকবেই।"
"থাক থাক, আর বার খাইয়ে আকাশে তুলতে হবে না। বলো কী জানতে চাও।"
"বলছি স্যার, বৈভবী আর আগরওয়ালের গাড়িকে যে ট্রাকটা ঠুকেছিল, তার ড্রাইভার এখন পুলিশ কাস্টডিতে আছে না জামিন পেয়ে গেছে?"
বরাট চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন, প্রশ্নটা শুনে চা-টা গিলতে পারলেন না, উঠে বেসিনে গিয়ে পুরোটা ফেলে দিলেন, বললেন, "হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?"
"স্যার কেউ কেউ মনে করছে অলকার হারিয়ে যাওয়া আর বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টটা ইন্টারলিংকড।"
"কে মনে করছে?"
"অনেকেই স্যার। মিডিয়া মনে করছে, পুলিশেও কেউ কেউ মনে করছে, এই কেসের চার্জ আপনার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে সেরকমও একটা খবর শুনছিলাম।"
বরাটের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল, বললেন, "কে বলল? নাকি আমাকে ব্লাফ মারছ?"
"ওই যে বললাম স্যার, আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনাকে ব্লাফ মারতে যাব কেন বলুন?"
বরাট বললেন, "ড্রাইভারটা তো এখন জেলে আছে। আলিপুরে সম্ভবত। জামিন হয়েছে কি না বলতে পারব না।"
ওপাশ থেকে হাসির শব্দ এল, "আগের উইকে জামিন হয়েছে স্যার। আপনি জানেন না দেখে অবাক হলাম।"

২১

রিমি খাটে শুয়ে নিঃশব্দে কাতরাচ্ছিল। তার হাত আর পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া। পরনে একটা সুতোও নেই। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ।
অফিস থেকে ফিরে একগাদা মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপ্ত। রিমিও ঘুমিয়েছিল।
মাঝরাতে উঠে দীপ্ত হঠাৎই রিমির মাথার চুল ধরে ঘুম থেকে তুলে হিসহিস করে বলল, "আমি জানি, তুই ঠিক জানিস অলকা কোথায় গেছে। খুব পিরিত দেখেছি আমি তোদের মধ্যে। বল কোথায় গেছে।"

ঘুম থেকে তুলেই আকস্মিক এই আক্রমণে রিমি প্রথমে হতচকিত হয়ে গেছিল। সামলাতে খানিকটা সময় লাগল তার। তারপর বলল, "আমার কোনও ক্ষতি হলে কিন্তু আপনাকে দায় নিতে হবে। বুঝতেই পারছেন আমি আপনার কেনা চাকর না।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তর মাথায় রক্ত উঠে গেল। রিমিকে মারতে মারতে খাটে শুইয়ে হাত পা বেঁধে দিল সে। মুখে কাপড় গুঁজে দিল। তারপরেই সিগারেট দিয়ে রিমির বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত তৈরি করতে করতে বলতে লাগল, "মাগি তোর শরীর বেচে খাওয়া না? এমন অবস্থা করে দিচ্ছি আর শরীর বেচার কথাও ভাবতে পারবি না সারাজীবন।"

রিমি একসময় অজ্ঞান হয়ে গেছিল। যখন জ্ঞান হল তখন দীপ্ত মদ খাচ্ছে বসে বসে। অসহ্য যন্ত্রণা সারা শরীরে। রিমি উঠল না। মড়ার মতো পড়ে রইল। কলিং বেল বাজল।

দীপ্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করল। বেডরুমটা বন্ধ করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলল সে। বুবকা দাঁড়িয়ে। দীপ্ত ভুরু কুঁচকাল, "তুমি এত রাতে? ঢুকতে দিল কে?"

বুবকা হাসল, "একটা ভালো মদ খাবার জায়গা পাচ্ছিলাম না দীপ্তদা। স্কচ আছে ভালো?"

দীপ্ত বলল, "রাতের শেষের দিকে তোমার এতদিন পরে আমার সঙ্গে মদ খাবার কথা মনে পড়ল?"

বুবকা বলল, "বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবে?"

দীপ্ত দরজা ছেড়ে দিল।

বুবকা ড্রয়িং রুমে সোফায় বসল। দীপ্ত দরজা বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বুবকার সামনের সোফায় বসে টিভি চালিয়ে দিল। স্পোর্টস চ্যানেল। কোন একটা ক্রিকেট খেলার হাইলাইটস চলছে।

বুবকা বলল, "এই টিভিটা নতুন নিলে?"

দীপ্ত বলল, "হ্যাঁ। বলো কী বলবে?"

বুবকা বলল, "মিউট করো। কত নিল?"

দীপ্ত টিভিটা মিউট করে বলল, "ভুলে গেছি।"

বুবকা বলল, "গাড়ির কাচের খবর কী? ঠিক করেছ?"

দীপ্ত কয়েক সেকেন্ড বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনলাম শুভ তোমার সঙ্গেই থাকে আজকাল। বুদ্ধিটা কার ছিল? তোমার?"

বুবকা টিভি থেকে মুখ সরিয়ে দীপ্তর চোখে চোখ রাখল, "বৈভবীকে আগরওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে খুন করার বুদ্ধিটাও ভালো ছিল। কার ছিল বুদ্ধিটা? তোমার?"

দীপ্ত উঠল। ডাইনিং টেবিল বড়ো ড্রয়িং রুমের এক কোণে। টেবিলের ওপর একটা স্কচের বোতল ছিল, দীপ্ত বোতল আর দুটো গ্লাস এনে বসল। বুবকাকে একটা গ্লাস দিয়ে বলল, "জল দেব না র খাবে?"

বুবকা বলল, "একার বুদ্ধি তোমার? না সঙ্গে কেউ ছিল?"

দীপ্ত পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল, "কয়েক লাখ টাকা ইনভেস্ট করে নিজের সিনেমার অন্যতম লিড অ্যাক্ট্রেসকে মেরে ফেলব? অ্যাপ্লাই সাম কমন সেন্স বুবকা। তোমার প্রেমিকা ছিল, তুমি প্রেমিকা থাকতেও দেবদাস হয়ে ঘুরে বেরিয়েছ, মারা যাবার পরও দেবদাস হয়ে ঘুরছ। একটু বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করতে বলছি জাস্ট। হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য টার্ম 'অনার কিলিং'? শুনেছ?"

বুবকা গ্লাসে চুমুক দিল, "এই কনসেপ্টটা আগেও ইনজেক্ট করার চেষ্টা হয়েছে আমার মধ্যে। ইন ফ্যাক্ট আমিও তাই ভাবতাম।"

দীপ্ত সিগারেট খেতে গিয়ে থমকাল, "ভাবতে মানে?"

বুবকা হাসল, "এখন ভাবি না। শুধু ভাবি একটা রাইভ্যালরির জন্য একটা নির্দোষ মেয়েকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করে খুন করতে দুবার ভাবো না তোমরা?"

দীপ্তর চোখ লাল হয়ে গেছিল, সে বুবকার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "তোর ওই মাগি যদি রাস্তায় এসে দাঁড়াত পাঁচশো টাকাও রেট দিত না কেউ বুঝলি? বুড়ি ছিবড়ে হওয়া মাল ছিল একটা। গান্ডুর মতো ওর জন্য নিজের কেরিয়রটা নষ্ট করছিস। তোর তো ভালোই হল বে। ওর জন্য অনেক বেশি টাকা খরচ করেছি। কম্পেনসেট করে দিস।"

বুবকা গ্লাসটা ছুড়ে মারল দীপ্ত রায়ের দিকে। দীপ্তর হাতের কাছে একটা পেপারওয়েট ছিল। সেটা ছুড়ে মারল বুবকার দিকে। একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সেটা। বুবকা উঠে দীপ্তর পেটে একটা সপাটে লাথি মারল। দীপ্ত ক্লান্ত ছিল। বুবকার লাথিটা নিতে পারল না। প্রবল রাগের মাথায় বুবকা পরপর ঘুসি মারতে লাগল দীপ্তর মুখে। দীপ্তর ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে বেশ কয়েকবার লাথি ঘুসি মারার পর বুবকা দীপ্তকে ছেড়ে দিল। টেবিল থেকে নিজের গ্লাসটা নিয়ে স্কচটা শেষ করল। দরজা খুলে বেরোতে যাবে, দীপ্ত ওখান থেকেই চ্যাঁচ্যাল, "হেই সন অফ আ বিচ, শুনতে যখন চেয়েছিস তখন জেনেই যা, দ্য প্রোজেক্ট ওয়াজ কো-প্রোডিউসড বাই মিস্টার তথাগত মিত্র। বেস্ট অফ লাক। যা এবার বাল।"

বুবকা একটু থমকে দাঁড়াল।

তারপর বেরিয়ে গেল।

২২

"গল্প লেখার সবথেকে খারাপ জিনিস কী জানেন?"

দীপ্তানুজ প্রশ্ন করল। তারা লোলেগাঁও পৌঁছেছে কিছুক্ষণ আগে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হ্যাংগিং ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। প্রীতিকা নুনের প্যাকেট নিয়েছে ব্যাগে। জোঁকের ভয় এখানে খুব।

তথাগত বলল, "কী?"

দীপ্তানুজ বলল, "অনেক কষ্ট করে লিখলাম, তারপর যদি কেউ বলে গল্পটা কোথাও শুনেছে।"

তথাগত বলল, "প্লটের মিল তো অনেক সময় কাকতালীয় ভাবে মিলে যেতেও পারে। অবশ্য অনেকেই আছে মিল না থাকলেও কষ্টকল্পনা করে মেলাতে ভালোবাসে। এটা ওটার মতো বলার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে।"

প্রীতিকা বলল, "দ্যাট ফেমাস সিনেমাটা, কী যেন নাম, অরিত্রর সেকেন্ড সিনেমাটা, ওর ব্যাপারে যে কথাটা উঠেছিল সেটা মনে আছে? গোটা সিনেমাটার গল্পটাই নাকি আসলে রুদ্রশেখরের একটা গল্প অবলম্বনে ফার্স্ট টু লাস্ট টোকা। রুদ্রশেখর অদ্ভুতভাবে চেপে গেল সে সময়টা। নইলে ব্যাপারটা নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি।"

তথাগত ক্যামেরাটা নিয়ে জঙ্গলের ছবি তুলছিল, প্রীতিকার কথায় অবাক হয়ে বলল, "তুমি তো দেখছি এসব ব্যাপারে আমার থেকেও বেশি জানো। কোত্থেকে শুনলে বলো তো?"

প্রীতিকা বলল, "গোটা ইন্ডাস্ট্রি জানে। শুধু তুমিই জানো না।"

দীপ্তানুজ বলল, "আমার ট্রুথ হাউজের গল্পটা একজনকে শুনিয়েছিলাম। যেই ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ারের পার্টটা শুনেছে, বলছে এরকম একটা সিনেমা নাকি হয়েছে। ভাবুন জাস্ট, ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার নিয়ে আর কোনও সিনেমা বানানো যাবে না? অথচ এই সিনেমাটার মেইন কনসেপ্টটা কিন্তু ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার না, ট্রুথ হাউজ।"

প্রীতিকা বলল, "কোন সিনেমাটা হয়েছে?"

দীপ্তানুজ নামটা বলল।

তথাগত বলল, "শিট, এ তো অন্য প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে গেল। সিনেমাটা দেখা যাবে? তাহলে অ্যাটলিস্ট কম্পেয়ার করে দেখা যেত।"

দীপ্তানুজ বলল, "কলকাতায় গিয়ে নাহয়..."

তথাগত ভ্রূ কুঁচকাল, “ওকে, ভুলো না, ফুলপ্রুফ না হলে মাকে শোনাব না, তরুণ দাস বড়ো খুঁত ধরা ডিসগাস্টিং একটা লোক।”
প্রীতিকা বলল, “সেক্ষেত্রে ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার না রেখে অন্য কিছুও তো রাখা যেতে পারে?”
তারা হ্যাংগিং ব্রিজে উঠল। একটু হেঁটেই প্রীতিকা বলল, “আমার শুধু মনে হচ্ছে পড়ে যাব।”
তথাগত প্রীতিকার হাত ধরল।
দীপ্তানুজ বলল, “ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার না রেখে কী রাখব তাহলে?”
তথাগত বলল, “ভাবো ভাবো, ব্রেইন স্টর্মিং করো। ট্রুথ হাউসের কনসেপ্টটা রেখে যেটা খুশি ভাবো। ইউ আর ফ্রি টু থিংক। শুধু বুঝে নিয়ো গল্প যেন মৌলিক হয়। নইলেই ঝামেলা।”
ব্রিজ থেকে নেমে প্রীতিকা বলল, “এই ব্রিজটায় চড়ার জন্য এত দূর এলাম?”
দীপ্তানুজ বলল, “এখন তো মেঘ আছে, একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব ভালোমতো দেখা যায়।”
তথাগত বলল, “সকাল থেকে আজ কী হয়েছে কে জানে, মোবাইলের টাওয়ার পাচ্ছি না, তোমরা কেউ পাচ্ছ?”
দীপ্তানুজ কাঁচুমাচু মুখে বলল, “আমার ফোনটা কাল রাতে চার্জ দিতে ভুলে গেছিলাম। সকালে বেরোনোর সময় দেখি সুইচড অফ হয়ে পড়ে আছে।”
প্রীতিকা বলল, “আমার আর তোমার তো একই সার্ভিস প্রোভাইডার। অন্য কোনও সিম থাকলে ভালো হত।”
সামনে এক ভদ্রলোক জঙ্গলে ফটো তুলতে ঢুকেছিলেন, লাফাতে লাফাতে বেরোলেন, দু পায়ে দুটো জোঁক জড়িয়ে ধরেছে, প্রীতিকা তাড়াতাড়ি গিয়ে নুন ছিটিয়ে দিল। তথাগত সন্দিগ্ধ চোখে নিজের জুতোজোড়া দেখে নিল। বলল, “এইখানে শ্যুটের কথা কিছুতেই ভাবা যাবে না। এত জোঁকে কীভাবে কাজ করব?”
দীপ্তানুজ বলল, “বাবুনবাবুকে তাহলে বলে দিতে হবে।”
তথাগত বলল, “কিন্তু তোমার গল্প ফাইনাল করো আগে। নইলে তো এখানে আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে।”
দীপ্তানুজ বলল, “আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আপনিও একবার আগের সিনেমাটা দেখে নিন।”
তথাগত বলল, “বেশ।”
তারা গাড়িতে গিয়ে উঠল। প্রীতিকা বলল, “লাঞ্চের কথা ভাবছ না তো কেউ? ব্রেকফাস্ট তো হেভি করেই বেরিয়েছিলাম।”
তথাগত বলল, “আমার তো এখানে কিছুক্ষণ পর পরই খিদে পাচ্ছে। যাই হোক, তাতে সমস্যা নেই, লাভায় গিয়ে খেয়ে নেওয়া যাবে দেন।”
তথাগতর ফোনটায় একটা মেসেজ এল। তথাগত বলল, “এই দ্যাখো, টাওয়ার লুকোচুরি খেলছে এদিকে আবার এসএমএস আসছে। কে দেখি... ওহ ইদ্রিশ, লিখেছে কল ইমিডিয়েটলি, আর্জেন্ট।”
তথাগত প্রীতিকার দিকে তাকাল।
দীপ্তানুজ বলল, “কোনও হোটেলে দাঁড়ানো যাক তাহলে। আপনি ফোনটা সেরে নিন।”

২৩

বাণীর ঘুম ভেঙেছে সকাল সাড়ে এগারোটায়। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে দেখলেন বুবকা কোথাও যাবার জন্য জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে বসে আছে।
বললেন, “এখন উঠলে? কোথাও যাবে?”
বুবকা কাগজ পড়ছিল। শুধু বলল, “হ্যাঁ।”
বাণী বললেন, “শ্যুট কটা থেকে আজ?”
বুবকা বলল, “সাতটা।”

বাণী বললেন, “এখন কেমন লাগছে? ইন্টারেস্ট পাচ্ছ কিছু?”
বুবকা বলল, “হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি বেরোব এখন।”
বাণী বললেন, “খেয়ে নিয়ে বেরোও।”
বুবকা বলল, “বাইরে খেয়ে নেব। দেরি হয়ে যাবে।”
বাণী উঠে রান্নাঘরে গেলেন। রান্নার মেয়েটার রান্না সবে শেষ হয়েছে। ওখান থেকেই বললেন, “খেয়ে যাও। রান্না হয়ে গেছে।”
বুবকা কিছু বলল না।
বাণী মেয়েটাকে বলে দিলেন বুবকাকে খেতে দিতে।
টেবিলে এসে বসলেন। বললেন, “তোমার বাবার সঙ্গে শেষ কবে তোমার দেখা হয়েছে?”
বুবকা বলল, “ভুলে গেছি।”
বাণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, “একদিন বাড়ি থেকো। কথা বোলো। এক কাজ করা যাক, এই রবিবারটা আমরা সবাই বাড়ি থাকি। লাঞ্চে কোথাও সবাই একসঙ্গে খেতে যাই। আগে যেমন যেতাম। আমরা প্রতি রবিবারেই এটা করতে পারি। ফার্স্ট ডে কোথায় যাব সেটা তুমি ঠিক কোরো।”
বুবকা বলল, “ফার্স্ট ডে-টা বউদি ঠিক করুক। নিউয়েস্ট ইন দ্য ফ্যামিলি, ওকেই বোলো।”
বাণী খুশি হলেন, বললেন, “ওকে, ডান। ওরা পরশু ফিরছে। রবিবারে কারও কোনও প্রবলেম হবে না আশা করি।”
বুবকাকে ভাত দিল মেয়েটা। বুবকা খেতে শুরু করল। বাণী মোবাইল ঘাঁটছিলেন। ফোন অন রেখেই ঘুমাতে যান, তবে সাইলেন্ট থাকে।
ভ্রূ কুঁচকে নাম্বারগুলো দেখতে দেখতে একটা নাম্বারে কলব্যাক করলেন তিনি, কয়েক সেকেন্ড কথা বলার পরই ফোনটা কেটে বুবকার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কাল দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকে ওকে মারধর করে এসেছ?”
বুবকা খাচ্ছিল। খাওয়া বন্ধ না করে নিস্পৃহ গলায় বলল, “না তো, কে এইসব রটাচ্ছে?”
বাণী বুবকার দিকে তাকালেন। ছোটোবেলায় স্কুলে মারপিট করে এসেও ছেলেটা এভাবেই ঠান্ডা থাকত। বললেন, “আমাকে যে ফোন করেছে সে তো বাজে খবর দেবে না। তুমি কেন স্বীকার করছ না বুবকা?”
বুবকা মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, “ব্রেকিং নিউজে দেখাচ্ছে?”
বাণী বললেন, “তুমি একজন সেলিব্রিটি হয়ে একটা হাউসের মাথাকে মেরে চলে আসবে, আর ভেবেছ এই খবরটা কেউ জানবে না? কেন করলে এরকম?”
বুবকা বলল, “দীপ্ত রায় স্বীকার করেছে বৈভবীকে মার্ডারের পিছনে ওর হাত আছে।”
বাণী বুবকার দিকে তাকালেন। বুবকার কোনও উত্তেজনা নেই। আবার খাওয়া শুরু করেছে।
বাণী বললেন, “এটা তুমি ওকে মেরে ধরে জানতে পারলে?”
বুবকা বলল, “আরও জানতে পারলাম এই প্ল্যানে ওর সঙ্গে দাদাও ছিল।”
বাণী আড়চোখে দেখলেন রান্নার মেয়েটা আছে নাকি। মেয়েটা রান্নাঘরেই আছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, “তুমি বুঝতে পারছ এটা একটা ট্র্যাপ? দীপ্ত মিথ্যে বলছে? এই পুরো ব্যাপারটাই দীপ্ত করিয়েছে যাতে তোমার সঙ্গে তোমার দাদার ঝামেলা বেধে যায়। আমাদের ফ্যামিলিতে যত ঝামেলা থাকবে তত ও কমফর্টেবল পজিশনে থাকবে। সেটা বোঝো?”
বুবকা বলল, “বুঝি। আমি তো কোনও রিঅ্যাক্ট করিনি। করেছি কি?”
বাণী অসহায় বোধ করলেন। এই বুবকাকে তিনি চিনতে পারছেন না। এর চেয়ে ঝামেলা করত, চ্যাঁচামেচি করত, তাহলে অন্তত বুঝতে পারতেন বুবকা রেগে আছে। এভাবে তো বুবকাকে পড়াই যাচ্ছে না!
বললেন, “তুমি খেয়ে কোথায় যাবে?”

বুবকা বলল, “বলা যাবে না।”
বাণী বললেন, “কেন বলা যাবে না জানতে পারি?”
বুবকা উঠল, “আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি বেরোই।”
অনেকটা খাবার না খেয়েই বুবকা উঠে গেল। বাণী বললেন, “এমন কিছু কোরো না, যাতে যেটুকু সম্মান অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও নষ্ট হয়ে যায়।”
বুবকা মুখ ধুচ্ছিল।
মুখ মুছে বাণীর সামনের চেয়ারে এসে বসে বলল, “মা, আমি জাস্ট তোমাকে একটা ফেয়ার চান্স দিতে চাই। তুমি শুধু আমাকে একটা কথা জানাও। বৈভবীর মার্ডারে তুমি কি যুক্ত আছ না নেই? আশা করব মিথ্যে কথা বলবে না।”
বাণী বুবকার চোখে চোখ রেখে বললেন, “মাকে খুনি বলতে চাইছ তুমি? তুমি ভুলে যেয়ো না সিপিকে বলে আমিই বৈভবীর কেসটা রি-ওপেন করিয়েছি।”
বুবকা হাসল, “বিশ্বাস করো, অন্য কারও থেকে যখন জানতে পারি ঘরের কেউ ব্যাকস্ট্যাব করেছে, খুব কষ্ট হয়।”
বাণী বললেন, “যেখানে যাচ্ছিলে যাও। দেরি হয়ে যাবে।”
বুবকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, “রবিবারের প্রোগ্রামটা বউদির সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে দিয়ো কোথায় হবে। এলাম।”
বাণী চুপ করে বসে থাকলেন।
বুবকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২৪

“মিস্টার বরাট, আপনি একটু বলবেন বৈভবী এবং আগরওয়ালের অ্যাক্সিডেন্ট কেসটার জিস্টটা? বেশি সময় না নিয়ে অবশ্যই।”
এসি চলছিল। তবু বরাটের ঘাম হচ্ছিল। তিনি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, “স্যার, উনত্রিশে মার্চ রাতে ওঁরা দুজন মন্দারমণি যাচ্ছিলেন।”
“এক মিনিট। আপনি কী করে জানলেন ওঁরা মন্দারমণিই যাচ্ছিলেন?”
“স্যার, ড্রাইভারকে আগরওয়াল সেদিন বিকেলে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন মন্দারমণি যাবেন।”
“ওকে। মানে প্ল্যানটা চেঞ্জ হলেও কেউ কিছু জানতেন না, তাই তো?”
“হ্যাঁ স্যার। আমরা ড্রাইভারের বক্তব্যটাতে গুরুত্ব দিয়েছি।”
“বেশ, গো অ্যাহেড।”
“এর পরের ঘটনা স্যার তো সবাই জানে। কাগজেও বেরিয়েছে।”
“কাগজে বেরোনো আর আপনার মুখ থেকে শোনার মধ্যে অনেক তফাত আছে বরাট। আপনি বলে যান। আমরা শুনছি।”
“এর পরে সাঁতরাগাছি পেরিয়ে বম্বে রোডে পড়ে ওরা অ্যাক্সিডেন্টটা করে।”
“কী করে, বলুন।”
“মানে, গাড়িটা রং সাইড থেকে একটা ট্রাককে ওভারটেক করতে যায়, ট্রাকটা বোঝেনি, আচমকা লেগে যায় গাড়িতে। গাড়িটা পালটি খায়। দুজনেই স্পট হয়ে যায়।”
“হুঁ। গুড। গাড়ির ড্রাইভারকে কী কেস দেওয়া হয়েছিল?”
“ফাইল দেখতে হবে স্যার।”
“ফাইল দেখতে হবে কেন?”
“স্যার অনেক দিন তো হয়ে গেল, এখন ঠিক মনে পড়ছে না আর কি।”

“বাহ। খুব রেসপন্সিবল লোক তো আপনি। ভেরি গুড। তা ভুল করেও নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা করা হয়নি?”

“ইয়ে স্যার মনে পড়ছে না।”

“আমি মনে করিয়ে দেব বরাটবাবু? একটা পেটি কেস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। খুবই পেটি কেস, ছেলেটার জামিন পর্যন্ত হয়ে গেছে। জানেন আপনি জামিন হয়ে গেছে?”

“না স্যার, জানি না।”

“এক্সপেক্টেড। আচ্ছা আপনি কী করেন থানায় এসে? নাকি সারাদিন ট্রাক ধরেন আর নোট গোনেন?”

“ছি ছি স্যার এসব কী কথা!”

“এই কেসটা কত টাকায় ডিল হয়েছিল? একজ্যাক্ট অ্যামাউন্টটা কত?”

“এসব কী বলছেন স্যার!”

“আপনার ভুলে যাবার বহর দেখে তো আরও অনেক কিছুই মনে পড়ছে। এই মুহূর্তে আপনাকে এই কেস থেকে রেহাই দেওয়া হল। আপনি কৌশিক রায়কে চার্জ হ্যান্ডওভার করে দেবেন। শো কজ খাবেন একটা হালকা করে। লিখিত উত্তর তো, একটু সাবধানে দেবেন। দেখবেন ডিপার্টমেন্টাল ইনভেস্টিগেশন না শুরু হয় আপনার এগেনস্টে। খুঁটি আছে?”

“না না স্যার, ওসব নেই।”

“থাকলে কি আর বলতেন? আচ্ছা, আপনি একটা এইচআইজি ফ্ল্যাট কিনেছেন না রিসেন্টলি রাজারহাটে? কত দিয়ে যেন?”

“ইএমআই স্যার। কী এমন পড়ে।”

“সে তো বটেই, পঞ্চান্ন লাখের ফ্ল্যাটের আর কী এমন ইএমআই পড়ে। আপনি তো দেখছি অঙ্কেও খুব পাকা। বেশ বেশ। আপনি যেতে পারেন।”

ঘরটা থেকে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে বরাট একটা নম্বরে ফোন করলেন। নম্বরটি নেটওয়ার্ক সীমার বাইরে বলছে। বাইরে এসে গাড়িতে উঠলেন। অস্থির লাগছে মাথা। ড্রাইভারকে বললেন, “কোন চায়ের দোকানে দাঁড় করাস।”

ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় নামল। ফোনটা বাজছিল আবার। বরাট ধরলেন, “কে?”

“স্যার আপনি আমার নম্বরটা এখনও সেভ করেননি?”

“বলো বলো কী বলবে? বেকার ভাট বোকো না তো! মেজাজ গরম আছে।”

“কেন স্যার? ডিসিশনটা জানিয়ে দিল?”

“হুঁ।”

“দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে তুলকালাম হয়েছে কাল, শুনেছেন তো?”

“আমি শুনে কী করব? নাচব? তুমি তো জানোই এই কেসের চার্জে আমি নেই।”

“স্যার কৌশিক রায় খুব বাজে লোক।”

“বাজে মানে?”

“মানে অনেস্ট স্যার।”

“আমাকে এসব বলছ কেন?”

“মানে স্যার আপনাকে তো রেসপেক্ট করি, এমনিই বললাম।”

“আর বলে কী করবে?”

“হ্যাঁ স্যার। আপনার ট্রান্সফারটাও পাক্কা। একদম ঘোড়ার মুখের খবর স্যার।”

“তুমি খুশি তো?”

“আমি কেন খুশি হব স্যার? আপনি আমাকে কাবাব...”

বরাট ফোনটা কেটে দিলেন।
বাকিটা শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

২৫

"তোমার ছেলে হাতের বাইরে চলে গেছে বাণী।"
তরুণ টেবিলের পেপারওয়েটটা নাড়তে নাড়তে কথাটা বললেন।
বাণী গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। বললেন, "কেন, শ্যুটিংয়ে এসেছে তো, ঠিক ঠাক ছিল না আজ?"
তরুণ বললেন, "কেন থাকবে না, ওর রক্তে অভিনয়।"
বাণী তরুণের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "তবে? সমস্যাটা কী?"
তরুণ বললেন, "ও কিছু একটা আন্দাজ করেছে। ওর চোখ সেটা বলছে।"
বাণী বললেন, "দীপ্ত কিছু একটা প্ল্যান করেছে তরুণ, ওকে যতটা ভালো ভাবতাম ও ততটাই খারাপ। বুঝতে পারছ ওর প্ল্যানটা?"
তরুণ বললেন, "হ্যাঁ, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লড়াতে চাইছে। তোমাকেও সন্দেহের বাইরে রাখেনি বুবকা দীপ্তর কথা শোনার পরে। এর মানে তোমার সোনার সংসারে ভাঙন।"
বাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সংসার আমার কোনও কালেই সোনার ছিল না তরুণ। সেটা তোমার থেকে ভালো কারও জানার কথা নয়।"
তরুণ বললেন, "তবু। এবার তো ডিজাস্টার আসছে।"
বাণী বললেন, "বুবকা এখনও ফ্লোরে আছে?"
তরুণ বললেন, "আছে।"
"আর ওই ছেলেটা?"
"গাড়িতে আছে। তোমার কথা শুনেছে।"
বাণী বললেন, "আর শুনে কী হবে? স্বয়ং ছেলেই তো দীপ্তকে মেরে এসেছে।"
তরুণ বললেন, "বেশ করেছে। বাপ কা বেটা।"
বাণী বললেন, "এভাবে মাথা গরম করাটা কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না তরুণ। আমি তো অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে এখনও পুলিশ বুবকাকে অ্যারেস্ট করছে না কেন?"
তরুণ বললেন, "কারণ ওদিকেও অনেক ভাঙাগড়া চলছে।"
বাণী অবাক হলেন, "মানে?"
তরুণ বললেন, "বরাটকে সরিয়ে দিয়েছে বৈভবী মার্ডার কেসের চার্জ থেকে। নতুন অফিসার এসেছে।"
বাণী বললেন, "তুমি কোত্থেকে জানলে?"
তরুণ বললেন, "জেনে গেছি, না জানার তো কিছু নেই। সর্বক্ষণ ফ্লোরে পড়ে আছি বলে ভেবেছ আমি কিছুই জানি না?"
বাণী বললেন, "তার মানে আবার সব নতুন করে...?"
তরুণ বললেন, "হ্যাঁ, তবে এতদিন পরে কেস রি-ওপেন হবে। কতটা কী হবে সে ব্যাপারে আমি অতটা নিশ্চিত হতে পারছি না।"
বাণী বললেন, "নিজেকে কুন্তীর মতো মনে হচ্ছে। ছেলেরা যুদ্ধ করবে, আর আমি কিছুই করতে পারছি না।"
তরুণ বললেন, "আবার ভুল করছ। এক্ষেত্রে তুমিও সাসপেক্ট লিস্টে আছ। ভুলে গেলে, সিনেমাটা করতে বুবকাকে সবচেয়ে বাধা তুমিই দিয়েছিলে?"

বাণী বললেন, "বুবকা আমার সবথেকে প্রিয় সন্তান তরুণ। বৈভবী আমার পুত্রবধূ হয়ে আসবে এটা আমার কাছে এখনও দুঃস্বপ্ন। অ্যাক্সিডেন্ট হোক কিংবা মার্ডার, যা হয়েছে তা কি খুব খারাপ হয়েছে?"
তরুণ বাণীর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "বুবকার তোমার সম্পর্কে সন্দেহটা অমূলক নয় বলতে চাইছ?"
বাণীর ফোন বাজছিল। ফোনটা দেখে বললেন, "নাও, তথাগত ফোন করছে।"
তরুণ গম্ভীর মুখে বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছ?"
বাণী ফোনটা ধরলেন, "বলো।"
"মা, বুবকা ফোন করেছিল।" তথাগতর গলাটা থমথমে।
বাণী ঠান্ডা গলায় বললেন, "কী বলছে? তোমায় হুমকি দিয়েছে?"
তথাগত বলল, "না, স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করেছে এই রবিবার কোথায় নাকি সবাই মিলে লাঞ্চ করতে যাবে, প্রীতিকাকে ভেনু ঠিক করার জন্য ফোন করেছিল।"
বাণী বললেন, "এ তো ভালো ব্যাপার, তোমার গলাটা এরকম লাগছে কেন? তোমার ফোনেরই বা কী হয়েছিল, কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না!"
তথাগত বলল, "লোলেগাঁও গেছিলাম লোকেশন দেখতে। কোনও কারণে টাওয়ার পাচ্ছিলাম না।"
বাণী বললেন, "এটা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দাও। তোমার গলাটা এমন লাগছে কেন? সবাই ঠিক আছ তো?"
তথাগত বলল, "এরকম লাগছে কারণ আমি খবর পেলাম বুবকা কাল দীপ্ত রায়ের বাড়ি গিয়ে দীপ্তর সঙ্গে ঝামেলা করে এসেছে। মারধরও করেছে এবং সেটা একতরফা।"
বাণী বললেন, "তোমাকে সে খবরটা কে দিল? দীপ্ত নিজে?"
একটু ইতস্তত করে তথাগত বলল, "হ্যাঁ।"
বাণী বললেন, "বাহ, বেশ। তো তোমাকে দীপ্ত এটা বলেছে যে সে বুবকাকে বলেছে বৈভবীকে মারার প্ল্যানে তুমিও ছিলে ওর সঙ্গে?"
তথাগত রাগি গলায় নিজের মনেই একটা গালাগালি দিয়ে বলল, "সরি, এটা তোমাকে বুবকা বলল?"
বাণী বললেন, "হ্যাঁ। তো এরপরও তুমি দীপ্ত রায়ের ফোন ধরবে তো? তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে শত্রুর সঙ্গে কখনও সব কথা শেয়ার করতে নেই। আশা করি মনে আছে কথাটা?"
তথাগত বলল, "বুবকার গলা শুনে তো সেরকম কিছু মনে হল না!"
বাণী বললেন, "সেটা বুবকা জানে, আমাকে জিজ্ঞেস করে কী করবে! ওদিকে বরাটেরও ট্রান্সফার হয়ে গেল।"
"হ্যাঁ, সেটা শুনেছি।"
"তোমার লোকেশন দেখা কি এখনও চলছে?"
"না, হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আর-একটা দিন থাকব। এখন মনে হচ্ছে কাল সকালেই যে ফ্লাইট পাই চলে আসি।"
"উঁহুঁ। তুমি এক কাজ করো, আরও দুদিন এক্সটেন্ড করো। ওখানে থেকে যাও।"
"মানেটা কী? এখানে আমি কী করব? কত কাজ আছে কলকাতায়!"
"আমি বলছি তুমি এটাই করবে। আমি আগে পরিস্থিতিটা দেখতে চাই। তারপর ডিসিশন নেব কী করতে হবে।"
বাণী ফোনটা কেটে দিলেন।
তরুণ বললেন, "আমি প্রশ্নটার উত্তরের জন্য বসে আছি বাণী।"
বাণী ক্লান্ত গলায় বললেন, "সবাই একরকম হলে কী করে হবে বলো তো তরুণ?"

২৬।

দীপ্ত অফিসে ছিল। রিসেপশনিস্ট ফোন করে জানাল পুলিশের কেউ একজন দেখা করতে এসেছেন।

দীপ্ত ভ্রূ কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।"

কৌশিক দীপ্তর চেম্বারে ঢুকে বললেন, "বাহ, আপনার তো বেশ রুচি আছে মশাই।"

দীপ্ত বলল, "চা না কফি?"

কৌশিক বললেন, "ডিউটি আওয়ারসে কিছু খাই না।"

দীপ্ত বলল, "ডিউটি আওয়ারসের পরে কী কী খান?"

কৌশিক প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "সবার কাছ থেকে সব কিছু খাওয়া যায় না জানেন তো। আমি আবার পার্টনার চয়েজের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। বাজে স্বভাব, কান্ট হেল্প ইট, বুঝলেন কি না?"

দীপ্ত বলল, "আমি পার্টনার হিসেবে খারাপ নই, সেটা সবাই বলে কিন্তু।"

কৌশিক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "অলকানন্দা মুখার্জিও তাই বলতেন নাকি?"

দীপ্ত বলল, "অফকোর্স।"

কৌশিক বললেন, "তা এখন বলছেন না কেন?"

দীপ্ত বলল, "দেখুন, সবার আগে তো আমিই চাই অলকা কোথায় আছে সেটা জানতে। আমি তো অনেকবার আপনাদের রিকোয়েস্ট করেছি কেসটায় যেন হায়েস্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয়।"

কৌশিক বললেন, "আচ্ছা! জানতাম না তো। আপনি ফোর্স করেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে। আপনি একজন পাওয়ারফুল লোক মিস্টার রায়। এখানে আসার আগে তিনটে জায়গা থেকে ফোন এসে গেছে।"

দীপ্ত হাসল, "আমি কাউকে কিছু বলতে বলিনি। সেটা ভাবলে ভুল ভাববেন।"

কৌশিক সিগারেটটা অর্ধেক খেয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, "আচ্ছা। আপনার ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে আছে, আপনি বলেছেন উনি আপনার বোন?"

দীপ্ত পেপারওয়েটের দিকে মনোযোগ দিল, "হ্যাঁ, দূর সম্পর্কের, শিলিগুড়ি থাকে।"

কৌশিক বললেন, "বেশ। আপনি শরদিন্দু পড়েছেন? আপনারা প্রোডাকশন হাউজ চালান, পড়াশোনা করেছেন আশা করব। অবশ্য আপনাদের সিরিয়ালগুলো দেখলে মনে হয় না কেউ পড়াশোনা করেন বলে, সেই একই বালবিচি জিনিস চালিয়ে যাচ্ছেন গতে ফেলে। সরি, স্ল্যাং ইউজ করে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না। যে কথা বলছিলাম, শরদিন্দু পড়েছেন?"

দীপ্ত বলল, "সব পড়িনি কিছু কিছু পড়েছি। ব্যোমকেশ পড়েছি খানিকটা।"

কৌশিক মাথা নাড়লেন, "না, এটা ব্যোমকেশ রিলেটেড না। যাক গে, একটা গল্প আছে, যেখানে এক বাদশার কাজই ছিল নারী ভোগ করা। প্রতিদিন নতুন নতুন নারী। তা হয়েছে কী..."

দীপ্ত বাধা দিল, "এসব গল্প আমাকে শুনিয়ে কী বলতে চাইছেন অফিসার?"

কৌশিক আবার প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললেন, "ডাক্তার বলেছে সিগারেট কম খেতে, বুঝলেন? তা হাফ করে খাচ্ছি। আশা করি ডাক্তারের বাবার এতে কোনও অসুবিধা হবে না। বাদ দিন, আমি যখন একটা কথা বলব, বাধা দেবেন না বুঝেছেন? এসিতে আছেন, এসি গাড়িতে চড়ছেন, বন্ধ ঘরে যখন থার্ড ডিগ্রি খাবেন তখন বুঝবেন পুলিশ কী জিনিস, এখনও বোঝেননি।"

দীপ্ত রেগে বলল, "এসব কী ভাষায় কথা বলছেন?"

কৌশিক অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন, "কোন ভাষায় কথা বলব বলুন দেখি আপনার সঙ্গে! আপনিই ঠিক করে দিন নাহয়।"

দীপ্ত বলল, "আপনি আমার রিচ জানেন না।"

কৌশিক বললেন, "আপনিও আমার রিচ জানেন না। নিন্দুকেরা বলে নরকেও আমি লোক-টোক রাখি,

বুঝলেন?”
দীপ্ত বলল, “আমি আপনাকে আর কিচ্ছু বলব না। আমার লইয়ার আপনার সঙ্গে কথা বলবে।”
কৌশিক বললেন, “বেশ তো। সে আপনি যাকে খুশি আমার সঙ্গে কথা বলাতে পাঠাতে পারেন। যাই হোক, একটা কথা বলুন দিকি, বরাটের সঙ্গে কত টাকায় ডিল হয়েছিল?”
দীপ্ত বলল, “কী উলটোপালটা কথা বলছেন? বরাটের সঙ্গে আমার ডিল কেন হবে?”
কৌশিক সিগারেটটা আবার অর্ধেক খাওয়ার পর অ্যাশট্রেতে বাকি ভাগটা গুঁজলেন, বললেন, “আপনি অ্যাক্টিং করতে পারেন তো! ভালো অ্যাক্টিং জানেন আপনি, দেখতেও ভালো, কী যে করছেন।”
দীপ্ত গম্ভীর হয়ে বলল, “সেটা আমার পার্সোনাল চয়েস, হু দ্য হেল আর ইউ যে আমাকে এসব কথা বলছেন। দু টাকার অফিসার!”
কৌশিক মুখে চুক চুক শব্দ করতে করতে বললেন, “ওসব বলবেন না, টাকার কথা বলে দুঃখ বাড়াবেন না। বরাটের ট্রান্সফার হয়েছে শুনেছেন তো?”
দীপ্ত বলল, “না, আমি কিছু জানি না তো।”
কৌশিক হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বললেন, “আপনি তো কিছুই জানেন না দেখি। বাবার নামটা জানেন তো?”
দীপ্ত রেগে উঠে দাঁড়াল, “জাস্ট গেট আউট ফ্রম হিয়ার। আপনি কোথায় পা দিয়েছেন সেটা আপনি নিজেও জানেন না।”
কৌশিক কাঁধ ঝাঁকালেন, “আমি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম, বেশ তো, আপনি কথা বলতে চান না। আমার কী! আচ্ছা শুনুন,এখন অবধি যা যা বললাম সেগুলো নিশ্চয়ই অনেককে এবার আপনি রিলে করে শোনাবেন, সেসব হয়ে গেলে একবার থানায় আসবেন। আজকেই। সরকারি নিমন্ত্রণপত্রখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু পরেই। বাই।”
কৌশিক দীপ্তর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
দীপ্তর হাতে তার ফোনটা ছিল। সেটাই দেওয়ালে ছুড়ে মারল রাগের মাথায়।

২৭

“তার মানে তোমাকে এখন নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে?” প্রীতিকা বলল।
বাইরে অন্ধকার। সব কটেজগুলোয় আলো নিভে গেছে। কটেজের সামনের বারান্দার চেয়ারে বসেছিল তারা।

তথাগত বলল, “আলোটা নিভিয়ে দেব?”
প্রীতিকা বলল, “কেন?”
তথাগত বলল, “অস্বস্তি হচ্ছে কেমন একটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।”
প্রীতিকা বলল, “এখন কটা বাজে?”
তথাগত মোবাইল দেখল, “দশটা।”
প্রীতিকা বলল, “ভাবা যায়? কলকাতায় এখন...”
তথাগত বলল, “হুঁ, দীপ্তানুজ পৌঁছল নাকি কে জানে!”
প্রীতিকা বলল, “ও ট্রেনে গেল তো। ফ্লাইটে না।”
তথাগত বলল, “ওহ। হ্যাঁ। তিস্তার ওখানে জ্যাম ছিল শুনছিলাম। পাহাড়ে একবার ধ্বস নামলে বিচ্ছিরি ব্যাপার কিন্তু।”
প্রীতিকা বলল, “সম্পর্কেও।”
তথাগত বলল, “মানে?”

প্রীতিকা বলল, "তোমাদের পরিবারে যেমন।"
তথাগত বলল, "হুঁ।"
প্রীতিকা বলল, "তুমি বুবকাকে ভয় পাও না?"
তথাগত বলল, "আমি কেন ভয় পেতে যাব? তবে হ্যাঁ, ও মাঝে মাঝে নিজের লিমিটটা বোঝে না। তখন বিরক্ত হই।"
প্রীতিকা বলল, "লিমিটটা বোঝানোর ওকে চেষ্টা হয়নি কোনও কালেই, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বেশি আদরে মানুষ হয়েছে। নইলে এত অ্যাডামেন্ট হয় না।"
তথাগত কিছু বলল না। প্রীতিকা বলল, "তুমি এত চুপচাপ হয়ে গেছ কেন? বুবকাকে দীপ্ত রায় কী বলেছে তাতে কি কিছু প্রমাণ হয়?"
তথাগত বলল, "দীপ্ত খুব ধূর্ত একজন মানুষ প্রীতিকা। ওকে রিড করা শিবেরও অসাধ্য।"
প্রীতিকা বলল, "আর তুমি?"
তথাগত বলল, "মানে? আমাকে তুমি পড়তে পারো না?"
প্রীতিকা বলল, "আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি। তুমি কী? তোমাকে রিড করা সহজ? তুমি বুবকাকে জড়িয়ে পর্যন্ত আমাকে সন্দেহ করো, সেদিন প্রশ্নটা না করলে আমি জানতে পারতাম?"
তথাগত বিরক্ত হল, "এখন এইসব প্রসঙ্গ কেন তুলছ?"
প্রীতিকা বলল, "ইদ্রিশ কী বলছে?"
তথাগত বলল, "কী বলবে! দীপ্ত রায়কে মেরেছে বুবকা, বাণী মিত্র তরুণ দাসের সঙ্গে ক্লোজ ডোর মিটিং করছে, কৌশিক রায় সবাইকে জেরায় জেরায় অস্থির করে তুলছে। আমার খোঁজেও নাকি অফিসে গেছিল!"
প্রীতিকা বলল, "ক্লোজ ডোর মিটিং? তোমার মায়ের চেম্বারে সোফাও আছে না?"
তথাগত কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল, "এত কিছু শুনে তোমার এই কথাটা স্ট্রাইক করল?"
প্রীতিকা হাসতে হাসতে বলল, "ওহ, সরি সরি, আসলে একগাদা ফিল্মি ম্যাগাজিন পড়ছিলাম তো একটু আগে, গসিপ মুডে চলে গেছিল মনটা।"
তথাগত থমথমে গলায় বলল, "লাইফ ইজ নট ফিল্ম প্রীতিকা, সব কিছু এত সোজা না। স্ট্রেট লাইনে কেচ্ছা খোঁজাটা বন্ধ করো দয়া করে।"
প্রীতিকা বলল, "সরি সরি। আচ্ছা, সেকেন্ড পয়েন্টটা ধরি, কৌশিক রায়টা কে?"
তথাগত বলল, "সিআইডি। ভীষণ সৎ অফিসার।"
প্রীতিকা বলল, "কোন একটা সিনেমায় একটা ডায়লগ শুনেছিলাম না? কেউ সৎ নয়, সবাই একটা দামে ঠিক বিকিয়ে যায়?"
তথাগত বলল, "কে কিনবে ওকে?"
প্রীতিকা বলল, "যে বৈভবীকে খুন করেছে, সে!"
তথাগত বলল, "বৈভবীকে কে খুন করেছে বা আদৌ কেউ খুন করেছে নাকি তুমি জানো?"
প্রীতিকা বলল, "জানি না তো। কে কোথায় কী করে আসে সব কি আর আমায় বলে?"
তথাগত বলল, "তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?"
প্রীতিকা বলল, "কেন, তুমি কি সন্দেহ করার মতো কিছু করেছ? আচ্ছা আমাকে একটা কথা বোঝাও তো, বৈভবী আগরওয়ালের সঙ্গে মন্দারমণি যেতে যাবে কেন?"
তথাগত বলল, "সেটা আমি কী করে জানব?"
প্রীতিকা বলল, "গেস করো কিছু একটা। কৌশিক রায় না কার কথা বললে, সে যদি জিজ্ঞেস করে তখন বলতে হবে তো!"
তথাগত বলল, "দিস ইজ নট ফান প্রীতিকা। হতেই পারে বৈভবীকে আগরওয়াল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল

সিনেমায় চান্স দেবে বলে। হু নোজ?”
প্রীতিকা বলল, “বৈভবী কি ফ্রেশার নাকি? ও এত সহজে মেনে নেবে?”
তথাগত বলল, “মানা না মানাটা তো যার যার ওপর। যৌবনোত্তীর্ণা নায়িকা, যে কাজ পাচ্ছে না, সে যদি কম্প্রোমাইজ করতে চায় কে দেখতে যাচ্ছে?”
প্রীতিকা বলল, “তোমার কাছে কম্প্রোমাইজের অফার আসে?”
তথাগত বলল, “আমি কদিন এসেছি আর!”
প্রীতিকা বলল, “ওহ, তো এলে কী করবে?”
তথাগত বলল, “তুমি কি আমাকে ওদের মতো ভেবেছ?”
প্রীতিকা বলল, “আচ্ছা বাদ দিলাম। কৌশিক রায় সম্পর্কে কী ভেবেছ?”
তথাগত বলল, “কিছু ভাবিনি। কী ভাবব?”
প্রীতিকা বলল, “সেই। পুলিশকে তো শুধু দোষীরাই ভয় পায়। নির্দোষ লোক ভয় পাবে কেন? একটা কথা মনে রেখো, যদি কিছু করেও থাকো, ওরা কিন্তু সব আটঘাট বেঁধেই তোমার কাছে আসবে, কারণ তোমরা প্রভাবশালী। সো বি প্রিপেয়ারড।”
তথাগত বলল, “তুমি ধরেই নিয়েছ আমি বৈভবীকে মেরেছি?”
প্রীতিকা হাসল, “আমার ধরা না ধরায় কারও কিছু যায় আসে না।”
তথাগত বলল, “দেন শাট দ্য ফাক আপ, বি...”
প্রীতিকা বলল, “বিচ? বিচ বলছিলে? বাহ...”
তথাগত বলল, “সরি, আমি রিয়েলি সরি।”
প্রীতিকা ঠান্ডা গলায় বলল, “আমি ঘুমাতে গেলাম। গুড নাইট।”
তথাগত কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

২৮

“গুরু তোমার তো এখন দেখি কিছুতেই নেশা হয় না!”
শুভ বুবকার গাড়ির পিছনের সিটে শুয়েছিল অভ্যাসমতো।
রাত আড়াইটা। রাস্তার মধ্যে একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মদ খাচ্ছিল তারা।
রোজের মতোই।
বুবকা বলল, “কেন হয় না? নেশাটা আসলে জানো তো মুডের ওপর ডিপেন্ড করে।”
শুভ বলল, “তোমার মুড তো আজকে ভালো হবার কথা। ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে গাঁড় ক্যালানি দিয়েছ। কোথায় আজ এট্টু ফুর্তি করবে তা না, কেমন একটা ঝিমিয়ে যাচ্ছ!”
বুবকা বলল, “শুধু দীপ্ত রায়কে মারলেই মুড ভালো হবে? হলে তো খুশিই হতাম।”
শুভ খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল, “ওই বানচোদকে মেরেছ, আমি তাতেই খুশি, মাইরি বলছি আজ যদি হাতে টাকা থাকত আমি তোমাকে মদে চান করিয়ে দিতাম। আচ্ছা তুমি যখন ক্যালাচ্ছিলে মালটা কী বলছিল?”
বুবকা বলল, “চুপচাপ মার খেয়ে গেল।”
শুভ বলল, “ওই দীপ্ত ব্যাটা তো চুপচাপ মার খাবার মাল না গুরু।”
বুবকা হাসল, “হিরো মারলে ভিলেন মার খায় জানো না?”
শুভ বলল, “তা যা বলেছ গুরু, তুমি শালা সত্যি সত্যি একটা হিরোই বটে!”
বুবকা বোতল থেকে অনেকটা মদ গলায় ঢালল, এই সময় তার গাড়ির সামনে একটা বাইক এসে থামল। একজন বাইক থেকে নেমে ড্রাইভার সিটের পাশে এসে বলল, “ওহ, আপনি এখানে? আর আমি গোটা

পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে!"
বুবকা বলল, "আপনি কে?"
লোকটা বলল, "আমি? আমি ওই যে আপনারা বলেন না, মামা! আমি ওই মামা।"
শুভ পিছন থেকে বলল, "গুরু, আজ গাঁ মারা গেল।"
লোকটা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, "বাহ, আপনিও আছেন শুভবাবু। এ তো এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম ফিল হচ্ছে। আচ্ছে দিন এসে গেল তো মশাই। গাড়িতে এসে বসতে পারি?"
বুবকা নিস্পৃহ গলায় বলল, "বসুন।"
লোকটা বলল, "কী খাচ্ছেন? রামের গন্ধ পাচ্ছি! এত বড়োলোকের ছেলে রাম খাচ্ছেন? স্কচ খান না?"
শুভ বলল, "রামের টাকা জোগাড় করতেই পেছন ফেটে যাচ্ছে আর আপনি আবার স্কচের গল্প শোনাচ্ছেন।"
লোকটা বলল, "ওই মুরগির গলার চর্বি ফ্রাই না কী খেতেন না আপনি? শোনার পর থেকে আমারও ভীষণ খেতে ইচ্ছা করছে। খাওয়াবেন?"
বুবকা বলল, "আপনার বাইক? এখানে থাকবে?"
লোকটা বলল, "সেটাও ঠিক। আচ্ছা, আজ বাদ দিন, পরে একদিন খাইয়ে দেবেন। কাজের কথায় আসি, আমার নাম কৌশিক রায়। আমি বৈভবী মার্ডার কেসটা এখন ইনভেস্টিগেট করছি।"
বুবকা বলল, "ডিল করে মাঠে নেমেছেন না সব জেনে-টেনে তারপর রেট ফিক্স করবেন?"
কৌশিক হাসলেন, "ডিল তো শেয়ালে করে। ওই শেয়ালের মাংস ভাগের গল্প পড়েছেন তো?"
বুবকা বলল, "পড়েছি। আচ্ছা বলুন আপনার কী জানার আছে।"
কৌশিক সিগারেটের প্যাকেট বের করে বুবকাকে অফার করলেন, বুবকা নিল না, শুভ উঠে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল।
কৌশিক বললেন, "দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কী করে বলুন তো। পিছন দিক দিয়ে? সামনে তো সিকিউরিটি থাকে দেখলাম।"
বুবকা বলল, "ওই শুয়োরটা আপনাকে আমার নামে নালিশ করেছে নাকি?"
কৌশিক বললেন, "ধুর মশাই, পুলিশকে কী ভাবেন বলুন তো? পুলিশ যদি চেষ্টা করে সব কিছু জানতে পারে।"
বুবকা বলল, "হ্যাঁ, পিছন দিয়ে।"
কৌশিক বললেন, "ঘরে আর কেউ ছিল?"
বুবকা বলল, "সেদিন তো দেখিনি কাউকে।"
কৌশিক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন, সেদিন দীপ্ত রায়ের বেডরুমে একটা মেয়ে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল। আজকে ঘরে কাছের ডাক্তার এনে সিক্রেট চিকিৎসা চলছে সে মেয়েটির।"
বুবকা বলল, "ও।"
কৌশিক হালকা চালে বললেন, "আপনি জানতেন না দীপ্ত রায়ের বেডরুমে কেউ ছিল? অলকা দেবী আপনাকে বলেননি কথাটা?"
বুবকা বলল, "অলকা? ও কী করে বলবে? আমি কি জানি নাকি ও কোথায় আছে?"
কৌশিক বললেন, "ওহ, জানেন না? আমি তো ভাবলাম আপনি জানেন।"
শুভ পিছনের সিট থেকে বলল, "জানলে তো ভালোই হত, কতদিন বউটাকে দেখি না।"
কৌশিক পিছনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বউ কেলিয়ে পুরুষসিংহ না আপনি? আপনার কিন্তু অনেক গুণ আছে মশাই।"

শুভ চুপ করে গেল। কৌশিক শুভর বোতলটা নিয়ে বেশ খানিকটা মদ গলায় ঢেলে বললেন, "আজ আসি, কাল একবার শ্যুটিং দেখতে যাব। বাংলা সিরিয়ালের শ্যুটিং দেখা আমার ছোটোবেলার ইচ্ছা, বুঝলেন তো?"
বুবকা বলল, "ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আশা করব শুধু বাতেলা না মেরে কাজেও কিছু করবেন।"
কৌশিক বুবকার গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, "আপনার পাহাড় কেমন লাগে বুবকা?"
বুবকা বলল, "ভালো লাগে। আপনার?"
কৌশিক বললেন, "অসাধারণ।"
তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কতদিন যাই না, শালার চাকরি!!!"

২৯

বাণীর ঘুম ভেঙে গেল সকাল সকাল।
রাত আড়াইটেয় বাড়ি ফিরেছেন।তিনটেয় শুয়েছিলেন। তবু সাড়ে ছটার সময় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ব্যালকনিতে এসে বসলেন।
মেঘে ঢেকে আছে শহরের আকাশ। বৃষ্টি হবে যে-কোনো সময়।
"চা খাবে?" প্রকাশ এসে দাঁড়িয়েছেন কখন বুঝতে পারেননি বাণী।
বললেন, "তুমি খাবে?"
"আমি এই সময়ে রোজই চা খাই। তোমার অবশ্য তখন মাঝরাত।" হাসলেন প্রকাশ।
বাণী বললেন, "বানাতে হবে নাকি?"
"নাহ, এই জাস্ট বানালাম।"
"হবে আমার?"
"হয়ে বেশি হবে। যাক গে, তোমার প্রেশারের কী হাল? ওষুধ খাচ্ছ নিয়মিত?"
"আর প্রেশার! বুবকা ফিরেছে? দেখলে?"
"না, ফেরেনি।"
বাণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, না? সুখটা সইল না।"
প্রকাশ বললেন, "তুমি এত অল্পে ভেঙে পড়ছ কেন? কী এমন হয়েছে?"
বাণী প্রকাশের দিকে তাকালেন, শেষ কবে একসঙ্গে এভাবে কথা বলেছেন মনে করতে পারছিলেন না। বললেন, "স্টুডিওতে সিআইডি অফিসার এসে দু ছেলের খোঁজ করছে, এর থেকে আর কত খারাপ হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?"
প্রকাশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "বুবকাকে ফোন করব? কোথায় আছে দেখব?"
বাণী বললেন, "নাহ। ফোন করে কী হবে? মাকে খুনি ভাবছে আজকাল। ফোন করলে ভাববে ট্র্যাক করতে চাইছি।"
প্রকাশ বিষণ্ণ গলায় বললেন, "আমিই দায়ী, ওকে আরও চোখে চোখে রাখা উচিত ছিল।"
বাণী মাথা নাড়লেন, "তুমি কেন দায়ী হতে যাবে? একটা সময় তুমি সাপোর্টটা না দিলে ভেলভেট পিকচারস দাঁড়াত না। কিন্তু সেসব করতে গিয়ে ছেলেটার দিকেই নজর দেওয়া হল না। মা বাড়িতে না থাকলে ছেলে এভাবেই বখে যায়। আরও ভুল করেছি আমি। বুবকাকে অ্যাকাডেমিক লাইনে জোর করে নিয়ে গেলেই ভালো হত। মাত্র সতেরো বছর বয়স ছিল ওর, যখন ওর ডেবিউ হয়। ওই অত অল্প বয়সে এত লাইমলাইট পড়ল, মাথাটা ঠিক রাখতে পারল না। আমাদের গাইডেন্সটা মিস করে গেল। ওই সময়টাই সব শেষ করে দিল।"

প্রকাশ বললেন, “বৈভবী মেয়েটা খারাপ ছিল না বাণী, বুবকাকে কিছুটা হলেও সামলাতে পারত।”
বাণী চুপ করে থাকলেন। প্রকাশ বললেন, “আমি বুবকার সাইকোলজিটা বোঝার চেষ্টা করেছি। ও তোমায় মিস করত। একটা সময় ছিল যখন ও মা ছাড়া আর কিছু বুঝত না। সর্বক্ষণ মা মা করেই চলেছে। যে সময়টা তুমি হাউসটাকে দাঁড় করানোর জন্য হঠাৎ করে ওর থেকে দূরে হয়ে গেল, ও অদ্ভুত এক ইনসিকিউরিটিতে ভোগা শুরু করল। এই ইনসিকিউরিটি থেকেই ও বৈভবীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ভালোবাসার থেকে বেশি ওর কাছে আশ্রয় কিংবা নিরাপত্তা বড়ো হয়ে গেছিল।”
বাণী ব্যঙ্গচ্ছলে হেসে বললেন, “হ্যাঁ, এমনই আশ্রয়, নিরাপত্তা, যে, ছেলে শান্তিনিকেতনে শ্যুট করছে আর তিনি এখানে প্রোডিউসারের সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন।”
প্রকাশ বললেন, “ফুর্তি করে বেড়াচ্ছিল কি না সেটা তো এখনও কনফার্মড না, তাই না? হয়তো জানাও যাবে না কোনও দিন। তোমার বৈভবীকে নিয়ে এত সমস্যা কেন বলো তো!”
বাণী প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে মেয়ে কেরিয়রের শুরুতে হেন কোনও লোক নেই যার সঙ্গে শোয়নি, তাকে যদি আমার ছেলে বউ হিসেবে মনোনীত করে, তাহলে আমি কেন, পৃথিবীর সব মায়েরই সমস্যা হবে প্রকাশ। হতে পারে সে মেয়ে ভালো হয়ে গেছে, হতে পারে সে বুবকাকে ভীষণ ভালোবাসে, তবু সমস্যা হতে পারে। পারে না? কেন, বাবা হিসেবে তোমার সমস্যা হত না?”
প্রকাশ বললেন, “আমি তোমাদের থেকে বহুদিন হল দূরে চলে গেছি বাণী। আমার শিডিউল তোমার শিডিউল মেলে না। অফিস থেকে ফিরে ঘরে কাউকেই দেখতে পাই না। তাও প্রীতিকা থাকলে কথা-টথা হয়, তবু সেটা একেবারেই সৌজন্যমূলক। কিন্তু দূর থেকে আমি এটুকু বুঝতে পারি, তোমরা যে জায়গাটায় এখন প্রবেশ করেছ, সেটাতে যতটা না গ্ল্যামার আছে, তার থেকেও বেশি আছে যান্ত্রিকতা। এই জীবনটা অদ্ভুত। এক-একটা মানুষ নিশাচর প্রাণীর মত পার্টি করে, রোজ নিয়ম করে মাঝরাতে বাড়ি ফেরে, তাদের কাজের সময়টাই অত রাত করে শেষ হয়। এ তো খুব একটা স্বাভাবিক জীবন না। এবার স্বাভাবিক জীবনের মানুষের থেকে তোমাদের পৃথিবীর জীবনটা অন্য হবেই, তাই না? সেক্ষেত্রে সমস্যা হলেও ভেবে নিতে হবে ওটা বুবকার লাইফ, ও যা ভালো ভেবেছে করেছে।”
বাণী কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, “আমার কিছু ভালো লাগছে না আর। সেই আগের মতো গান চালাও তো। শুনি বসে বসে। তখন সস্তার টেপরেকর্ডার ছিল, কত গান শুনতাম। এখন দামি মিউজিক সিস্টেম, অথচ গানই শোনা হয় না দ্যাখো।”
প্রকাশ উঠলেন, “বেশ, রবীন্দ্রসংগীত চলবে তো?”
বাণী হাসলেন, “শুধু রবীন্দ্রসংগীতই। আর কিছু না। সাগর সেন। আছে?”
প্রকাশ বললেন, “আছে।”

৩০

“একটা ভালো গান চালাও তো ড্রাইভারভাই। নেপালি গান এখন জমছে না। মেরে সপনো কি রানি আছে?”
তাদের গাড়ি সেবক কালীবাড়ি পেরোতে পেরোতে কৌশিক হাঁক পাড়লেন।
শুভ বলল, “হ্যাঁ। সত্যি মাইরি। কান পচে গেল। এ শালারা গোর্খাল্যান্ড নিয়েই ছাড়বে!”
বুবকা তিস্তা দেখছিল, বলল, “তুমি তো দেখি সব ব্যাপারই কম বেশি জানো।”
শুভ বলল, “হ্যাঁ, কাগজটা পড়া চাই, বুঝলে গুরু।”
ড্রাইভার গান চেঞ্জ করল।
কৌশিক বললেন, “আচ্ছা শুভবাবু, প্লেনের মধ্যে চোখ বন্ধ করে বসে কাঁপছিলেন কেন? এত ভয় কীসের? বেঁচে থেকেই বা কী হবে? এই যদি গাড়িটা এখন খাদে পড়ে যায়, কী করবেন তখন?”

শুভ সভয়ে বলল, "কী সব অলুক্ষুনে কথা বলছেন স্যার! এসব বলে নাকি! বেঁচে থেকে কী করব মানে? মরে গিয়েই বা কী করব? ভগবান মানুষ করে পাঠিয়েছেন, কতদিন আর বাঁচব। যতদিন বাঁচব ভালো করে বেঁচে নি। এখনও কত কিছু খেলাম না, কত জায়গায় গেলাম না। কিছুই তো দেখলাম না। তবু এই আপনাদের কল্যাণে প্লেনে চড়তে পারলাম। এইটা একটা ভালো কাজ করলাম বলতে পারেন সারা জীবন ধরে।"

কৌশিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, "সেই, কথায় আছে না ভাগ্যবানের বউ পালায়, আপনি হলেন সেই বিরল ক্যাটাগরির ভাগ্যবান। যা যা উইশলিস্টে আছে সবই দেখতে পাবেন আপনি, চাপ নেই।"

বুবকা বলল, "আমি প্রথম যখন ছোটোবেলায় এখানে আসি, মনে আছে ট্রেন থেকে নেমে বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম যখন ভাঙল দেখি খাদ। সারা রাস্তা বমি করতে করতে গ্যাংটক পৌঁছেছিলাম।"

কৌশিক বললেন, "আপনার কিন্তু বেশ ক্রেজ আছে বুবকা, যা বুঝলাম। লোকজন চিনতেও পারে। গোটা ফ্লাইটে একটা মেয়ে আপনাকে ঝাড়ি মারতে মারতে এল। বোঝাই গেল ক্রাশ-টাশ আছে। লাইফটা এভাবে রাস্তায় রাস্তায় মদ না খেয়ে বেরিয়ে নতুন করে ভাবছেন না কেন?"

শুভ বলল, "সে তো স্যার আপনাকে না চিনেও দেখলাম এক মেয়ে অনেকক্ষণ ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে ছিল। হ্যান্ডু আপনিও কম না।"

বুবকা বলল, "আপনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন?"

কৌশিক হাসলেন, "আমিও আপনার মতোই করতাম। কিন্তু লাইফ কি তাই? সবকিছু ভুলে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা না করলে কীভাবে হবে বলুন তো?"

বুবকা বলল, "গার্লফ্রেন্ড, যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেও কথা হয়েছে, শুনতে পেলাম সে স্পট ডেড হয়ে গেছে, তাও নাকি কোন এক লম্পটের সঙ্গে সে যাচ্ছিল। গোটা পৃথিবীর লোক অনুকম্পার দৃষ্টি মেলে আপনাকে দেখছে, হায় রে ছেলেটা সারাজীবন ধোঁকা খেয়ে গেল, কেউ বা ভাবছে এহ, এটা একটা ভালো মুরগি হল তো, সে অবস্থায় মানুষ কী করবে?"

কৌশিক বললেন, "খবরটা আপনাকে কে দিয়েছিল?"

বুবকা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, "দাদা।"

কৌশিক আধখাওয়া সিগারেটটা জানলার বাইরে ফেলে বললেন, "টাইমটা মনে আছে?"

বুবকা বলল, "নাহ।"

কৌশিক বললেন, "আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

বুবকা বলল, "খোয়াইতে।"

কৌশিক বললেন, "একা?"

বুবকা শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, "অলকা ছিল।"

শুভ বলল, "আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই গুরু। আমি জানি তুমি অন্য কারও দিকে তাকাতেই পারো না, কিছু করা তো ছেড়েই দিলাম।"

কৌশিক হাসতে হাসতে বললেন, "এ তো মহা পজেসিভ লোক দেখছি। যাই হোক, আমাকে একটা কথা বলুন তো বুবকা, বরাট আপনাকে বৈভবীকে নিয়ে কী কী জেরা করেছে?"

বুবকা বলল, "করেইনি কোনও দিন।"

কৌশিক চোখ বড়ো বড়ো করলেন, "সে কী! মালটা কী করছিল তাহলে!"

বুবকা বলল, "ডিল অ্যামাউন্টটা জানতে পেরেছেন?"

কৌশিক বললেন, "হুঁ, মন্দ নয় সে টঙ্কা ভালো, রং যদিও বেজায় কালো।"

বুবকা বলল, "ব্ল্যাক মানি?"

কৌশিক বললেন, "হুঁ।"

শুভ বলল, “মাইরি কত লোকের কত ব্ল্যাক মানি, সারাজীবন শুনেই গেলাম। কেউ তো বলে না, নে ভাই শুভ আমার অনেক ব্ল্যাক মানি আছে, আমার এত টাকা লাগবে না, তুই নিয়ে যা, মৌজ কর।”
কৌশিক বললেন, “বলবেও না। আপনাকে দিয়ে কারও এক টাকারও উপকার হবে না।”
শুভ মুষড়ে পড়ে বলল, “সেই, গরিবের দিকে তো আর কেউ কোনও দিন চোখ তুলে তাকাবে না।”
কৌশিক হাসতে লাগলেন।
#
তথাগত কটেজের বাইরে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিল। প্রীতিকা স্নানে গেছিল। হঠাৎ দেখতে পেল সিঁড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক আসছেন। তার পিছনে বুবকা।
নিচ থেকেই কৌশিক হাঁক পাড়লেন, “কেমন আছেন তথাগতবাবু, কী ভাগ্যিস আপনি পাহাড়ে এসেছিলেন, নইলে এই গরমে শহরে পচে মরতে হত। থ্যাংক ইউ বস, থ্যাংক ইউ!”

৩১

“জায়গাটা তো বেড়ে মশাই। এসব তো অনেক ভাড়া, কী বলেন?” কৌশিক তথাগতর সামনের চেয়ারে বসলেন।
বুবকা রেলিংয়ে হেলান দিল। শুভ মাটিতেই বসে পড়ল।
তথাগত বুবকা আর শুভর দিকে একবার তাকিয়ে কৌশিকের দিকে তাকাল, “হ্যাঁ, ভাড়া মন্দ না। সাড়ে তিন হাজার পার ডে। খাওয়ার চার্জ আলাদা। ব্রেকফাস্ট পার হেড আড়াইশো টাকা, লাঞ্চ ডিনার চারশো টাকা করে।”
কৌশিক চোখ বড়ো বড়ো করে তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, “শালা সৎ হবার বড্ড জ্বালা মশাই, যা মাইনে পাই, তার ওপর ডিএ তো ভুলে গেছি, এসব জায়গা তো ভাবতেও পারি না।”
বুবকা বলল, “বউদি কোথায়?”
তথাগত বলল, “স্নানে।”
কৌশিক বললেন, “তা তথাগতবাবু, আপনার তো ফেরার কথা আগেই ছিল, থেকে গেলেন যে?”
তথাগত একটু ইতস্তত করে বলল, “এমনি, এত ভালো জায়গা, কলকাতা তো সেই জ্যাম, টেনশন, যতদিন এখানে থাকা যায় আর কি!”
কৌশিক বললেন, “ওহ। তা ভালো। তা কী কী ঘুরলেন কালিম্পংয়ে? ভূত দেখলেন?”
তথাগত বলল, “ভূত বলে কিছু থাকলে তো দেখব।”
কৌশিক বললেন, “ঠিকই, ভূত বলে কিছু হয় নাকি, সবটাই ঢপবাজি, আর ভূতের বই, ভূতের সিনেমা বিক্রির চেষ্টা। জঘন্য জঘন্য। সবাই ব্যবসা করছে।”
তথাগত বলল, “একেবারেই। ব্যবসা ছাড়া আর কী?”
“তা তথাগত বাবু, চাকরি ছাড়লেন কী আনন্দে? আপনি তো গুছিয়ে ছড়াচ্ছেন যা শুনতে পেলাম। একটা মেগা অলরেডি কেস খাইয়েছেন, আরও কী কী করবেন কে জানে। এভাবে চললে তো ভেলভেট পিকচারস ডুবে যাবে।”
তথাগত বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, “ঘরের কথা বাইরের লোকের কাছে বলার দরকার ছিল কি খুব?”
কৌশিক মুখে চুক চুক শব্দ করলেন, “আরে মশাই, আপনি পুলিশকে এত আন্ডারএস্টিমেট করেন কেন? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি নাকি আমরা? শুনুন, মানুষ দুটো পর্যায়ে গিয়ে নির্লিপ্ত হয়, এক, সে কিছুই জানে না, দুই, সে সব জানে। আমরা, মানে পুলিশরা এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ি। আমরা জানি সবই, কিন্তু ভাব করি কিছুই বুঝতে পারি না। বুঝলেন?”
তথাগত কিছু বলল না। প্রীতিকা বাইরে এল।

অবাক চোখে বুবকার দিকে তাকাল।
কৌশিক বললেন, "এই তো, বউদি এসে পড়েছেন।"
প্রীতিকা বলল, "আপনাকে তো ঠিক..."
কৌশিক বললেন, "আমি তথাগতবাবুর বন্ধু।"
প্রীতিকা বলল, "ওহ্, চা খাবেন? বলব?"
কৌশিক বললেন, "তা মন্দ হয় না। চা তো দরকারই। ও ছাড়া কী করে হবে?"
প্রীতিকা ঘরে গেল ইন্টারকম থেকে ফোন করতে।
কৌশিক বললেন, "তথাগতবাবু, দীপ্ত রায় কী বলছে আজকাল?"
তথাগত গম্ভীর ছিল, আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয় না।"
কৌশিক বললেন, "স্বাভাবিক, সেয়ানে সেয়ানে তো কোলাকুলি হয়, কথা তো কমই হয়। অবশ্য আপনাকে সেয়ানা বললে অনেক সেয়ানা আত্মহত্যা করবে। এবার কাজের কথায় আসি, বলুন তথাগতবাবু, কেদার সিংয়ের নাম শুনেছেন?"
তথাগত অবাক হল, "কে বলুন তো!"
কৌশিক বললেন, "ও, আপনি কেদার সিংকে চিনবেন না, কেদার সিং তো একজন পাতি ট্রাক ড্রাইভার যে একটা গাড়িকে ইচ্ছা করে মেরেছিল। আপনি চিনবেন কী করে?"
তথাগত বলল, "আমি চিনি না, কোন গাড়িকে মেরেছে?"
কৌশিক বললেন, "আপনি বলেছিলেন যার গাড়িকে মারতে। মনে করতে পারছেন না? নাকি মনে করিয়ে দেব?"
বুবকা কৌশিকের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "ও আছে না? আমি জানতাম ও আছে। আমি জানতাম..."
কৌশিক বুবকার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিলেন, "আপনি একটা কথাও বলবেন না বুবকা। প্লিজ। এটা ওঁর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। আপনি দূরে কোথাও যেতে চাইলে যেতে পারেন। প্লিজ।"
বুবকা চুপ করে গেল।
কৌশিক বললেন, "বলুন তথাগতবাবু। আচ্ছা দীপ্ত রায়ের সঙ্গে আপনার ফিটিংটা হল কবে থেকে? মানে কবে থেকে এইসব প্ল্যানগুলো করলেন। একটু আলোকপাত করুন। ওহ্, ওয়ান মোর থিং, আপনি ভাবুন কী করবেন এখন, দীপ্ত রায়কে কিন্তু খুব শিগগিরি আমরা পাকড়াও করব এবার।"
তথাগত রেগে গেল, "দেখুন, আপনি যদি আমাকে বৈভবী মার্ডারে দোষী ভাবেন, তাহলে ভুল ভাবছেন, আমি কিন্তু খুন করিনি। কাউকে খুন করতেও বলিনি।"
কৌশিক ঠান্ডা গলায় বললেন, "শুধু অ্যারেঞ্জ করেছিলেন আগরওয়াল যেন বৈভবীকে ডাকে স্ক্রিপ্ট শোনাবার নাম করে। এদিকে বুবকাও সেটা জানতে পারলে রেগে যাবেন, তাই বুবকাকেও বলেনি কিছু বৈভবী, তারা গাড়িতে করে কোথাও একটা যাচ্ছিল, আপনারা ট্রাক দিয়ে গাড়িটাকে..."
তথাগত চেঁচিয়ে উঠল, "উফ... পাগল করে দিচ্ছেন তখন থেকে। শুনুন, আমি বারবার বলছি, আবার বলছি, আমি খুন করিনি। যেহেতু দীপ্ত রায়ের সঙ্গে আগরওয়ালের ভালো বন্ধুত্ব ছিল, তাই আমি ওকে ফিট করেছিলাম আগরওয়ালকে দিয়ে বৈভবীকে ডাকার জন্য। আমাদের প্ল্যান ছিল কিছু ফটো তোলা, ভিডিও করে বুবকাকে পাঠানো, যাতে ও বোঝে বৈভবী ওকে চিট করছে। কিন্তু ব্যাপারটা হল ওই ড্রাইভার গাড়িটায় মেরেই দিল। সেটা আমি বলিনি! বিশ্বাস করুন!!!"
একবারে কথাগুলো বলে তথাগত থামল।
কৌশিক বুবকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিন বুবকা, দিস ইজ দ্য স্টোরি, বুঝলেন?"

তথাগত হাঁফাচ্ছিল। বুবকা এগিয়ে এসে তথাগতর কলার ধরল, “তুই এটা করতে পারলি? কী লাভ হল তোর এটা করে দাদা? একটা মেয়েকে মেরে ফেললি তোরা?”
বুবকার চ্যাঁচ্যামেচি শুনে কটেজের হাউসস্টাফরা দৌড়ে এল। কৌশিক তাদের হাত তুলে নিরস্ত করলেন।
তথাগত বলল, “আমার বুদ্ধিতে এটা হয়নি বুবকা। মা বলেছিল বলেই এটা করা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর, বৈভবীকে খুনের কথা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।” বুবকা বিস্ফারিত চোখে তথাগতর দিকে তাকিয়ে থাকল।
কৌশিক বললেন, “হুঁ, কলার ছাড়ুন বুবকা। দীপ্ত রায় ওভারট্রাম মেরেছিলেন, যাতে আপনাদের মধ্যে খিঁচটা জম্পেশ করে লাগে। মা ব্যাটায় বোঝেননি।”
চ্যাঁচামেচিতে প্রীতিকা বেরিয়ে এসেছিল। বুবকা তথাগতর কলার ছেড়ে দিল। রেলিংয়ে একটা ঘুসি মেরে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।
কৌশিক বললেন, “এইজন্য বলি একটা ট্রুথ হাউজ দরকার, সবাই মিলে ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার খেলতাম, কিছু না কিছু একটা বেরিয়ে আসত।”
প্রীতিকা বিস্মিত হয়ে বলল, “আপনি কী করে জানলেন ট্রুথ হাউজের কথা?”
কৌশিক হাসতে হাসতে বললেন, “ওটা তো আমারই লেখা। সৌভিকের মুখস্থ বুদ্ধি ভালো, তবে এইসব লিখতে সেই আমাকেই লাগে।”
প্রীতিকা বলল, “সৌভিক মানে?”
কৌশিক বললেন, “ওহ, আপনারা তো ওকে দীপ্তানুজ নামে চেনেন। তা ভালো। ওই নামটাও আমারই দেওয়া। নাম মনে পড়ছিল না মাথায়, ওটাই দিয়েছিলাম। দীপ্ত রায় বোঝেনি বাপেরও বাপ থাকে। এদিকে বরাটকে ফিট করছে, ওদিকে বড়ো সাহেব আমাকে ডেকে প্যারালাল ইনভেস্টিগেশন চালাতে বললেন। এদিকে দেখলাম আপনারা স্ক্রিপ্ট রাইটার নিচ্ছেন, ব্যস, মালটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। ভেতরের খবর রাখার জন্য এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে? এককালে স্ক্রিপ্টও লিখেছি, বুঝলেন কিনা? তবে আপনাদের সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট বড্ড ঢপের জিনিস, খুব বিরক্ত লাগে লিখতে।”
প্রীতিকা অবাক হয়ে কৌশিক রায়ের দিকে তাকাল। তথাগত চেয়ারে বসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, “বিশ্বাস কর, বৈভবীকে মারার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।”
বুবকা কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

৩২

“বাবা একটা কারখানায় কাজ করত বুঝলেন বুবকা, দেড় কামরার একটা ঘরে দুই ভাই, বাবা, মা। একবার বাবা পুজো বোনাস পেল, আর কীভাবে যেন টাকা বাঁচিয়েছিল। সেই প্রথম দার্জিলিং যাওয়া। সে কী উৎসাহ আমাদের। দাদা আর আমি মিলে ম্যালে দৌড়ে বেড়াচ্ছি সারাদিন ধরে। হোটেলের থেকে কত দূরে ছিল ম্যাল, অনেকটা হাঁটতে হত, কিন্তু তাই সই। দুজনে মিলে মাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে চলে আসতাম। তারপর দৌড়ে বেড়ানো। তিন না চার দিন ছিলাম মনে নেই। ফিরলাম যেদিন সেদিন কী মনখারাপ। শুধু মনে হত আবার সেই জীবনে ফিরে যেতে হবে!
যেতে হল। ফেরার পরেই বাবার কারখানায় লক আউট হল। কোনও দিন এক বেলা খেয়ে কাটাতাম, কোনও দিন খাওয়াই হত না। ভদ্রলোকের সন্তান হবার সমস্যা হল, ভিক্ষা চাওয়াতে আমাদের অসম্মান। দিনের পর দিন বাবা ফিরত আর আমরা হাঁ করে অপেক্ষা করতাম ভালো কোনও খবর শুনব হয়তো। এর মধ্যে একদিন দাদা স্কুল থেকে ফিরছিল, রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ল। দাদার বডি আসছে, বাড়ির সেই পরিবেশ, বাবার সেই দৃষ্টি, মার কান্না আমাকে একদিনে বড়ো করে দিয়েছিল। তারপর থেকে স্বপ্নে দাদাকে দেখেছি প্রতিবার, ম্যালে ছোটাছুটি করছি আমরা। আর দাদা সেই একইরকম আছে।”

কৌশিক কথাগুলো বলে পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে ধরালেন।
শুভ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।
তারা দুজন হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে একটা বসার জায়গায় এসে বসেছে।
বুবকা বলল, "দাদা আর মাকে কি অ্যারেস্ট করা হবে?"
কৌশিক সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, "এখানে আপনার এখনও এইসব কথা মনে আসছে? এই পরিবেশে? আমার তো ইচ্ছা করছে কোথাও না গিয়ে এখানেই থেকে যাই। ডিপার্টমেন্টে এক-আধ দিন একটু ঝামেলা হবে বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"
বুবকা বলল, "পারবেন না থাকতে।"
কৌশিক বললেন, "কেন বলছেন?"
বুবকা বলল, "আপনি মানুষ ঘেঁটে ঘেঁটে রোবট হয়ে গেছেন। রোবটদের এইসব সৌন্দর্য ভালো লাগে না।"
কৌশিক বললেন, "তা বটে। দু-চারটে ক্রিমিনালকে পিটিয়ে ঠান্ডা না করতে পারলে আজকাল মনে হয় দিনটা খুব খারাপ যাচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি রিমিকে চিনতেন?"
বুবকা বলল, "কে রিমি?"
কৌশিক বললেন, "ওহ, আপনি চিনবেন না।"
বুবকা বলল, "এখানে রিমি এল কোত্থেকে?"
কৌশিক বললেন, "রিমি হল একজন এসকর্ট, যাকে দীপ্ত রায় বোন বলে পরিচয় দিচ্ছিল। তাকে খানিকক্ষণ আগে অর্ধমৃত অবস্থায় দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা গেছে। দীপ্ত রায় তালা লাগিয়ে অফিসে গেছিলেন। আমাদের ফোর্স অনেক কসরত করে দরজা খুলে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নার্সিং হোমে নিয়ে গেছে। দ্য ফানি সাইড ইজ, স্টিল দীপ্ত রায় এ ব্যাপারে কিছু জানে না। মেয়েটার সারা শরীরে উন্ড, অত্যাচারের ছাপ স্পষ্ট। হালকা ক্লু পাওয়া গেছে, একটা নারী পাচার চক্রের অন্যতম মাথাও এই গুণধর বাবুটি। দীপ্তবাবু লম্বা ফাঁসবেন। শুধু অলকা দেবীকে প্রয়োজন ছিল এই সময় বুবকা। ওঁর কাছে অনেক খবর থাকতে পারে।"
অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছিল। কৌশিক সিগারেটটা ফেলে দিল।
বুবকা বলল, "চিরকাল দেখে এসেছি আমার দাদা পড়াশোনায় সেরা। ক্লাসে ফার্স্ট হত। ক্যুইজে একবার কলকাতার সেরা হয়েছিল। অঙ্কে এত ভালো ছিল যে ক্লাসের ছেলেরাই দাদার কাছে বুঝতে আসত। ছোটোবেলা থেকে মা ছাড়া কিছু বুঝিনি। এরা এই দীপ্ত রায়ের মতো লোকের সঙ্গে হাত মেলাবে কৌশিকবাবু? শুধু বৈভবীকে পছন্দ নয় বলে?"
কৌশিক বললেন, "আপনার দাদার চাকরিটা ছাড়া উচিত হয়নি। একটা প্রাচীন ক্লিশে প্রবাদ আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর। আপনার দাদা ওই ঝকঝকে অফিসগুলোতেই সুন্দর। সৌভিক যখন আমাকে রিপোর্ট দিত তখনই বুঝেছিলাম। উনি এই লাইনের লোকই নন। আপনার একেবারে উলটো।"
বুবকা বলল, "ছোটোবেলায় সবাই বলত দাদা বাবার মতন। অ্যাকাডেমিক টাইপ। পড়াশোনা ছাড়া কিছু বোঝে না।"
কৌশিক বললেন, "একজ্যাক্টলি। আর আপনি বাণী মিত্রের মতোই। কিংবা বাণী মিত্র আপনার মতো। নিজেরা যেটা চান, তার জন্য এমন জেদ করে থাকেন যেখানে আর সব কিছু খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। বেশি ভালোবাসা মানুষকে ঠিক ভুল বিচার করতে দেয় না। ন্যায় অন্যায়ও না। বাণী দেবী আপনাকে ভালোবাসেন..."
বুবকা বাধা দিল, "এটা ভালোবাসা না কৌশিকবাবু, এটা লোকলজ্জার ভয়, ইগো ক্ল্যাশ।"
কৌশিক পকেট খুঁজে আর-একটা সিগারেট ধরালেন, বললেন, "আমার মা এখনও দিনে তিরিশবার ফোন করে বুবকা। খেয়েছি কি না, বাড়ি কখন আসব। মায়েরা আসলে সন্তানের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকে, কিছু

বুঝতে চায় না।”
বুবকা চুপ করে বসে থাকল।
কৌশিক বললেন, “যারা বর্ন ক্রিমিনাল হয়, তাদের পেট থেকে কথা বের করতে আমাদের অনেক ঘুঘু অফিসারদের পর্যন্ত দম বেরিয়ে যায়। ক্রমাগত তারা মিসলিড করে যাবে, দিনের পর দিন তারা মার খাবে, কিন্তু তাদের পেট থেকে একটা কথা বেরোবে না। অথচ তথাগতবাবুকে দেখুন। কত সহজে কনফেস করে দিলেন। উনি আসলে ভাঙছিলেন ভিতরে ভিতরে। চাপটা আর নিতে পারছিলেন না। ওঁকে রিড করতে আমার বেশি সময় লাগেনি। সৌভিকের রিপোর্টই এনাফ ছিল। পাহাড়ে তড়িঘড়ি আপনাকে এজন্যই নিয়ে আসা। আর-একটা কারণ অবশ্য, আমার ভয় ছিল তথাগত বেশি প্যানিকড হয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে না যান!”
বুবকা বলল, “আপনি ক্রমাগত আমার দাদা আর মার পক্ষে কথা বলছেন কেন?”
কৌশিক হাসলেন, “আচ্ছা ছাড়ুন আপনাকে একটা খবর দি।”
বুবকা বলল, “কী?”
কৌশিক বললেন, “অলকানন্দা মুখার্জির কল লিস্ট চেক করা হয়েছে। নিখোঁজ হবার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই একটি নম্বরে উনি প্রায়ই ফোন করতেন। যাবার আগে অবশ্য ফোনের ডায়াল লিস্ট থেকে নম্বরটা ডিলিট করে গেছেন। আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। অগত্যা একটু গভীরে যেতে হল। নাম্বারটা আপনার বুবকা।”
বুবকা বলল, “আমি জানতাম আপনি বুঝে যাবেন।”
কৌশিক বললেন, “রেখেছেন কোথায়? জানতে পারি? এখানে আমি আপনি আর পাহাড় ছাড়া কেউ নেই।”
বুবকা হাসল। কিছু বলল না।

৩৩

সন্ধে সাতটা। প্রকাশ অফিস থেকে ফিরে দেখলেন বাণী ব্যালকনিতেই বসে আছেন। অবাক হলেন তিনি, “তুমি অফিস যাওনি?”
বাণী বললেন, “নাহ। আজ আর ইচ্ছে করল না।”
প্রকাশ বললেন, “সে কী! তাহলে অসুবিধা হবে না?”
বাণী হাসলেন, “কোনও কিছু কারও জন্য থেমে থাকে না। আমি না গেলেও কাজটা ঠিকই চলবে। তুমি চা খাবে?”
প্রকাশ বললেন, “ব্ল্যাক টি, নো সুগার।”
বাণী বললেন, “জানি জানি। আমার অতটাও ভুলো মন না।”
প্রকাশ বসলেন। বাণী বললেন, “তুমি ফ্রেশ হয়ে নিতে পারতে তো।”
প্রকাশ বললেন, “নাহ। অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আর-একটু বলি।”
বাণী বললেন, “আজ সকালেই তো বললে।”
প্রকাশ গুনগুন করলেন, “তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে।”
বাণী বললেন, “বাহ। তোমার গলাটা তো সেই একইরকম আছে। কতদিন পর শুনলাম।”
প্রকাশ বললেন, “আমিও বহুদিন পর গাইলাম। গাইতে যে পারি, সেটাই ভুলতে বসেছিলাম, আসলে শোনারও তো কেউ নেই।”
বাণী বললেন, “অনেক হল। আমাদের এবার অবসরের সময়। থামতে হবে হয়তো এবার।”
প্রকাশ বললেন, “অবসর কেন? অবসরের কোনও বয়স হয় নাকি? তুমি কি এখনও বুবকার ব্যাপারে ভেবে যাচ্ছ?”

বাণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "বুবকা সব জেনে গেছে প্রকাশ।"
প্রকাশ বললেন, "স্বাভাবিক। আজ না হয় কাল জানত। কতদিন এভাবে চেপে রাখতে পারতে সত্যিটাকে?"
বাণী বললেন, "তুমি এত নির্লিপ্ত হও কী করে? সংসার থেকে এতটা দূরে চলে গেলে কবে?"
প্রকাশ বললেন, "যেদিন জানতে পারলাম তোমার আর তরুণের ব্যাপারটা। সেদিন থেকেই।"
বাণী প্রকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। বললেন, "তুমি সব জানতে? তবু কিছু বলোনি কোনও দিন?"
প্রকাশ বললেন, "কী করতাম বলো? ছেলেরা বড়ো হচ্ছে, তরুণের সংসার আছে, স্ত্রী কন্যা আছে। অকারণ একটা জটিলতা তৈরি করা ছাড়া আর কিছু হত? নিজেকে তোমার থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার ছিল!"
বাণী বললেন, "চিরকাল একটা বোকা মানুষ থেকে গেলে। কী পেলে এত বোকা থেকে?"
প্রকাশ বললেন, "তোমাকে পেলাম। এই যে, অফিস থেকে ফিরে ব্যালকনিতে বসে আছ দেখলাম, এই মুহূর্তটা পেলাম।"
বাণী বললেন, "রোম্যান্টিক মানুষেরা চিরকাল বোকা থেকে যায়, তুমি সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।"
প্রকাশ বললেন, "বোকা থাকাই বোধহয় ভালো। আচ্ছা বাদ দাও, বুবকা কোথায়?"
বাণী বললেন, "কালিম্পংয়ে। তথাগতর ওখানে।"
প্রকাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "তথাগতই বলেছে তাহলে ওকে?"
বাণী বললেন, "হ্যাঁ। ভালোই করেছে। কতদিন আর পালিয়ে থাকা যায়!"
প্রকাশ বললেন, "ও কি নিজেই ওখানে থাকাটা এক্সটেন্ড করেছিল না তুমি বলেছিলে?"
বাণী বললেন, "আমিই বলেছিলাম। ব্যাপারটা কী থেকে কী হয়ে গেল, না? আমি শুধু চেয়েছিলাম বুবকা যেন বৈভবীর থেকে দূরে চলে যায়। দীপ্ত সেখানে মেয়েটাকে মেরেই ফেলল!"
প্রকাশ বললেন, "আগুন নিয়ে খেললে তুমি যদি ভাবো শরীর পুড়বে না তাহলে তো তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলে। তোমার অনেক ভেবে এগোনো উচিত ছিল, বা না এগোলেই ভালো হত।"
বাণী বললেন, "কী যে হল আমার! যতবার ভেবেছি বুবকা বৈভবীকে বিয়ে করবে ততবার আমার শুধু মনে হয়েছে এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না! যদিও দীপ্তর সঙ্গে বসার কথা তথাগতই বলেছিল, তবু আমি এই দায় ওকে দিতে পারি না, এ আমারই দায়। আমারই বোঝা উচিত ছিল দীপ্তর মতো ছেলে ঠিক এই সুযোগটা নেবে। বম্বে রোডের ধারে একটা বারে ওদের বসার কথা ছিল স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য, বৈভবীর ড্রিংকসে ড্রাগস মিশিয়ে ওকে খাইয়ে ওর সঙ্গে আগরওয়ালের ঘনিষ্ঠ ছবি তোলার প্ল্যান ছিল। ওরা যেতে পারল না তার আগেই ট্রাকটা... ছি ছি ছি, আমি কী করলাম। এত নিচে নেমে গেলাম!"
বাণী ভেঙে পড়লেন। প্রকাশ বাণীর পিঠে হাত রাখলেন, "একটা কথা বলব শুনবে?"
বাণী বললেন, "কী?"
প্রকাশ বললেন, "এসব নিয়ে আর ভেবো না। চা করবে বলছিলে না? যাও। অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হও।"
বাণী বললেন, "যাচ্ছি।"
প্রকাশ বললেন, "তুমি যেদিন প্রথম ভেলভেট পিকচারস শুরু করেছিলে ব্যাংক লোন নিয়ে, সেদিনের কথাটা মনে আছে? কতটা ভয় ছিল, আদৌ এত টাকা শোধ করতে পারবে নাকি! জীবনটাও তো অনেকটা সেরকমই। অনিশ্চয়তায় ভরা। শুধু একটা সিদ্ধান্তের জন্য সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে না। তুমি ওঠো। চলো দুজনে মিলেই চা-টা বানাই। ওঠো।"
বাণী উঠলেন। প্রকাশ বাণীর হাত ধরলেন।

তারা যখন হোটেলে ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। কৌশিকের সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। কৌশিক বুবকাকে বললেন, "আপনি যান, আমি কিনে ঢুকছি।"
বুবকারা অন্য হোটেলে উঠেছিল। বুবকা ঘরে গিয়ে দেখল শুভর সঙ্গে তথাগতও বসে আছে। কথা বলছিল তারা। বুবকা বলল, "কি রে, তুই?"
তথাগত বলল, "তোর কাছেই এসেছিলাম।"
বুবকা বলল, "শুভদা তুমি তো সারাদিন হোটেলে ঘুমালে, যাও একটু বাইরে হাওয়া খেয়ে এসো।"
শুভ বলল, "বুঝেছি বুঝেছি, তবে দেখো বাপু, মারপিট কোরো না যেন।"
বুবকা বলল, "যাও তো।"
শুভ করুণ মুখে বলল, "বুঝেছি, গরিব মানুষের কোনও দাম নেই। আচ্ছা আসছি।"
শুভ বেরিয়ে গেল।
বুবকা বলল, "বল কী বলবি।"
তথাগত বলল, "আমি ডিসিশন নিয়েছি আগের কোম্পানিতে জয়েন করব, এসব আমার জন্য না।"
বুবকা বলল, "সেটা আমি জেনে কী করব।"
তথাগত বলল, "একটা সময় ভেবেছিলাম এত বড়ো হাউজ, হয়তো খুব ইজিলি ব্যাপারগুলোকে বুঝে নেব। আদতে বুঝলাম আমি পারছি না। আর এইসবের মধ্যেই খুব বড়ো একটা পাপ করে ফেললাম। তোকে আবার বলছি, বৈভবীকে মারার কথা কোনও দিনও ভাবিনি। সেদিন যখন খবরটা শুনলাম, প্রথমেই হতভম্ব হয়ে তোকেই ফোন করে দিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি দীপ্ত এটা করতে পারে। যতবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি, ততবার আমি নিজেকেই ক্ষমা করতে পারি না। তুই আর আমাকে কী ক্ষমা করবি!"
বুবকা বলল, "তোর মনে আছে দাদা ক্লাস টুয়েলভে আমি অঙ্কে টেস্টে ফেল করেছিলাম? আর তুই তারপর থেকে তিনমাস নিয়ম করে আমাকে অঙ্ক করাতে বসতি? কিছুতেই মাথায় ঢুকত না, আর তুই দিনের পর দিন ধৈর্য নিয়ে আমাকে বুঝিয়ে যেতিস। সেই তুই এত তাড়াতাড়ি এতটা চেঞ্জ হয়ে গেলি?"
তথাগত চুপ করে বসে রইল মাথা নিচু করে।
বুবকা বলল, "দুজন মানুষ ভালোবাসলে সবার এত সমস্যা কেন বল তো দাদা? বয়সটাই কি সব? এই যে বাবা মা দিনের পর দিন আলাদা ঘরে থাকে, একটা ঠান্ডা সম্পর্ক বয়ে চলে এল সারাটা জীবন, এটাই বা কেমন সম্পর্ক বল তো? একটা মানুষ কাকে ভালোবাসবে তাতে তাদের দুজন ছাড়া সবার এত মাথাব্যথা কেন হবে?"
তথাগত বলল, "আই অ্যাম সরি বুবকা, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিস।"
বুবকা বলল, "ক্ষমা যার করার কথা ছিল, সে-ই তো নেই আর, আমি কী করব আর!"
কলিং বেল বাজল।
বুবকা দরজা খুলে দেখল কৌশিক এসেছেন।
কৌশিক ঘরে ঢুকে তথাগতকে দেখে বললেন, "ওহ, আমার মনে হয়েছিল আপনি এখানে আসবেন। আপনাদের জন্য একটা খবর আছে।"
তথাগত বলল, "কী?"
কৌশিক বললেন, "টিভিতে দেখাচ্ছে তো, টিভিটা চালান। দীপ্ত রায় কিছুক্ষণ আগে ওঁর অফিস থেকেই অ্যারেস্ট হয়েছেন। আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে আছেন।"
বুবকা বলল, "কোন চার্জে?"
কৌশিক বললেন, "আপাতত বৈভবী এবং আগরওয়ালের মার্ডারের চার্জ আছে। অলকা দেবীকে খুঁজে পাওয়া গেলে দীপ্তর জন্য আরও বড়ো বাঁশ অপেক্ষা করছে। যাকে বলে আছোলা এক্কেবারে।"
বুবকা কৌশিকের দিকে তাকাল, "দীপ্ত তো সবার আগে মার আর দাদার নাম নেবে।"

কৌশিক বললেন, "স্বাভাবিক। ওর মতো হারামি মাল কী কী করতে পারে তা আমার থেকে ভালো আর কে জানতে পারে।"

বুবকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "মাকে এখন টানাহ্যাঁচড়া না করলেই ভালো হয় বোধহয়, দাদাকেও। আমি ওদের ক্ষমা করে দিয়েছি কৌশিকবাবু।"

তথাগত দুহাতে মুখ ঢাকল। কৌশিক বললেন, "সেটা হয়তো সম্ভব হবে না, তবে কেদার সিংয়ের সাক্ষ্যটা খুব ইম্পরট্যান্ট হবে, কারণ ব্যাটাকে দীপ্তই ইনভলভ করিয়েছিল। মালটাকে আমার গোপন ডেরায় রাখা আছে যাতে ওকে চাপ দিয়ে বয়ান চেঞ্জ না করানো যেতে পারে। আশা করা যায় এই ব্যাপারে দীপ্ত রায়ের খেলা এখানেই শেষ।"

বুবকা বলল, "শুভদাকে দেখলেন বাইরে?"

কৌশিক বললেন, "হ্যাঁ, নিচে এক ভদ্রলোক মাউথ অরগ্যান বাজাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে সেটা শুনছে। চলুন আপনারাও চলুন। মারামারি, হানাহানি, হিংসার বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। দেখে আসবেন চলুন।"

তারা বেরোল ঘর থেকে। নিচে নেমে দেখল এক বৃদ্ধ অপূর্ব এক সুর তুলেছেন মাউথ অরগ্যানে। "তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।"

বুবকা দেখল একদিকে বৃদ্ধ সুর তুলছেন অন্যদিকে শুভর দু চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। বুবকা তথাগতকে বলল, "দাদা, অনেক দিন টাকা দিস না, আজ দে তো কিছু, স্কচ খাই বহুদিন পর।"

৩৫

-দীপ্তবাবু ভালো আছেন? এরা ভালো রেখেছে তো আপনাকে?

-ওহ, কৌশিকবাবু! বাহ। আপনাকেই এক্সপেক্ট করছিলাম। কী দেবেন? থার্ড ডিগ্রি?

-আপনাকে তো পারলে হাজার ডিগ্রি দিতাম দীপ্তবাবু, কিন্তু কী করব বলুন, আপনি তো এমনিই সব বলে দেবেন। অকারণে আর এনার্জি নষ্ট করে কী করব।

-বলতে পারি, কিন্তু কেন বলব?

-যাতে শাস্তি কম হয়।

-ওহ। তা বটে। কিন্তু বলব না। বুঝলেন? চিন্তা করবেন না, আমারও মিডিয়া আছে, আপনার মতো দুর্নীতিবাজ পুলিশ যে কীভাবে একজন নির্দোষ লোককে ফাঁসাচ্ছে সকাল বিকাল দেখবেন আপনি।

-তা দেখান, কোনও চিন্তা নেই। আচ্ছা এবার কাজের কথায় আসি। বলুন তো বস, বৈভবীকে মারলেন কেন? শুধুই রাইভ্যালরি? নাকি বৈভবী আর-একটু বেশি কিছু জেনে ফেলেছিল?

-আপনাদের তো বললাম, তথাগত মিত্র আর বাণী মিত্র আমাকে মারতে বলেছিল বলে আমি মেরে দিলাম। ওদের জেরা করে জানুন পুরোটা। আমাকে কেন বলছেন?

-দীপ্তবাবু, আপনার ফেসবুক ডেটিং ব্যবসাটা কেমন চলছে? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বনাশ করে পাচারের কাজ? খুব বেশি দূর গেছে না এখনও ওয়েস্ট বেঙ্গলই...?

-মাইনে কত পান কৌশিকবাবু? ডিএ তো পান না। রাস্তায় মাঝরাতে গাড়ি ধরে ট্রাক ধরে বিশ টাকা ত্রিশ টাকায় সংসার চলে?

-বৈভবী কি সব জেনে গেছিল দীপ্তবাবু? আগরওয়ালও তো জানত, তাই না?

-পঁচাত্তর লাখ টাকা চোখে দেখেছেন কোনও দিন কৌশিকবাবু? সবার একটা রেট থাকে। কোন শুয়োরের বাচ্চা বলছিল আপনি নাকি সৎ? আমি বিশ্বাস করি না। পুরোনো প্রবাদ আছে, সৎ বলে কিছু হয় না। সবার রেট আছে কৌশিকবাবু। এসব চাকরি করে কী করবেন? আমি শুনলাম আপনি ভালো স্ক্রিপ্ট লেখেন। আপনার গল্পে আমি সিনেমা বানাব। ভাবুন তো এই বালের চাকরি করে কী লাভ হয়? আপনার সিনেমা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আপনাকে পুরস্কার দেবে, হট নায়িকারা আপনার বুকে বুক ঠেকিয়ে ফটো তুলে পেজ থ্রিতে দেবে। ভাবতে পারছেন কৌশিকবাবু?

-রিমিকে ওভাবে মারলেন কেন দীপ্তবাবু?
-আচ্ছা ছেড়ে দিন, এক কোটি, আমি বেরিয়েই আপনাকে একটা ওয়ার্ল্ড ট্যুরে পাঠাব। প্যারিসের মেয়েরা খুব ভালো শয্যাসঙ্গিনী হয় জানেন তো? কিংবা ব্রাজিল। মরিশাসও যেতে পারেন। আপনি তো অবিবাহিত, নাহয় একজন মডেলকে নিয়েই বেরোবেন। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব কৌশিকবাবু, একদম চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরুন। আমি আছি আপনার পিছনে। কলকাতার বস্তিতে অপরাধীদের পিছনে ঘুরে বেড়াবেন, কোন ধাপার মাঠে রাতবিরেতে পড়ে থাকবেন, কেন? কল্পনা করুন আপনি স্কটল্যান্ডের বিচে বসে মার্টিনি খাচ্ছেন, ঠিক যেমন জেমস বন্ড খেতেন, পাশে অর্ধনগ্না মডেল, আপনি চাইলেই আপনাকে ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে, আমি আরব্য রজনীর দৈত্য কৌশিকবাবু, একবার চেয়ে তো দেখুন।
-আপনার মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি আছে দীপ্তবাবু, কথাও ভারী সুন্দর বলেন। আচ্ছা আরও বলুন তো, নিজের বাজারদরটা বুঝে নি।
-আমার কেসটা হালকা করে দিন কৌশিকবাবু, আপনাকে বুবকা টাকা খাইয়েছে না? কত টাকা খাইয়েছে, আপনি আমাকে বলুন।
-আমাকে আমার চাকরি টাকা খাওয়ায় দীপ্তবাবু, ওই ডিএ না পেয়ে পেয়ে যে মাইনেটা পাই, ওই টাকাই আমাকে খাওয়ায় দীপ্তবাবু। সে টাকাটার বেশি টাকা আপনি দিতে পারবেন না।
-আপনি বোকা কৌশিক, আপনি বোকা, আপনি একটি চার অক্ষরের বোকা। লাস ভেগাসে ক্যাসিনোতে জুয়া খেলছেন, একের পর এক টাকা হারছেন তবু আপনি টাকা লাগাতে পিছপা নন, জানেন দীপ্ত ঠিক আছে আপনার সঙ্গে, ভাবতে পেরেছেন কোনও দিন? ভাবুন ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন। আপনার বস, তার তস্য বস, তার তস্য তস্য বস সবাই বিক্রি হয়ে যায়, আপনি তো কোন ছাড় কৌশিক, রেটটা বলুন। টাকাটা বলুন।
-অলকানন্দা সব জানিয়ে দিয়েছে আপনার ব্যাপারে দীপ্তবাবু। কেদার সিংও। শিলিগুড়ি এবং কলকাতা মিলিয়ে আপনার এসকর্ট সার্ভিসের চুয়ান্ন জন মহিলাকে উদ্ধার করে এনজিওর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কাস্টিং কাউচ করে, অভিনয় করার নাম করে আপনি মেয়েদের যে রাস্তায় নামিয়েছিলেন সেই পথটা আমরা কেটে দিয়েছি দীপ্তবাবু। আপনার খেলা শেষ।
-অলকানন্দা? শি ইজ আ বিচ! মাগিটাকে বরের মারের হাত থেকে বাঁচালাম আমি। শেষে এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করল? হবেই তো, এরাই নিমকহারাম হবে, গলায় জুতো পিষে...
-আহ, দীপ্তবাবু, অনেক মাথা ঠান্ডা করে ছিলাম। এই চড়টা আপনার প্রাপ্য ছিল। ব্যথা লাগল? চিন্তা করবেন না, ধীরে ধীরে সেরে যাবে। চলি, কাল কোর্টে আপনাকে আমিই নিয়ে যাব। ভালো থাকবেন।

৩৬

-গুরু।
-বলো শুভদা।
-আমরা পথের লোক পথেই ফিরে এলাম।
-সেই। যা বলেছ।
-এই যে বৃষ্টি, এমন একটা রোম্যান্টিক দিন। আমরা কী করছি? রাস্তার ধারে, কেলিয়ে বসে থেকে মদ গিলছি। এটা কোনও লাইফ গুরু?
-চানাচুরটা না খেলে দাও শুভদা। কষ্টের টাকায় কেনা চানাচুর। নষ্ট কোরো না।
-খাব রে ভাই। আচ্ছা নে। তুই তো আজ শ্যুটিংয়েও গেলি না। আচ্ছা তোকে আমি তুই বলতাম না তুমি বলতাম?
-ও যা ইচ্ছা বলো তুমি। আমার কোনও চাপ নেই।

-চাপ নেই তো জানি। অত বড়ো সেলিব্রিটি তুই। রাস্তাঘাটে বেরোলে মেয়েরা তো পারলে চুমু অবধি খেয়ে নেয়। কী করছিস বল তো ভাই আমার? মাঝরাতে মদ খেয়ে পড়ে থাকলে চলে? একটা লক্ষ্মীমন্ত বউ আন, সংসার কর। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, জানিস এরকমই বৃষ্টি ছিল সেদিন। এমন বৃষ্টি যে আদ্ধেক লোকই আসতে পারেনি। অলকার ঠাকুমা বেঁচে ছিল তখন। আমাকে বলল, জামাই, বৃষ্টির দিনে বিয়ে শুভ লক্ষণ। টিনের চালে ফুলশয্যার মজা বোঝো জামাই? যেদিন ফুলশয্যা হল ভাই, বাড়ির সামনে হাঁটুজল জমে গেছে, আমি ঘর-টর পরিষ্কার করছি, অলকাও করছে, তারপর কখন যেন বাজ পড়ল। আর সে কী ভয়! আমার হাত ধরে বসে আছে। বলে তুমি আমাকে ছেড়ো না। আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। বউ এরকম ভয় পেলে কী করে হবে? একা গোটা সংসারটা ধরে রাখতে হবে তাকে। আমি যত বোঝাই সে তত আমার হাত চেপে ধরে, আর বৃষ্টিও হয়েছিল সেদিন। সঙ্গে বাজ। কী দিন ছিল রে ভাই, কী দিন ছিল, ভেসে গেল সব...

দুজনে চুপ করে বসে ছিল।

বুবকার গাড়ির সামনে একটা বাইক এসে দাঁড়াল। শুভ বলল, "উফ, ইমোশনাল সময়গুলোতেই এই বেরসিক পুলিশগুলোকে আসতে হয়।"

কৌশিক জানলায় উঁকি মারলেন, "বুবকাবাবু, এবার তো সময় এসে গেছে। কাল তো আমাকে কোর্টে..."

বুবকা বলল, "বাইকটা কী করবেন?"

কৌশিক বললেন, "আপনি গাড়িটা নিয়ে এগোন, আমি বাইক নিয়ে পিছনে যাচ্ছি।"

বুবকা গাড়ি স্টার্ট দিল।

শুভ অবাক গলায় বলল, "গুরু, কোথায় যাচ্ছ?"

বুবকা বলল, "চুপ করে বসে থাকো না। থাকা যায় না?"

শুভ বলল, "ভালো লাগে না, এই পুলিশ যেদিন থেকে জীবনে এসেছে, একটু শান্তি নেই রে ভাই।"

বুবকা বলল, "শুভদা, অলকা এখন ফিরে এলে সংসার করবে?"

শুভ বলল, "কেউ ফিরে আসে না রে ভাই, আমি যা করেছি, আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।"

বুবকা বলল, "যদি ফিরে আসে? তোমাকে সিচুয়েশন দিলাম। তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি কী করবে?"

শুভ বলল, "পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, বলব সবই তো করেছ সেই আমাকে খাওয়ানোর জন্যই, আমরা যাতে ভালো থাকি তার জন্যই। দোষ ত্রুটি তো সবাই করে। আমি যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে শুয়ে আসতাম তুমি তো কিছুই বলতে না, আমি খুব ভুল করে ফেলেছি বউ, এই কান ধরলাম, আর কোনও দিন করব না, বিশ্বাস করো।"

বুবকার গাড়িটা বৈভবীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বুবকা পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দিয়ে বলল, "দরজাটা খোলো।"

শুভ বলল, "এ কোথায় নিয়ে এলি ভাই?"

বুবকা বলল, "যাও না। দরজাটা খোলো, আর এ নাও, টর্চটা নিয়ে যাও।"

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল আবার। শুভ গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গেটটা খুলে সদর দরজার তালাটা খুলল। কৌশিক বাইক নিয়ে চলে এসেছিলেন।

বুবকা বলল, "দাঁড়ান। আমরা একটু পরে যাই, নাহয় বৃষ্টিতে ভিজি কিছুক্ষণ। শুভদার শুভদৃষ্টি হবে আজকে অনেক দিন পরে, কাবাব মে হাড্ডি হবার দরকার নেই কোনও।"

কৌশিক অবাক গলায় বললেন, "আপনি এখানে রেখেছিলেন? ইলেক্ট্রিক পর্যন্ত নেই? খেত কী?"

বুবকা হাসল, "মাঝরাতটা তো আমার দখলে কৌশিকবাবু, ভুলছেন কেন? সে সময়েই যতটা পারতাম সাপ্লাই করেছি খাবারদাবার, ঘরদোর বন্ধ করে থাকাটা কষ্টকর, কিন্তু একটা জানোয়ারের কাছে থাকার চেয়ে

এ যন্ত্রণা তুচ্ছ। মোবাইলটা তো ইচ্ছা করেই রেখে এসেছিল যাতে কেউ ট্রেস করতে না পারে কোথায় থাকবে, কিছুদিন এভাবেই থাকত, নইলে অন্য চিন্তা করতে হত।"

কৌশিক বললেন, "টেক্কা মেরে দিলেন ফটোফিনিশে। শহরের মধ্যে রাখবেন সেটাই ভাবিনি, শিট, এটা আমার কিছুতেই মাথায় আসেনি।"

বুবকা বলল, "টেক্কা আপনিই মেরেছেন, এত কম সময়ে এত বড়ো একটা জানোয়ারকে ধরেছেন, শুধু..."

কৌশিক বুবকার কাঁধে হাত রাখলেন, "চলুন ভিতরে যাওয়া যাক, শুভবাবু আনন্দের চোটে আমাদের কালকের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে বেশি আদর-টাদর করে দিলে অসুবিধা হয়ে যাবে।"

বুবকা বলল, "আপনিই যান, অলকা আর শুভকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে আজকের মতো, কাল থেকে আবার কোর্টের যুদ্ধ।"

কৌশিক বললেন, "বেশ, আমি আসছি ওদের নিয়ে।"

ধীর পায়ে বৈভবীর বাড়ি ঢুকে গেলেন কৌশিক, বুবকা গাড়ির মিউজিক প্লেয়ারটা অন করল, "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"...

দেবব্রত বিশ্বাস ধীরে ধীরে গাড়িটার দখল নিয়ে নিলেন।

অসময়ের বৃত্তান্ত

১

।। ভূমিকা।।

সন ১৫৩১। দিল্লির সিংহাসনে আসীন বাদশাহ হুমায়ন। পিতা বাবরের মৃত্যু হয়েছে সদ্য। শিল্পপ্রিয় এবং খামখেয়ালি বাদশাহকে নিয়ে দিল্লির হাওয়া কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত।

যদিও আমাদের গল্প বাদশাহকে নিয়ে নয়।

চোখ রাখা যাক বাংলার দিকে।

বীরভূমের কোনও এক গ্রাম।

হিন্দুপ্রধান।

হরি মিশ্র পূজারী বামুন। প্রবল গ্রীষ্মের দুপুরে মন্দিরেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

গ্রামের প্রবেশপথে শিবমন্দির। গ্রামে প্রবেশ করতে হলে মন্দিরের পথ ধরে প্রবেশ করতে হয় যদি কেউ পশ্চিম দিক থেকে আসে। গ্রামটি তার আশেপাশের গ্রাম থেকে একটু দূরত্বে অবস্থিত।

হরি মিশ্রের ঘর মন্দির সংলগ্ন। বামনী কাত্যায়নী এবং তাঁদের একাদশবর্ষীয়া কন্যা রাধা। হরির একমাত্র ছেলে বিশ্বম্ভর জীবিকার সন্ধানে কাশীতে গেছিল তিন বছর আগে। আপাতত ওখানেই এক টোলে পণ্ডিতি করে। ছ মাস সাত মাসে একবার করে আসে।

বিশ্বম্ভরের বিয়ে হয়েছিল গ্রামেরই এক মেয়ের সঙ্গে। বেনারসে যাবার পাঁচ মাসের মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়। তার চার পুত্র।

হরি পঞ্চাশোর্ধ্ব। রাধা তাঁর বেশি বয়সের সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই কন্যাস্নেহ বেশি। মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেলেও হরি গড়িমসি করে যান। কাত্যায়নী মেয়েকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় বড়োই চিন্তা করেন। বিশ্বম্ভরও বাবাকে ঠারেঠোরে বুঝিয়েছে, যদিও হরি এই প্রসঙ্গ উঠলেই হেসে বলেন, সবই জগজ্জননীর ইচ্ছা, তিনি চাইলে সবই হবে। এই ব্যাপারে আর কেউ চিন্তা না করলেও হবে।

মন্দিরের বাইরেই চণ্ডীমণ্ডপ। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা এসে গল্পগুজব করেন। আপাতত প্রবল দাবদাহে কারও দেখা নেই।

হরির ঝিমুনি মতন এসেছিল। ঘোড়ার পায়ের শব্দে চোখ খুলে দেখলেন এক অশ্বারোহী গ্রামের দিকে ছুটে আসছে।

হরি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

এক দীর্ঘদেহী পুরুষ ঘোড়া থেকে নামলেন। নেমেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

হরি মিশ্র তড়িঘড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন এক মুসলমান যোদ্ধা। সম্ভবত দীর্ঘ পথশ্রমে এবং তীব্র দাবদাহে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

তিনি মন্দিরের ভিতরের কলস থেকে জল নিয়ে এসে দূর থেকে চোখে মুখে ছেটালেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে যোদ্ধার জ্ঞান ফিরল।

তিনি কোনওমতে জলের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝালেন তাঁর আরও জলের প্রয়োজন।

হরি গলা ছেড়ে রাধাকে জল নিয়ে আসার জন্য বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাত্যায়নী এবং রাধা কলসি নিয়ে হাজির হলেন।

কাত্যায়নী মুসলমান যোদ্ধা দেখেই তড়িঘড়ি ঘোমটা দিলেন।
রাধা কলসি বাবার কাছে নিয়ে এসে কৌতূহলভরে মুসলমান যোদ্ধাকে দেখতে থাকল।
কাত্যায়নী ধমকের সুরে বললেন, "ঘর যা রাধা। তোর বাবার তো বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না কোনও দিন।"
যোদ্ধা কোনও দিকে না তাকিয়ে কলসি নিয়ে অনেকটা জল খেয়ে ফেললেন।
কাত্যায়নী হতাশ গলায় বললেন, "গেল কলসিটা। আগে জানলে..."
জল খেয়ে যোদ্ধাটি অজানা কোনও ভাষায় (পুস্তু ভাষা) হরিকে কিছু বললেন। হরি বুঝলেন না। কাত্যায়নী রাধাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার মালিক। হরি বেশ মুগ্ধ হয়ে যোদ্ধাটিকে দেখতে লাগলেন।
যোদ্ধার ভাষা যদিও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তিনি।
যোদ্ধাটি বেশ খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "জলিল খান। জলিল খান।"
হরি বুঝলেন যোদ্ধাটির নাম জলিল খান।
জলিল খানের ঘোড়াটি ভদ্র সভ্য। কোথাও পালিয়ে যায়নি।
জলিল উঠে ক্লান্ত দেহ ঘষটে ঘষটে ঘোড়াটিকে বাঁধলেন। অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে হরির দিকে কিছু খেতে দেওয়ার কথা আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগলেন।
হরি কিছুক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন। তারপরে দ্রুতবেগে নিজের ঘরের প্রতি ধাবমান হলেন।
কাত্যায়নী গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। তাঁকে দেখেই ফোঁস করে উঠলেন, "আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।"
হরি বিচলিত কণ্ঠে বললেন, "বিবাদ পরে কোরো। কিছু খাবার থাকলে দাও।"
কাত্যায়নী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হরির দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। হরি নিজেই হাঁড়ি থেকে কিছুটা ভাত আর শাক একখানি কলাপাতায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রাধা বাপের পিছন পিছন যাবে ঠিক করেছিল, কাত্যায়নীর মুখ দেখে আর যাবার সাহস করল না।
জলিল সবখানি খাবার খেয়ে গাছের তলাতেই নিদ্রা গেলেন।
বিকেল নাগাদ গ্রামে খবর হলে গ্রামের সবাই দল বেঁধে চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হল।
হরিকে বিদ্যাচরণ ডেকে বললেন, "ছোঁয়াছুয়ি হয়নি তো ঠাকুর?"
হরি একগাল হেসে মাথা নাড়লেন, "কী যে বলেন!"
বিদ্যাচরণ বললেন, "এ পেয়াদা কোত্থেকে এয়েচে? এখেনেই থাকবে?"
হরি জলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভাষা তো কিছুই বুঝি না। তবে থাকবে না মনে হয়। রাতেই দেখবেন চলে যাবে।"
বিদ্যাচরণ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ভারী অলুক্ষুনে হে হরি। ম্লেচ্ছ পেয়াদা ভারী অলুক্ষুনে। দেখো সাবধানে।"
সবাই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে জলিল খানকে দেখতে লাগল।
সন্ধে নাগাদ জলিল উঠে কলসির বাকি জলটুকু খেয়ে ঘোড়ায় উঠে গ্রাম ত্যাগ করলেন।
সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। বিদ্যাচরণের নেতৃত্বে চণ্ডীমণ্ডপসহ গোটা চত্বরটা গোবর (গোবর দিয়ে নিকোনো হয়, ধোয়া যায় না।) এবং গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া হল।
সন্ধ্যারতি হবার পরে সব গ্রামবাসী যখন ঘরে ফিরে গেল, হরি দেখলেন জলিল ফিরে এসেছেন।
তিনি জলিলের কলসিতে জল ভরে দিলেন।
কাত্যায়নীর রক্তচক্ষু আরও একবার উপেক্ষা করে জলিলকে খেতে দিলেন। জলিল খেয়েদেয়ে গাছতলাতেই ঘুমিয়ে পড়লেন।
পরের দিন সকালে হরি ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করলেন, রাধা এবং জলিল, কেউই নেই।

২

।। বর্তমান সময়।।

আদিত্য গাড়ি বের করছিল। সবে গাড়ি চালানো শিখে নতুন গাড়িটা কিনেছে। সাবধানে চালাতে হয়। এখনও মাঝে মাঝে ব্রেক আর অ্যাক্সিলারেটর গুলিয়ে ফ্যালে।

রুমকি দরজায় তালা দিয়ে গাড়িতে উঠল। হালকা গলায় বলল, "দেখো, ঠিকঠাক পৌঁছোতে পারবে তো?"

আদিত্য বলল, "দেখাই যাক।"

গাড়ি চালানোর সময় কোনও কথা বলে না আদিত্য।

মাথা ঠান্ডা করে চালাতে হয়। অন্য কোনও দিকে মন দিলে হবে না।

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সাবধানে না চালালে চিত্তির।

রুমকির ফোনে ফোন আসছিল বাড়ি থেকে। মাঝে মাঝেই ফোন বের করে রুমকি "হ্যাঁ এই তো রুবি" "এই তো সাইন্স সিটি" করে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক লাগল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছোতে।

বাড়িতে পুজো হচ্ছে। রুমকি ঢুকেই ঠাকুরঘরে চলে গেল। রুমকির বাবা পুজো করছেন।

আদিত্য বসার ঘরে বসল। ঝুমকি বসে বসে মোবাইল ঘাঁটছে। অন্যান্য দিন তাকে দেখলেই ঝুমকি একগাদা প্রশ্ন করে। আজ শুধু হাসল।

আদিত্য বলল, "কী ব্যাপার রে? মুড অফ কেন? পুজোর ওখানেও যাসনি!"

ঝুমকি বলল, "কিছু না দা, শরীরটা একটু খারাপ, এই যা।"

আদিত্য বুঝল পিরিয়ডস সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হবে হয়তো। সে আর কিছু বলল না।

ঝুমকি বলল, "তোমরা নৈনিতাল কবে যাচ্ছ যেন?"

আদিত্য বলল, "কেন? তোর দিদিয়া তোকে বলেনি?"

ঝুমকি বলল, "দিদিয়া তো সময়ই পায় না আজকাল কথা বলতে।"

আদিত্য বলল, "তা ঠিক। তোর দিদিয়া সর্বক্ষণ বই নিয়ে ব্যস্ত। ইউনিভার্সিটির এক্সামটা শেষ হলে বাঁচি।"

ঝুমকি বলল, "আর আমি? ফার্স্ট ইয়ারের যে কী চাপ তা আর তোমাকে কী বোঝাব! মাঝে মাঝে মনে হয় গলাজলে বসে থাকি।"

আদিত্য হাসল। বলল, "বিয়ে করে নে তাহলে। পড়াশোনা করতে হবে না।"

ঝুমকি ছদ্ম আগ্রহী গলায় বলল, "হাতে ভালো পাত্র আছে নাকি?"

আদিত্য বলল, "আছে তো। বলব কথা?"

ঝুমকি বলল, "প্লিজ বলো। দেখতে কেমন? হৃতিক পুরো?"

আদিত্য বলল, "একদম। রূপে কার্তিক, গুণে কী যেন বলে..."

ঝুমকি ছদ্ম রাগে বলল, "হুঁ, সেই তো হুঁকোমুখো হ্যাংলা ধরে নিয়ে আসবে একটা।"

ঝুমকির মোবাইলে ঘন ঘন মেসেজ টোন বাজছে।

আদিত্য বলল, "কে রে? প্রেম-ট্রেম করছিস নাকি?"

ঝুমকি একটু চমকাল, পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে বলল, "না না, ধুস, কী যে বলো।"

আদিত্য বলল, "তবে?"

ঝুমকি বলল, "কলেজের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সারাক্ষণ কিছু না কিছু আসছে।"

আদিত্য বলল, "ও। আমারও অনেকক্ষণ হোয়াটসঅ্যাপ চেক করা হয়নি বটে।"

আদিত্য মোবাইল বের করল। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে পুজো শেষে রুমকি বসার ঘরে এসে আদিত্যকে দেখে বলল, "এ কী! আবার মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তুমি? তোমার শালিকে নিয়ে গল্প তো করতে পারতে!"

আদিত্য বলল, "উনিও তো ওতেই ব্যস্ত।"
রুমকি ঝুমকির মোবাইলের দিকে দেখে রাগ করল, "দেখেছিস? আমি বাবাকে বারবার বারণ করলাম তোকে যেন স্মার্টফোন এখনই না কিনে দেয়, ঠিক কিনে দিল, না? এইজন্য আমি বাড়ির ব্যাপারে আজকাল আর কিছু বলি না। আমার কথা কেউ শোনেই না আজকাল!"
ঝুমকি বলল, "আমি একদম বেশি নেট করি না দিদিয়া, বিশ্বাস কর!"
রুমকি বলল, "যা ইচ্ছা কর। আমার কী!"
আদিত্য বলল, "বেরোব এখন?"
রুমকি বড়ো বড়ো চোখ করে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখনই যাবে? খাবে না?"
আদিত্য বলল, "প্রসাদ হয়েছে? আমাকে আবার কতটা ড্রাইভ করতে হবে!"
রুমকি বলল, "হবে না কেন! বসো। খেয়ে যাও। এই মেয়ে, যা ওর খিচুড়িটা নিয়ে আয় শিগগির।"
ঝুমকি উঠে ঘর থেকে বেরোলে রুমকি বলল, "দেখেছ? ঠিক মোবাইল দিয়ে দিল বাবা ওকে। কতবার বলেছি।"
আদিত্য বলল, "দিয়েছে ভালো করেছে। সব বন্ধুরা স্মার্টফোন নিয়ে ঘুরবে আর তোমার বোন গরিবের কমদামি ফোন নিয়ে ঘুরবে? তুমিও যেমন।"
রুমকি মুখ ভার করল, "যাক গে, তুমি সাবধানে যাবে। আর শোনো, রাত্তিরে আবার বোতল খুলে বোসো না যেন।"
আদিত্য বলল, "না না, তুমি না থাকলে আমি বোতল খুলি না তো! জানো না?"
রুমকি মুখ বাঁকাল, "হ্যাঁ, ওই আনন্দেই আছি আর কি।"
ঝুমকি প্রসাদ নিয়ে এসেছিল। আদিত্য খেতে খেতেই বলল, "বাবা মাকে দেখছি না?"
রুমকি বলল, "আরও কী সব লোক এসেছে, বাইরে আছে। তুমি যাবার সময় দেখা করে যেয়ো, তাহলেই হবে।"
আদিত্য খেয়ে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করে বেরোল।
বেশি রাত করে সে শহরের রাস্তায় গাড়ি চালাতে চায় না।
#
পরদিন অফিসে ছিল আদিত্য। দুপুর দেড়টা নাগাদ দেখল রুমকি ফোন করছে। বিরক্ত হল খানিকটা। মেয়েটা অফিস আওয়ারস বুঝতে পারে না। ধরল, "বলো, আবার কী হল।"
রুমকি ওপাশ থেকে ধরা গলায় বলল, "সর্বনাশ হয়েছে দিত্য। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো এ বাড়ি এসো।"

৩

সরু গলি। গাড়িটা দাঁড় করানোর পর অনেকটা হাঁটতে হয়।
ঝুমকি গাড়ি থেকে নামল। রিন্টু বলল, "চ।"
ঝুমকি ইতস্তত করে বলল, "তোমার বাড়ি থেকে ঝামেলা করবে না তো?"
রিন্টু ঝুমকির হাত ধরল, "ধুস। চ তো।"
ঝুমকি হাত ছাড়িয়ে নিল না। তার ভালো লাগছিল সব কিছুই।
সকাল থেকে তাকে অনেক অভিনয় করতে হয়েছে। গয়নাগাঁটি যা ছিল সব খুলে খাটের ওপর রেখে ক্লাস টেন আর টুয়েলভের সব সার্টিফিকেট, ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড কলেজের ব্যাগে নিয়ে নিয়েছে। মাসের হাতখরচটা নিয়েছে। রিন্টু বলেছিল কোনও জামাকাপড় না নিতে। সব কিনে নেওয়া যাবে। ঝুমকি কিছুই নেয়নি। একটা চিঠি রেখে এসেছে শুধু, "আমি বিয়ে করছি মা। আমার সঙ্গে কোনও দিন আর যোগাযোগ রেখো না। জানি আমি খুব খারাপ।" ব্যস, এটুকুই।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যেভাবে রোজ তাড়াহুড়ো করে খায় সেভাবেই খেয়েছে। রুমকি ঘুমোচ্ছিল। আগের দিন পুজো করে ক্লান্ত ছিল। ঝুমকি রুমকির ঘরে গিয়ে ওকে আদর করে এসেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসরাস্তায় রিন্টু একটা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেই চালিয়ে এসেছিল। ঝুমকি সে গাড়িতে উঠতেই রিন্টু গাড়ি স্টার্ট দিয়েছিল। সারা রাস্তা খুব বেশি কথা হয়নি। ফোন বাজছিল তার মাঝরাস্তায়। ঝুমকি দেখল রুমকি ফোন করছে। বুঝেছিল চিঠিটা হয়তো রুমকিই প্রথম দেখেছে। ফোনটা কেটে মোবাইলটা অফ করে দিয়েছিল।

গলিতে হাঁটতে হাঁটতে ঝুমকি দেখল পাড়াটা খুব একটা পরিষ্কার না। সে নাক সিঁটকাল।

রিন্টু সেটা দেখল, বলল, "চিন্তা করিস না। খুব শিগগিরি আমরা শিয়ালদা সাইডে চলে যাব। খিদিরপুর আমারও পছন্দ না।"

ঝুমকির একটু ভয় ভয় করছিল। সে রিন্টুর হাত জোরে চেপে ধরল।

খানিকক্ষণ পরে তারা রিন্টুদের বাড়িতে পৌঁছল। রিন্টু দরজা ধাক্কাল। একজন মহিলা দরজা খুলল।

তাদের দেখে অবাক হয়ে তাকাল। রিন্টু বলল, "নিয়ে এসেছি।"

মহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

বাড়িটা বেশ বড়। গলির মধ্যে যে এত বড়ো বাড়ি হতে পারে ঝুমকির ধারণা ছিল না।

রিন্টু ঝুমকিকে একটা ঘরে বসিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে বলল, "বস। মাকে নিয়ে আসি।"

ঝুমকি ঘরটা দেখল। বেশ বড়ো একটা খাট। দেওয়ালে একটা বড়ো ক্যালেন্ডার।

তার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কেন হচ্ছিল সে নিজেও বুঝতে পারছিল না।

খানিকক্ষণ পরেই সালোয়ার পরা এক মধ্যবয়স্ক মহিলা ঘরে ঢুকলেন। ঝুমকি বুঝল ইনিই রিন্টুর মা।

সে উঠে প্রণাম করতে গেল। মহিলা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "জিতি রহো।" রিন্টু ঘরে ঢুকেছিল। মহিলা ওকে বললেন, "খানা খাকে আয়া হ্যায়?"

রিন্টু বলল, "নেহি।"

মহিলা রাগি চোখে ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠহরো।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

ঝুমকি ভাবছিল কথাটা। শেষমেশ বলেই ফেলল, "তোমাদের বাড়িটা কেমন মুসলমান মুসলমান বাড়ি। এরকম মক্কা শরিফের ফটো দেওয়া ক্যালেন্ডার ঝুলিয়েছ কেন দেওয়ালে?"

রিন্টু খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, "মুসলমানদের বাড়ি মুসলমানদের মতোই তো হবে। কেমন আশা করছিস?"

ঝুমকি হাঁ করে রিন্টুর দিকে তাকাল। বলল, "মানে?"

রিন্টু বলল, "কেন তুই জানিস না?"

ঝুমকি মাথা নাড়ল দুদিকে। "না তো।"

রিন্টু বলল, "তাতে কি কোনও সমস্যা আছে তোর? আমি কিন্তু কোনও জোর করছি না। তুই চাইলে আমি তোকে বাড়ি দিয়ে আসতে পারি।"

ঝুমকি একটা চেয়ার টেনে বসল। তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না সবটা।

সে বলল, "আমাকে তো কোনও দিন বলোনি!"

রিন্টু বলল, "এটা কি খুব ইম্পরট্যান্ট কিছু ব্যাপার? জানতাম না তো!"

ঝুমকি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় রিন্টুর মা দুটো থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। খাটের ওপর রেখে তার দিকে তাকিয়ে আধভাঙা বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন, খাওয়া হয়ে গেলে থালা দুটো ঘরের বাইরে রেখে দিতে।

রুটি মাংস দিয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। রিন্টু বলল, "খেয়ে নে। খেয়ে বাড়িতে ফোন কর। চিন্তা করবে সব।"

ঝুমকি বলল, “কীসের মাংস?”
রিন্টু বলল, “বিফ। খাস তো তুই। আসমাতে সেই মনে নেই?”
ঝুমকির খিদে পেয়েছিল। সে খাওয়া শুরু করল।
রিন্টুও খাচ্ছিল। বলল, “আজ রাতে ট্রেনে উঠব। হানিমুন সেরে আসি। তারপর দেখা যাবে। তোর বাড়ি থেকে কদিন আর ঝামেলা করবে। ঠিকই মেনে নেবে।”
ঝুমকি কিছু বলছিল না। চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল।
তার হঠাৎ করে খুব কান্না পাচ্ছিল।
কেন পাচ্ছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না।

৪

তড়িঘড়ি শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে আদিত্য বুঝতে পারল সমস্যা গুরুতর। ড্রয়িং রুমে গম্ভীর মুখে শ্বশুর, শাশুড়ি আর রুমকি বসে আছে।
আদিত্য বলল, “কী হয়েছে? প্রবলেম কী হল?”
রুমকি ঝুমকির চিঠিটা আদিত্যকে দিল।
চিঠিতে লেখা, “আমি বিয়ে করছি মা। আমার সঙ্গে কোনও দিন আর যোগাযোগ রেখো না। জানি আমি খুব খারাপ।”
আদিত্য চিঠিটা পড়ে অবাক চোখে ঘরের সবার দিকে তাকাল। শ্বশুরমশাই তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কী করব?”
আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল। রুমকি সম্ভবত কেঁদেছে। চোখ ফুলে গেছে। কাঁদলে ওর চোখ ফুলে যায়।
আদিত্য বলল, “ফোন করেছিল?”
রুমকি বলল, “ফোন অফ। তুমি তোমার ওই বন্ধুকে বলো না, যদি ট্র্যাক করা যায়।”
আদিত্য বলল, “দেখছি।”
আদিত্যর শ্বশুর তপনবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কার না কার সঙ্গে, কোন জাত, কী করে, কিছুই তো জানি না। রুমকিকে পর্যন্ত কাল অবধি কোনও হিন্টস দেয়নি।”
রুমকি বলল, “সব রেখে গেছে জানো তো, শুধু সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে গেছে। ঝুমকির এত বুদ্ধি হতে পারে না।”
তপন বললেন, “আমি বিকাশকে আসতে বলেছি।”
আদিত্যর শাশুড়ি মিনু এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। মিনু কোনও দিনও বেশি কথা বলেন না। স্বামীর আলোতেই বরাবর আলোকিত। আদিত্যকে বললেন, “চা খাবে বাবা?”
আদিত্য বলল, “না না। এখন না।”
তপন রাগি গলায় বললেন, “ব্যানার্জি বংশের একটা সম্মান ছিল। কী মুখ দেখাব!”
রুমকি বলল, “আহ বাবা, আগে থেকে এত ভেবে রাখছ কেন, দ্যাখো না কী হয় আগে।”
তপন বললেন, “আর কী ভাবব, অজাত কুজাত, কোথাকার কোন মুচি মেথর জোটাবে কে জানে, আর...”
কলিং বেল বাজল। আদিত্য উঠল, “আমি দেখছি।”
আদিত্য দরজা খুলল। বিকাশ এসেছেন।
ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন। তপন বললেন, “কী করি বল আগে।”
বিকাশের গোঁফ দেখার মতো। বেশ মোটা গোঁফ। হরলিক্সের কাচের মতো মোটা কাচের ফ্রেমের চশমা। বিয়ের আগে অনেকবার আদিত্যর অফিসে আদিত্যর ঠিকুজি কুষ্ঠি জানতে গেছিলেন। তপনই পাঠাতেন। আদিত্যর বিকাশকে পোষায় না। শ্বশুরের বন্ধু বলে সহ্য করতে হয়।
বিকাশ বললেন, “গয়নাগাঁটি কিছু নেয়নি তো?”

তপন একটু আশান্বিত হলেন, "না। তা নেয়নি।"
বিকাশ বললেন, "লাভ জেহাদের নাম শুনেছিস?"
তপন গম্ভীর হলেন, "তা শুনিনি আবার। কান পাতলেই তো আজকাল শোনা যায়।"
বিকাশ একবার আদিত্য আর-একবার তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধাঁচটা চেনা চেনা। আমার এক শালির মেয়েকেও এভাবেই..."
মিনু বিহ্বল চোখে রুমকির দিকে তাকালেন।
তপন বললেন, "তাহলে আজ থেকে আমার এক মেয়ে মরে গেছে জানতে হবে।"
বিকাশ বললেন, "ওদের ব্রাহ্মণ মেয়ে পছন্দ। টার্গেট করেই করে এগুলো। ভালোবাসা-টাসা সব ঢপের কেত্তন। কচি মেয়েদের মাথা খেতে কী লাগে? এদিক ওদিক বুঝিয়ে নিতে পারলেই হল।"
রুমকি রেগে গেল, "কী সব বলছেন উলটোপালটা কথা! আমাদের ঝুমকি কি সেরকম মেয়ে নাকি? একটা বলে দিতে পারলেই হল?"
বিকাশ রুমকির দিকে তাকালেন, "আমি কিছু বলছি না মা। পরিবেশ পরিস্থিতি বলছে। মেয়ের বাড়ির লোক কিছু জানতে পারছে না..."
আদিত্য বাধা দিল, "দেখুন এটা কোনও কথা না। কন্সপিরেসি থিওরি নিয়ে ভাবলে চলবে না আমাদের।"
তপন কঠিন চোখে আদিত্যর দিকে তাকালেন, "তা কী নিয়ে ভাবলে চলবে? মেয়েটার তো কোনও খোঁজ পাচ্ছি না!"
আদিত্য বলল, "ধর্ম বা জাতপাত নিয়ে এই সময়ে কি ভেবে সত্যিই কোনও লাভ আছে? আমার তো মনে হয় আমাদের ভয়টা অন্য দিকে হওয়া উচিত।"
তপন বললেন, "কোন দিকে?"
আদিত্য বলল, "নারী পাচার চক্র যেভাবে সক্রিয়..." আদিত্য একটু ইতস্তত করল।
বিকাশ হাত নাড়লেন, "ঝুমকি তো অশিক্ষিত নয়! একেবারে যে সে এই ধরনের চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে, এসব নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নই।"
আদিত্য তপনের দিকে তাকাল, "দেখুন, আমার মনে হয় আমাদের একটা মিসিং ডায়েরি করা উচিত। লালবাজারে আমার এক বন্ধু আছে, আপনি বললে ফোন করতে পারি। শিক্ষিত অশিক্ষিত এসব সবসময়ে ভ্যালিড হয় না। কার মনে কী অভিসন্ধি থাকে তা প্রথম প্রথম সেভাবে বোঝা যায় না।"
তপন বিকাশের দিকে তাকালেন। সম্ভবত বিকাশ যা বলবেন তাতেই শিলমোহর দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর। বিকাশ বললেন, "কী বলবে তা তো জানি, প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে নিজের অমতে বিয়ে করলে পুলিশের কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না। দ্যাখো ফোন করে।"
আদিত্য ফোনটা বের করল।

৫

সৈনিকদের তাঁবু খাটানো হয়েছে গঙ্গার পাশে।
প্রবল গ্রীষ্ম। সৈনিকরা এখানে তাঁবু খাটিয়ে কয়েক দিন থাকবে। দিনে প্রবল তাপপ্রবাহ থাকলেও রাতের দিকে গঙ্গার হাওয়ায় প্রাণ জুড়ায়।
সৈন্যদলের প্রধান আব্দাল খান বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। দিল্লির হালচাল ভালো না। কামরান মির্জা (বাদশা হুমায়ুনের ভাই) তাঁকে তৈরি থাকতে বলেছেন। যে-কোনো সময় বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে। কিন্তু আব্দাল খানের এখন যুদ্ধ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হবে আর তাঁদের মতো কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে, এই সারসত্য আব্দাল খান অনেক আগেই অনুধাবন করেছেন।

তাঁবু থাকলেও এখানে সৈনিকদের মনোরঞ্জনদের জন্য প্রায় প্রতি রাতেই সরাইখানা থেকে নর্তকী নিয়ে আসা হয়। সৈনিকদের মধ্যে মল্লযুদ্ধে যে জয়ী হয়, নর্তকীর সঙ্গে সে রাত কাটানোর সুযোগ পায়।

এভাবে সৈনিকদের মনোবল খানিকটা হলেও ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। তবে আব্দাল খান বুঝতে পারছেন, ভেতরে ভেতরে মনোবল ভাঙছে। এভাবে দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা স্বাস্থ্যকর নয়। প্রায়ই বিদ্রোহ তৈরি হয়। আব্দাল খান অনেক কষ্টে সেগুলো দমন করেন।

বিকেলবেলা। আব্দাল খান অন্যমনস্ক ভাবে বিমর্ষ মুখে বসে ছিলেন, এমন সময় তাঁবুর বাইরে হইহই শব্দ শোনা গেল। আব্দাল খান শঙ্কিত হলেন। আবার কোনও বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেখা দিল নাকি?

তড়িঘড়ি উঠে আব্দাল বাইরে গিয়ে দেখলেন চার-পাঁচজন সৈনিক একজনকে ঘিরে ধরে আছে। একটি কন্যা ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে।

আব্দাল এগিয়ে গিয়ে তাঁর সৈনিকদের জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে? কে এ?”

সৈনিকরা জানাল এই লোকটি এই মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা লোকটিকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করায় লোকটা পালাতে যায়। তাকে ধরে সেনা ছাউনিতে নিয়ে আসা হয়েছে।

ধৃত সৈনিকের সঙ্গে আমাদের পূর্বে পরিচয় হয়েছে। এই সেই জলিল খান।

আর মেয়েটি রাধা।

আব্দাল তলোয়ার বের করে জলিল খানের গলায় ধরে বললেন, “কোথায় যাচ্ছিলে বাপু?”

জলিল খান মাথা নিচু করে বললেন, “জনাব, আমি বাদশায়ে হিন্দুস্থানের অধীনস্থ একজন সামান্য সৈনিক মাত্র। দিল্লি যাচ্ছিলাম। বাদশার জন্য ভেট নিয়ে।”

আব্দাল অবাক হয়ে বললেন, “ভেট? কোথায় ভেট?”

জলিল খান হাত দিয়ে রাধার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

আব্দাল চিন্তিত হলেন। এইটুকু মেয়েকে বাদশার কাছে নিয়ে যাবে? যদিও বাদশাহি হারেমে যে এই বয়সি মেয়ে থাকে না তা নয়, তবে এত কমবয়সি মেয়ে? আব্দাল জলিল খানের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, “মেয়েটিকে রেখে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।”

জলিল খান তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন, “আপনি বুঝতে পারছেন তো জনাব আপনি কী বলছেন? আপনি স্বয়ং বাদশাহর ভেটকে লুঠ করতে চাইছেন।”

আব্দাল সৈনিকদের দিকে তাকালেন। তাদের দিকে গলা তুলে বললেন, “তোমরা কী বলো, এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে এই লোককে যেতে দেওয়া উচিত?”

সৈনিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

জলিল খান বললেন, “আমাকে যেতে দিন জনাব বাদশাহের ভেট নিয়ে। নইলে এর ফলাফল ভালো হবে না।”

আব্দাল জলিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আচ্ছা? এবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে? তা তোমার এই চুরির কথা বাদশাহ জানেন? যদি তিনি রেগে গিয়ে উলটে তোমার গর্দান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কী হবে?”

জলিল আব্দালের দিকে তাকিয়ে এবার রাগি গলায় বললেন, “আমায় যেতে দিন, আমি আবার বলছি…”

জলিলের কথা শেষ হল না, আব্দালের তলোয়ার বের করে জলিলের গলা বরাবর চালিয়ে দিলেন।

বিস্মিত জলিল কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।

রাধা এমনিতেই কাঁদছিল, এই ঘটনা চোখের সামনে দেখে আর্তনাদ করে কাঁদতে শুরু করল।

আব্দাল তলোয়ারটা ছুড়ে ফেলে রাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, “ভয় নেই, ভয় নেই, আমি বাজে লোক নই।”

রাধা আব্দালের কথা বুঝল না, আব্দালের মুখে জলিলের রক্ত দেখে আরও কেঁদে উঠল।

আব্দাল শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একজন সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়েটাকে আপাতত সরাইতে পাঠাও। এখানে তো রাখা সম্ভব নয়। পরে দেখা যাবে কী করা যায় এর সঙ্গে।"

৬

শেষ মুহূর্তে প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ট্রেনে যাওয়া হবে। কিন্তু রিন্টুর কী মনে হল, সে পাড়ার আসলামের থেকে গাড়ি বুক করল।

বাড়ি থেকে টিফিনকারিতে খাবার নেওয়া হয়েছে। রিন্টুর মা ঝুমকির জন্য বোরখা বের করে দিয়েছেন। সদ্য কেনা। সেটা পরার পরে ঝুমকির ভীষণ গরম লাগছিল।

রিন্টু ব্যাপারটা বুঝেছে। বলল, "একটু ম্যানেজ করে নে। কলকাতা পেরিয়ে গেলে বোরখাটা খুলে ফেলিস।"

ঝুমকি কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ বসে ছিল।

ডানকুনি টোল পেরোলে প্রথম মুখ খুলল সে, "তোমার আসল নাম কী?"

রিন্টু বলল, "রুবেল খান। বাজে নাম, না?"

রিন্টু ঝুমকির হাতে হাত রাখল।

বাইরে ঝড়ের গতিতে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। ঝুমকি বলল, "তুমি কি আমাকে কনভার্ট করবে?"

রিন্টু জোরে হেসে উঠল, "ধুস, কেন কনভার্ট করতে যাব। তুই তোর মতো করে থাকবি। আর শোন, তোর কাছে এখনও সময় আছে। তুই যদি মনে করিস এই বিয়েটায় থাকবি না, আমি তোকে বাধা দেব না। বিলিভ মি, আমার মাথায় এই চিন্তাটা কোনও দিন আসেইনি।"

ঝুমকি বলল, "কোন চিন্তা? ধর্ম নিয়ে?"

রিন্টু বলল, "অবভিয়াসলি।"

ঝুমকি বলল, "আমার মাথাতেও আসেনি। কিন্তু প্রথমে বলোনি তার মানে তোমার সাবকনশাস মাইন্ডে কোথাও একটা ছিল যে তুমি মুসলমান জানলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না, ঠিক না?"

রিন্টু ঝুমকির হাতে হালকা চাপ দিয়ে বলল, "তুই ডিসিশন নে। এখনও সময় আছে। বাড়ি যাবি?"

ঝুমকি বলল, "চিঠি দিয়ে এসেছি। এখন কোন মুখে বাড়ি যাব?"

রিন্টু বলল, "বলবি মজা করছিলি। বল, বাড়ি যাবি?"

ঝুমকি বলল, "না। আমার ফেরার আর কোনও পথ নেই।"

রিন্টু আর কিছু বলল না।

শক্তিগড়ে পৌঁছল গাড়ি। রিন্টু নেমে মুড়ি নিল।

ঝুমকি বলল, "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

রিন্টু ঝুমকির দিকে মুড়ির ঠোঙা এগিয়ে দিয়ে বলল, "চাচার বাড়ি আছে ধানবাদে। আজ রাতটা ওখানে থাকব। কাল ট্রেন ধরব ধানবাদ থেকে। তুই একটু ঘুমিয়ে নে পারলে।"

ঝুমকি ঠোঙা নিল না। বলল, "আমার খিদে নেই।"

রিন্টু বলল, "খেয়ে নে। রাগ করে থাকিস না।"

ঝুমকি বলল, "আমি রাগ করিনি। ডিস্টার্বড আছি একটু। তুমি এখন আমাকে ঘাঁটিয়ো না দয়া করে।"

রিন্টু বলল, "ঠিক আছে।"

ঝুমকির মাথা ধরেছিল। সে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার চেষ্টা করল।

গভীর রাতে একটা বেশ বড়ো বাড়িতে তারা পৌঁছল। বাড়িভর্তি লোক গিজগিজ করছে। রিন্টু ঝুমকিকে নিয়ে নামতেই চারদিক থেকে লোক এসে তাদের ঘিরে ধরল।

রিন্টুর বড়ো চাচা দুহাজার টাকার নোট দিয়ে ঝুমকিকে আশীর্বাদ করল। ঝুমকির বোরখাতে গরম লাগছিল। রিন্টু বলেছিল চাচাদের সামনে বোরখা খোলা চলবে না। রাত দেড়টার সময় একটা ছোটো ঘরে তারা ঢুকল। রিন্টু দরজা বন্ধ করে বসল।

ঝুমকি পাশ ফিরে শুয়ে ছিল।
রিন্টু ঝুমকিকে ঠেলে বলল, “বোরখা খোল।”
ঝুমকি বলল, “থাক। ভালো লাগছে না।”
রিন্টু ঝুমকির ঘাড়ে চুমু খেল। ঝুমকি সিঁটিয়ে বলল, “প্লিজ, ছাড়ো আজকে।”
রিন্টু সরাসরি ঝুমকির বুকে হাত দিয়ে বলল, “ছাড়ার জন্য নিয়ে এসেছি তোকে? আজ আমাদের সুহাগ রাত। চল ওঠ।”
ঝুমকি চমকে উঠল। এই রিন্টুকে তো সে চেনে না। এই ছেলেটাকে তো সে ভালোবাসত না!
সে শক্ত হয়ে শুয়ে রইল।
রিন্টু সজোরে ঝুমকির পিঠে লাথি মারল। “ওঠ শালি, বিয়ে করেছি যখন, তখন কোনওরকম ন্যাকামি বরদাস্ত করব না।”
ঝুমকি ককিয়ে উঠল।
পরের আধঘণ্টা রিন্টু রীতিমতো ধর্ষণ করল ঝুমকিকে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঁচড়ের দাগ নিয়ে আধা অচেতন অবস্থায় ঝুমকি পড়ে রইল।

৭

“দেখুন, আপনার মেয়ে তো মাইনর নয়। যদি নিজের ইচ্ছায় গিয়ে থাকে, ইনফ্যাক্ট এই নোটটা তাই বলছে, সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই।”
সোফায় বসে ইন্সপেক্টর সুশোভন রায় বাড়ির সবার দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললেন। আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুই বুঝতে পারছিস তো সমস্যাটা?”
আদিত্য মাথা নাড়ল।
বিকাশ তপনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি রে, দেখলি? আমি কী বলেছিলাম?”
তপন সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “দ্যাখো বাবা, তুমি আমার জামাইয়ের বন্ধু। তোমাকে তুমি করেই বলছি।”
সুশোভন মাথা নাড়লেন, “নিশ্চয়ই।”
তপন বললেন, “কিছুই কি করা যাবে না? মানে মেয়েটা কোথায় আছে, কী করছে, অন্তত সেটুকু তো জানা দরকার। পরে নাহয় কোনওভাবে বুঝিয়েসুঝিয়ে যদি...”
সুশোভন বললেন, “আপাতত ফোন ট্র্যাক করার চেষ্টা করছি। দেখা যাক কোনও লাভ হয় নাকি। আর যেভাবে শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে গেছে তাতে মনে হচ্ছে আজকের দিনের প্ল্যানটা আরও অনেক দিন আগে থেকেই করা হয়েছিল। আপনার মেয়ের ঘরটা একটু দেখব।”
সুশোভন উঠলেন। আদিত্যই নিয়ে গেল সুশোভনকে। পিছন পিছন রুমকি গেল।
সুশোভন ঘরের চারদিকে দেখল। বললেন, “ব্যাগ-ট্যাগগুলো?”
রুমকিই দেখাল ঝুমকির ব্যাগগুলো। বলল, “ব্যাগের শখ ছিল। গড়িয়াহাট থেকে কত যে ব্যাগ কিনেছে!”
সুশোভন বললেন, “ব্যাগগুলোতে যা আছে সব খাটের ওপর ফেলে দিন। আমি একটু দেখি যদি ছাই পাওয়া যায় কোনও।”
রুমকি ব্যাগগুলো খাটের ওপর খালি করে দিল।
সুশোভন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখতে থাকলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা গ্রিটিংস কার্ডের দিকে নজর গেল তাঁর। গ্রিটিংস কার্ডটা খুলে দেখলেন লেখা, “টু মাই লাভ, ফ্রম রিন্টু।”
সুশোভনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, “রিন্টু ছেলেটি কে?”
রুমকি বলল, “জানি না। মানে ঝুমকির সঙ্গে তো আমার সব ব্যাপারে কথা হত, কিন্তু ইদানীং আমাকে কিছুই বলত না।”

সুশোভন বললেন, "আপনার বোনের ক্লাসমেটদের নাম্বার দিতে পারবেন? কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতে চাইছি না আসলে। মেয়ে বাড়ি ছেড়ে কারও সঙ্গে গেছে বোঝা যাচ্ছে, এবার কোথায় গেছে, সেটা বের করা খুব একটা সমস্যা হবার কথা না।"
রুমকি বলল, "পাড়ার একটা মেয়ে আছে, সহেলি নাম। ঝুমকির কলেজে না পড়লেও ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে। সহেলি চিনতে পারে কলেজের কাউকে।"
রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে ঝুমকির কলেজের এক বন্ধুর থেকে রিন্টুর ব্যাপারে জানা গেল। কলেজে দেখা করতে আসত ছেলেটা । দেখে ভালো ফ্যামিলির বলে মনে হয়।
সুশোভন তপনকে বললেন, "যা বোঝা যাচ্ছে আপনার মেয়ে বিয়ে করেছে। কার সঙ্গে করেছে, কেমন পরিবার, কী বৃত্তান্ত, কালকের মধ্যে জেনে যাবেন।"
বিকাশ বললেন, "অন্য ধর্মে বিয়ে করলে কোনও স্টেপ নেওয়া যাবে না? ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি?"
সুশোভন বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেয়েটা স্বেচ্ছায় গেলে কিছুই করা যাবে না। তার লাইফ, তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে নিজের মতো করে বাঁচার।"
বিকাশ বললেন, "শুনুন না অফিসার, আপনি বুঝতে পারছেন না, ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে, মুসলমান বিয়ে করলে কী হতে পারে বুঝতে পারছেন?"
সুশোভন আদিত্যর দিকে তাকালেন, "আমি এলাম রে। কাল তোকে সবটা দেখে বলব। ফোন ট্র্যাক করা যায় নাকি দেখছি।"
#
পরের দিন সকাল দশটা। আদিত্য রাতটা শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে।
রুমকি মাকে সামলাচ্ছে। তপন গম্ভীর মুখে কাগজ পড়ছিলেন।
আদিত্যর ফোন এল, দেখল সুশোভন।
ধরল, "হ্যাঁ বল।"
"শোন, ছেলেটার নাম রুবেল খান। খিদিরপুরের ছেলে। কাল ওরা কলকাতা ছেড়েছে। এখন ধানবাদে আছে। আমরা যেটুকু করার করলাম। বুঝতেই পারছিস, বিয়েটা স্বেচ্ছায় হয়েছে। আমাদের হাত পা বাঁধা। সুতরাং..."
আদিত্য বলল, "বুঝেছি। থ্যাংক ইউ রে।"
ফোনটা রেখে আদিত্য রুমকিকে বলল, "একটু ও ঘরে চলো।"
তপনের চোখটা জ্বলে উঠল, "ও ঘরে যেতে হবে না। যা বোঝার আমি বুঝে গেছি। ও মেয়ে আমার কাছে আজ থেকে মৃত।"
রুমকির মা কেঁদে উঠলেন।

৮

আব্দাল খাঁর নির্দেশে পথের পাশের নিকটবর্তী একমাত্র বড়ো সরাইখানায় নিয়ে যাওয়া হল রাধাকে। সরাইখানা মানে শুধু খাওয়াদাওয়ার জায়গা নয়, এখানে নৃত্য এবং গীতে আগত পথযাত্রীদের মনোরঞ্জন করা হয়।
মূলত মুসলমান সৈনিক এবং সেনানায়করা এ সরাইখানায় বেশি আসেন। সন্ধের পর থেকে আশরফির আশকারায় গানবাজনায় এ চত্বর রমরমিয়ে চলে।
দ্বিপ্রহর। বাইজি মনোয়ারা নিজের কক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন দাসী এসে উপস্থিত হল, "মা জি, জনাব আব্দাল খাঁ আপনার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছেন।"
মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন, "একটু বিশ্রাম করারও ফুরসত পাই না। কী পত্র পাঠিয়েছে, দে দেখি।"
দাসী ইতস্তত করে বলল, "আজ্ঞে, শুধু পত্র পাঠাননি, তার সঙ্গে একজনকে পাঠিয়েছেনও বটে।"

মনোয়ারা বললেন, "কাকে পাঠিয়েছেন?"
দাসী বাইরে থেকে রাধাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।
কেঁদে কেঁদে রাধার চোখ, নাক, মুখ ফুলে গেছে। মনোয়ারা অবাক চোখে দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ কে?"
দাসী বলল, "পত্রে সব লেখা আছে সম্ভবত।"
মনোয়ারা বললেন, "পত্র আমি পড়তে পারি নাকি? আজমলকে ডেকে নিয়ে আয়। উফ, কী সব ঝামেলা যে কপালে এসে জোটে আল্লাই জানেন।"
দাসী ঘর থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গিয়ে একজন ষোড়শবর্ষীয় ছেলেকে নিয়ে এল। মনোয়ারা বললেন, "ও আজমল, কী লিখেছেন আব্দাল খান একটু পড়ে দাও তো শুনি।"
আজমল দাসীর হাত থেকে পত্রটা নিয়ে পড়ে রাধার দিকে তাকাল। রাধা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আজমল মনোয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ্ঞে এই মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে বলেছেন। বলেছেন আপাতত আপনার কাছে রাখতে, উনি বাড়ি যাবার সময় নিজের মেয়ের খেলার সঙ্গিনী হিসেবে এই মেয়েটিকে নিয়ে যাবেন।"
মনোয়ারা রাগি চোখে দাসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখেছিস? আমাদের কী ভাবে এরা? আমাদের কি কাজবাজ নেই?"
দাসী বলল, "অপরাধ মার্জনা করবেন মা জি, কিন্তু আব্দাল খাঁর কথা না শুনলে আমাদের এখানে শান্তিতে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।"
মনোয়ারার চোখ একটু জ্বলে শান্ত হয়ে গেল, "মেয়েটাকে নিয়ে যা। খেতে-টেতে দে। আর দেখিস, কেউ যেন মেয়েটার খবর না পায়, সেপাইদের এই কচি মেয়েদের প্রতিই ঝোঁক বেশি থাকে। ইবলিশের বাচ্চা যতসব।"
দাসী রাধার হাত ধরে বেরিয়ে গেল।
মনোয়ারা আজমলকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, বললেন, "খবর এসেছে কিছু?"
আজমল বলল, "হ্যাঁ, আজকেই।"
মনোয়ারা খুশি হলেন। মাথা নাড়িয়ে বললেন, "ব্যবস্থা করো।"
আজমল বেরিয়ে গেল।
#
রাত ঘনিয়েছে। আব্দাল খান তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সরাইখানায় এসেছেন। বিশেষ মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জন্য। সৈনিকদের মন পালাই পালাই করলে প্রায়ই এরকম জলসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সরাইখানার নাচঘরে প্রশস্ত পরিসরে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনোয়ারা বেগম স্বয়ং আজ নৃত্য পরিবেশন করবেন আব্দাল খানের সম্মানার্থে।
সুরা পরিবেশন হচ্ছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যেরও আয়োজন হয়েছে।
তবলচিরা তবলায় বোল তুলছেন, খানিকক্ষণ পরেই মনোয়ারা বেগম প্রবেশ করবেন। একজন চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা এসে মাননীয় অতিথিদের হাতে বিভিন্ন সুগন্ধী ফুল দিয়ে গেল। আব্দাল খান উশখুশ করছেন। ঘরবাড়ি থেকে এত দূরে এসে শুধু নৃত্যগীতে মন ভরে না। মনোয়ারা বেগমের মতো একজন রাত্রিসঙ্গিনী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনের মধ্যে চলাচল করছে।
এর আগে যেবার মনোয়ারা তাঁর সঙ্গিনী হয়েছিলেন, সে রাতের কথা ভাবতে আব্দাল উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অধৈর্য গলায় বললেন, "বেগম এলেন?"
তবলার শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। নৃত্যকক্ষে প্রবেশ করলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মনোয়ারা বেগম। সুরার ঘোরে আব্দাল খান উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, কোমরবন্ধনী থেকে আশরফি ছুড়ে মারলেন মনোয়ারার

উদ্দেশে। মনোয়ারা নৃত্য শুরু করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মোহময়ী নৃত্যকলায় নাচঘর যেন গভীর কোন ঘুম থেকে জেগে উঠল।
তবলার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনোয়ারার শরীরী বিভঙ্গ দর্শকদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে শুরু করল। আব্দাল খান সুরায় নিমজ্জিত হতে হতে মনোয়ারাকে পাওয়ার অভিপ্রায়ে অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন।
ঠিক এই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে নাচঘরে প্রবেশ করল শের শাহ সুরির গোপন ঘাতক বাহিনী। আব্দাল খান প্রস্তুতির সামান্যতম সময়টুকু পেলেন না। মিনিট দশেকের মধ্যে প্রায় বিনা যুদ্ধে আবদাল খান এবং তার শাগরেদদের রক্তে ভেসে উঠল সরাইখানার নাচঘর।
প্রায় নিঃশব্দে এবং সুকৌশলে সেনাছাউনির দখল নিল শের শাহ সুরির সেনাবাহিনী।
আর এই সময় সরাইখানার পিছনের দরজা দিয়ে তার ঘোড়ায় করে রাধাকে নিয়ে আজমল পালিয়ে গেল।

৯

"অনার কিলিং বস্তুটাকে একটা সময় ঘেন্না করতাম। এখন বুঝি কোন পরিস্থিতিতে গিয়ে পরিবারের লোক এই সিদ্ধান্ত নেয়।"
গম্ভীর মুখে কথাটা বললেন তপন। আদিত্য চমকে শ্বশুরের দিকে তাকাল। খবরটা পাবার পর থেকে তপন গুম হয়ে গেছিলেন। এতক্ষণ পরে এই কথাটা বললেন। মিনু শাড়িতে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছিলেন।
তপনের কথা শুনে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
রুমকি প্রতিবাদ করে বলল, "কী বলছ বাবা এসব তুমি? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার?"
তপন বললেন, "তো কী বলব? যাদের জন্য একটা দেশ থেকে উৎখাত হয়ে এপারে আসতে হল, তাদের গলাতেই যদি আমার মেয়ে মালা দেয়, তবে কি উদ্বাহু হয়ে নাচব? এত ইনভেস্টমেন্ট, এত আশায় সব জলাঞ্জলি দিয়ে... ছি ছি ছি..." মাথা নাড়লেন তপন।
রুমকি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি দ্যাখো না যদি ঝুমকির সঙ্গে ফোনে কথা বলানোর ব্যবস্থা করানো যায় তোমার ওই পুলিশ বন্ধুকে বলে!"
আদিত্য বলল, "দেখছি।"
দেখছি শব্দটা আদিত্য তার বসের থেকে শুনেছে। বস শিখিয়েছেন কখনও কোনও কিছুতে সরাসরি না বলতে নেই। বলতে হয় দেখছি। তাতে উলটোদিকের মানুষটা কখনও রেগে যায় না। আবার কোনও কিছু না করেও পরে বলে দেওয়া যায়, চেষ্টা করেছিলাম, হল না।
তপন বললেন, "খিদিরপুরের মুসলমান, ভাবতে পারছিস?"
রুমকি বলল, "ভাবতে পারছি বাবা, কিন্তু তুমি আর এসব নিয়ে ভেবো না। ডাক্তার আঙ্কেলকে ফোন কর, তোমার প্রেশার মাপা দরকার।"
তপন জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "কাউকে ফোন করতে হবে না। আমি ঠিক আছি। পিনাকের ছেলে, পুনেতে ছিল যে, আমেরিকাতে আছে এখন, সব ঠিক করে রেখেছিলাম জানিস..."
তপনের গলা ধরে এল।
আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল, "আমি অফিস যাই? ছুটিটা ক্যানসেল করা যাবে। ফিরে এসে নাহয়..."
রুমকি আগুনে চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "একদিন না গেলে কিচ্ছু হবে না। বোসো চুপচাপ। আমি একা পারব সব সামলাতে?"
তপন বললেন, "না না, তুই আদিত্যকে আটকে রেখেছিস কেন? আমি আছি তো। কেসটা তো যা হবার হয়েই গেল। ও অফিসে গেলে যাক।"
আদিত্য রুমকির দিকে আর তাকাল না। উঠে পড়ল।
রুমকি বলল, "ফোনের ব্যাপারটা দেখো।"
আদিত্য বেরোতে বেরোতে বলল, "হুঁ।"

গাড়ি বের করে আদিত্য সন্তর্পণে প্রথম গিয়ারে দিয়ে গাড়িটা এগোল। নতুন গাড়ি চালানো শেখার মজা হল সারাদিন গাড়ি চালাতে ইচ্ছা হয়। আবার মুহূর্তের ভুলে বড়ো বিপদ ঘটে যেতে পারে।
খানিকটা গিয়ে রাস্তার বাঁদিকে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সুশোভনকে ফোন করল আদিত্য। একটা রিঙেই ফোন তুললেন সুশোভন। বললেন, "বল রে।"
আদিত্য বলল, "বলছি ভাই, শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবি আমায়? তুই আর আমি গেলাম? কোনও প্রবলেম আছে?"
সুশোভন বললেন, "প্রবলেম কিছু নেই, কিন্তু গিয়ে কী করবি?"
আদিত্য বলল, "জাস্ট দেখে আসব। আমার বউ তো পাগল করে দিচ্ছে বোনের সঙ্গে ফোনে কথা বলাতে হবে, যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায় ওখানে গিয়ে।"
সুশোভন বললেন, "তুই কোথায় আছিস বল।"
আদিত্য নিজের লোকেশন বলল।
সুশোভন বললেন, "ঠিক আছে, তুই ওদিকে রওনা দে, আমিও যাচ্ছি। ফোন করে নিস আমায়।"
আদিত্য বলল, "ওকে।"
##
সরু গলিটায় ঢুকে নাকে রুমাল চাপা দিল আদিত্য। অত্যন্ত নোংরা গলিটা।
সুশোভন বললেন, "তুই বলেই এলাম। নইলে এসব কেসে পুলিশ কখনও আসে না। সেই কেসটা মনে আছে তো?"
আদিত্য বলল, "হ্যাঁ। তবে আমি তো কোনও ঝামেলা করতে আসিনি। জাস্ট কথা বলে চলে যাব।"
সুশোভন বাড়িটার সামনে দিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। আশেপাশের বাড়ি থেকে পুলিশের উর্দিতে থাকা সুশোভনকে সবাই কৌতূহলী চোখে দেখছিল। দরজা খুলল কিছুক্ষণ পরে। এক মহিলা দরজা খুললেন।
সুশোভন বললেন, "রুবেলের কেউ হন আপনি?"
ভদ্রমহিলা তাদের দুজনকে আপাদমস্তক মেপে বললেন, "আম্মি, ক্যা চাহিয়ে?"
সুশোভন বললেন, "বাড়ির ভেতরে গিয়ে কথা বলা যাবে? উনি মেয়েটির জামাইবাবু।"
ভদ্রমহিলা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।

১০

ঝুমকির শেষরাতের দিকে ঘুম এসেছিল। তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠে দেখল তার দিকে রিন্টু তাকিয়ে আছে। সে জাগতেই রিন্টু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, "কি রে, ঠিক আছিস?"
ঝুমকি অবাক হল। এই রিন্টু আর রাতের রিন্টু তো এক নয়! এই রিন্টুকেই তো সে এতদিন চিনে এসেছিল! রাতে কী হয়ে গেছিল ছেলেটার?
ঝুমকি উঠে বসতে গিয়ে ককিয়ে উঠল। ব্যথা করছে। রিন্টু ব্যস্ত হল, "কী হচ্ছে?"
ঝুমকি উত্তর দিল না।
রিন্টু ঝুমকির হাত ধরে বলল, "কি রে, এখনও রাগ করে আছিস? আসলে কাল রাতে আমার যে কী হয়েছিল, চাচাতো দাদা বউদিরা এমন সব কথা বলল, আমার মাথাটা কেমন হয়ে গেছিল।"
ঝুমকি বলল, "ওরা বললে তুমি আমাকে মেরেও ফেলতে, তাই না?"
রিন্টু ঝুমকিকে জড়িয়ে ধরতে গেল, "এসব কথা বলিস না প্লিজ। আমি সেটা করতে পারি? তুই তো মেরা জান সে ভি প্যারি।"
ঝুমকি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "বাথরুম যাব।"
রিন্টু বলল, "বুরখাটা পরে নে। বাইরে চাচা আছে।"
ঝুমকি অবাক হয়ে বলল, "মানে? বোরখা পরে বাথরুম যেতে হবে নাকি?"

রিন্টু বলল, "হ্যাঁ, এরা একটু গোঁড়া, বুঝলি না? আমাদের বাড়িতে অত চাপ নেই।"
ঝুমকি রেগে গেল, "তুমি তো কালকে বললে আমাকে এসব আর পরাবে না।"
রিন্টু বলল, "তুই যদি হিন্দু বিয়ে করতিস, শাঁখা সিঁদুর পরতিস না? এগুলো তো রিচুয়ালস। আমাদের রিলিজিয়নে মেয়েরা বেআব্রু থাক সেটা যদি আমাদের বয়স্ক লোকেরা না চায়, তবে কি তারা খুব ভুল কিছু চায়? সব ধর্মেরই তো আলাদা আলাদা রিচুয়ালস আছে। তুই-ই বল, আমি মুসলিম হয়ে কি খুব বড়ো কোনও অপরাধ করে ফেলেছি?"
ঝুমকি কয়েক সেকেন্ড রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বোরখাটা পরে নিয়ে বলল, "দয়া করে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও। আমি তো চিনব না, কার না কার ঘরে ঢুকে পড়ব, সেই নিয়ে আর-এক ঝামেলা শুরু হবে। আর এখান থেকে আজকেই যাব তো?"
রিন্টু ঝুমকির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উঠে বলল, "চল তোকে বাথরুমে নিয়ে যাই।"
ঝুমকি নড়ল না, বলল, "আজকে যাব তো এখান থেকে?"
রিন্টু মাথা চুলকে বলল, "ইয়ে মানে চাচা কাজি সাহেবকে খবর দিয়েছে। একটা ছোটো অনুষ্ঠান আছে। ওটা না করলে তো হবে না।"
ঝুমকি বলল, "কীসের ছোটো অনুষ্ঠান?"
রিন্টু বলল, "তোকে কনভার্ট করে তারপর নিকাহটা হবে। বেশিক্ষণের কাজ না। কাজি সাহেব এলেই হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ফান বুঝলি? সিনেমায় দেখিস না, তিনবার কবুল বলে। করিনা কাপুরও তো বলেছিল।"
ঝুমকি বলল, "আমাকে কনভার্ট হতে হবে?"
রিন্টু কাঁধ ঝাঁকাল, "আরে জাস্ট একটা প্রোগ্রাম। এই আত্মীয়স্বজনদের মুখ বন্ধ করার জন্য। তুই তোর মতো তোর ধর্ম মেনে চলিস, আমি কিছু বলব না, সিরিয়াসলি।"
ঝুমকি বলল, "চলো বাথরুম দেখিয়ে দাও।"
ঘর থেকে বেরোনো মাত্র রিন্টুর চাচা চাচি বউদিরা ঝুমকিকে ঘিরে ধরল।
ঝুমকি ক্লান্ত মুখে রিন্টুর দিকে তাকাল। রিন্টু ওদের হাত থেকে ঝুমকিকে বাঁচিয়ে বাথরুমে নিয়ে গেল।
বাথরুমে ঢুকে সম্পূর্ণ নগ্ন হল ঝুমকি। নিজের দিকে তাকিয়ে কান্না পেয়ে গেল তার। বুকের ওপর একগাদা দাগ। এই ছেলেটাকে সে প্রেম করেছিল? জীবন দিয়ে ভালোবাসত? মানুষের এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে?
বেশ খানিকক্ষণ বাথরুমে কাটিয়ে বেরোল ঝুমকি।
বাড়ির মাঝের খোলা জায়গাটায় রিন্টুর চাচা একটা চেয়ারে এসে বসেছে। আর-একজন অপরিচিত লোক ছাড়াও বাড়িভর্তি লোকজন।
ঝুমকি অবাক হয়ে রিন্টুর দিকে তাকাল।
রিন্টু বলল, "তোকে বললাম না?"
ঝুমকি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমি একটু ঘর থেকে আসি?"
রিন্টু বলল, "ওকে।"
ঝুমকি বলল, "তুমি আসবে একটু?"
রিন্টু বলল, "আচ্ছা, আসছি।"
দুজনে ঘরে যেতে ঝুমকি দরজা বন্ধ করে বলল, "আমি কনভার্ট হতে চাই না। কিছু করা যাবে?"
রিন্টু ঝুমকির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বারোটা ভাই আছে। সবাই মিলে তোকে যদি রেপ করে কয়লাখনিতে ফেলে রেখে দেয়, তোর বাপ কেন, তোর চোদ্দোগুষ্টি খবর পাবে না, বুঝলি?"
ঝুমকি শিউরে উঠল। সেই অচেনা রিন্টু যাকে সে চেনে না! যাকে সে কোনও দিন ভালোবাসেনি!

রিন্টু গলা নামিয়ে বলল, “চুপচাপ বাইরে চ, যা যা করতে বলবে করবি। একটু নড়চড় হয়েছে কী তোকে আমি বুঝে নেব বলে দিলাম।”

১১

একটা ঘরে বসিয়ে রেখে ভদ্রমহিলা বেরোলেন। সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে আদিত্যকে বললেন, “তোরা কেসটা নিয়ে এগিয়ে কোনও লাভ পাবি না সেটা বুঝতে পারছিস?”

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “না বোঝার কিছু নেই। অফিসটা গেল মাঝখান থেকে। কাউন্টার দিস।”

সুশোভন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ঘরের মধ্যে প্রায় দশ-বারোজন ছেলে এসে ঢুকল। তাদের পিছনে রিন্টুর মা। সুশোভন অবাক হয়ে বললেন, “কী ব্যাপার?”

রিন্টুর মা বললেন, “ইয়ে সব মেরে রুবেল কে ভাই হ্যায়। আপ ইন হি লোগো সে বাত কিজিয়ে।”

আদিত্য দেখল প্রায় সবাই ষণ্ডা গুন্ডা টাইপ। সে অবাক হয়ে সুশোভনের দিকে তাকাল। সুশোভন একটুও উত্তেজিত হলেন না। রিন্টুর মার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমরা তো বিয়েটা আটকাতে আসিনি। আপনি খামোখা ওদের ডেকে নিয়ে এলেন কেন?”

একটা ছেলে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “পুলিশ কিঁউ লেকে আয়া?”

আদিত্য বলতে যাচ্ছিল, সুশোভন আটকালেন তাকে। বললেন, “পুলিশ না। আমি ওর বন্ধু। যে মেয়েটি পালিয়েছে, ও আমারও বোনের মতোই। আমরা দেখতে এসেছি কোন বাড়িতে এসে ও উঠেছে। আপনাদের বাড়ির কোনও মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করলে আপনাদের জানতে ইচ্ছা করবে না সে কেমন আছে, কোথায় আছে?”

সুশোভনের কথায় ভিড়ের উত্তেজিত ভাবটা কমল খানিকটা। রিন্টুর মা বসলেন। সুশোভন বললেন, “দেখুন মেয়েটি পালিয়ে বিয়ে করেছে, কিন্তু নিজের অমতে। আমাদের এখানে কিছু করার নেই। বুঝতে পারছেন আমি কী বলছি?”

রিন্টুর মা বাকি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হাঁ বতাইয়ে।”

সুশোভন বললেন, “মেয়েটি, মানে যাকে আপনাদের ছেলে বিয়ে করেছে, তার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ওরা কোথায় আছে, সেটা বললে, কিংবা যদি ফোনেও কথা বলানো যায়...”

একটা ছেলে বলে উঠল, “ফোন নেহি হ্যায় উসকে পাস।”

সুশোভন ঠান্ডা চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিছু তো আছে, কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি আমরা। ফোন অফ করে রেখে দিয়েছে। বাড়ির লোক না জানলে সমস্যা কি কমবে? আমরা তো বিয়েটা মেনে নিয়েছি।”

আদিত্য ছেলেগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। কারও চেহারাই স্বাভাবিক নয়। সুশোভনের ঠান্ডা মাথার মনে মনে তারিফ করল সে।

রিন্টুর মা বললেন ওরা দিল্লি গেছে। ফিরলে যোগাযোগ করতে বলবেন।

সুশোভন কয়েক সেকেন্ড বসে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কার্ড বের করে রিন্টুর মার হাতে দিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, কোনওরকম খবর এলে জানাবেন। আপনাদের যেমন পরিবার আছে, ওদেরও তেমনি আছে। বুঝতেই পারছেন, জন্ম থেকে বড়ো করার পরে মেয়ে যদি কিছু না বলে চলে যায়, তাহলে বাবা মার ওপর দিয়ে ঠিক কতটা চাপ আসতে পারে।”

রিন্টুর মা কিছু বললেন না। সুশোভন আদিত্যকে বললেন, “চল।”

আদিত্য সুশোভনের পিছন পিছন এগোল। ছেলেগুলোও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেট অবধি এল। গলি দিয়ে হেঁটে বড়ো রাস্তায় উঠে হাঁফ ছাড়ল আদিত্য। বলল, “বাপ রে, কী ডেঞ্জার জায়গা রে!”

সুশোভন বললেন, “সেন্সিটিভ জায়গা। খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হয়। না হলেই চিত্তির। অনেকরকম খেলা চলে এখানে।”

আদিত্য বলল, “সেটা বুঝতেই পারছি। তোর সেই মাথা গরম অবতার এতটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে প্রায় অপোজিট হয়ে গেছে সেটা দেখেও অবাক হয়ে গেলাম। ফাটিয়ে দিলি তো!”

সুশোভন বললেন, “কিছু করার নেই। যেখানে যেরকম, সেখানে তেমন হতেই হবে। এখানে আমি একা কী করব? তুই-ই বা কী করতিস? কীভাবে তেড়ে এসেছিল দেখেছিস?”

আদিত্য চিন্তিত গলায় বলল, “হুঁ। কেসটা আর কিছু করার নেই।”

সুশোভন বললেন, “এক-একটা ফ্যামিলি এক-এক রকম ভাবে ডিল করে। কিছুদিন আগে এক মাড়োয়ারি ফ্যামিলির মেয়ে একটা মুসলিম ছেলের সাথে ভেগেছিল। ছেলের বাপ বুঝিয়ে-টুঝিয়ে মেয়েটাকে বাড়িতে এনে আর-একটা বিয়ে দিয়ে দিল অ্যাব্রডে। সে ক্যাচাল এখনও আমাদের সামলাতে হচ্ছে। তবে তোর শ্বশুরকে বলে দে ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু না করতে।”

আদিত্য বলল, “উনি কিছু করবেনও না আর। এমনিতেই তীব্র অ্যান্টি-মুসলিম। আর-এক বন্ধু আছে। লাভ জিহাদ এটসেট্রা বুঝিয়ে দিয়েছে। আর কী...”

সুশোভন বললেন, “বাদ দে। আমি তবে যাই রে, আর বেশিক্ষণ থাকলে চলবে না। একগাদা কাজ জমে আছে।”

আদিত্য ঘাড় নাড়ল, “ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়।”

সুশোভন চলে গেলেন।

আদিত্য কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আবার রিন্টুদের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

১২

আদিত্য শ্বশুরবাড়ি পৌঁছল বেলা চারটে নাগাদ। রুমকি দরজা খুলল।

তাকে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, “কী হল? কোনও আপডেট পেলে?”

আদিত্য দেখল ড্রয়িং রুমে শ্বশুর শাশুড়ি দুজনেই বসে আছেন।

সে রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ, ওই ছেলেটার বাড়ি গেছিলাম সুশোভনের সঙ্গে।”

শাশুড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “বসো বাবা, বসো। এই দুপুর রোদে এলে।”

আদিত্য সোফায় বসে বলল, “হ্যাঁ, বিয়েটা হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই আর কি।”

তপন শ্লেষ জড়ানো গলায় বললেন, “তাহলে তো হয়েই গেল। তা উনি কি এখন এখানেই আছেন?”

আদিত্য রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “না, হানিমুনে গেছে।”

শাশুড়ি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

রুমকি বলল, “তোমার বন্ধু কী বলল? কিছু করা যাবে?”

আদিত্য বলল, “ওরা ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ। আর কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।”

তপন রুমকির দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমি জানতাম। ওরা এমনই। সঙ্গে সঙ্গে কনভার্ট করে দেয়। যেভাবে সোনার দোকানে সোনা বেচার পর ওরা সোনা গলিয়ে দেয়, একইভাবে কোনও হিন্দু মেয়ে যদি ওরা বিয়ে করে, ওদের টার্গেটই থাকে কত তাড়াতাড়ি কনভার্ট করবে।”

আদিত্য বলল, “তা কেন হবে? অনেক ক্ষেত্রেই সেটা হয় না। আমাদের অফিসের এক কাপলই আছে, মহিলাটি এখনও শাঁখা সিঁদুর পরেন।”

তপন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললেন, “হবে হয়তো। যাই হোক, আমি আর চিন্তা করছি না। প্রথম প্রথম আমার টেনশন হচ্ছিল। এখন আমি অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছি। অবশ্য শোক করবই বা কার জন্য? যে মেয়ে নিজের পরিবারের মূল্যবোধের দাম দিতে পারে না, তাকে তো আর কিছু বলার নেই আমার।”

আদিত্যর অস্বস্তি হল, এমনিতেই শ্বশুরের সামনে সে খুব একটা স্বাভাবিক হতে পারে না, তার ওপর এই পরিস্থিতি। সে রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “আমরা তাহলে কি আজ বাড়ি যাব?”
রুমকি একবার বাবার দিকে, আর-একবার আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি তো এই অবস্থায় কোনওভাবেই যেতে পারব না। তুমি যাও বরং। আমি দুটো দিন বাবা-মার কাছে থেকে যাই। এখনই যেয়ো না, লাঞ্চ করোনি তো?”
আদিত্য বানিয়ে বলল, “হ্যাঁ, করে এসেছি। সুশোভন খাইয়ে দিয়েছে। আমি যাই বরং।”
রুমকি আদিত্যর অস্বস্তিটা বুঝল। বলল, “ঠিক আছে, তুমি সাবধানে যেয়ো। গিয়ে ফোন কোরো কিন্তু।”
তপন বিড়বিড় করে বললেন, “সবাই এবার আমাকে দেখে হাসবে। সারাজীবন ভক্তিভরে ধর্মপালন করে গেলাম, আর সেই আমার মেয়েকেই কিনা... ছি ছি ছি।”
আদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল। পিছন পিছন রুমকি।
আদিত্য জুতো পরছিল, রুমকি ফিসফিস করে বলল, “কী বুঝলে? কেমন বাড়িঘর?”
আদিত্য বলল, “একেবারেই অন্য ধরনের, ওই পরিবেশে থাকতে পারবে না। সব কিছুই অন্যরকম। কী দেখে গেল, ও-ই জানে।”
রুমকি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, “চিরকালই তো বোকা হাঁদা একটা জানোই তো, কোনও কিছুর আগু পিছু কিছু না ভেবে কাজ করে ফ্যালে। ও যে এরকম করবে তা তো জানা ছিলই। এবার কী হবে?”
আদিত্য বলল, “মেনে নিতে হবে। সময় পালটেছে, এখনও যদি প্রাচীন ধ্যানধারণা নিয়ে থাকতে হয় সেটা তো অসম্ভব, তাই না?”
রুমকি রেগে বলল, “আমার বোন বলে খুব সহজে কথাটা বলে দিতে পারলে, তাই না? নিজের বোন হলে বলতে পারতে?”
আদিত্য থমকে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি কী করব বলো? আমার কী করার আছে? আমি তো ছেলেটার সঙ্গে তোমার বোনের পরিচয় করিয়ে দিইনি, দিয়েছি কি?”
রুমকি চাপা গলায় বলল, “একদম গলা তুলে কথা বলবে না। ভদ্রভাবে কথা বলো। এমনিতেই আমার বাবা মা চিন্তায় আছে।”
আদিত্য বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, “সেজন্যই তো আমি থাকছি না। তুমি থেকে সামলাও।”
রুমকি রাগি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। আর বাড়ির বাইরে গেল না।
#
রাত সাড়ে নটা।
আদিত্য ফ্ল্যাটে ফিরে টিভি দেখছিল। হোম ডেলিভারি থেকে খাবার আনিয়েছে। আর কিছুক্ষণ পর খেতে বসবে। রুমকিকে আর ফোন করেনি।
আর-এক দফা ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে রুমকির সঙ্গে। এরকম তাদের প্রায়ই হয়। যখন হয়, তখন দু পক্ষের কথা বন্ধ থাকে। কোনও প্রয়োজন ছাড়া কথা শুরুও হয় না।
সোফায় বসে আদিত্যর ঘুমে চোখ লেগে আসছিল। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে।
সে ভাবছিল ডিনারটা কাটিয়েই দেবে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।
আদিত্য বিরক্ত মুখে উঠল, দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল।
বাইরে ঝুমকি দাঁড়িয়ে আছে। রীতিমতো হাঁফাচ্ছে।

১৩

।।আগের কথা।।

ফিরোজা বেগম পথের পানে তাকিয়ে বসেছিলেন। ছেলেটা সেই কবে পালিয়ে চলে গেল মনোয়ারা বেগমের দলের সঙ্গে, তারপর থেকে কোনওরকম খোঁজ খবর নেই।

একা একা কাঁদেন, গ্রামের বাকি লোকেদের জিজ্ঞেস করেন। সবাই একটাই কথা বলে, ও ছোঁড়া কম বয়সে রং বুঝে ফেলেছে, আর ফিরবে না। ফিরোজা তাঁর জীর্ণ কুটিরে দিন গুজরান করতে করতে স্বামী সন্তানের কথাই ভাবেন। আজমলের বাবা ইব্রাহিম লোদির সেনাবাহিনীর সেপাই ছিলেন। যুদ্ধে মারা যান। তখন সবে আজমল হয়েছে। তারপর থেকে কম কষ্ট হয়নি ফিরোজার। আগামী দিনের কথা ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে ছেলেকে বড়ো করে তুলেছিলেন শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে। সে ছেলেটাকে পর্যন্ত মনোয়ারা বশ করে নিয়ে চলে গেল।

দুপুর হয়েছে, ফিরোজা সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ দূর থেকে একটা ঘোড়া আসতে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। এ ভঙ্গি তো তাঁর বড়ো চেনা। ফিরোজা উঠে দাঁড়ালেন, দৌড়োতে দৌড়োতে দুপুর রোদের মধ্যেই ধুলোমাখা পথে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আজমল! আজমল এসেছে। সঙ্গে একটা মেয়ে!

আজমল একদম তার বাবার মতো ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়া থেকে মেয়েটাকে নামাল। পরক্ষণেই ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, "আম্মিইই... কেমন আছ তুমি?"

ফিরোজা কাঁদতে কাঁদতে ছেলের দুগালে জোরে জোরে চড় মারতে বললেন, "কোথায় চলে গেছিলি তুই আমাকে না বলে? ওই ডাইনিটা তোকে কি গুণ করেছিল? আর এই মেয়েটা কে?"

রাধা ফিরোজা আর আজমলের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছিল না। পথশ্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

ফিরোজা দৌড়ে গিয়ে রাধাকে ধরে আজমলকে ধমক দিয়ে বললেন, "পানি নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা।"

আজমল দৌড়ে জল নিয়ে এল। ফিরোজা রাধার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিলেন। আজমলকে বললেন, "ওকে ঘরে নিয়ে চল।"

মা ছেলে মিলে রাধাকে ধরে ঘরে নিয়ে মেঝেতে শোয়াল।

ফিরোজা আরও অনেকটা জল দিলেন রাধাকে। রাধা ক্লান্ত চোখে ফিরোজার দিকে তাকাল।

ফিরোজা রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আজমলের দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বললেন, "দেখে হিন্দু মনে হচ্ছে। কোত্থেকে নিয়ে এসেছিস তুই ওকে?"

আজমল বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে বলল, "বেগমের কুঠি থেকে। ওকে হারেমে পাঠিয়ে দিত নইলে।"

ফিরোজা বললেন, "দিলে দিত। তোর কী হয়েছিল?"

আজমল মাথা চুলকে বলল, "জানি না, কী হয়েছিল। মনে হল ওকে হারেমে নিয়ে গেলে খুব খারাপ হবে। তাই যখন সরাইখানায় ঝামেলা শুরু হয়ে গেল, আমি ওকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এলাম। আগে পিছে কী হবে, অত ভেবে দেখিনি আমি।"

ফিরোজা ছেলের দিকে তাকালেন। ছেলেটা এ কদিনেই কতটা বড়ো হয়ে গেছে। কেমন বড়োদের মতো করে কথা বলছে। মেয়েটার মধ্যেও একটা অদ্ভুত মায়া আছে। ফিরোজা প্রাণভরে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আজমলকে বললেন, "এ মেয়েকে তো এমনি এমনি এখানে রাখা যাবে না। ইমাম সাহেব অনেকরকম প্রশ্ন করবেন। গ্রামের বাকি মুরুব্বিরাও ছেড়ে কথা বলবেন না। তোকে এ মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।"

আজমল লজ্জায় মাথা নিচু করল।

ফিরোজা আজমলের চুলের মুঠি ধরে নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "সেই ইচ্ছাই ছিল তোর, তাই না?"

আজমল বলল, "জানি না আম্মি, অত কিছু তো ভাবিনি আমি।"

ফিরোজা বললেন, "কোথায় বাড়ি এ মেয়ের? জানিস কিছু?"

আজমল মাথা নাড়ল।

ফিরোজা আরও খানিকটা জল রাধার চোখে মুখে দিলেন। রাধা কেঁদে উঠল, "আমি বাবার কাছে যাব।"

ফিরোজা অবাক মুখে আজমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কী ভাষা?"
আজমল বলল, "পুবের ভাষা। বঙ্গাল মুলুকের ভাষা মনে হয়।"
ফিরোজা বললেন, "এই মেয়েকে তুই বিয়ে করলে কী করে হবে? কেউই তো কিছু বুঝব না ও কী বলছে। কিন্তু এভাবে রেখেও তো দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, কাজি সাহেবকে ডেকে আজকেই বিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি দেখছি কী করা যায়।"
আজমল বলল, "আর মনোয়ারা বেগম যদি ওকে খুঁজতে এখানে চলে আসে?"
ফিরোজা চিন্তিত গলায় বললেন, "তা তো হতেই পারে। ওদের অনেক ক্ষমতা। সত্যিই যদি দেখতে পায় ওর দলের মেয়ে নিয়ে এসেছিস, তাহলে সবাইকে মেরে ফেলবে। কী করা যায়?"
আজমল বলল, "দিল্লি চলো মা। ছোটো খালার কাছে যাই। এখানে, এই গ্রামে থেকে তো কিছু হবেও না। আমাদের চাষের জমিই বা কতটুকু আর আছে? চলো দিল্লি যাই।"
ফিরোজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এতদিন পরে এলি, তাও আবার কতরকম মুসিবত নিয়ে এলি। তুই কোনও দিন আর মানুষ হলি না রে আজমল, এত বড়ো হয়ে গেলি, তবুও মানুষ হলি না।"

১৪

।। এই সময়।।

আদিত্য অবাক চোখে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই? এত রাতে?"
ঝুমকি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "দিদি কোথায়?"
আদিত্য বলল, "রুমকি তো তোদের বাড়িতেই। বাবা মাকে সামলাচ্ছে। আয়, ভিতরে আয়।"
ঝুমকি তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে বলল, "দরজাটা দাও শিগগিরি। ওরা আমাকে ফলো করছে নাকি জানি না।"
আদিত্য দরজায় লক করে বলল, "তুই বস। কী হয়েছে বল আগে।"
ঝুমকি কেঁদে ফেলল। আদিত্য কিছু বলল না। চুপ করে বসে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর ঝুমকি বলল, "আমি কোনওমতে পালিয়ে এসেছি।"
আদিত্য বলল, "আমি তোর দিদিকে ফোন করব?"
ঝুমকি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না, দিদিকে ফোন কোরো না। বাবা মাকে যদি বলে দেয় আর-এক ঝামেলা। দিদির পেটে কোনও কথা থাকে না।"
আদিত্য রুমকিকে খুব ভালো করে চেনে। ঝুমকি কথাটা ঠিকই বলেছে।
সে বলল, "কী হয়েছিল কী? হঠাৎ করে এত বড়ো কাণ্ড করার দরকার কী ছিল?"
ঝুমকি আবার কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে জানাল কলেজ ফেস্টের দিন রিন্টুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দারুণ গিটার বাজায়, ব্যান্ডে গান করে। কখন যে দুজনের প্রেম হয়ে গেল বুঝতেও পারেনি। বিয়ের সমস্ত প্ল্যানিং ও-ই করেছিল। শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে আসা, মোবাইল অফ করে রাখা, সব প্ল্যান রিন্টুর। ও যে অন্য ধর্মের, কোথায় থাকে, সে সম্পর্কে আগে কিছুই জানায়নি তাকে। ঝুমকিও জানার প্রয়োজন বোধ করেনি কখনোই। কিন্তু একদিনের অভিজ্ঞতা তার রিন্টু সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাকি সবটা বলার পর ঝুমকি জানাল কী করে সে পালাতে পারল।
ঝুমকিকে কনভার্ট করার উৎসবে একে একে জড়ো হয়েছিল সবাই। স্থানীয় ইমামও চলে এসেছিলেন। হঠাৎ রিন্টুর চাচি রিন্টুকে বলল, বহুকে তারা সাজাতে চায়। রিন্টু আর আপত্তি করেনি। ঝুমকিকে নিয়ে চাচি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে চমকে দিয়ে বাংলায় বলল, "তোমাকে জোর করে নিয়ে এসেছে, না?"
ঝুমকি হাঁ করে রিন্টুর চাচির দিকে তাকাল।
রিন্টুর চাচি বলল, "আমি সব বুঝেছি। আমাকেও একদিন এভাবেই নিয়ে আসা হয়েছিল। তুমি যাও, পিছনের দরজায় আমার খুব বিশ্বস্ত একজন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি গাড়িতে গিয়ে ওঠো। ও

তোমাকে স্টেশনে দিয়ে আসবে, আর এই টাকাগুলো রাখো। কোনও দিন ভুলেও এর কাছে ফিরে আসবে না, মনে রেখো, জানে মেরে দেবে তোমাকে।"

হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে রিন্টুর চাচি ঝুমকিকে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিল। সেখান থেকে স্টেশন, হাওড়াগামী ট্রেন, হাওড়া থেকে এখানে ট্যাক্সি নিয়ে আসা, সমস্ত পথটাই ঝুমকি তীব্র আতঙ্কের মধ্যে ছিল। তার বারবার মনে হয়েছে, এই বুঝি রিন্টু তাকে ধরে ফেলল।

আদিত্য ফ্রিজ থেকে জলের বোতল এনে ঝুমকিকে দিয়ে বলল, "জল খা। এসে যখন পড়েছিস, তখন আর চিন্তার কিছু নেই।"

ঝুমকি আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা সব জেনে গেছে, না?"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল, "হ্যাঁ। সবটাই।"

ঝুমকি মাথা নিচু করে বলল, "বাবা আমাকে কোনও দিন মেনে নেবে না।"

আদিত্য বলল, "সেটা বড়ো কথা না। তুই বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, সেটা বড়ো কথা। জলটা খা। আমি সুশোভনকে ফোন করি।"

ঝুমকি বলল, "সুশোভন কে?"

আদিত্য বলল, "আমার বন্ধু। পুলিশে আছে। চিন্তা করিস না। তুই খাসনি তো কিছু? ফ্রিজে খাবার আছে, গরম করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

ঝুমকি উঠল না। বসে রইল।

আদিত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুশোভনকে ফোন করল।

সুশোভন একটা রিং হতেই ধরলেন, "বল রে, কোনও আপডেট?"

আদিত্য বলল, "ঝুমকি ফিরে এসেছে। টর্চার হয়েছে, কনভার্শনের চেষ্টা হয়েছে এবং রেপ হয়েছে। কী করা যায়?"

আদিত্যর কথা শুনে ঝুমকি মুখ চাপা দিল দু হাত দিয়ে।

সুশোভন চাপা গলায় বললেন, "ফিরে আসতে পেরেছে এটা বিরাট ব্যাপার। বাকিটা কী হবে সেটা নিয়ে কাল কথা বলি বরং। মেয়েটি কোথায়?"

আদিত্য বলল, "আমার সামনেই। এখন কথা বলতে পারবে না। বুঝতেই পারছিস কী অবস্থা ওর।"

সুশোভন বললেন, "ওকে। কাল কথা হচ্ছে। গুড নাইট।"

আদিত্য বলল, "গুড নাইট।"

ফোনটা রেখে আদিত্য ঝুমকিকে বলল, "তুই খেয়ে নে।"

ঝুমকি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "আমি নষ্ট হয়ে গেলাম।"

আদিত্য চুপ করে বসে রইল।

১৫

ঝুমকি গেস্টরুমে ঘুমাল। আদিত্য বেশ কয়েকবার ভেবেছিল রুমকিকে জানাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর জানাল না। ঝুমকি ঠিকই বলেছে রুমকির সম্পর্কে। ও পেটে কথা রাখতে পারে না। এখন ওদের বাবার প্রতিক্রিয়া ঠিক কী হবে সেটা আঁচ করা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক বেশ গোঁড়া।

ঘুমাতে যাবার আগেও আদিত্যর রিন্টুর বাড়ির পরিবেশটা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। সুশোভন চলে গেলে সে আবার গেছিল। দরজার বাইরে থেকেই উত্তেজিত কথোপকথন শুনতে পেয়েছিল সে। পুলিশ কেন এসেছে, আগে জানলে পুলিশের গলা নামিয়ে দিত, এই সমস্ত কথা শুনে সে আর দাঁড়ায়নি। সন্তর্পণে চলে এসেছিল। মানুষ এত মারমুখী কেন হবে অনেক ভেবেও সে বুঝে উঠতে পারেনি। বিয়ে হয়েছে, মেয়ে নিজের ইচ্ছাতেই বিয়ে করেছে, তাতে গলা নামিয়ে দেবে, এ জাতীয় ভাষা কেন ব্যবহৃত হবে? আদিত্য খানিকটা ভয়ই পেয়েছিল। অনেক রাত অবধি এপাশ ওপাশ করে শেষমেশ ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে।

ড্রয়িং রুমে এসে দেখল ঝুমকি আগেই দরজা খুলে দিয়ে আবার ঘরে চলে গেছে। সুশোভনের সঙ্গে আর-একজন মধ্যবয়স্ক অপরিচিত মানুষ। উর্দি পরে রয়েছেন। আদিত্য বুঝল ইনি সুশোভনের কলিগ।

সে সুশোভনকে বলল, "তোরা বোস, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।"

সুশোভন বললেন, "বেশ।"

আদিত্য বাথরুমে গিয়ে ব্রাশ করে, চোখে মুখে জল দিয়ে ড্রয়িং রুমে এল। সুশোভন তাঁর সঙ্গে আসা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করালেন, "আদিত্য, উনি জামান সাহেব। আমাদের সিনিয়র। তোর শালির ব্যাপারটা ওঁকে জানাতে উনি নিজেই কেসটার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।"

আদিত্য হাত জোড় করল।

জামান বললেন, "আমি সুশোভনের কাছে কাল রাতেই শুনলাম ব্যাপারটা। খুব আনফরচুনেট ব্যাপার ঘটেছে। এসব মানুষদের জন্যই কিন্তু কমিউনাল টেনশন তৈরি হয়।"

আদিত্য বলল, "আমারও তাই মনে হয়। ইন ফ্যাক্ট কাল আমি আর সুশোভন ছেলেটার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওদের অ্যাগ্রেসিভ চেহারা আমার অন্তত ভালো লাগেনি। সুশোভন যদিও ব্যাপারটা বেশ ঠান্ডা মাথায় সামলে নিয়েছিল। কিন্তু আমার রীতিমতো ভয় লাগছিল ওদের অ্যাটিচিউড দেখে।"

জামান বললেন, "আমি নিজে ব্যাপারটা দেখতে চাই। আমার জন্মও খিদিরপুরে। এরকম কেস আমি দেখিনি এমন নয়, কিন্তু ইদানীং যেন এই ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে গেছে। কিছু মানুষের জন্য গোটা ধর্মের লোকেদের দিকে তর্জনী উঠছে। আচ্ছা, মেয়েটিকে একটু ডাকা যাবে?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, যাবে, কিন্তু এখনই ওকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ না করলেই ভালো হয়। একটা শকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ও।"

জামান হাত তুললেন, "তাহলে থাক। প্রথম স্টেপ হিসেবে আজকেই ছেলেটি এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করুন। মেয়েটিকে মেন্টাল সাপোর্ট দিন। এসব কেসে মেয়ের বাড়ির লোক লজ্জার ভয়ে পুরো ব্যাপারটাই চেপে গিয়ে অন্য কোনওখানে মেয়েটির বিয়ে ঠিক করে। সেটা করতে চাইলে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই ধরনের ক্রিমিনালদের খোলা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত।"

সুশোভন বললেন, "স্যার, লাস্ট কয়েকটা বছরে স্টেটে কমিউনাল টেনশন বেড়েছে। এই ধরনের ঘটনা যদি সামনে আসে তবে স্বাভাবিকভাবেই..."

জামান বললেন, "সামনে আসার দরকার আছে। সমাজের স্বার্থেই সেটা দরকার আছে। এ ধরনের কাজকর্ম কোনওভাবেই সাপোর্ট করা যায় না।"

সুশোভন আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কী বলিস? ব্যাপারটা নিয়ে তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনওরকম মুভমেন্ট হবে?"

আদিত্য ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, "আগে ওর বাবা ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিক। আমার তো যথেষ্ট ডাউট আছে, সেই প্রসেসটা শান্তিপূর্ণভাবে হবে নাকি সে সম্পর্কে। তারপরে তো লড়াইয়ের প্রশ্ন আসছে।"

জামান বললেন, "মেয়ে পালিয়ে গেলে মেয়ের ওপর বাপের অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমার নিজেরও মেয়ে আছে। একজন মেয়ের বাপ হিসেবে ব্যাপারটা আমি ফিল করতে পারি। যাই হোক, এফআইআর-টা করুন। লড়াইটা শুরু হোক।"

আদিত্য বলল, "আমি আজ ওদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যাই। তারপর কী প্রতিক্রিয়া হয় সুশোভনকে জানাচ্ছি। সেটা দেখে নাহয় পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা যাবে?"

জামান উঠলেন, "বেশ, তাই হোক। আমাকে আপডেট দিতে থাকবেন।"

আদিত্য বলল, "নিশ্চয়ই। অনেক ধন্যবাদ।"

সম্রাট হুমায়ুন একমনে কিছু লেখার চেষ্টা করছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কিছু লিখতে পারছেন না। মন বড়োই বিক্ষিপ্ত।
এমন সময় এক দাসী এসে খবর দিল বৈরাম খাঁ দেখা করতে এসেছেন।
হুমায়ুন বিরক্ত হলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁকে আসার অনুমতিও দিলেন।
বৈরাম খাঁ সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করলেন।
হুমায়ুন বললেন, "কী ব্যাপার খাঁ সাহেব? বড়ো উতলা মনে হচ্ছে?"
বৈরাম খাঁ বললেন, "জাহাঁপনা, খুশি হবার মতো একটা খবর ঘটেছে বটে। অবশ্য একইসঙ্গে চিন্তা বাড়ারও পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।"
হুমায়ুন অবাক গলায় বললেন, "আমার খুশি হবার মতো ঘটনা? কী হয়েছে শুনি?"
বৈরাম খাঁ বললেন, "জাহাঁপনা, আপনার ভাই কামরান মির্জা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে লোকলশকর জড়ো করছিল। সুখের কথা হল, শের শাহ সুরির সৈন্যরা তাদের একটা দলকে কচুকাটা করেছে সরাইখানার ভিতরে।"
হুমায়ুন শিউরে উঠে বললেন, "আমার ভাই ভালো আছে তো?"
বৈরাম খাঁ সম্রাটের প্রতিক্রিয়া দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "এই খবরে আপনার আর কোনও কিছু মনে পড়ল না?"
হুমায়ুন বললেন, "নাহ। আগে তো পরিবার। তারপরে সব কিছু। যাই হোক, কামরান ভালো আছে তো?"
বৈরাম খাঁ সম্রাটকে আশ্বস্ত করলেন, "হ্যাঁ জাহাঁপনা। ওঁর শরীরে আঁচটুকুও লাগেনি। তা ছাড়া উনি ঘটনাস্থলে ছিলেনও না। তবে রাজবিদ্রোহ দমন করা এই মুহূর্তে কঠিন কাজ হত। যা হয়েছে, ভালোর জন্যই হয়েছে। যদিও কামরান মির্জা চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আমাদেরই সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনও গুপ্তঘাতক আপনার কাছে না ঘেঁষতে পারে।"
হুমায়ুন বললেন, "তাহলে ঠিক আছে। আর চিন্তা বাড়ার কারণ কী?"
বৈরাম খাঁ বললেন, "শের শাহ শক্তিবৃদ্ধি করছেন। আমার মনে হয়, আমাদের শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়া উচিত।"
হুমায়ুন বললেন, "বেশ তো, আপনি প্রস্তুত করুন সকলকে। তরবারি ধরি না অনেকদিন হয়ে গেল।"
বৈরাম খাঁ বললেন, "অধৈর্য হবেন না জাহাঁপনা। এই মুহূর্তে শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার কথা রাজ্যের সর্বত্র রটে গেলে কামরান মির্জা খুশিই হবেন। দিল্লির তখত খালি থাকবে। কামরান মির্জা বিদ্রোহীদের নিয়ে রাজধানী দখল করতে চলে আসবেন। এখন এই সংবাদ গোপন করা আমাদের আশু কর্তব্য। আমরা নিঃশব্দে প্রস্তুতি শুরু করব।"
হুমায়ুন বললেন, "বেশ। আর কিছু বলার আছে? না থাকলে আপনি যেতে পারেন।"
বৈরাম খাঁ খানিকটা নিরাশ হলেন। শের শাহ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সম্রাটকে দেবেন ঠিক করে এসেছিলেন। সম্রাটের মতিগতি দেখে বুঝতে পারলেন সেসব শুনতে সম্রাট একেবারেই আগ্রহী নন। তিনি নতজানু হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুমায়ুন নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরে এলেন, জলাশয়ের কাছে এসে বসে জলে হাত চুবালেন। গ্রীষ্মকালে জল নিয়ে খেলা সম্রাটের প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে একটা।
খাস বাঁদি মেহজাবিন সম্রাটের কাছে এসে দাঁড়াল। মুখে খানিকটা উৎসুক ভাব। হুমায়ুন বললেন, "কী সংবাদ মেহজাবিন? কিছু বলবে তুমি?"
মেহজাবিন বলল, "জাহাঁপনা কি আজকে হারেমে যাবেন?"
হুমায়ুন অবাক হলেন, বললেন, "কেন বলো তো?"

মেহজাবিন বলল, "এক হিন্দু মেয়ে গত কাল হারেমে এসেছে জাহাঁপনা। সমস্যা হল আসা ইস্তক মেয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। কিছুতেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না।"
হুমায়ুন বললেন, "হারেমে এসেছে? কী করে সম্ভব? বাদশাহী হারেমের আদৌ উপযুক্ত সে কন্যা?"
মেহজাবিন মাথা নিচু করে জানাল, মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য পালিয়ে নিয়ে এসেছিল তার এক আত্মীয়। ছেলেটির মা যখন বুঝতে পারেন মেয়েটি সুন্দরী এবং নিরাপত্তাহীন পথে কোথাও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তখন ছেলেটিকে না জানিয়েই হিন্দু মেয়েটিকে বাদশাহি হারেমে পাঠিয়ে দেন মেহজাবিনের হাত দিয়ে। সমস্যা যদিও অন্য হয়েছে, মেয়েটি খাওয়া প্রায় ত্যাগ করেছে, সারাদিন ধরে কেঁদে চলেছে। এমন অবস্থায় যদি বাদশাহ একবার মেয়েটির সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে।
হুমায়ুন মেহজাবিনের দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে বললেন, "বেশ। চলো। পরখ করে আসি, কোন কোহিনূর এত পরম যত্নে তুমি আগলে রেখেছ। চলো।"

১৭

সুশোভনরা চলে গেলে আদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করে ড্রয়িংরুমে বসে রইল। ঝুমকি এসে বলল, "ওঁরা পুলিশ? আমার ব্যাপারে এসেছিলেন?"
আদিত্য ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। তোর ব্যাপারে।"
ঝুমকি বলল, "আমার জন্য সবার মাথা নিচু হল।"
আদিত্য বলল, "এখন এই কথাটা বলে লাভ আছে ঝুমকি? তোর এটা আগে ভাবা উচিত ছিল। হিন্দু মুসলিমটা বড়ো কথা না, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার কনসেপ্টটাই বা তুই এনকারেজ করলি কেন?"
ঝুমকি মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, "আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম।"
আদিত্য বলল, "সে কি আর আলাদা করে বলার দরকার পড়ে? কিন্তু দয়া করে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে টাইপ কমেন্ট করিস না এখন।"
ঝুমকি কিছু বলল না।
আদিত্যর ফোন বেজে উঠল। সে দেখল রুমকি ফোন করছে। ঝুমকিকে বলল, "তোর দিদি ফোন করছে। চুপ করে থাকিস।"
ঝুমকি মাথা নাড়ল।
আদিত্য ধরল, "হ্যালো।"
"এই তুমি তোমার বন্ধুকে ফোন করো একবার শিগগিরি।"
ওপাশ থেকে রুমকির কাঁদো কাঁদো গলা ভেসে এল।
আদিত্য অবাক গলায় বলল, "কেন? কী হয়েছে?"
রুমকি বলল, "আরে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। বাবা সামনের ঘরে ছিল। পাঁচ-ছটা ছেলে এসে বাবাকে হুমকি দিয়ে গেছে। ঝুমকি নাকি পালিয়েছে ওখান থেকে। বাবার বুক ধড়ফড় করছে। আমি ডাক্তার আঙ্কেলকে ফোন করেছি। আসছে। তুমি এসো প্লিজ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঝুমকি কোথায় গেল?"
আদিত্য আঙুল দিয়ে মাথা টিপে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "আমি আসছি। সুশোভনকেও বলছি। আপাতত পাড়ার লোকজনকে বলে রাখো তারা যেন উটকো লোক দেখলে তাড়া করে। ছেলেগুলোকে সুবিধার মনে হচ্ছে না।"
রুমকি বলল, "প্লিজ এসো। আমি আর চাপ নিতে পারছি না।"
ফোন রেখে আদিত্য সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন ধরলেন, "বল রে।"
আদিত্য বলল যা হয়েছে।
সুশোভন অস্ফুটে বললেন, "আনএক্সপেক্টেড ছিল না ব্যাপারটা। বরং আগে থেকে আমারই অ্যালার্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। চিন্তা করিস না, আমি লোকাল থানায় ইনফর্ম করে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছি। তুই কি

তোর শ্বশুরবাড়িতে এখনই ও যে ফিরে এসেছে সেটা বলে দিবি?"
আদিত্য বলল, "নাহ। ও বাড়িতে পরিস্থিতি ভালো না। এখন বললে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমি ঝুমকিকে এ বাড়িতে রেখে যাচ্ছি। গিয়ে দেখি কী হাল।"
সুশোভন বলল, "ঠিক আছে। তুই যা। আমি থানায় বলে দিচ্ছি।"
ফোন রাখল আদিত্য। ঝুমকি চিন্তিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"
আদিত্য বলল, "শুনতে পেলি তো। তোর পেয়ারের রিন্টু ওরফে রুবেল লোক পাঠিয়েছে তোদের বাড়িতে। রীতিমতো হুমকি দিয়ে গেছে। কত বড়ো গ্যাংস্টার ছেলেটা?"
ঝুমকি এবার কাঁদো কাঁদো হল, "ওর খুব রাগ। আমি আগে একবার বুঝেছিলাম।"
আদিত্য হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, "ওর রাগ খুব না কম, তাতে কারও যায় আসে না। এই যন্তরটাকে তুই এখন ভোলার চেষ্টা কর। দয়া করে সেন্টু খেয়ে আবার ওর কাছে ফিরে যাস না।"
ঝুমকি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "কখনোই না। কোনও দিনও আমি আর ফিরে যাব না।"
আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। শোন, তুই এখানেই থাক। আমি তোদের বাড়িতে যাচ্ছি। ওদিকটাও তো সামলাতে হবে। তোর জ্বালায় আমার অফিস মাথায় উঠল যা বুঝতে পারছি। চাকরিটা থাকলে হয়।"
ঝুমকি কেঁদে ফেলল।
আদিত্য এবার নরম হয়ে বলল, "কাঁদিস না। ফ্রিজে চকোলেট আছে। খেয়ে নিস। এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয় আর মেয়ে চললেন বাড়ি থেকে পালাতে। যত্তসব!"
ঝুমকি নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল।
আদিত্য আর দাঁড়াল না। স্নান, বাথরুম সব সেরে বাড়ি থেকে বেরোল। ঝুমকিকে বলল, "আমার নাম্বার ল্যান্ডলাইনের পাশের ডায়েরিতে আছে। কোনও সমস্যা হলে ফোন করবি। তোর যত চিন্তাই হোক বাড়িতে এখন ফোন করবি না, বুঝেছিস?"
ঝুমকি মাথা নাড়ল, "বুঝেছি।"

১৮

আদিত্য গাড়ি চালাচ্ছিল।
রুবি পেরোতে ফোনটা বাজতে শুরু করল। আদিত্য বিরক্ত হল। এমনিতেই কাঁচা হাত, গাড়ি চালানোর সময় খুব অ্যালার্ট থাকতে হয়।
রুবির মোড় পেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে গাড়িটা বাঁদিকে দাঁড় করাল সে। আননোন নাম্বার। কল ব্যাক করল সে। ওপাশে একটা রিং হতেই ধরল, "হ্যালো।"
আদিত্য বলল, "কে বলছেন?"
"দাদা ভালো আছেন?"
আদিত্য গলাটা চিনল না। অবাক গলায় বলল, "কে বলছেন?"
"আমি রিন্টু বলছি দাদা। ওই কী যেন বলে না, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনার ভায়রা ভাই।"
আদিত্য থমকাল। বলল, "আপনি আমার নাম্বার পেলেন কোত্থেকে?"
"কী যে বলেন দাদা, ঝুমকির মোবাইল থেকেই পেয়েছিলাম। আপনাদের সবার নাম্বারই আমার কাছে আছে।"
আদিত্য বলল, "ওহ, বেশ তো। তা আমাকে ফোন করলেন কেন?"
রিন্টু বলল, "অ্যাকচুয়ালি একটা বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করেছি দাদা।"
"কী বিপদ?"
"জানেন তো, ঝুমকির সঙ্গে আমার বেশ কিছুদিন ধরেই অ্যাফেয়ার চলছিল। আমি কিছু বলিনি জানেন তো, ও-ই ইনসিস্ট করত আমার সঙ্গে পালাবে বলে। ওর বাড়ি থেকে নাকি মানবে না। আমি ওকে বোঝাতাম যে

দ্যাখো এগুলো ভাবা উচিত না, কিন্তু ও কিছুতেই মানতে চাইত না বুঝলেন তো দাদা। তারপর তো জানেনই কী ঘটে গেল।"

আদিত্য অবাক হল, ছেলেটার ভাষা অত্যন্ত মার্জিত।

সে বলল, "আচ্ছা, তো তারপর?"

"তারপর তো দাদা সবাই জানে। ঝুমকি পালিয়ে গেল। ও দেখল আমরা মুসলমান, মানতে পারল না। কিন্তু আপনিই বলুন দাদা, আজকালকার দিনে এসব কেউ দ্যাখে?"

আদিত্য বুঝল ঝুমকি যে তার ফ্ল্যাটে আছে সেটা রিন্টু জানে না। সে বলল, "আচ্ছা, আমি তো অতটা ওদের ব্যাপারে ঢুকি না, আমি দেখি কী হয়েছে, তারপর নাহয় আপনাকে ফোন করি?"

রিন্টু বলল, "শুনুন না, শুনুন না দাদা।"

আদিত্য বলল, "বলুন।"

রিন্টু বলল, "দেখুন দাদা, আমি ঝুমকিকে খুব ভালোবাসি। কথা দিচ্ছি বাকি জীবনে ওকে কোনওরকম কষ্ট দেব না। আপনি একটু দেখুন না, যদি সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে পারেন।"

আদিত্য বলল, "দেখুন ভাই, এটা তো আমার শ্বশুরবাড়ির ব্যাপার, এসব ব্যাপারে আমি খুব কম ঢুকি। যদি আমার কোনও ওপিনিয়ন নেয়, তখন নাহয় আমি দেখব, কেমন? এখন আমি শ্বশুরবাড়িই যাচ্ছিলাম, কোথাকার কিছু লাথখোর ছেলে নাকি ওদের বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে গেছে, আমার বন্ধু তো লালবাজারে আছে, দেখি যদি কিছু করা যায় নাকি।"

আদিত্যকে অবাক করে রিন্টু চেঁচিয়ে উঠল, "এই শুয়োরের বাচ্চা, মাদারচোদ, লাথখোর কাকে বলছিস বে? আমার ভাই হয় ওরা! খোঁজ নিতে গেছিল।"

আদিত্য হেসে ফেলল, "এই তো ভাই, আপনার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকা শুয়োরকে লাঠির বাড়ি মারলে তার যে আসল রূপ বেরোবে এ তো জানাই ছিল।"

রিন্টুর গলার নিমেষে পরিবর্তন হল, "সরি সরি দাদা, আমার মাথার ঠিক নেই তো, হঠাৎ এক্সাইটমেন্ট চলে এসেছিল। আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না দাদা।"

আদিত্য বলল, "আমি কিছু মনে করিনি, তবে আপনি যেটা করেছেন, সেটা ঠিক করেননি। আপনি ঝুমকিকে বলেননি আপনি অন্য ধর্মের মানুষ, তাই না?"

রিন্টু বলল, "সেটা আপনি কী করে জানলেন?"

আদিত্য সতর্ক হল, বলল, "অনুমান করাই যায়। আপনার কথা শুনে সেরকমই মনে হয়েছে আমার।"

রিন্টু বলল, "ধর্মটা কি ম্যাটার করে আজকাল? আপনিই বলুন?"

আদিত্য বলল, "ম্যাটার করে না। সত্যিই করে না। ধর্ম একটা ইউজলেস ব্যাপার। কিন্তু জোরজারি করে কিছু করাটাও ক্রিমিনাল অফেন্সের আন্ডারে পড়ে, এটা বোধহয় আপনি বা আপনারা জানেন না। শুনুন, ঝুমকি আমার বোনের মতো, ওর কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাইব না। আমরা থানায় মিসিং ডায়েরি করছি, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে, আপনি বরং এর ফলাফলের জন্য প্রস্তুত থাকুন। পুলিশকে সাহায্য করুন, দেখা যাক কী হয়।"

রিন্টু কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ফোনটা কেটে দিল।

১৯

কাঁদো কাঁদো মুখে রুমকি দরজা খুলল। আদিত্য ঘরে ঢুকে দেখল বিকাশ বসে আছেন। মুখটা বিরক্তিতে একটু কুঁচকেই ঠিক করে নিল সে। রুমকি এরকম মুখ দেখলে অশান্তি করে।

বিকাশ তাকে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "দেখলে বাবাজীবন? সেকুলার হওয়ার সমস্যা? যাদের ভয়ে বর্ডার পেরিয়ে এসেছিলাম, তারা শুধু মেয়েই তুলে নিয়ে যাচ্ছে না, সঙ্গে বাড়ি বয়ে এসে হুমকিও দিয়ে যাচ্ছে।"

আদিত্য সোফায় বসে শ্বশুরের দিকে তাকাল। তপন খানিকটা ভেবলে গেছেন বোঝা যাচ্ছে। সামনের টেবিলে জলের বোতল রাখা। আদিত্য বোতল থেকে খানিকটা জল খেয়ে বলল, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সুশোভন ব্যবস্থা করছে বলেছে।"

রুমকি বলল, "ঝুমকির কী হবে? ও পালিয়ে কোথায় গেছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে..."

রুমকি কথা শেষ করতে পারল না। মুখে আঁচল দিল।

তপন বিরক্ত গলায় বললেন, "বাচ্চার কিছু নেই তো। পালিয়ে বিয়ে যখন করতে পেরেছে তখনই বড়ো হয়ে গেছে। এসব ফালতু কথা বলিস না।"

বিকাশ উদগ্রীব গলায় বললেন, "ওরা আবার কনভার্ট করে বেচে দেয় জানো তো?"

আদিত্যর মুখে খিস্তি আসছিল। অনেক কষ্টে সেটা আটকে সে বলল, "আমরা তো এখনও কিছু জানি না। কিছু না জেনে বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?"

তপন বললেন, "কিছু না জানলেও, যেসব ছেলেরা এ বাড়িতে এসেছিল, তাদের দেখে খানিকটা আন্দাজ করাই যায় আমার মেয়ে কোন বাড়িতে গেছে। লাথখোর, লুম্পেন টাইপ ছেলে একেবারে সবকটা। আর চোখ কী তাদের, বাপরে...।"

রুমকির মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপ করে। বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছেন। বিকাশ বললেন, "আমি পাড়ার ছেলেদের খবর দিয়েছি। পুলিশ কী করবে সেটা তো বুঝে উঠতে পারছি না, আপাতত পাড়ার লোকেরা একটু দেখুক।"

তপন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "ছি ছি ছি ছি। এত নিষ্ঠাসহকারে পুজো করি আমি, জ্ঞানত কোনও দিন কারও কোনও ক্ষতি করিনি, সেই আমার মেয়েই কিনা এত বড়ো... ভাবতেই পারছি না।"

রুমকি আদিত্যর দিকে তাকাল, "সুশোভনরা কোনওরকম কিছু জানতে পারল?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, ঝুমকিকে ওরা ধানবাদে নিয়ে গেছিল। ঝুমকি সম্ভবত জানত না ছেলেটা অন্য ধর্মের, ও ওখান থেকে পালাতে পেরেছে। এটুকু জানা গেছে।"

তপন বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখলে? জানত না নাকি। যদি নিজের জাত ধর্মেরই হত, তাহলেই বা পালিয়ে তুই কী রাজকাজটি করতি? এদের প্রতিপালনেই সমস্যা ছিল আমার। আমারই ব্যর্থতা।" তপন দৃশ্যতই ভেঙে পড়লেন।

বিকাশ বললেন, "এই যে ছেলেগুলো এসেছিল, সব কোন ভাষায় কথা বলছিল?"

তপন বললেন, "উর্দু বা হিন্দু কিছু একটা হবে। একেবারেই অবাঙালি টানে কথা বলল।"

বিকাশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ, বুঝেছি, এইসব ছেলেছোকরাই ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে। নিজেদের জায়গায় যতরকম ক্রাইম করে বেড়াবে। বলার কেউ নেই তো। গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা আর হিন্দু ঘরের মেয়ে বিয়ে করা ছাড়া এদের কোনও কাজ নেই। নেহাত আমি ছিলাম না তাই, থাকলে দেখিয়ে দিতাম..."

আদিত্য আড়চোখে বিকাশের দিকে তাকাল। সামান্য হাওয়া দিলে উড়ে যাওয়া চেহারা। অতি কষ্টে হাসি চাপল সে।

কলিং বেল বাজল। রুমকি খানিকটা শিউরে উঠল। আদিত্য উঠে বলল, "আমি দেখছি।"

রুমকি বলল, "দাঁড়াও আগে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে নি।"

বাইরের জানলা দিয়ে রাস্তা দেখে আশ্বস্ত হয়ে রুমকি দরজা খুলল। পাড়ার কয়েকজন লোক এসেছে। বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা পাড়ায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। আদিত্য রুমকিকে বলল, "তুমি একটু ভেতরের ঘরে এসো, কথা আছে।"

রুমকি বলল, "কী কথা?"

আদিত্য বলল, “চলো, বলছি।”

রুমকি আর আদিত্য ভেতরের ঘরে গেল। বাইরের ঘর থেকে উত্তেজিত লোকজনের কথোপকথন ভেসে আসছে। সবথেকে বেশি আসছে বিকাশের গলার স্বর।

রুমকি ঘরে ঢুকলে আদিত্য আড়চোখে একবার বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, “শোনো, এখানে তো যা হবার হয়ে গেছে, আমার অফিস যাওয়া হচ্ছে না, তুমি আপাতত আমার সঙ্গে চলো।”

রুমকি তার দিকে ভস্ম করে দেওয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “মানে? তুমি চাইছ এই পরিস্থিতিতে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?”

আদিত্য বলল, “সেটা তো বলিনি, তুমি এসো, কিন্তু আমিও তো ওদিকে একা আছি। সমস্যা হচ্ছে...” আদিত্য বলতে পারছিল না ঝুমকি তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে। জানলেই হয়তো রুমকি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে।

রুমকি জোরে জোরে মাথা দুদিকে নাড়িয়ে বলল, “কখনও না। বাবা-মাকে এই অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যাব না। বরং তুমিও এখন এই বাড়ি থেকেই অফিস যাতায়াত করো।”

আদিত্য বলল, “সম্ভব না। নর্থের জ্যাম ঠেলে অফিস পৌঁছোতে হলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।”

রুমকি রেগে গিয়ে বলল, “তা তো বলবেই। শুধু সব কিছু থেকে পালিয়ে পালিয়েই গেলে। যাও, যেখানে ইচ্ছে যাও, আমাদের দিকে তোমার না দেখলেও হবে। আর শুনে রাখো, যতদিন না ঝুমকি বাড়ি ফিরছে, আমি কোথাও যাচ্ছি না।”

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

২০

সুশোভন দুজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। আদিত্য আর বসল না। রুমকির থমথমে মুখের মধ্যেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল।

শ্বশুরবাড়িতে মেলা বসে গেছে এখন। বিভিন্ন লোক এসে মতামত দিয়ে যাচ্ছে। আদিত্যর বিরক্ত লাগছিল থাকতে। শাশুড়ি খেয়ে যেতে বললেও সে থাকল না। এত ঘেন্না সে আর নিতে পারছিল না। অসুস্থ লাগছিল।

চারদিকটা কীভাবে যেন ধর্ম ধর্ম করে খেপে উঠেছে। এই মানুষগুলোকে সে নতুন করে চিনছে। ধর্ম সম্পর্কে এত সজাগ কলকাতার মানুষ কি আগে কোনও কালে ছিল? মনে করতে পারল না সে।

বেশ খানিকটা রাস্তা যাবার পর তার ঝুমকির কথা মনে পড়ল। একটা রেস্তোরাঁয় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন প্যাক করে নিল। দরজায় যখন বেল বাজাল তখন দুপুর হয়েছে। ঝুমকি বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে দরজা খুলল। চোখ মুখ ফোলা। আদিত্য বলল, “ঘুমাচ্ছিলি?”

ঝুমকি বলল, “হ্যাঁ, খুব টায়ার্ড লাগছিল। ও বাড়ির কী খবর?”

আদিত্য হাতের প্যাকেট ঝুমকির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ভাগ কর। আমিও খেয়ে নি। ও বাড়ির খবর আর কী, পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। আর তোর রোমিও আমাকে ফোন করেছিল তো!”

ঝুমকি অবাক হয়ে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, “মানে? কখন?”

আদিত্য বলল, “আগে খেয়ে নে। সকাল থেকে তো কিছুই খাসনি মনে হয়।”

ঝুমকি বলল, “বিস্কুট খেয়েছি। আচ্ছা খেয়ে নি। আর শুনতেও ইচ্ছা করছে না আমার।”

আদিত্য টেবিলে বসল। ঝুমকিই খাবার ভাগ করে দিল।

টিভি চালাল আদিত্য। কোথায় একটা ঝামেলা লেগেছে। র‍্যাফ নেমেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। চারদিকে ঝামেলা শুধু।

ঝুমকি কিছুটা খেয়ে বলল, “আমি আর পারছি না। খেতে ইচ্ছা করছে না।”

আদিত্য ধমকাল, "চুপচাপ খেয়ে নে। কষ্ট হলেও খা। খালি পেটে থাকবি না। তোর দিদিকে তো আনার চেষ্টা করলাম, বুঝে উঠতেই পারল না কেন আসতে বলছি। এল না।"
ঝুমকি বলল, "আমি কী করব? ফিরে যাব ও বাড়ি?"
আদিত্য বলল, "কোন বাড়ি? খিদিরপুর?"
ঝুমকি বলল, "না না, আমাদের বাড়ি।"
আদিত্য খেতে খেতে বলল, "আমাদের এই যে সমাজ না কী একটা জিনিস আছে না, এখানে একটা কথা বারবার বলা হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পর মেয়েদের নাকি শ্বশুরবাড়িটাই আসল। একটা মেয়ের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ না করা এই সমাজ শ্বশুরবাড়িটাকেই তার নিজের বাড়ি বানিয়ে দেয়। তোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবশ্য অন্য। তোর শ্বশুরবাড়ি তুই নিজেই পছন্দ করেছিলি। কিন্তু তাদের স্বরূপটা বোঝার চেষ্টা করিসনি। যখন জানতে পেরেছিস, তৎক্ষণাৎ পালিয়ে এসেছিস। এবারে তোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বাবা তোকে ফিরিয়ে নেবেন কি না, বা তাঁর বাড়িটাকে তোর বাড়ি বলে আর স্বীকৃতি দেবেন কি না, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। আমি অনেক বিয়েই দেখেছি, মেয়ের সিঁদুর ধুইয়ে, শাঁখা ভেঙে বাবা অন্য জায়গায় পাচার করে দিয়েছে, বিয়ে মানেনি। কিন্তু তোর বাবা কী করবেন সে সম্পর্কে আমি একেবারেই অন্ধকারে।"
ঝুমকি বলল, "জানি। এ সব কিছুর জন্য আমি দায়ী। তিন দিন পিছিয়ে দেওয়া যেত যদি সময়টা, কী ভালোই না হত বলো?"
আদিত্য হাসল। ফোনটা পকেট থেকে বের করে রিন্টুর রেকর্ডেড কথাগুলো শোনাল। ঝুমকি সবটা মন দিয়ে শুনে বলল, "আমি এখনও ওকে মেলাতে পারছি না।"
আদিত্য বলল, "স্বাভাবিক। দুনিয়ায় যত মানুষের মুখ আর মুখোশ আলাদা, দুনিয়াটা তত জটিল। এই ছেলেটার মুখোশ আর মুখ দুটোই তুই দেখেছিস। কনভার্শন বা একটা ধর্ম চেঞ্জ করলেই কি সব হয়ে গেল? সব কিছু কি এতই সোজা?"
ঝুমকি বলল, "আমার আর ভাল্লাগছে না কিছু। কী করব তুমিই বলো।"
আদিত্য বলল, "এখানে থাক। দেখা যাক কী করা যায়।"

২১

সুশোভন যখন তার অফিসে ঢুকলেন, তখন বিকেল চারটে। আদিত্যর শ্বশুরবাড়িতে দুজন কনস্টেবল মোতায়েন করতে উপরমহল থেকে অনুমতি নিতে হয়েছে।
ডিউটির প্রতিটা দিনই আজকাল ঘটনাবহুল হয়। নিজের মানবিক সত্তাটাও কর্তব্যের খাতিরে হারিয়ে যেতে বসে। মাঝে মাঝে সুশোভনকে আবার সব কিছু নতুন করে ভাবতে হয়। পুলিশের চাকরির মতো ভয়াবহ চাকরি বোধহয় আর কিছু হয় না। হয় সব কিছু মেনে নিতে হবে, নয়তো একেবারে বিদ্রোহী হতে হবে। সব নৌকায় পা দিয়ে পুলিশের চাকরি করার জন্য এলেম থাকা দরকার, যেটা সবার থাকে না।
বেশ কয়েকটা কেস ফাইল টেবিলে এসেছিল ডাক ফাইলে, সুশোভন একটা করে ফাইল ছাড়ছিলেন, এমন সময় তাঁর মোবাইলটা বেজে উঠল।
সুশোভন নম্বরটা চিনতে পারলেন না, তবু ধরলেন, "হ্যালো।"
"আমি ইজাজ মল্লিক বলছি অফিসার। চিনতে পারছেন তো?"
কথাটা ভেসে আসতে একটু থমকে গেলেন সুশোভন। ইজাজ মল্লিক? তাঁকে ফোন করছে? কেন? তিনি খানিকটা সতর্ক গলাতেই বললেন, "পারছি। বলুন।"
"একটা মিসিং ডায়েরি করাতে হবে, বুঝলেন অফিসার। আমার এক ভাইপোর বউ গতকাল রাত থেকে মিসিং হয়েছে। আপনি এই ব্যাপারে কোনওরকম সাহায্য করতে পারবেন?"
সুশোভন অবাক গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই পারব, তবে আপনাকে লোকাল থানায় এফআইআর করতে হবে, আপনি আমাকে ফোন করলেন কেন, বুঝতে পারলাম না তো!"

ইজাজ মল্লিক হেসে নিয়ে বলল, “আসলে ব্যাপারটা আপনিই হ্যান্ডেল করছেন শুনলাম। কাল আমার ভাইয়ের বাড়িতেও গেছিলেন খিদিরপুরে। তো আপনিই যখন দেখছেন, তখন আপনাকে ফোন করাটাই তো সমীচীন হবে, তাই না অফিসার?”
সুশোভন এবার বুঝলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, “বুঝেছি। মেয়েটা মিসিং হয়েছে ধানবাদ থেকে। আপনারা ওখানে এফআইআর করার ব্যবস্থা করুন।”
“ধুস! কী যে বলেন! আমার কথা ধানবাদে কেউ শুনবে নাকি অফিসার? আমি কি ধানবাদের নেতা বলুন তো? আমি তো এখানকার নেতা। যে যেখানকার নেতা, সে তো সেখানেই ব্যবস্থা নেবে নাকি? শুনুন না, আপনি বরং এখান থেকেই ধানবাদে যোগাযোগ করে দেখুন। বাচ্চা মেয়ে, কোথায় হারিয়ে যাবে, কী থেকে কী হয়ে যাবে, কে দায়িত্ব নেবে বলুন তো?”
শেষের কথাগুলো অনেকটা হুমকির মতো শোনাল।
সুশোভন বললেন, “আপনাকে আমি বলেছি স্যার, আপনি ধানবাদ থানায় ডায়েরির ব্যবস্থা করুন। আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। এ ব্যাপারে আপনাকে কোনওরকম সাহায্য করতে পারব না।”
“হা হা হা হা” ওপাশ থেকে জোরে হাসির শব্দ ভেসে এল, “আপনি কাকে কী বলছেন বুঝতে পারছেন তো?”
সুশোভন বললেন, “আমি বাজে কোনও কথা বলেছি বলে মনে তো হয় না।”
ইজাজ বললেন, “মেয়েটার বাড়িতে ভেড়ুয়া পুলিশ বসিয়েছেন কেন? কী ভাবছেন, ওই দুজন সব কিছু সামলে নিতে পারবে? আপনি জানেন ওদের ক্ষমতা? কিংবা ধরুন, ছেলেটা মেয়েটার দুঃখে, অপমানে সুইসাইড করে বসল, তখন কী করবেন বলুন তো? কিছু করার থাকবে? মোমবাতি মিছিলগুলো সব তো আপনার লাশ চাইবে অফিসার। পালিয়ে কোথায় যাবেন তখন?”
সুশোভন বললেন, “দেখুন স্যার, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। এই মুহূর্তে আমি আর কোনও কথা বলতে পারছি না। ধন্যবাদ।”
ইজাজ কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিলেন সুশোভন। ঠান্ডা মাথায় ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। ব্যাপারটা খুব একটা সাধারণ জায়গায় থাকছে না। রাজনৈতিক রং নিচ্ছে। একটা ইস্যু হয়ে যাবে। ব্যাপারটা পুরোটাই বসকে জানানো দরকার। ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমন সময় দেখলেন ফোনটা আবার বেজে উঠল। মানালি, সাংবাদিক। সুশোভন একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ধরলেন, “বলুন।”
“স্যার, একটু কথা বলা যাবে?”
“বলুন।”
“এইমাত্র আমাদের কাছে খবর এল পুলিশ নাকি এক মুসলিম ছেলে এবং এক হিন্দু মেয়ের সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করেছে। মেয়েটি নিখোঁজ, ছেলেটি পাগলের মতো হয়ে গেছে। এবং এই কেসটা আপনিই হ্যান্ডেল করছেন, খবরটা একটু এক্সপ্লেন করবেন প্লিজ?”
সুশোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যা ভয় পেয়েছিলেন, তাই হতে চলেছে।

২২

।।পূর্ব কথা।।

রাধা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল।
মেহজাবিনকে ডেকে আনল এক বাঁদি। মেহজাবিন বাঁদির দিকে তাকিয়ে বলল, “কতক্ষণ হল এরকম করছে?”
বাঁদি বলল, “কাল রাতে বাদশাহ যাবার পর থেকেই।”
মেহজাবিন রাধার বিছানা দেখল। বিছানায় চাপ চাপ রক্ত। সে বাঁদিকে ধমক দিল, “পরিষ্কার করিসনি কেন?”
বাঁদি কাঁচুমাচু মুখে বলল, “দেখিনি।”

মেহজাবিন বাঁদিকে জোরে চড় মারল। বাঁদি চড় খেয়ে তড়িঘড়ি রাধার বিছানা পরিষ্কার করতে শুরু করল। মেহজাবিন রাধাকে জোর করে তুলল। অস্ফুটে বলল, "এ মেয়ে তো আমাদের ভাষা বুঝবে না।"
রাধাকে ইশারায় বোঝাল তার সঙ্গে যেতে। রাধা উত্তর দিল না। মেহজাবিন রাধাকে হারেমের জলাশয়ে নিয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েরা সেখানে হাসাহাসি করতে করতে স্নান করছিল। মেহজাবিনকে সবাই ভয় পায়। দেখা মাত্র চুপ করে গেল। মেহজাবিন রাধাকে যত্ন করে স্নান করিয়ে, গা মুছিয়ে হারেমের একটা ঘরে নিয়ে গেল। এক ষোড়শী মেয়ে শুয়ে ছিল। মেহজাবিন রাধাকে সে মেয়ের পালঙ্কে শুইয়ে দিয়ে বলল, "ওকে দেখিস তো রুকসানা। কাল..." ইশারায় বোঝাল বাদশাহ কী করেছেন রাধাকে।
রুকসানা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে রাধাকে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী? কোথা থেকে এসেছিস?"
রাধা অবুঝ চোখে একবার রুকসানা, একবার মেহজাবিনের দিকে তাকাল।
মেহজাবিন রুকসানাকে বলল, "অন্য মুলুক থেকে এসেছে রে। আমাদের ভাষা বোঝে না।"
রুকসানা কোনও কারণ ছাড়াই হি হি করে হাসল।
মেহজাবিন বলল, "আমি যাই, তুই একে দেখে রাখ। অন্য কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। প্রথম বার তো, এরপরে তো সেই আবার আমাদের মতো হাপিত্যেশ করে বাদশাহের জন্য বসে থাকবে।"
মেহজাবিন হাসল, রুকসানাও। রুকসানা বলল, "আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে আলাপ করি।"
মেহজাবিন বলল, "খাইয়ে দিস পারলে। হুজুরের যদি ওকে পছন্দ হয়ে থাকে তবে আবার আসবেন হয়তো।"
রুকসানা ছদ্ম শ্বাস ফেলে বলল, "অত সৌভাগ্য কি আর সবার হয়?"
মেহজাবিন বলল, "হতেই পারে। যে মেয়ের রহস্য যত বেশি, পুরুষমানুষ তত বেশি তার কাছে আসে। এ মেয়ের ভাষা তো বাদশাহ বোঝেননি, তাই এই মেয়ের আকর্ষণ বেশি হবে।"
রুকসানা বলল, "ঠিকই বলেছ। আমরাও সেরকম অভিনয় করতে পারলে ভালো হত বলো?"
রুকসানা আর মেহজাবিন খিলখিল করে হেসে উঠল।
মেহজাবিন বলল, "দেখিস একে। আমি যাই।"
মেহজাবিন চলে গেল।
রাধার গলায় একটা ঝকঝকে মুক্তোর মালা। রুকসানা সেটায় হাত বুলিয়ে বলল, "মাশাল্লাহ। বাদশাহ দিয়েছেন? আমাকেও দিয়েছিলেন প্রথমবার।"
রাধার তলপেটে ব্যথা করছিল।
গতকালের কথা সে আর মনে করতে চাইছিল না।
রুকসানা ইশারায় রাধার তলপেটের দিকে হাত দিয়ে বোঝাল তারও ব্যথা হয়েছিল প্রথমবারে।
রাধা তাকিয়ে রইল রুকসানার দিকে।
রুকসানা রুপোর পাত্রে জল এনে দিল। রাধার শরীর কাঁপছিল। কোনওমতে খানিকটা জল খেতে পারল।
রুকসানা রাধাকে শুইয়ে দিল আবার। ফিসফিস করে বলল, "তোর মতো আমারও হয়েছিল রে। এভাবেই।"
রাধা রুকসানার ভাষা না বুঝলেও বুঝতে পারল রুকসানা কী বলতে চাইছে।
সে ফুঁপিয়ে উঠল, "মার কাছে যাব।"
রুকসানা রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল পরম মমতায়।
রাধার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।
রুকসানা বলল, "আম্মির কথা মনে পড়ছে? আমার তো গোটা পরিবারকেই মেরে দিয়েছিল বাবর শাহের সেনা। এখানে যখন নিয়ে এসেছিল ওরা, আমিও তোর মতোই ছিলাম। কিছু বুঝতাম না। বাদশাহ হুমায়ুন কত আদর করলেন আমায়। তারপর সে কী ব্যথা! তোর তো আমি আছি। আমার কেউ ছিল না।"
রাধা কাঁদতে লাগল।

রুকসানা উঠে একটা বাক্স নিয়ে এল। বাক্সটা খুলে বেশ কয়েকটা গয়না বের করে রাধাকে দেখিয়ে ইশারায় বলল, "বাদশাহ দিয়েছেন। উনি খুশি হলে আমরা খুশি। বুঝেছিস?"
রাধা উঠে বসল কোনওভাবে।
মেহজাবিন প্রায় দৌড়ে রুকসানার ঘরে ঢুকল, "বাদশাহ স্বয়ং আসছেন এই মেয়েকে দেখার জন্য।"
রুকসানা অবাক হয়ে রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, "মাশাল্লাহ! হুজুরকে কী জাদু করেছিস রে মেয়ে?"
বাদশাহ এলে হারেমে হইহই রব পড়ে যায়। বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের হারেমে প্রবেশ নিষেধ। বাদশাহ হুমায়ুন সরাসরি রুকসানার ঘরে প্রবেশ করলেন। মেহজাবিন আর রুকসানা বাদশাহকে সেলাম করে মাথা নিচু করল। রাধা শুয়ে ছিল।
বাদশাহ এসে রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মেহজাবিনকে বললেন, "ওর কি শরীর খুব খারাপ? হাকিমকে দেখানোর দরকার আছে?"
মেহজাবিন হাসল, "না হুজুর, এ তো সব মেয়েরই হয় প্রথমবারে।"
বাদশাহ রাধার দিকে তাকিয়ে মেহজাবিনকে বললেন, "আমি বৈরাম খাঁকে বলেছি বঙ্গদেশ থেকে কোনও দোভাষীকে নিয়ে আসতে। এ মেয়ে কী বলছে তা জানতে চাই।"
মেহজাবিন আর রুকসানা পরম বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

২৩

দোভাষী খুঁজতে বঙ্গদেশে লোক পাঠাতে হয়নি। পাওয়া গেছে রাজধানীতেই।
সমস্যা হল বাদশাহর হারেমে বাদশাহ ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মেহজাবিন ভেবেছিল বাদশাহ ভুলে যাবেন কথাটা বলে।
বাস্তবে দেখা গেল বাদশাহ ভোলেননি।
উজিরদের সঙ্গে বৈঠকের শেষেই ডেকে পাঠালেন মেহজাবিনকে।
মেহজাবিন বাদশাহকে অভিবাদন করে দাঁড়াল।
বাদশাহ বললেন, "কী ব্যবস্থা হল মেয়েটির?"
মেহজাবিন বলল, "জনাব, একজনকে পাওয়া গেছে। সমস্যা হল সে পুরুষমানুষ।"
বাদশাহ বললেন, "তাতে কী হয়েছে? মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা করার ব্যবস্থা করা হোক। মেয়েটি কী চায় দ্যাখো।"
মেহজাবিন শিউরে উঠে বলল, "সে কী জনাব, অচেনা অজানা একটা লোককে শাহি হারেমে নিয়ে যাব?"
বাদশাহ বললেন, "অচেনা অজানা লোক হারেমে যেতে পারবে না তো কী হয়েছে, মেয়েটিকে তো হারেমের বাইরে আনাই যায়, তাই না? তুমি ব্যবস্থা করো, আমিও থাকতে চাই।"
মেহজাবিন বাদশাহকে সালাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারেমের দিকে যেতে যেতে মনে মনে বলল, "অনেক কপাল করে এসেছিলি মেয়ে, তোর কথা শুনতে চান স্বয়ং বাদশাহ। আমাদের কথা শোনার সময় নেই যাঁর, তোর কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছেন তিনি।"
রাধা রুকসানার খাটে ঘুমিয়ে ছিল। মেহজাবিন সেখানে উপস্থিত হয়ে রুকসানাকে বলল বাদশাহের কথাগুলো।
রুকসানা গালে হাত দিয়ে বলল, "সত্যি কী নসিব করে এসেছে এই মেয়ে। ইস, আমাদের ভাষা কেন বাদশাহের ভাষার থেকে আলাদা হল না?"
মেহজাবিন রাধাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুলল। রাধা চমকে উঠে বসল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।
মেহজাবিন রুকসানাকে বলল, "ওকে বুরখা পরিয়ে নিয়ে চল। আমাদের কথা কিছুই তো বুঝবে না। বেরোতে হবে, এটুকু বুঝিয়ে দে।"

রুকসানা রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে মেহজাবিনকে বলল, "বাদশাহ ওর কথা শুনে কী বলবেন? এই মেয়ের বাড়ি ফেরা ছাড়া আর কোনও চাহিদা থাকতে পারে? আমাদেরও তো বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাড়ির লোক কি কোনও দিনও আমাদের আর ফিরিয়ে নেবে?"

মেহজাবিন উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কোনও অযোগ্য পুরুষের ফাইফরমাশ খাটার থেকে বাদশাহের হারেমের মেয়েছেলে হওয়া অনেক ভালো। অন্তত এ দেশের বাদশাহ তো কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমার শরীর আদরে স্পর্শ করেছেন। তুই ওকে তৈরি কর রুকসানা। এসব বেফুজুল কথা এখন আর বলে লাভ নেই।"

মেহজাবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

#

দুর্গের একটি কক্ষে পর্দা টাঙানো হয়েছে। মেহজাবিন, রাধা এসে বসেছে পর্দার একপাশে। অন্য পাশে অনুবাদককে নিয়ে আসা হয়েছে।

হিন্দু পণ্ডিত। মেহজাবিন পণ্ডিতকে বলল, "মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করুন ও কী চায়।"

পণ্ডিত গলা তুলল, "কী চান আপনি?"

রাধা অনেক দিন পরে নিজের ভাষা শুনে কেঁদে ফেলল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "আমি মার কাছে যাব।"

পণ্ডিত মেহজাবিনকে বলল। মেহজাবিন হেসে বলল, "আমিও এরকমই কিছু একটা ভেবেছিলাম। এই কথা শোনার জন্য আপনাকে না আনলেই হত।"

পণ্ডিত বলল, "আমি কি তবে এবার যেতে পারি?"

মেহজাবিন বলল, "না। স্বয়ং বাদশাহ আসবেন। আপনি প্রতীক্ষা করুন।"

পণ্ডিত চমকে উঠল।

মেহজাবিন বলল, "আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন ওর বাড়ি কোথায় ছিল?"

পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল।

রাধা বলল, "জানি না। আমার বাবা গ্রামের মন্দিরের পূজারী ছিলেন।"

পণ্ডিত এবার ঈষৎ চমকে উঠে রাধাকে বলল, "তুমি ব্রাহ্মণকন্যা?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ। আমাকে এক সেনা বলপূর্বক নিয়ে এসেছিল..." বাকি সব কথা রাধা পণ্ডিতকে বর্ণনা করে গেল।

পণ্ডিত বলল, "অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে তোমার সঙ্গে। কিন্তু আমরা চাইলেই তো কিছু করতে পারব না মা। এ দেশ এখন এরাই চালাচ্ছে। আমাদের কোনও কথাই এরা শুনতে চাইবে না।"

মেহজাবিন অধৈর্য হয়ে বলল, "কী কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে?"

পণ্ডিত চমকে উঠে বলল, "সেরকম কিছুই না। মেয়েটির বাড়ি কোথায় জানার চেষ্টা করছিলাম।"

মেহজাবিন বলল, "এত কথা বলার অনুমতি তো আপনাকে দেওয়া হয়নি। যেটুকু জানার সেটুকু জানুন। সবথেকে ভালো কথা, আপনি এখন এক্কেবারে চুপ করে থাকুন। সম্রাট আসুন, তারপর যা কথা বলার উনিই বলবেন।"

পণ্ডিত আতঙ্কিত হয়ে বলল, "যা বলবেন।"

মেহজাবিন আর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাদশাহের আগমনধ্বনি শোনা গেল।

২৪

বিকেল হয়েছে।

আদিত্য দুপুরে ঘুমাবার চেষ্টা করছিল। ঘুম এল না। ড্রয়িং রুমে ঝুমকি টিভি দেখছিল।

আদিত্য এসে বসল। ঝুমকি সোফায় আধশোয়া হয়ে হিন্দি সিনেমা দেখছিল।

আদিত্যকে দেখে বলল, "তুমি কিছু দেখবে?"

আদিত্য বলল, "না, তুই দেখ না। আমার ঘুম এল না। মাথায় একগাদা চিন্তা আসছে শুধু।"
ঝুমকি বলল, "খুব সমস্যা করে দিলাম বলো?"
আদিত্য বলল, "সমস্যা না ঠিক। দেখ আমার তো অফিস আছে। এখানে তোকে কদিন গার্ড দেব? আর তোর দিদির বুদ্ধিশুদ্ধি কোনও কালে হবে না। আমি যখন আসতে বলছি, নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। সেটা বুঝবে না।"
ঝুমকি নখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও কী করবে বলো। আমার জন্য বাড়িতে এত বড়ো একটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেল।"
আদিত্য বলল, "হুঁ। সে তো বুঝতেই পারছি। তবে ব্যাপারটাকে সমস্যা না ভেবে আমাদের এবার সলিউশনের দিকে যাওয়া উচিত। সমস্যা জিইয়ে রেখে কোনও পক্ষেরই কোনও লাভ হবে না।"
ঝুমকি বলল, "ও খুব ডেসপারেট, না?"
আদিত্য বলল, "হ্যাঁ। তোকে ভালোবাসে কি না বুঝতে পারছি না।"
ঝুমকি ম্লান হেসে বলল, "ধুস, ভালোবাসা না। গোটাটাই ইগো। কনভার্ট করতে চেয়েছিল, পারেনি। ব্যস। এর মানেই হল এবার ও মরিয়া হয়ে আমার ক্ষতি করতে চাইছে।"
আদিত্য রিমোটটা হাতে নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করে খবরের চ্যানেল দিল। ব্রেকিং নিউজে দেখাচ্ছে রাজ্যে আবার ভিন ধর্মে বিয়ে করায় যুবতিকে নিখোঁজ করল যুবতির পরিবার। টিভিতে ঝুমকির মুখ দেখাচ্ছে।
আদিত্য আর ঝুমকি পরস্পর চমকে দুজনের মুখ দেখল। আদিত্য বলল, "প্রেস হয়ে গেল? এভাবে একপেশে খবর দেখাচ্ছে কেন?"
ঝুমকি অধৈর্য হয়ে বলল, "জানি না। কিন্তু দ্যাখো, এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন আমার বাড়ির লোকই অপরাধী। ঘটনাটা তো পুরো উলটো আসলে!"
আদিত্য বলল, "এরকমই তো হয়। মিডিয়ার কাজই হল সোজা জিনিসকে বাঁকাভাবে ঘুরপথে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। তুই এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না তো। ভুলে যা।"
ঝুমকি বলল, "কেন ভাবব না? আমার মুখ দেখিয়ে দিল কেন? এ আবার কী ধরনের অসভ্যতা?"
আদিত্য বলল, "খবরটাই তো এমনভাবে প্রেজেন্ট করছে ওরা। দাঁড়া, সুশোভনকে ফোন করি।"
আদিত্য ফোন নিয়ে সুশোভনকে ফোন করল।
সুশোভন ফোন ধরে বললেন, "কি রে, কখন ট্রিট দিবি জানাতে ফোন করলি?"
আদিত্য অবাক হয়ে বলল, "মানে?"
সুশোভন বললেন, "এই যে তোদের সবাইকে বারবার টিভিতে দেখাচ্ছে। সবই তো আমার দৌলতে!"
আদিত্য বলল, "ছাড় তো। আসল কথা বল। আমরা এবার কী করব?"
সুশোভন বললেন, "কী করব সেটা বলাই তো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। উপরমহল থেকে ফোন আসা শুরু হয়েছে। তোরা নাকি আমার সহায়তায় ঝুমকিকে লুকিয়ে রেখেছিস। মারাত্মক ব্যাপার হয়ে গেছে। একদিকের কমিউনিটি থেকে হুমকি ফোন আসা শুরু হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের মোমবাতি মিছিল এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।"
আদিত্য বলল, "মোমবাতি মিছিলকে গুলি মারি। জামান সাহেবের সঙ্গে কথা হল?"
সুশোভন বললেন, "আমি এখনও কারও সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করিনি। কেসটা অনেক উপরের লেভেলে চলে গেছে। ন্যাশনাল মিডিয়া কভারেজ শুরু করে দিয়েছে। ঝুমকি কেন পালিয়েছে সেটা বলার থেকে এদের ঝুমকির উপর করা বাপের বাড়ির অত্যাচার নিয়ে আগ্রহ বেশি। তোর শ্বশুরবাড়িতে ঝুমকির খবরটা দিলি?"
আদিত্য বলল, "দেব কীভাবে? ওর বাবা ভীষণ রিজিড লোক। ওর মা, ওর বাবাকে ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমার বউয়ের তো কিছু বোঝার বুদ্ধিই নেই। আমি খবরটা দিলে উলটে তুলকালাম লেগে যাবে। এই

নিয়ে এখন যত কম চর্চা করা যায় তত ভালো। ঝুমকির সেফ থাকাটা অনেক বেশি জরুরি এখন।"
সুশোভন বলল, "তুই চিন্তা করিস না। তোর বাড়ির সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ থাকবে, আমি ব্যবস্থা করেছি।"
আদিত্য বলল, "কেউ বুঝবে না তো ওরা পুলিশ? জানলেই তো বিপদ।"
সুশোভন বলল, "কোনও বিপদ না। এ তো আর যন্তর মন্তর ঘর না যে আমরা কিছু বুঝতে পারব না? আমরা নজর রাখব। তোদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখব। চিন্তার কোনও কারণ নেই।"
আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। রাখি এখন।"
ফোনটা রাখল আদিত্য। সোফায় ঝুমকি শুয়েছিল।
নিজেকে অসহ্য লজ্জায় রেখে আদিত্যর হঠাৎ করে ঝুমকির প্রতি প্রবল যৌন আকর্ষণ হল। পরক্ষণেই জিভ কাটল সে।
চরিত্র জিনিসটাই সুতোয় হাঁটার মতো।
একটু পিচ্ছিল রাস্তা হলেই সব গেল।

২৫

মেহজাবিন রাধাকে সাজিয়ে দিচ্ছিল।
বাদশাহ হারেমে আসবেন খানিকক্ষণ পরে। রাধা কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে ছিল।
মেহজাবিন নিজের মনে বকবক করে যাচ্ছিল, "এক মেয়ের জন্য বাদশাহ যা শুরু করেছেন, সেটা কি তাঁকে মানায়? হারেমের মেয়ে তো। বিবি বানাতে কী হয়েছিল? তা করবেন না। ওদিকে হাজার খোঁজখবর নিয়ে যাবেন। যত্তসব।"
রুকসানা এসে রাধাকে কয়েক সেকেন্ড মুগ্ধ চোখে দেখে মেহজাবিনকে বলল, "মেয়ে কিন্তু বহুত খুবসুরত, যাই বলো বিবি।"
মেহজাবিন খিঁচিয়ে উঠল, "খুবসুরত? শাহি হারেমে যেন আর খুবসুরত আওরত নেই? কাবুলের শাহ যাকে পাঠিয়েছেন, সে এই মেয়ের থেকে হাজার গুণে সুন্দর।"
রুকসানা রাধার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রাধাকে চমকে দিয়ে রাধার একটা স্তনে হাত দিয়ে বলল, "তা বললে হবে? এ মেয়ের যেন সব কিছু সুন্দর। সাধে বাদশাহ হারেমে এসে শুধু এর ঘরেই যাবেন?"
রাধা রুকসানার হাত সরিয়ে দিল।
মেহজাবিন বিরক্ত গলায় রুকসানাকে বকল, "কী শুরু করলি? হাতে সময় কম আর তোর বেত্তমিজি শুরু। বেশি ইচ্ছা করলে রাবেয়ার কাছে গিয়ে শো।"
রুকসানা ফিচেল হাসি হেসে বলল, "রাবেয়ার কাছে তুমি যাও। আমি তো এই মেয়ের কাছেই থাকব। চোখ দেখেছ? এই মেয়েকে নাচ শেখাও বিবি, বাদশাহ আরও খুশি হবেন।"
মেহজাবিন বলল, "হ্যাঁ রে, সব দায় তো আমার, আমি সাজিয়ে দেব। নাচ শিখিয়ে দেব। সাজিয়ে দেব, সব আমিই করি।"
রুকসানা ফলের রেকাবি থেকে একটা আঙুর তুলল। রাধার পেটে বুলিয়ে মুখে দিয়ে বলল, "তা শেখাবে। তুমিই তো নিয়ে এসেছিলে একে। তোমার তো একটা দায়িত্ব আছে বিবিজান। তা সে ছেলের খবর কী, যে এ মেয়েকে বিয়ে করবে বলে নিয়ে এসেছিল?"
মেহজাবিন বলল, "গোঁসা করে চলে গেছে। তার মা তো রোজ কাঁদে, বলে ভুল হয়ে গেল রে মেহজাবিন। আমার ছেলেটা রাগ করে চলে গেল।"
রুকসানা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "তা রাগবেই তো। এ মেয়ে যার হাতছাড়া হয় সে রাগবে না?"
মেহজাবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ও কথা বলে লাভ নেই। বাদশাহের কাছে এসে পড়েছে, বাদশাহই এখন এ মেয়ের সুখ দুঃখের সব কিছু ঠিক করে দেবেন।"

রুকসানা মুখ বাঁকাল, "আর পরের হপ্তায় নতুন মেয়ে এলে আমাদের মতো একেও দূর করে দেবেন। আশায় আশায় বসে থাকতে হবে কখন আসবেন হুজুর।"
মেহজাবিন বলল, "তোর ঘরে আসেন না, এমন কথা বলিস না। বাদশাহ তোকে যথেষ্ট পছন্দ করেন।"
রুকসানা মাথা নাড়ল, "করেন। অস্বীকার করব না। কিন্তু প্রথম যখন এসেছিলাম, তখন যা করতেন, এখন কি তাই করেন?"
মেহজাবিন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় এক মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল।
মেহজাবিন বলল, "কী হয়েছে?"
মেয়েটা উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
মেহজাবিন রুকসানার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই এর চুলে ধূপটা দে, আমি আসছি।"
রুকসানা অবাক হয়ে বলল, "কে গো বিবিজান ও? হারেমে আগে দেখিনি তো।"
মেহজাবিন বলল, "আমি দেখেছি। তুই ওকে দেখ।"
মেহজাবিন পালঙ্ক থেকে নেমে বেরোল। রুকসানা সন্দেহের চোখে সেদিকে তাকিয়ে রাধার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "আহা, কী সুন্দর গোছ। ওহ, তুই তো আমার ভাষা বুঝবি না। তোর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। বিবিজানকে বলতে হবে বাদশাহকে বলে তোর পুস্তু শেখার ব্যবস্থা করতে।"
রাধা কথা বলল না কোনও। একইরকম ভাবে বসে রইল।
মেহজাবিন ঘরটা থেকে বেরিয়ে চুপচাপ হাঁটতে থাকল। মেয়েটা মেহজাবিনের পিছু ছাড়ল না। নিজের ঘরে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে মেহজাবিন সতর্ক চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইজান?"
মেয়েটা মাথা উপর নিচ করল।
মেহজাবিন হাত পেতে বলল, "দে।"
মেয়েটা একটা ছোট্ট বাক্স মেহজাবিনের হাতে দিল।
মেহজাবিন ত্রস্ত হাতে বাক্সটা নিয়ে দরজা খুলে দিল।
মেয়েটা চারদিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।
মেহজাবিন দরজা বন্ধ করে বাক্সটা খুলল।
কামরান মির্জা পত্র পাঠিয়েছেন।

২৬

বিকেল হতেই বৃষ্টি নেমেছে। জানলাগুলো বন্ধ করতে হল।
ঝুমকি ড্রয়িং রুমের সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।
ব্যালকনিতে চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট খাচ্ছিল আদিত্য। বাড়ির সামনেটা বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে।
অনেক দিন পরের বৃষ্টি। শহরের উত্তাপ বেড়ে যাচ্ছিল। সংবাদপত্র আর চ্যানেলগুলো বৃষ্টি কবে আসবে, বৃষ্টি কবে আসবে বলে হেদিয়ে মরছিল। বৃষ্টি এসে সবাইকেই স্বস্তি দিল বলা বাহুল্য। ফোন বাজছিল। আদিত্য দেখল বাবা ফোন করছেন।
ধরল সে, "হ্যাঁ বলো।"
"কি রে বিল্টু, ওদিকে খবর কী রে?" বাবার উৎকণ্ঠিত গলা ভেসে এল।
আদিত্য অবাক হল, "কী খবর বলো তো?"
বাবা বললেন, "আরে ঝুমকিকে মনে হল টিভিতে দেখলাম। কী হচ্ছে এসব?"
আদিত্য মাথায় হাত দিল। সর্বশক্তিমান গণমাধ্যমের যুগে কোনও কিছুই আজকাল আর ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয়। আলোর গতিতে সবার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সব খবর।
সে বলল, "হুঁ, দেখেছি। ওটা ঝুমকিই।"

"কী সর্বনাশ! এসব কী ঘটছে? জানাসনি কেন?"
আদিত্য বলল, "আমি নিজেই ঠিক করে জানি না বাবা। খোঁজ নিয়ে জানাব।"
"বেয়াইমশাইকে ফোন করব নাকি?"
আঁতকে উঠল আদিত্য, "না না, সেসবের কোনও প্রয়োজন নেই। ফোন করতে যেয়ো না আবার। ওঁরা এমনিতেই প্রচুর চিন্তায় আছেন। তোমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে কোরো, আমি খোঁজ নিয়ে রাখবখন।"
আদিত্যর বাবা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ জানাস। কী যে হচ্ছে কিছুই বলার নেই। তুই অফিসে?"
আদিত্য মিথ্যা করে বলল, "হ্যাঁ, অফিসে আছি। তোমায় পরে ফোন করছি বাবা।"
"হ্যাঁ হ্যাঁ। রাখ এখন। কাজ কর।"
বাবা ব্যস্ত হয়ে ফোন কেটে দিলেন। আদিত্য ফোন রেখে বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকাল। আজকাল দায়িত্বজ্ঞানহীনতার আর-এক নাম মিডিয়া। খবর সম্পূর্ণভাবে না জেনে, নিজেদের মতো করে পরিবেশন করা এক জিনিস, সবথেকে বাজে ব্যাপার হল এরা এভাবে ঝুমকির মুখ দেখিয়ে দিল কী হিসেবে? একদিকের খবর পেয়ে অর্ধসত্য খবর পরিবেশন করাটা যে অপরাধ, সে বোধটুকু এদের নেই।

"চা খাবে?"
ঝুমকি কখন চলে এসেছে দেখেনি আদিত্য। বলল, "হ্যাঁ। কর। বাইরের দিকে আসিস না। আবার কে দেখে নেবে। তুই এখন ফেমাস হয়ে গেছিস।"
ঝুমকি বলল, "হুঁ। চা করছি।"
ভেতরের ঘরে গেল ঝুমকি। সিগারেটটা ফেলে আদিত্য নিচের রাস্তাটা দেখে নিল। বৃষ্টিপাতের ফলে শুনশান রাস্তা। সন্দেহজনক কাউকে দেখা গেল না। রিন্টুদের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী বোঝাই যাচ্ছে। এরা শুধুমাত্র মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হয় না। তারপরের সমস্ত ফলাফলগুলো নিয়েও যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেই এগোয়, সেটা রিন্টুর ফোন থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।
কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আদিত্য রুমকিকে ফোন করল। রুমকি ধরল। বলল, "বলো।"
আদিত্য বলল, "বাড়িতে বাবা মাকে টিভি দেখিয়ো না। সমস্যা হতে পারে।"
রুমকি ধরা গলায় বলল, "টিভির পরোয়া করে যেন সব। গোটা পাড়ার লোক ভেঙে আসছে আমাদের বাড়িতে মজা দেখতে। টিভির খবর নিয়ে সেখানে রসালো আলোচনা হচ্ছে। বাড়ির বাইরে প্রেসের দুটো ভ্যান এসে দাঁড়িয়ে। বাবা একসময় রেগেমেগে বাইরে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে আটকে রেখে দিতে পেরেছি। জানি না পারব নাকি।"
আদিত্য বলল, "প্রেসের কারও সঙ্গে কোনওরকম কথা বলার দরকার নেই। ওদের চাই ব্রেকিং নিউজ। কাউকে একটা ভিলেন খাড়া করে দিতে পারলেই হল। এই মুহূর্তে তোমাদের বাড়ি ভিলেন। মিডিয়ার ধারণা ঝুমকিকে তোমরাই লুকিয়ে রেখেছ।"
রুমকি কেঁদে ফেলল। আদিত্য বিরক্ত গলায় বলল, "সব কথায় যদি এভাবে কেঁদে ফ্যালো তাহলে তো কথা বলাই দায় হয়ে যায়।"
রুমকি কাঁদতে কাঁদতেই ঝাঁঝালো গলায় বলল, "তোমার আর কী! তোমার বোন তো পালায়নি! পালিয়েছে আমার বোন। আমরাই বুঝছি বাড়িতে কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। নিজে তো দিব্যি ঠিক সময়ে কেটে পড়লে।"
আদিত্য বলল, "শোনো, এই সময় যদি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও, তো করতেই পারো। তবে আমার মনে হয় না, এটা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার খুব একটা ভালো সময়। কী করবে, তোমাদের বাড়িতে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা বলো।"

রুমকি বলল, “সিদ্ধান্তের কিছুই নেই। বাবা তো বলেই দিয়েছে ঝুমকি বাবার কাছে মরে গেছে। কোনওভাবেই বাকি জীবনটা বাবা আর ঝুমকিকে মেনে নিতে পারবে না।”

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “ঠিক আছে।”
রুমকি বলল, “তোমার বন্ধুকে বলো পুলিশ দিয়ে মিডিয়া তাড়াতে।”
আদিত্য বলল, “সেটা বলা সম্ভব না। মিডিয়াকে পুলিশও ভয় পায়।”
রুমকি বলল, “সবকটা চ্যানেলে আমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে বলছে যেন আমার বাবা বাঘ বা ভাল্লুক! পালানোর আগে আমরা জানতামও না ঝুমকি কার সঙ্গে পালিয়েছে, সে হিন্দু না মুসলিম। এখন কী হিসেবে বাবাকে ভিলেন করা হচ্ছে বলো তো?”
আদিত্য বলল, “দ্যাখো, মিডিয়া মানেই তাই। তিলকে তাল করা। এই মুহূর্তে টিভি না দেখে নিজেদের মধ্যে সময় কাটাও বরং।”
রুমকি ভেঙে পড়া গলায় বলল, “জানি না কী করব।”
আদিত্য উত্তর দিল না। চুপ করে থাকল।

২৭

সুশোভনের উপরওয়ালা মিত্রসাহেব গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। সুশোভনও কোনও কথা বলছিলেন না।
চুপ করে বসে ছিলেন।
খানিকক্ষণ পরে নীরবতা ভঙ্গ করে মিত্র বললেন, “ব্যাপারটা ছড়াচ্ছে সুশোভন। উপর থেকে ফোন এসে গেছে।”
সুশোভন বললেন, “কতটা উপর?”
মিত্র বললেন, “মাঝারি উপর। আরও উপরের ফোন যে-কোনো সময় আসতেই পারে। সেনসিটিভ কেস যখন।”
সুশোভন মিত্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, “জামান সাহেব কেসটা পুরোটা জানেন স্যার।”
মিত্র বললেন, “জানি তো, সে তো আমিও জানি। সমস্যা সেখানে হবে না। সমস্যা বাধাবে মিডিয়া। ওদের কাজটাই তো তাই। তোমার বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে সিকিউরিটি দেওয়া নিয়েও ইস্যু তৈরি করে দিয়েছে।”
সুশোভন বললেন, “স্যার, প্রথমত ওঁরা কোনওরকম ইনফ্লুয়েনশিয়াল মানুষ নন, দ্বিতীয়ত, ওঁদের বাড়িতে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আমি আপনাকে জানিয়েই ব্যাপারটা করেছিলাম।”
মিত্র চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে বললেন, “মানবিকতার খাতিরে স্টেপটা নিতেই হত। কিন্তু সমস্যা হল, এক্ষেত্রে যখনই পলিটিক্যাল লোকজন ইনভলভ হবে, ব্যাপারটা একটু একটু করে উপরে যেতে যেতে একবারে উপরে চলে যাবে, তখন ঠিক কী হবে, সেটা নিয়েই আমার চিন্তা হচ্ছে। ওদের পাড়ার লোকেরা কী বলছে?”
সুশোভন বললেন, “ওদের ফরে আছে স্যার। কিন্তু যদি এই পার্টি, লরি ইত্যাদিতে আর্মস সহ লোক নিয়ে গিয়ে হামলা করে, তখন কী হবে, সেটা তো বলা যাচ্ছে না। শান্তিপ্রিয় লোকজন, অত দূর যে ব্যাপারটা গড়াতে পারে, সেসবের প্রিপারেশন ও পাড়ার লোকের থাকবে না।”
মিত্র খানিকটা চমকে গিয়ে বললেন, “করতেই পারে। ঝামেলা না করার কিছু নেই। এসব ব্যাপার অত্যন্ত সেনসিটিভ। শোনো সুশোভন, ওই এলাকার এক কিলোমিটার রেডিয়াসে টহলদারি বাড়িয়ে দাও। আমি ব্যাপারটা নিয়ে বেশ টেনশনে পড়লাম। কে জানে, কাল হয়তো এর জন্যই আমার মুন্ডু চাই বলে মিছিল বেরিয়ে গেল। সমস্যা হল, আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া, মিডিয়া ইত্যাদিতে কোনওরকম যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই মব জাস্টিস হয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজেরাই ঠিক করে নিচ্ছে কে ঠিক, আর কে ভুল। তিন-চারটে চ্যানেল

থেকে ক্রমাগত আমাকে ফোন করে যাচ্ছে, আমি রেগেমেগে ফোন অফ করে দিয়েছি। তোমায় কেউ ফোন করেছিল?"
সুশোভন বললেন, "হ্যাঁ, মানালি করেছিলেন।"
মিত্র পেপারওয়েট হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে দেওয়া যাবে না। মেয়েটি, মানে তোমার বন্ধুর শালি, সেফ আছে তো?"
সুশোভন বললেন, "হ্যাঁ স্যার।"
মিত্র বললেন, "এই মুহূর্তে মেয়েটাকে জাস্টিস দেওয়া সম্ভব না হয়তো। কিন্তু সেফটি দেওয়াই যায়। তোমার বন্ধু, কী নাম বললে যেন...?"
সুশোভন বললেন, "আদিত্য, স্যার।"
মিত্র বললেন, "রাইট, আদিত্য। আদিত্যর সঙ্গে কন্টিনিউয়াস কন্ট্যাক্ট রেখে চলো। আর আমাকে আপডেট দিয়ে যেয়ো। যে-কোনো সময় উনি ফোন করতে পারেন, বুঝতেই পারছ।"
সুশোভন উঠলেন, "রাইট স্যার।"
মিত্র গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।
মিত্রসাহেবের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সুশোভন নিজের টেবিলে এসে বসলেন।
শহরে সন্ধে নেমেছে। যদিও কর্মব্যস্ততা বিন্দুমাত্র কমেনি তাঁর অফিসে।
মাথা ধরেছিল। সুশোভন চা আনালেন। বেশ সময় নিয়ে চা শেষ করছিলেন, দেখলেন আদিত্য ফোন করছে। ধরলেন তিনি, "বল। খানিক আগেই তো কথা হল। আবার কিছু হল নাকি?"
আদিত্য থমথমে গলায় বলল, "ফেসবুকে ঝুমকির ছবি দিয়ে একটা পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। ওর বাড়ির লোক ভিনধর্মে বিয়ে মানেনি বলে ঝুমকিকে লুকিয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা তো পুরো উলটো ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে। আমরা কি কিছুই করতে পারি না?"
সুশোভন একটু চুপ করে বলল, "বসের সঙ্গে এই সোশ্যাল মিডিয়া নিয়েই কথা হচ্ছিল। এই ব্যাপারটা যখন ওরা ওদের মতো করে ভাইরাল করছে, তখন ঝুমকিকে দিয়েও একটা পোস্ট করানো যেতে পারে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে। সমস্যা হল, এর ফলে তোর শ্বশুরবাড়িতে হামলাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে। আমার মতে এই মুহূর্তে, কোনওরকম ইম্পালসিভ ডিসিশন নিস না। ধরে খেল। পাবলিক নিয়ে ভাবিস না, আজ এই কেসটা নিয়ে মাতবে, কাল ফুটবল বা ক্রিকেট নিয়ে লাফাতে শুরু করবে, এই কেসের দিকে ফিরেও তাকাবে না। আপাতত তোর শ্বশুরবাড়ির লোকজন আর তোর বাড়ি, এই দুটো ঠিকঠাক আমাদের নজরে থাকুক। বাকিটা নিয়ে ভাবিস না বেশি।"
আদিত্য বলল, "বেশ। আমার হয়েছে জ্বালা। বউ এখানে থাকলে সমস্যা হত না। সে গিয়ে বসে আছে বাপের বাড়ি। কী যে করি!"
সুশোভন খুক খুক করে হাসতে হাসতে বললেন, "দেখ কেমন লাগে। খুব তো বলতি চিরকুমার থাকবি। কেন বিয়ে করতে গেলি। এবার কেস খা।"
আদিত্য রেগে গেল, "ইয়ার্কি মারিস না। পারলে বাড়ি ফেরার সময় এ বাড়ি হয়ে যাস।"
সুশোভন বললেন, "ঠিক আছে। আমি ঠিক যাব। চাপ নিস না। নিশ্চিন্তে থাক।

২৮

বৃষ্টি থামেনি। ঝুমকি চা নিয়ে এসেছে।
আদিত্য অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল। ঝুমকি কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, "এ নাও। দিদি কী বলছে?"
আদিত্য চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, "তুই এই মালটাকে জোটালি কী করে বল তো?"
ঝুমকির মুখটা নিমেষে কালো হয়ে গেল।
বলল, "আগে তো বলেছি। আর বলতে ভাল্লাগছে না বিশ্বাস করো।"

আদিত্য একটু ইতস্তত করে বলল, "তুই কনসিভ করিসনি তো? সেক্ষেত্রে তো আর-এক প্রবলেম হবে।"
ঝুমকি ফ্যাকাশে মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা কী করে বোঝে?"
আদিত্য কড়া চোখে কয়েক সেকেন্ড ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "ধরে নিলাম ছেলেটা তোর সাথে ভালোভাবেই বিহেভ করত। তারপরেও তুই কোনও দিন এসব সম্পর্কে ভাবিসনি?"
ঝুমকি বলল, "ব্যাপারগুলো এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিল, আমি ভাবিওনি কোনও দিন। তা ছাড়া রিন্টু বরাবরই নরম স্বভাবের। কোনও দিন গায়ে হাতও দিত না সেভাবে..."
চুপ করে গেল ঝুমকি।
আদিত্য বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, "তোকে এখানে রেখে দিলে ব্যাপারটা থিতিয়ে যাবে হয়তো, কিন্তু তুই যদি কনসিভ করে থাকিস, সেক্ষেত্রে আর-এক ক্যাচাল দেখা দেবে। তুই রেপ চার্জ আনতে পারিস, সেক্ষেত্রে অনেক হ্যাপা পোহাতে হবে। তোদের কনজারভেটিভ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে সেটা করতে পারবি? জীবনে আর বিয়েও না হতে পারে।"
ঝুমকি বলল, "কনজারভেটিভ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে নিউজ চ্যানেল তো খবরটা দেখিয়েই দিল। পাড়ার সবাই চেনে আমাকে। চেনাজানা সবাই জেনে গেছে। আর কী হবে? কিন্তু যদি জানোয়ারটা শাস্তি পায়, তার থেকে ভালো আর কিছু হয় না।"
আদিত্য চায়ের কাপে চুমুক দিল, "শুনতে ভালো লাগবে, দোষী শাস্তি পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক কতটা পথ পেরিয়ে একজন ধর্ষক শাস্তি পায়, সে সম্পর্কে তো সবাই জানে। নতুন করে বলার কিছু নেই। দেখ, এই মুহূর্তে দুটো রাস্তা খোলা আছে।"
ঝুমকি আদিত্যর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।
আদিত্য বলল, "এক, যেটা জামান সাহেব বললেন। অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিচিউড নেওয়া। তোকে প্রকাশ্যে এসে প্রেস কনফারেন্স করে এফআইআর দায়ের করা। সেক্ষেত্রে তোর লাইফ থ্রেট আসতে পারে, তোকে দুশ্চরিত্রা বলে দাগিয়ে দেওয়া হতে পারে, আরও অনেক কিছুই হতে পারে।
দুই, একেবারে লুকিয়ে থাকা। বাড়ির লোকদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে চেন্নাই বা গুজরাটে তোদের যারা আত্মীয়স্বজন আছে তাদের বাড়ি গিয়ে ওদিকে কোনও প্রবাসী বাঙালি ছেলেকে সব লুকিয়ে বিয়ে করা। এবার তুই ঠিক কর কী করবি।"
ঝুমকি মাথা নিচু করে বলল, "আমি একটা বোঝা হয়ে গেছি সবার কাছে, তাই না?"
আদিত্য বলল, "তুই বাচ্চা মেয়ে, বোঝা হয়েছিস নাকি সেটা আমি বলার কেউ না, কিন্তু একটা কথা তুইও বুঝিস, এখন সময়টা মোটেও ভালো না আমাদের জন্য। তোর বাবা রক্ষণশীল লোক। ওদিকে ছেলেটার বাড়ির লোক মোটেও সুবিধের না। সব সামলে চলা খুব কঠিন, খুব।"
ঝুমকি গোঁজ হয়ে থেকে বলল, "ও যদি আগে আমাকে বলত ও মুসলিম, তাহলে আমি ভেবে দেখতাম।"
আদিত্য বলল, "সেটা কোনও কথা না। হিন্দু মুসলিম বা অন্য যে-কোনো ধর্মে ভালোবাসা হতেই পারে। সমস্যাটা হল ইচ্ছা করে সেটা লুকিয়ে রাখায়। এভাবে লুকিয়ে রাখার অর্থ হল কোনও দুরভিসন্ধি ছিল। সে যে কী ছিল, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। যাই হোক, যদি কনসিভ করিস, কী করবি?"
ঝুমকি বলল, "ওর বাচ্চা আমি নেব না। মরে গেলেও নেব না। তোমার প্রেসে কেউ চেনা আছে?"
আদিত্য বলল, "না। সুশোভনের থাকতে পারে। কেন?"
ঝুমকি বলল, "আমি ব্যাপারটা নিয়ে লড়তে চাই। আমি যদি পিছিয়ে যাই, তাহলে নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারব না। তাতে যদি মরি তো মরব। এমনিতেই তো জীবনে যা হবার হয়েই গেল। এর থেকে মরে যাওয়াই তো ভালো।"
আদিত্য ঝুমকির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "আজ রাতটা ভাব। কাল সকালে বলবি আমায়। তোর বাড়ির লোকের, আমাদের, সবার নিরাপত্তা জড়িয়ে আছে।"

ঝুমকি চুপ করে মেঝেতে বসে পড়ল।

#
রাত তিনটে। আদিত্য ঘুমাচ্ছিল।
দরজা নকের শব্দে উঠে বসল।
দরজা খুলে দেখল ঝুমকি দাঁড়িয়ে আছে।
আদিত্য বলল, "কী হল?"
ঝুমকি বলল, "আমি ভেবে নিয়েছি। তোমার ফোনটা দেবে? যা যা হয়েছে, সেটা ফেসবুকে লিখব। কোথায় আছি সেটা বলব না। তাহলে তো আর কারও নিরাপত্তায় কোনও সমস্যা দেখা দেবে না?"
আদিত্য ঘুমচোখে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "কাল সকালে করিস।"
ঝুমকি বলল, "না, এখনই দাও। এখনই করব।"
আদিত্য কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দরজা ছেড়ে বলল, "টেবিলের ওপর আছে ফোনটা। পোস্ট করার আগে আমাকে দেখাবি।"

২৯

কাজ মিটিয়ে সুশোভনের পুলিশ কোয়ার্টারসে ফিরতে দেরি হয়ে গেছিল। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দেড়টা।

ভোর সাড়ে চারটের দিকে ফোনের রিঙের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এরকম অভ্যাস আছে তাঁর। প্রায়শই এভাবে ঘুম ভেঙে যায়। অভ্যস্ত হাতে নম্বর না দেখেই ফোনটা কানে দিলেন তিনি, "হ্যালো।"
"কাজটা ভালো হল কি স্যার?"
গলাটা বুঝতে পারলেন না সুশোভন। অবাক গলায় বললেন, "কে বলছেন?"
"এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে হবে সাহেব? আমি ইজাজ মল্লিক বলছি। কাজটা কিন্তু আপনারা ভালো করলেন না। এর ফল ভালো হবে না।"
সুশোভন বললেন, "কোন কাজ? আমি কিছু জানি না।"
ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল, "যা বলেছেন। নেতা আর পুলিশের কাজই হল কিছু না জানা। যাই হোক, মেয়েটিকে দিয়ে ফেসবুকে বয়ান দেওয়ানো হয়েছে। ওকে নাকি রেপ আর জোর করে কনভার্ট করার চেষ্টা করানো হয়েছে। এই মিথ্যার উত্তর পাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আপনাদের। চাকা জ্যাম করে দিলে সামলাতে পারবেন তো?"
সুশোভনের ঘুমটা ভেঙে গেল এবার পুরোপুরি। কড়া গলায় বললেন, "প্রথমত, মেয়েটি আমার কাস্টডিতে নেই। দ্বিতীয়ত, মেয়েটি যদি তার সঙ্গে যা ঘটেছে তার রিটেন কমপ্লেইন করে, তার ফলাফল যারা দোষী তাদের ভুগতেই হবে। আমি এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা বলতে রাজি নই।"
ইজাজ মল্লিক বলল, "তা তো জানি অফিসার, আপনাকে বলতেও হবে না। আপনার ভালোর জন্যই বলেছিলাম, ব্যাপারটা আমাদের লেভেলে মিটে গেলেই ভালো হত। এবার সামলাতে পারবেন কি না দেখুন বাউন্সারগুলো। সবকটা বাউন্সারই কিন্তু বুকের ওপর দিয়েই আসবে। পারবেন তো অফিসার?"
সুশোভন বিরক্ত হয়ে ফোনটা কেটে দিলেন। লোকটা কিছুদিন আগেও পকেটমারি করে মার খেত। এখন বড়ো নেতা হয়ে গেছে। নেতা হওয়ার জন্য কোনওরকম পড়াশোনা লাগে না। কোয়ালিফিকেশন লাগে না। চিটিংবাজি, চুরিচামারি, খুন করতে জানতে পারলেও আজকাল নেতা হওয়া যায়।
তবে ইজাজ মল্লিকের গলার টোনটা তাঁর ভালো লাগল না। তিনি খাট থেকে নেমে খানিকটা পায়চারি করে আদিত্যকে ফোন করলেন। আদিত্যর ফোনটা একবার পুরো রিং হয়ে গেল। সুশোভন বুঝলেন আদিত্য

ঘুমোচ্ছে। মোবাইলটা বন্ধ করতে যাবেন, এমন সময় দেখলেন আদিত্য কলব্যাক করছে। তিনি ফোন ধরতেই আদিত্য বলে উঠল, “খবরটা পেয়েছিস তবে?”
সুশোভন বললেন, “হ্যাঁ, রীতিমতো হুমকি আসা শুরু হয়েছে।”
আদিত্য বলল, “আজব! ঝুমকি তো এই জাস্ট কিছুক্ষণ আগে ফেসবুকে লিখল। এর মধ্যেই ওরা দেখে নিল? রাতে ঘুমায় না নাকি ওরা?”
সুশোভন বললেন, “যারা ক্রাইম করে, তারা কি অত সহজে রাত্তিরে ঘুমাতে পারে? আর ব্যাপারটা যেরকম স্পর্শকাতর হয়ে আছে, বুঝতেই পারছিস এত সহজে সব কিছু মিটে যাবে না। আচ্ছা, যেটা আমার জানার ছিল, মেয়েটা কি নিজে থেকেই ঠিক করল ঘটনাটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেবে বলে?”
আদিত্য বলল, “হ্যাঁ। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল, ফোনটা দিতে। ছটফট করছে অ্যাকচুয়ালি। একটা পাপবোধ তো আছেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল বলে, তার ওপর এভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনা আর মিডিয়াতে তার সম্পূর্ণ মিসইন্টারপ্রিটেশন নিতে পারছিল না আর কি। কাঁহাতক আর লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে বল তো!”
সুশোভন বললেন, “চাকা জ্যাম করার ভয় দিচ্ছে। সম্ভবত কালকের দিনটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখকর হবে না।”
আদিত্য বলল, “পুরো ব্যাপারটা হজম করে যাওয়াটাও তো কোনও কাজের কথা হবে না। তুই বললে আমি ঝুমকিকে দিয়ে স্ট্যাটাসটা সরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?”
সুশোভন বললেন, “না, সেটার দরকার নেই। এক কাজ করা যায়, স্ট্যাটাস দেওয়া মানে তো বয়ান দেওয়া। সেটা যে কারও কাস্টডিতে থেকেও দেওয়ানো যায়। তার থেকে ভালো হয় ঝুমকিকে বল সকালে ফেসবুক লাইভ করতে।”
আদিত্য বলল, “লাইভ করলে যদি লোকে বুঝে যায় ব্যাপারটা আমার বাড়ি থেকে হচ্ছে, তাহলে তো এখানেই হামলা হয়ে যাবে।”
সুশোভন একটু থমকে বললেন, “সেটা ঠিক। আচ্ছা, আপাতত স্ট্যাটাসটাই থাক। সেটার কী রিপার্কেশন হয় সেটা দেখে নি। তুই ঘুমিয়ে পড়। কাল দেখা যাবে যা হবে। গুড নাইট।”
আদিত্য “গুড নাইট” বলে ফোন রেখে দিল।
#
সুশোভন ফোন বন্ধ করে শুলেন। এপাশ ওপাশ করে ঘুম এল শেষরাতের (প্রথম ফোনের সময়ই ভোর সাড়ে চারটে বলা হয়েছে) দিকে। সকাল দশটা নাগাদ ফোন অন করে বাথরুমে গেছিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন ফোন বেজে চলেছে।
দেখলেন অফিস থেকে ফোন আসছে, ধরলেন, “হ্যালো।”
“সুশোভন?”
সুশোভন গলাটা চিনলেন। ইন্সপেক্টর বিশ্বাস। বললেন, “হ্যাঁ, বলুন।”
“ফোন অফ রেখেছিলেন কেন?”
সুশোভন হাসলেন, “আর কী বলব, ফোনের জ্বালায় তো ঘুম মাথায় উঠেছিল। কেন, কী হয়েছে?”
“আপনার ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে। সন্দেশখালিতে। ইমিডিয়েট পোস্টিং।”
সুশোভন চুপ করে ফোন হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

৩০

সকাল আটটা। আদিত্যর শেষরাতের (সুশোভন ভোরে ফোন করেছে) দিকে ঘুম এসেছিল। ঘুম ভাঙল রুমকির ফোনে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে রুমকির উত্তেজিত গলা ভেসে এল, “এই, উঠেছ?”
আদিত্য ঘুম জড়ানো গলায় বলল, “না, কী হয়েছে?”

রুমকি বলল, “আরে বোন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে। আমি তো ভাবতেই পারছি না ও এরকম একটা চক্রে জড়িয়ে পড়েছিল।”
রুমকি কেঁদে ফেলল।
আদিত্য বলল, “ওহ। ভাবতে পারোনি? তোমার বাবাকে দেখিয়েছ?”
রুমকি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, “বাবা বোনকে নিয়ে কোনও কথা শুনতেই চাইছে না। তুমি একবার এসো না।”
আদিত্য শুয়ে ছিল। এবার বিরক্ত হয়ে খাটে উঠে বসে বলল, “কী ব্যাপার বলো তো? আমি কি অফিস ছেড়েই দেব? রোজ রোজ এভাবে অফিস কামাই করলে তো চাকরিটাই চলে যাবে। কী চাইছ?”
রুমকি রেগে গেল, “তা তো বলবেই। তোমার নিজের বোন হলে কী করতে? আমার বোন, আমার বাড়ির ব্যাপারে তো তোমার বিরক্তি আসবেই! থাক। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমার বোনটা মরুক বাঁচুক, আমাদের সংসারটা ভেসে যাক, তুমি অফিস করো, যাও। অফিসে গিয়ে বসে থাকো।”
ফোনটা কেটে দিল রুমকি।
আদিত্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে ফেসবুক খুলল। ঝুমকি কাল তার ফোন থেকে লগ আউট করেনি। একগাদা কমেন্ট পড়েছে ঝুমকির স্ট্যাটাসে। দু ধর্মের মধ্যে লাঠালাঠি লেগে গেছে প্রায়। হিন্দুরা বলছে তারা জানত মুসলিম মানেই এরকম, আর মুসলিমরা ঝুমকির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তুলকালাম কাণ্ড চলছে। কয়েক সেকেন্ড কমেন্টগুলো দেখে আদিত্যর কান মাথা গরম হয়ে গেল। সে খাট থেকে নেমে বাথরুম সেরে ড্রয়িং রুমে গিয়ে টিভি ছাড়ল। ঝুমকির ব্যাপারটা খবরে দেখাচ্ছে। ঝুমকির স্ট্যাটাসটা আসার আগে অবধি ব্যাপারটা একরকম ছিল, রিন্টুর দিকে সহানুভূতির ঝড় বইছিল, এখন ব্যাপারটা খানিকটা দুভাগে ভাগ হয়েছে। রিন্টুদের বাড়ি থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে ঝুমকির বাড়ির লোকই ঝুমকিকে গুম করে এখন জোর করে তাকে দিয়ে বয়ান লেখাচ্ছে।
আদিত্য কয়েক মিনিট টিভি দেখে চ্যানেল চেঞ্জ করে কার্টুন চালাল। দেখা যাচ্ছে না। সত্যি, খবরকে কীভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নাটকীয় করে তিল থেকে তাল করতে হয় তা এই চ্যানেলগুলোর থেকে শেখার আছে।
ঝুমকি মনে হয় সারারাত ঘুমোয়নি। শেষরাতে ঘুমিয়েছে। আদিত্য প্রথমে তৈরি হয়ে নিয়ে পরে গেস্ট রুমে গিয়ে নক করতে যাচ্ছিল, ফোনটা আবার বেজে উঠল।
আদিত্য নাম্বার না দেখেই ধরল। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, “দাদা, ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তো।”
রিন্টুর গলা।
আদিত্য সোফায় বসল। ঠান্ডা গলায় বলল, “কী যাচ্ছে হাতের বাইরে?”
রিন্টু হাসল, “বুঝতেই পারছেন দাদা কী বলতে চাইছি। আমার বিয়ে করা বউকে আপনারা লুকিয়ে রেখে ঠিক করছেন? এরপর তো বাড়িতে বোম পড়তে পারে, আমার আর কিছু হাত থাকবে না।”
আদিত্য বলল, “ফ্যালো না বোম, কে বারণ করেছে। তোমরা বোম ফেললেই বরং তোমাদের চরিত্র, উদ্দেশ্য সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে জিনিসটা তোমরা করতে চাইছ, যদি ভেবে থাকো করে পার পেয়ে যাবে, তাহলে ভুল ভাববে।”
রিন্টু বলল, “কী করতে চাইছি দাদা? গরিব মানুষ আর অন্য ধর্ম বলে আমি আমার ভালোবাসাকে পেতে পারি না?”
আদিত্য বলল, “একশোবার পেতে পারো, ধর্মের জন্য কোনও দিন কিছু আটকাবে না, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ যে শাস্তির আওতায় পড়ে তা বোধহয় তুমি জানো না। তুমি শিক্ষিত তো, না একেবারেই গণ্ডমূর্খ?”

রিন্টু এবার রেগে বলল, "একদম মুখ সামলে কথা বলবি। নিজের বউয়ের সঙ্গে সেক্স করলে কবে থেকে সেটা রেপের আওতায় আসে রে মাদারচোদ? ভেবেছিস কী তোরা? যে জাহান্নামেই লুকিয়ে রাখিস ওকে, খুঁজে বের করে আমার ঘরে নিয়ে আসবই। চ্যালেঞ্জ দিলাম তোকে।"
আদিত্য বলল, "এ কি সিনেমা পেয়েছ ভাই? বিয়ে করা বউ? ধর্ম লুকিয়ে বিয়ে করা কোথাকার বিয়ে করা বরের কাজ হে? একটা কথা মনে রেখো, দেশে এখনও আইন আদালত আছে, তোমাদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে, সমঝে যাও। নইলে..."
রিন্টু ফোন কেটে দিল।
আদিত্য উঠল। গেস্ট রুমের দরজায় নক করল।
ঝুমকি ঘুমচোখে দরজা খুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বেরোবে?"
আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, যথারীতি তুই আবার আগুন লাগিয়ে দিয়েছিস চারদিকে।"
ঝুমকি আঁতকে উঠে বলল, "মানে? আমাদের বাড়ি ঠিক আছে তো?"
আদিত্য আশ্বস্ত করল "হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। তবে তোর স্ট্যাটাসটা পড়ে তোর দিদির মন নরম হয়েছে। এবার মনে হয় তোর ব্যাপারটা বলা যাবে। তোর বাবাকে ম্যানেজ করতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই। ফ্রিজে কিছু খাবার আছে। ওগুলো খেয়ে সকালের খিদে মেটা। দুপুরে ভাত এনে দেব।"
ঝুমকি বলল, "অফিসে যাবে না আজকেও?"
আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, চাকরিটা ছেড়েই দিতে হবে যা বুঝছি। তোর রোমিও ফোন করেছিল। খুব তড়পাচ্ছে।"
ঝুমকির মুখটা কঠিন হয়ে গেল। বলল, "ওকে কেউ মেরে ফেললে আমি সবথেকে বেশি খুশি হতাম। জানোয়ার একটা।"

৩১

মিত্র সাহেব চেম্বারে ছিলেন। সুশোভন নক করলেন।
মিত্র সাহেব বললেন, "কে?"
সুশোভন মুখ দেখালেন।
মিত্র সাহেব বললেন, "একটু পরে আসতে পারবে? কাজ ছিল এখন।"
সুশোভন বললেন, "দু মিনিট নেব স্যার। চলে যাব তারপর।"
মিত্র বললেন, "ওকে। এসো।"
সুশোভন চেম্বারে ঢুকলেন।
মিত্রসাহেব বললেন, "আমি জানি তুমি কী নিয়ে বলতে এসেছ। শকিং অর্ডার। কিন্তু কিছু করার নেই। উপরওয়ালার নির্দেশ এলে আমি অপারগ। তুমিও জানো কিছুদিন আগেই ডিএ নিয়ে আন্দোলন করতে গেছিল বলে পার্মানেন্ট পোস্টেড কয়েকজনকে এভাবেই ট্রান্সফার করা হয়েছিল।"
সুশোভন বললেন, "আমি সবটাই বুঝেছি স্যার। এবং এই নিয়ে আমার কিছুই বলার নেই।"
মিত্রসাহেব অবাক হয়ে বললেন, "তবে?"
সুশোভন বললেন, "আমি বলতে চাইছি আপনার সঙ্গে কাজ করে ভালো লাগল। নতুন টেরিটরিতে যাব। এরা আমাকে ট্রান্সফার করে ভালোই করেছে। আশা করছি খুব বেশিদিন আমাকে সন্দেশখালিতে রাখতে হবে না। ওখানেও তো একটা কমিউনাল টেনশন চলছে শুনছিলাম কদিন ধরে। গভর্নমেন্টের ভূমিকা ওখানেও সন্তোষজনক নয়।"
মিত্র সভয়ে সুশোভনের পেছনে কেউ আছে নাকি দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি এসব কথা বলতে যেয়ো না এখন। একেবারেই বলতে যেয়ো না। তুমি রেগে আছ আমি জানি, কিন্তু আমাদের চাকরিতে অ্যাঙ্গার

ম্যানেজমেন্ট একটা আর্ট। দরকার হলে সাত-আট দিন ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো, এসে অর্ডারটা অ্যাক্সেপ্ট কোরো।"

সুশোভন হাসলেন, "না স্যার, অর্ডার নিয়ে ভয় পাবার তো কিছু নেই, সন্দেশখালিই পাঠান আর সুন্দরবন, মাস গেলে মাইনে পেলেই হবে। তবে একটা কথা ঠিক, ইজাজ মল্লিকরা কিন্তু স্যার সংখ্যায় বাড়ছে। আজ আমার বন্ধুর বাড়িতে হয়েছে, কাল আপনার বাড়িতেও হতে পারে। আপনারও মেয়ে আছে শুনেছি। একইভাবে একই ট্র্যাপ যদি আপনার বাড়িতে ওরা ফেলত এই হাস্যকর একটা ধর্মীয় কারণে, আপনি কী করতেন?"

মিত্র মাথা নাড়িয়ে বললেন, "ওহ, তুমি এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ সুশোভন। গ্রো আপ!"

সুশোভন বললেন, "আমি মাথা ঘামাচ্ছি না স্যার। একেবারেই না। কিন্তু আপনি পুরো ঘটনাটা আমার থেকে শুনেছেন। জামান সাহেব জানেন। কতগুলো সড়কছাপ ক্রিমিনাল একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হামলা করেছে বলে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু এই অপরাধে আমার বদলি হয়ে যাবে?"

মিত্র বললেন, "চা খাবে? দাঁড়াও চা বলছি।"

সুশোভন চুপ করে বসে রইলেন।

চা বলে মিত্র বললেন, "শোনো, আমিও জানি, তুমিও জানো, ঠিক কোন পরিস্থিতিতে আমাদের চাকরি করতে হয়। আমাদের বেসিক্যালি কিছু করার থাকে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অর্ডার বের করতে হয়েছে। বুঝতেই পারছ... তুমি বুদ্ধিমান..."

সুশোভন বললেন, "মেয়েটা স্ট্যাটাস দিয়েছে স্যার। এবার তো ডিপার্টমেন্ট কিছু স্টেপ নেবে!"

মিত্র অস্বস্তিমাখা মুখে বললেন, "এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ব্যাপারটা নিয়ে শুধু পরিস্থিতি দেখার নির্দেশ আছে। এবং এও বলা আছে মেয়েটিকে পেলে যেন কাস্টডিতে নেওয়া হয়।"

সুশোভন এবার উত্তেজিত হলেন। বললেন, "মেয়েটাকে কাস্টডিতে কেন নিতে হবে? কেন ছেলেটাকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হবে না? সবার আগে তো ফ্যাক্ট লুকিয়ে বিয়ে করার জন্য ফোর টুয়েন্টি চার্জ দেওয়া উচিত। তারপর কিডন্যাপিং, রেপ, সমস্ত চার্জ দেওয়া যায়!"

মিত্র বললেন, "রেপ চার্জ দেবে, প্রমাণ করতে হবে তো! তার জন্য মেয়েটার মেডিক্যাল চেক আপ করতে হবে। তুমি মেয়েটিকে জনসমক্ষে আনার ব্যবস্থা করো, মেডিকেল করাও, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে তো অ্যারেস্ট করা যায় না!"

সুশোভন বললেন, "আর কতগুলো লুম্পেন শহরে দাপিয়ে বেড়াবে, ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের কিচ্ছু করা হবে না, এটা কোথায় লেখা আছে স্যার?"

চা এল। মিত্র সুশোভনকে বললেন, "চা নাও। তুমি এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছ। পারসোনালি নিয়ে নিচ্ছ কেন? আমি আছি তো এখানে। আমি দেখব মেয়েটি যেন জাস্টিস পায়। তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।"

সুশোভন গুম হয়ে বসে রইলেন।

৩২

ঝুমকিকে ঘরের ভেতরেই রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল আদিত্য। ঝুমকিকে বলে দিয়েছে বারান্দায় না যেতে। বাইরের কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝে যায় ঘরের ভেতরে কেউ আছে, তাহলে আর-এক সমস্যা হতে পারে।

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে রাস্তায় নামাতে আদিত্য দেখল একটা টাটা সুমোতে কয়েকটা ছেলে তাকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে। আদিত্য চারপাশে দেখল। দিনের আলো। পাড়ায় যথেষ্ট লোকজনও আছে।

সে নিজের গাড়িটা স্টার্ট করে খানিকটা এগোতে বুঝতে পারল সুমোটা তাকে ফলো করা শুরু করেছে। সে সবে গাড়ি চালানো শুরু করেছে। অনেকটাই অ্যালার্ট হয়ে চালাতে হয়।

এই ছেলেগুলো রিন্টুদের বাড়িতে ছিল সম্ভবত। চোয়াড়ে মার্কা। রুবির জ্যামে গাড়ি দাঁড়ালে লুকিং গ্লাসে দেখল গাড়িটা একটা গাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য ফোনটা বের করে সুশোভনকে ফোন করল। একটা রিং হতেই সুশোভন ফোন ধরলেন, "বল।"

আদিত্য বলল, "একটা সুমো ফলো করছে।"

সুশোভন বললেন, "একটা কাজ কর, তিলজলা থানায় গাড়ি ভিড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়া। সুমো কেটে যাবে।"

আদিত্য বলল, "যদি তারপরেও না কাটে?"

সুশোভন বললেন, "ফোন করিস আমায়।"

আদিত্য বলল, "ঠিক আছে।"

লাল আলো সবুজ হতে সতর্ক হাতে আদিত্য গাড়ির গতি বাড়াল। সুমোটা দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। সায়েন্স সিটির কাছে এসে আদিত্য সুমোটাকে ট্র্যাক করে সুশোভনের কথামতো থানায় ঢুকিয়ে দিল।

বেশ কয়েকজন পুলিশ বিরক্ত মুখে তার দিকে এগিয়ে এল।

আদিত্য সুশোভনের পরিচয় দিতে কেউ আর কিছু বলল না। সুমোটা থানার খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য গাড়ির ভেতরে বসে মোবাইলটা হাতে নিল। গাড়ি থেকে নেমে সোজা সুমোটার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সুমোটা দাঁড়িয়ে ছিল। আদিত্য চুপ করে গাড়িটার কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

গাড়ির ছেলেগুলো তাকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখছে। ওরা ভাবতে পারেনি আদিত্য তাদের কাছে চলে আসবে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

আদিত্য ছেলেগুলোর দিকে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রিন্টুর নম্বরে ফোন করল। একবার রিং হতেই রিন্টু ধরল, "হ্যালো।"

আদিত্য ছেলেগুলোকে শুনিয়ে শুনিয়ে রিন্টুকে বলল, "তোমার অনেক টাকা? একটা সুমোসুদ্ধ লোক পাঠিয়েছ আমাকে কড়কে দেওয়ার জন্য? এত ম্যানপাওয়ার নষ্ট করছ একটা লাভ জিহাদের জন্য? কাজ নেই? সিরিয়াসলি?"

ছেলেগুলো আদিত্যর দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছে এবার। আদিত্য একবার থানার দিকে আড়চোখে দেখে নিল। ঠিক করে নিয়েছে ছেলেগুলো কিছু করলেই থানায় ঢুকে যাবে। তারপর যা হবে দেখা যাবে।

রিন্টু বলল, "আমার বউকে ছেড়ে দিন। আপনাদের আর কোনও জ্বালাতন হবে না। একদম উপরওয়ালার দিব্যি বলছি।"

আদিত্য সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, "আমি তো উলটো কাজ করতে এলাম। আমাদের বাড়ির মেয়েকে গুম করে এখন সিন ক্রিয়েট করছ বলে তোমার এগেনস্টে চার্জ আনতে এসেছি থানায়।"

ওপাশটা স্তব্ধ হতেই আদিত্য ফোনটা কেটে দিল। রিন্টু ফোন করা শুরু করেছে। আদিত্য ধরল না ফোনটা। সুমোর ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বলল, "কাম কাজ কিছুই করো না তোমরা? সারাদিন এদিক সেদিক গুন্ডাগিরি করে কত টাকা কামাই হয়?"

ড্রাইভারের পাশে যে ছেলেটা বসেছিল সে ড্রাইভারকে কিছু একটা বলল। সুমোটা স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল। আদিত্য সেদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়িটা স্টার্ট নিতে গিয়েও নিল না। ফোন বের করে ঝুমকির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলল। বেশ কয়েকজন বন্ধু ঝুমকিকে মেসেজ করেছে। অনধিকার চর্চা জেনেও আদিত্য মেসেজগুলো পড়তে শুরু করল। তিতলি নামে একটা মেয়ের মেসেজে এসে থমকে গেল আদিত্য। ঝুমকিকে লিখেছে, "কাজটা ভালো করলি না ঝুমকি। সমস্যা হতে পারে।"

আদিত্য তিতলির প্রোফাইল খুলল। ঝুমকি মেয়েটার সব প্রোফাইল পিকচারেই লাইক করে। অনেক চ্যাটও হয়েছে দেখা যাচ্ছে।
কয়েক সেকেন্ড ঠোঁট কামড়ে বসে থেকে আদিত্য তিতলিকে মেসেজ করল, “আমার ফোনে সব নাম্বার উড়ে গেছে। তোর নাম্বারটা একটু দে তো।”

তিতলি অনলাইনই ছিল। নিজের নাম্বারটা দিয়ে লিখল, “কোথায় তুই? কী করছিস? রিন্টুদাকে ফোন কর শিগগির! এসব কী করছিস তুই?”
আদিত্য ব্রাউজার বন্ধ করে তিতলিকে ফোন করল।
একটা রিঙেই ধরল তিতলি, “হ্যালো।”
আদিত্য খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই ফোনটা করেছিল। কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, “অর্ণব আছে?”
তিতলি “রং নাম্বার” বলে ফোনটা কেটে দিল।
আদিত্য ঠোঁট কামড়াল। ঝোঁকের মাথায় ফোনটা তার করা উচিত হয়নি। সে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।
উলটোডাঙার জ্যামের সুবাদে পৌঁছোতে দেরি হল।
আদিত্য পৌঁছে দেখল বাড়ি থেকে সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে।
অবাক হয়ে সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন বললেন, “বল রে।”
আদিত্য বলল, “সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে রে।”
সুশোভন হেসে বললেন, “সঙ্গে আমাকেও। ট্রান্সফার করে দিয়েছে, সন্দেশখালি!”
আদিত্য বলল, “সে কী! এবার কী হবে?”
সুশোভন বললেন, “কী আর হবে? লড়াইটা কঠিন হবে। জামান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করিস। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কিছু একটা হেল্প করবেন।”
আদিত্য মাথায় হাত দিল। রুমকি গাড়ির শব্দ শুনেছিল। বাইরে বেরিয়ে দেখল আদিত্য ফোনে কথা বলছে। তাকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, “সিকিউরিটি তুলে নিয়েছে, দেখেছ? সুশোভনকে ফোন করো না!”
আদিত্য রুমকিকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে সুশোভনকে বলল, “জামান সাহেবের নাম্বারটা পাঠা একবার। হারিয়েছি মনে হয়।”
সুশোভন বললেন, “পাঠাচ্ছি। আর শোন, ঝুমকিকে এখনও সামনে আনার সময় হয়নি। বি কেয়ারফুল।”
আদিত্য আড়চোখে রুমকির দিকে তাকিয়ে সুশোভনকে বলল, “আচ্ছা। থ্যাংকিউ রে।”

৩৩

সন্ধেবেলা।
ইজাজ মল্লিক গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। রিন্টু ঘরে ঢুকল।
ইজাজ বললেন, “মেয়েটার কোনও খোঁজ পেলি?”
রিন্টু মাথা নাড়ল।
ইজাজ বিরক্ত বললেন, “তোদের আর কীভাবে শেখাতে হবে বল তো? মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে এসে, বাঁধিয়ে দেওয়ার পর যা ইচ্ছা করতে পারতিস! শুরুতেই এত জোরাজুরি করার কী ছিল? এখন ফেসবুক এসে গেছে, শুধু মিডিয়া সব কাজ করতে পারে না। মানুষ চাইলে ফেসবুক ব্যবহার করে মিডিয়ার সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে নিতে পারে। যেটা মেয়েটা নিচ্ছে।”
রিন্টু বলল, “আমি বুঝতে পারিনি ধানবাদ থেকে ওভাবে পালিয়ে যেতে পারবে।”
ইজাজ রেগে গেলেন, বললেন, “ধানবাদেই কেন করার দরকার ছিল? আদৌ করারই বা কী দরকার ছিল? ওর পেটে যে বাচ্চা হত সে হিন্দু হত?”

রিন্টু চুপ করে রইল।
ইজাজ বলল, “মিডিয়া পর্যন্ত এখন ভাগ হয়ে গেছে। হিন্দুদের দল নড়েচড়ে বসেছে। ওরা ইস্যু করবে এবার এটাকে নিয়ে। আমি একা কত করব?”
রিন্টু বলল, “ওকে খুঁজে পেলে আপনার কাজ হবে তো?”
ইজাজের চোয়াল শক্ত হল, “হ্যাঁ। কোথায় যেতে পারে?”
রিন্টু বলল, “দিল্লি যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশের কোনও শহরে গিয়ে লুকোতে পারে। কলকাতাতেও আসতে পারে। আবার ধানবাদেও লুকিয়ে থাকতে পারে।”
ইজাজ বললেন, “যেখানেই গিয়ে থাকুক, ওকে বের কর। যে গর্তে লুকিয়ে থাকুক। ওর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা মানেই বিপদ। আমি একটা চ্যানেলকে বলে দিয়েছি, মেয়েটা যে বাড়ির চাপে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে সেটা প্রচার করার জন্য। কিন্তু তাতে বালির বাঁধ দেওয়া হবে। ও আবার কিছু লিখলে সেটা ঢাকা পড়ে যাবার চান্স প্রবল।”
রিন্টু চিন্তিত মুখে বসে রইল।
ইজাজ মল্লিক বললেন, “এভাবে বসে থাকবি না। ছেলেদের বল মেয়েটার বাড়ির লোককে চমকে রাখতে। সেটা করছিস?”
রিন্টু বলল, “প্রতিরোধ আসছে। পাড়ার লোক একজোট হয়েছে। আমাদের ছেলেরা একবার মার খেয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। বড়ো ফোর্স চাই যারা এলাকায় গিয়ে বোমবাজি করে আসতে পারবে। আজ মাঝরাতে হলে ভালো। সেটা হলে ওরা ঘরে ঢুকে যাবে। তখন ওদের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করা সহজ হবে।”
ইজাজ কয়েক সেকেন্ড রিন্টুর দিকে তাকিয়ে ফোন বের করে একটা নাম্বারে ফোন করলেন। রিং হতেই ওপাশ থেকে ফোন রিসিভ হল। ইজাজ বললেন, “আলম? এই ঘরে আয়।”
মিনিটখানেক পরে একজন লম্বাচওড়া লোক ঢুকল ঘরে। ইজাজ বললেন, “নর্থে, একটা পাড়ায় আজ রাতে বেশ কিছু বোম ফেলে আসতে হবে। পুলিশ আমি ম্যানেজ করে নেব। পারবি?”
আলম বলল, “ঠিকানা দিন। এখনই করে আসি।”
ইজাজ ধমকালেন, “আমি এখন বলেছি? যখন বলেছি তখন করবি। রাত একটা থেকে দুটোর সময় যাবি। সারা পাড়া যখন ঘুমোবে তখন। পাড়া চমকাতে হবে শুধু। বাকিটা আমি বুঝে নেব।”
আলম মাথা নাড়ল।
রিন্টু বলল, “মেয়েটার দুলাভাই লোকটা টাইট আছে। ওকেও চমকানো দরকার। ওরই তো বন্ধু ওই পুলিশটা, যাকে ট্রান্সফার করা হল।”
ইজাজ মুখে তাচ্ছিল্যের শব্দ করে বললেন, “দুলাভাইকে দিয়ে কী করবি? তোদের এই হল সমস্যা। সব জায়গায় মাথা গরম করে কাজ হবে? বাপ মা বুড়ো বুড়ি। দুজন তো লোক। এক রাত বোমবাজি হলে ভয়ে পেচ্ছাপ করে দেবে।”
রিন্টু বলল, “তবু আপনি জায়গামতো বলে রাখুন, মেয়েটা আমার নামে রেপ চার্জ এনেছে ফেসবুকে। দেখার পর থেকে আমার মাথা কাজ করছে না।”
ইজাজ বলল, “আবেগঘন ভাষায় তুই একটা পোস্ট লেখ। কীভাবে ওর বাড়ি থেকে ওর ওপর চাপ দিয়ে তোদের পবিত্র প্রেমকে নষ্ট করতে চাইছে এই নিয়ে বড়ো করে কিছু লেখ।”
রিন্টু গম্ভীর হয়ে নখ খুঁটতে থাকল।

৩৪

“দেশভাগের ক্ষত ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি হয়েছিল বাংলা আর পাঞ্জাবে। পাঞ্জাব যতটা সে জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল, পশ্চিমবঙ্গ সে জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। ক্ষতটা থেকেই গেছে। যতই

কমিউনিজম পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করুক অনেক বছর ধরে, মানুষের ভেতর থেকে সে ক্ষতকে সরানো যায়নি। অবচেতন মনে সযত্নে লালিত পালিত হয়ে আছে আমরা ওরা, হিন্দু মুসলমান। নজরুল যতই বলে থাকুন মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, আদতে তা নয়। এই ক্ষত ছাইচাপা আগুনের মতো এ রাজ্যে বরাবরই ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ দেশের শাসককে ধর্ম উদাসীন হতে হবে। ভোটের রাজনীতি আপনি করতেই পারেন। আপনি মাথায় কাপড় বেঁধে নামাজ পড়ে আসতেই পারেন ইফতারের সময়। কিন্তু তাতে মুসলমানদের প্রকৃত উপকার হবে না। মুসলমানদের দয়া কিংবা ঘৃণার চোখে দেখলে হবে না। তাঁরা ভিক্ষার দান চান না। তাঁদের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষার পরিকাঠামো। এ রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কি কোনও কালেই ছিল না? শাসক যদি তাঁর মনোমতো ধর্মকে ব্যবহার করেন, ধর্মকে রাজনীতির জন্য ব্যবহার করেন, তার ফল মারাত্মক। সংখ্যালঘুকে ভুলভাবে তোষণ করে যাওয়া সংখ্যাগুরুকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। একইসঙ্গে সংখ্যালঘুরাও যে খুব বেশি নিরাপদ বোধ করেন, সেটা ভাবলে বোকামি হবে। আবারও বলছি, তাঁরা কিন্তু দয়ার দান চান না। আপনি মুসলমান ক্রিমিনালদের ব্যবহার করবেন, আর সোশাল মিডিয়ায় কিছু ইন্টেলেকচুয়ালকে দিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করাবেন, এতে মুসলমানদের ভালো হচ্ছে না।

আমাদের সমস্যা আমাদের কোনও রাজা রামমোহন রায় নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নেই। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যে ধর্মের তত্ত্বের পরিবর্তন হয়, তা আমরা স্বীকার করি না। এর জন্য দায়ী অপর কেউ নয়। আমরাই দায়ী। ধর্মীয় গোঁড়ামি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে সে ধর্ম মানুষের ভালোর জন্য আর থাকে না। হিংসা কিংবা দ্বেষ ছড়ানোর লক্ষ্যে কেউ ধর্মের গোড়াপত্তন করেন না। কয়েকশো বছর আগে আরব দেশে যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই ২০১৯-এ পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির কোনও মিল নেই। মানুষকে একটা সময় বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল। যুগে যুগে যুদ্ধ হয়েছে। মানুষ মানুষকে মেরেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ কমেছে। সভ্যতা মানেই তো তাই? অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদিকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষ যত পৃথিবীটাকে সুন্দর করে রাখবে, সভ্য সে তখন হবে। উন্নততম প্রযুক্তির পরমাণু বোমা যদি মানুষ মারার জন্যই তৈরি হয়ে থাকে, তা সভ্যতার কলঙ্ক।

যাই হোক, আমি খানিকটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিলাম। আমার মূল বক্তব্যে ফিরে এসে বলি, রাজ্যে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তার দায় আমরা কেউ এড়াতে পারব না। আমি আবারও বলি, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য, যেখানে অনুপ্রবেশ এখনও একটা সমস্যা, যেখানে দেশভাগের ক্ষত এখনও ছাইচাপা আগুনের মতো মানুষের অবচেতনে হানা দেয়, সেখানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আগুন নিয়ে খেলার সমান। আমাদের দুর্ভাগ্য, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্ম নিয়ে রাজনীতিটাই হয় সবথেকে বেশি। উঁচু নিচু জাতি থেকে শুরু করে হিন্দু মুসলমান, এই সমস্ত ভেদাভেদ যতদিন না আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর হচ্ছে, ততদিন আমরা প্রকৃত সভ্য হতে পারব না।”

জামান সাহেব থামলেন। হলঘর ফেটে পড়ল হাততালিতে। বক্তব্যের বিষয় ছিল “সংখ্যালঘু এবং পশ্চিমবঙ্গ।” সুশোভন অপেক্ষা করছিলেন। সভা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে জামান সাহেবের কাছে গিয়ে সুশোভন বললেন, “পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে জামান সাহেব। আমাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল, ওদের বাড়ি থেকে সিকিউরিটিও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

জামান সাহেব সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “স্বাভাবিক। লুম্পেনরা যখন প্রশাসনকে ব্যবহার করতে শুরু করবে, তখন এরকমই হবে।”

সুশোভন বললেন, “সন্দেশখালি জয়েন করতে যাব কাল। এর পরে কী করা যাবে?”

জামান বললেন, “আমি দেখছি। তুমি জয়েন করো। সব কিছু এত সহজে শেষ হতে দেওয়া যাবে না। মেয়েটির বাড়ির নিরাপত্তা যাতে থাকে সেটা আমি দেখে নেব। পুলিশের গাড়ি যাতে টহল দেয়, সেটা

নিশ্চিত করা যাক। সেটা আমি লোকাল থানায় কথা বলে দেখে নেব। তোমার বন্ধুর নাম্বারটা আমায় দাও। আমি কথা বলি ওর সঙ্গে। একটা কংক্রিট স্টেপ নেওয়া দরকার। বেশি সময় নেই হাতে।"

সুশোভন আদিত্যর ফোন নাম্বার দিল।

জামান সাহেব মোবাইলে আদিত্যর নাম্বার সেভ করতে করতে বললেন, "লাভ জিহাদের নামে যে নোংরামি হচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ না করা গেলে এ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছ? সবাই বুঝতে পারছে, সমস্যা হল যাদের বোঝার কথা তারা বুঝতে পারছে না।"

সুশোভন কিছু বললেন না। গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৩৫

তপন খানিকটা ভেঙেছেন, দেখে বুঝতে পারল আদিত্য। ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "কোনও খবর পেলে বাবা?"

আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল। রুমকির চেহারা ভাঙছে। কষ্ট হল হঠাৎ করে। মেয়েটার ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। বাবা মা দুজনকেই সামলাচ্ছে।

রুমকি আদিত্যকে বলল, "বাবা ঝুমকিকে ক্ষমা করে দিয়েছে। পোস্টটা দেখেছে।"

আদিত্য সোফায় বসে রুমকিকে বলল, "জল দেবে একটু?"

রুমকি একটা জলের বোতল এনে আদিত্যকে দিল।

তপন পায়চারি থামিয়ে আদিত্যর সামনে বসলেন। বললেন, "নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে। মেয়েটাকে কী না কী ভেবে নিয়েছি। আমার জন্যই, এত কড়া মনোভাবের জন্যই মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বুঝতে পারছি। কী করা যায় বলো তো? মেয়েটা কোথায় থাকতে পারে? এইটুকু মেয়ে, এত কষ্ট সহ্য করেছে। ওরা বেচে-টেচে দেবে না তো?"

আদিত্য শ্বশুরের দিকে তাকাল। মনে মনে বলল, এই মনোভাবটা প্রথম থেকে থাকলে এত সমস্যা হত না। সুশোভনের কথা মাথায় এল তার। সে মাথা নাড়িয়ে বলল, "বলতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে ঝুমকি কোনও বন্ধুর কাছেই আছে।"

রুমকি বলল, "ওর সব বন্ধুকে ফোন করেছি। এমনকি কলেজের বন্ধুদের নাম্বার জোগাড় করেও ফোন করেছি। কোনও খবর পাচ্ছি না।"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড তপনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঝুমকি আমাদের বাড়িতে আছে।"

রুমকি চমকে আদিত্যর দিকে তাকাল।

তপন বড়ো বড়ো চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আগে বলোনি কেন?"

আদিত্য বলল, "আপনারা সবাই এত রেগে ছিলেন তাই বলিনি। এখন রেগে নেই, তাই বললাম।"

রুমকি মাথায় হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "এত ইম্পরট্যান্ট ব্যাপারটা তুমি আমাকে বললে না?"

আদিত্য বলল, "সুশোভন বারণ করেছিল। তোমরা যদি বেশি উত্তেজিত হয়ে কিছু করে ফ্যালো, তাই। কিন্তু এখন মনে হল বাবা মা যেভাবে ভেঙে পড়ছেন, তাতে ব্যাপারটা আর চেপে রাখার কোনও মানে হয় না।"

তপন আদিত্যর হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেললেন, "তুমি বেশ করেছ। ঠিক করেছ তুমি। আমার রাগের ওপরে আমার নিজেরই ভরসা নেই। সুস্থ আছে তো আমার মেয়েটা?"

আদিত্য বলল, "একদম।"

রুমকি দৌড়োতে দৌড়োতে ঘরের ভিতরে গিয়ে মাকে নিয়ে এল। মা কথাটা শুনে কেঁদে ফেললেন।

তপন এবার একটু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "কিন্তু বাবা, ওই লুম্পেনগুলো যদি জানতে পারে ঝুমকি তোমার কাছে আছে, তাহলে তোমার নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে।"

আদিত্য বলল, “এখন অন্য কিছু ভাবলে চলবে না। আমাদের সবাইকে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কী করব। ব্যাপারটা নিয়ে এগোব, না ওকে বাইরের কোনও স্টেটে পাঠিয়ে ওখানে কারও সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।”
তপন মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বললেন, “মেয়েটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। অবশ্য এখন সেটা অসম্ভব। ওরা কোনওরকম ক্লু পেলে...” শিউরে উঠলেন তপন।

কিছুক্ষণ বসে তপন বললেন, “আমি গৃহদেবতার কাছে গেলাম। তোমরা বসো। ওঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি।”
তপন উঠলেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে ঠাকুরঘরে রওনা দিলেন। রুমকি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে আদিত্যকে বলল, “তুমি আমাকে কেন বলোনি কিছু?”
আদিত্য বুঝল ঈশান কোণে মেঘ করেছে। সে বলল, “তোমাকে শুরুতেই বলেছিলাম ফিরতে। তুমি বলেছিলে বাড়িতে বাবা মাকে সামলাবে।”
রুমকি বলল, “একবার বলতে পারতে ও আমাদের ওখানে আছে। তাহলে আমি চলে যেতাম ঠিক। তোমরা একসঙ্গে আছ বাড়িতে?”
আদিত্য বিরক্ত চোখে রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “তো কী করব? তুমি কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছ? ভেবে নিয়ো আমি না থাকলে তোমার বোনের ঠিক কী হতে পারত।”
রুমকি বলল, “আমি তো সেরকম কিছু বলিনি! তোমার এই কথাটাই মনে হল কেন আমি কিছু ইঙ্গিত করছি? কী হয়েছে?”
আদিত্য বলল, “কিছু হয়নি। কী হতে পারে? মেয়েটা ভয়াবহ রকমের ভয় পেয়ে আছে। তোমাদের কাউকে ওর দরকার।”
রুমকি চুপ করল। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার একই কথা বলল, “তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল।”
আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৩৬

“বোন কোন ঘরে শুচ্ছে?” রুমকি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অন্য দিকে তাকিয়ে আদিত্যকে জিজ্ঞেস করল।
আদিত্য রুমকির দিকে সরাসরি তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, “মানে? তোমার ধারণা ঝুমকি আমার সঙ্গে ঘুমায়?”
রুমকি রাগি গলায় বলল, “আমি কি তোমাকে একবারও সেটা বলেছি? এইজন্যই মনে হয় বলে চোরের মন বোঁচকার দিকে।”
আদিত্য বলল, “বোঁচকার কিছু নেই। অফিস বন্ধ করে, সব বন্ধ করে তোমার ফ্যামিলির লোকের জন্য লেবার দিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি যদি এখন এসব বলো তাহলে তো আর কিছু বলার নেই, তাই না?”
রুমকি এবার আদিত্যর দিকে তাকাল, “আমাকে প্রথমেই কথাটা বলা উচিত ছিল।”
আদিত্য বলল, “এ বাড়ির যা পরিস্থিতি ছিল, বলা কি সম্ভব ছিল? তোমাকে আমি বারবার আকারে ইঙ্গিতে বলেছি বাড়ি ফিরতে, তুমি বলেছ বাবা-মার সঙ্গে থাকবে। এখন তুমি আমার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাচ্ছ। তোমার বোন যে ছেলেটার সঙ্গে পালিয়েছিল, সে আমাকে থ্রেট করছে, তোমার বাড়িতে একটা গোটা মহল্লা এসে থ্রেট দিয়ে গেছে। এত সব কিছুর পরে তুমি আমাকে সন্দেহ করছ। এত যদি সন্দেহ থাকে নিজের বোনকেই জিজ্ঞেস করতে পারো।”
রুমকি গুম হয়ে বসে রইল। আদিত্য বলল, “শোনো, আমার এত কৈফিয়ত দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তোমার যদি মনে হয়, বাড়ি যাবে, চলো। যদি মনে হয় থাকবে, থাকো।

আমি আমার যেটা ভালো মনে হয় সেটা করেছি, করবও। মেয়েটা আমারও বোনেরই মতো। ওভাবে এসে আশ্রয় চেয়েছিল, আমি যদি তখন ওকে গার্ড না দিতাম, তাহলে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যেত। তোমাদের বাড়ির সম্মানের কথা ভেবে যা করার করেছি। সুশোভনকে বলেছি, প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করেছি। এত সব কিছুর পরে তোমার মনে প্রশ্ন এল ঝুমকি কোন ঘরে শুয়েছে। মানে সিরিয়াসলি? কী করে পারো বলো তো?"

রুমকি গলা নিচু করে রাগি গলায় বলল, "চ্যাঁচাবে না। কোনওরকম সিন ক্রিয়েট করবে না। বাবা কিংবা মা শুনলে দুজনেই খারাপ ভাববে।"

আদিত্য বলল, "ভাবাই উচিত। তোমার মতো মেয়ে জন্ম দিলে খারাপ না ভাবার কিছু নেই।"

রুমকি বলল, "মানে? আমার মতো মেয়ে জন্ম দিল মানে? এখন আর আমাকে ভালো লাগছে না, তাই না?"

আদিত্য বলল, "আমি কি সেটা বলেছি? ভালো লাগা, না লাগার কারণগুলো তো তুমিই মাটি খুঁড়ে বের করছ। শোনো, তুমি রেডি হয়ে নাও। বাড়ি গিয়ে বোনকে সামলাও।"

রুমকি শক্ত হয়ে বসে বলল, "আমি কোথাও যাব না। নিজে সামলাচ্ছ যখন তুমিই সামলাও।"

আদিত্য এবার রাগল, বলল, "এটাই তোমার ফাইনাল ডিসিশান তো?"

রুমকি বলল, "হ্যাঁ। এটাই ফাইনাল ডিসিশান।"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে উঠে বলল, "ঠিক আছে। আমিও তাহলে একটা কাজ করছি। ছেলেটাকে ফোন করে বলছি, তোমার বউকে নিয়ে যাও বাপু, এর জন্য আমার সংসারে অশান্তি লাগছে। তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে কনভার্ট করো, নিকাহ্‌ করো, রেপ করো, তিন তালাক দাও, চার তালাক দাও, তাতে আমার কোনও কিছু যায় আসে না। নিয়ে গিয়ে যা খুশি করো। প্রয়োজন হলে মেরে পুঁতে দাও, আমার কোনও কিছু যায় আসে না।"

রুমকি আদিত্যর কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

আদিত্য রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল। রুমকি বেরোল না। খানিকটা যাওয়ার পর দেখল ফোন বাজছে। শ্বশুরমশাই ফোন করছেন। আদিত্যর রাগটা মাথা চাড়া দিল। গাড়ি রাস্তার বাঁদিকে পার্ক করে ফোন ধরল, "হ্যালো।"

তপন উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "তুমি বেরিয়ে গেলে কেন আদিত্য? আমরা তো কী করব কিছুই ঠিক হল না!"

আদিত্য ঠান্ডা গলায় বলল, "আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন কী করবেন। আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না।"

ফোন রেখে আদিত্য গাড়ি স্টার্ট দিল।

৩৭

কাবুল থেকে তোতাপাখি পাঠানো হয়েছে বাদশাহকে। হুমায়ুন মুগ্ধ চোখে সকাল থেকে তাদেরকেই দেখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝেই বলছেন, "মারহাবা।"

বাদশাহকে যাঁরা চেনেন তাঁরা কেউই বিশেষ আশ্চর্য হচ্ছেন না। প্রায়শই এমন দিন আসে যেদিন বাদশাহ নিজের কক্ষে এরকম কোনও কিছু নিয়ে বসে থাকেন সারাক্ষণ।

বাদশাহর এক উজির এসে মাঝে মাঝেই উঁকিঝুঁকি মারছেন। হুমায়ুন বিরক্ত হলেন দেখে। নিশ্চয়ই কোনও কাজের কথা বলবে, নইলে আবার কোনও না কোনও সমস্যার কথা তুলবে। তিনি অনেকক্ষণ দেখার পরে একসময় রেগেমেগে নিরাপত্তারক্ষীকে হাঁক পেড়ে উজিরকে নিয়ে আসতে বললেন।

উজির নূর আলম শাহ সংকুচিত ভাবে এসে দাঁড়ালেন বাদশাহের কাছে। বাদশাহ বললেন, "কী ব্যাপার বলো তো? একটা দিনও কি তুমি আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? কী হল আবার?"

নূর আলম বললেন, “জাহাঁপনা, একটা ব্যাপার আমাকে কয়েক দিন ধরে বেশ চিন্তায় ফেলেছে, আমি কাকে বলব বুঝতেও পারছি না। বিশ্বাস করার মতো মানুষ তো খুব বেশি নেই এখানে।”
হুমায়ুন তাঁর উজিরের দিকে সস্নেহে তাকালেন। এই মানুষটির আনুগত্য প্রশ্নাতীত। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে যার জন্য নূর আলম এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।
বাদশাহ বললেন, “তোমার যখন কোনও কিছু মনে হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এর পিছনে কারণ আছেই। বলো নির্দ্বিধায়। আমি রেগে যাব না। বিরক্ত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে তুমি কিছু বলতে চাইছ। বলো।”
নূর আলম চারদিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে বললেন, “হুজুর, আমার কাছে খবর আছে শাহি হারেমের মেহজাবিনের সঙ্গে আপনার ভাই কামরান মির্জার গোপন যোগাযোগ আছে। আমার সন্দেহ, উনি আপনাকে হত্যা করার কোনও পরিকল্পনা করছেন।”
বাদশাহ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, “সে তো স্বাভাবিক ঘটনা। এতে এত উতলা হবার কী আছে? ভাই যদি ভাইকে ষড়যন্ত্র করে মেরে আনন্দ পায়, তাহলে পাবে। মরব নাহয়। কী আর এল গেল তাতে? এত চিন্তা কোরো না। তুমি বরং এই পাখিদের দেখো। হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটির থেকে কত দূরে, কত নিশ্চিন্তে ওরা আছে। আমাদের মতো এত চিন্তা ওদের করতে হয় না। নিজের মাশুকার সঙ্গে সংসর্গে লিপ্ত অবস্থায় নিহত হবার কথাও এদের ভাবতে হয় না। এরা কত ভালো আছে না আলম?”
নূর আলম হাসার চেষ্টা করলেন, “বাদশাহ আমার কথাকে মনে হয় হালকাভাবে নিলেন। আপনার দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি জাহাঁপনা। আমাকে আসতে আজ্ঞা দিন।”
হুমায়ুন আবার হেসে বললেন, “এসো, বসো। পারস্যের সুলতান দমীহ পাঠিয়েছেন। পান করো। এসো।”
নূর আলম বসলেন। হুমায়ুন নিজের হাতে নূর আলমকে পান পাত্রে দমীহ ঢেলে দিয়ে পানপাত্রটি নূর আলমের হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “নাও।”
নূর আলম সসম্মানে বাদশাহের হাত থেকে পানপাত্রটি নিলেন।
বাদশাহ গলা তুললেন, “কে আছিস?”
একজন নিরাপত্তারক্ষী এগিয়ে এল।
বাদশাহ বললেন, “শাহি হারেম থেকে মেহজাবিন বিবিকে ডেকে নিয়ে এসো। এখনই।”
নিরাপত্তারক্ষী চলে গেল।
বাদশাহ বললেন, “তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে তা আমার জানার প্রয়োজন নেই আলম, তোমার মুখের কথাই আমার জন্য সব। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।”
নূর আলম মাথা নুইয়ে বললেন, “আপনার মেহেরবানি জাহাঁপনা।”
বাদশাহ বললেন, “এই তোতাপাখিরা নাকি কথা বলতে পারে। তুমি এদের কথা বলা শেখাতে পারবে নূর?”
নূর আলম বললেন, “কোশিশ করতে পারি জাহাঁপনা। যদি পারি তবে খুদার অসীম মেহেরবানি হবে।”
বাদশাহ বললেন, “তোমার হাতে আমি এদের দায়িত্ব দিলাম আজ থেকে। এদের কথা বলা শেখাবে। কী কথা শেখাবে?”
নূর আলম বলতে যাচ্ছিলেন কিছু, এমন সময় নিরাপত্তারক্ষী মেহজাবিনকে নিয়ে প্রবেশ করল।
বাদশাহ নূর আলমকে ঠান্ডা গলায় বললেন, “ওর চোখ দুটো উপড়ে নাও নূর আলম। আমার সামনেই।”
মেহজাবিন আতঙ্কিত চোখে হুমায়ুনের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার কী গুনাহ হুজুর?”
হুমায়ুন বললেন, “কোনও গুনাহ নেই মেহজাবিন। আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে তোমার চোখ দুখানি রাখবেন না। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।”
নূর আলম এক চুমুকে দমীহের পাত্র শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

আদিত্যর মাথা বেশ গরম হয়ে ছিল।
সে খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে রাস্তার পাশের একটা ধাবায় গিয়ে বসল।
এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, লোকজনকে খেতে দেখে তার খিদে পেয়ে গেল।
খাবার অর্ডার করতে গিয়ে মনে পড়ল ঝুমকি খায়নি এখনও। কয়েক সেকেন্ড থমকে থেকে "ধুত্তোর" বলে অর্ডার করে দিল। ঠিক করল ঝুমকির জন্য পার্সেল করে নিয়ে যাবে।
ফোন বাজছিল তার। দেখল সুশোভন ফোন করছে।
ধরল, "বল।"
"খবর কী ওদিকে?"
আদিত্য বলল, "খবর? খবর মজার। বউকে যেই বললাম ঝুমকি আমার কাছে আছে, ওমনি সন্দেহ করতে শুরু করে দিল।"
সুশোভন অবাক গলায় বললেন, "বলতে গেলি কেন? তোকে তো বারণ করেছিলাম।"
আদিত্য বলল, "কী করব? একটা পরিবারের লোকজনকে চোখের সামনে ভেঙে পড়তে দেখলে কি খুব ভালো লাগে? আমার মনে হয়েছিল, বলে ফেললে ওরা খানিকটা চাপমুক্ত হবে। ব্যাপারটা ব্যাকফায়ার করবে কী করে জানব? অবশ্য রুমকি বরাবরই এরকম। ছোটোখাটো ব্যাপারে পর্যন্ত সন্দেহ করবে।"
সুশোভন হেসে ফেললেন, "এইজন্যই বিয়ে করতে নেই। বিয়ে শব্দটার মধ্যেই ব আছে আর ব থেকে বরবাদিও শুরু হয়, বুঝলি?"
আদিত্য বলল, "ব থেকে ব-কারান্ত অসংখ্য গালাগালও শুরু হয়।"
সুশোভন হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "একজ্যাক্টলি। আচ্ছা শোন, এই বিপ্লবী রিন্টুর সম্পর্কে বেশ খানিকটা ইনফরমেশন বের করতে পেরেছি। ইজাজ মল্লিকের চামচা এগুলো সব। তবে শিক্ষিত চামচা।"
আদিত্য বলল, "আর ভাই, এরা যত শিক্ষিতই হোক আসলে সব এক।"
সুশোভন সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বললেন, "তুইও এভাবে কথা বলছিস কেন? একটা ঘটনা থেকে হঠাৎ এত জাজমেন্টাল হয়ে যাওয়ার তো কোনও কারণ নেই! তুই জামান সাহেবকে দেখিসনি? সবাই শুধুমাত্র লাভ জিহাদ করবে বলেই ভালোবাসে না রে ভাই। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে এই মুহূর্তে একটা চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে।"
আদিত্য তেতো গলায় বলল, "এই মুহূর্তে কী রে, আমি খিদিরপুরে একটা ফ্যামিলিকে চিনি, পাঁচ ভাইয়ের পাঁচজনই ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ে করেছে। এরা হিন্দু মেয়েদের টার্গেট বানায়। কোথায়, একটা মুসলিম মেয়ে যখন হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে ওরা চুপ করে বসে থাকে দেখেছিস? এদের কী করা উচিত জানিস? হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো, সবকটাকে একসঙ্গে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা উচিত। সমাজ থেকে কতগুলো জঞ্জাল দূর হবে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আর সবাইকে কনভার্ট করতে হবে। কেন রে? কনভার্ট করে কী হবে?"
আদিত্য চেঁচিয়ে ফেলেছিল। আশপাশের টেবিল থেকে সবাই তার দিকে তাকাল। আদিত্য চুপ করে গেল।
সুশোভন বললেন, "আদিত্য, ভেতরের পশুটাকে বের করিস না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা পশু লুকিয়ে আছে। কেউ ইন্ধন পেয়ে সেটাকে বের করে ফেলি, কেউ বা আজন্মকাল সযত্নে সেটাকে লুকিয়ে রেখে দি। ভেতরে ভেতরে আদতে আমরা সবাই মারাত্মক কমিউনাল। রেড রোডে নামাজ পড়তে দেখলে কখনও শ্লেষ করি, হিন্দুদের ধর্মের জন্য মাতামাতি করতে দেখলে ওরাও হাসাহাসি করে। সমস্যাটা হল, যত দিন যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে ধর্মবোধটা বড্ড বেশি চাগাড় দিচ্ছে। মনে করে দেখ, আমাদের ছোটোবেলায় এসব ব্যাপার এতটা ছিল না। ইদানীং সবাই কেমন আফিমের মতো সব কিছু ভুলে ধার্মিক হয়ে উঠছে। কিন্তু এটা কি সলিউশন? আই উইশ, সবরকম ধর্মকে একবারে তুলে দেওয়া যেত। পৃথিবীর আসল সমস্যাগুলোর দিকে কেউ নজর দেবে না, পলিউশন, ক্যান্সার, গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে ভাববে না, সারাক্ষণ ধর্ম ধর্ম করে যাচ্ছে। এই রিন্টু ছেলেটা ফিজিক্সে অনার্স জানিস? ফিজিক্স, ভাব জাস্ট। সে ছেলে এরকম ব্রেনওয়াশড হয়ে

গেল। তুই, তোর মতো একটা সেনসিটিভ ছেলে এখন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কথা বলছিস। নিজে ঠান্ডা মাথায় ভাবিস তো, কী বললি। কেন এগুলো তোর মাথায় আসবে?"
আদিত্য লজ্জিত হল। বলল, "হুঁ। ঠিকই। আমার মাথা কাজ করছে না অ্যাকচুয়ালি।"
সুশোভন বললেন, "স্বাভাবিক। মানুষের মাথা যেখানে কাজ করা বন্ধ করে এরকম পরিস্থিতিতে, তখন থেকেই তারা কোণঠাসা হয়ে গিয়ে এসব ভাবতে, বলতে শুরু করে। তা ছাড়া ইন্ধন দেওয়ার মানুষের তো অভাব নেই। সাধে কি আর আমাদের দেশে সামান্য কোনও মাংস থেকে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব? ফ্রাস্ট্রেটেড হতে হতে মানুষ চিন্তাভাবনা করা ছেড়ে দিচ্ছে। সারাক্ষণ ধর্মের আফিমে বুঁদ হয়ে থাকতে চাইছে। বিলিভ মি আদিত্য, এগুলো সলিউশন নয়। মানুষকে মেরে ধর্ম শেখানো কোনও সলিউশন হতে পারে না।"
আদিত্য একগ্লাস জল খেল। তারপর বলল, "কী করব এবারে?"
সুশোভন বললেন, "মাথা ঠান্ডা কর। সিচুয়েশন এসেছে, হ্যান্ডেল কর। রাগ করিস না। বউকে বোঝা। জীবন এতটাও কঠিন না যতটা আমরা করে দি।"
আদিত্য চুপ করে বসে রইল।

৩৯

আদিত্য ঘরে ঢুকলে ঝুমকি জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল।
আদিত্য বলল, "খেয়ে নিস। খাবার এনেছি।"
ঝুমকি বলল, "আচ্ছা। ও বাড়ির কী খবর?"
আদিত্য খাবারের প্যাকেট টেবিলের ওপর রেখে বলল, "তোর বাবা মা দিদি চিন্তা করছিল দেখে বলে দিয়েছি তুই এখানে আছিস।"
ঝুমকি বলল, "ওরা কী বলল?"
আদিত্য চেয়ার টেনে বসল, "পরিস্থিতি ভাল। তোর বাবা যেমন মারমুখী হয়ে ছিলেন এখন অতটা নেই। আশা করছি তোর হোম ফ্রন্ট বেশি ঝামেলা করবে না আর।"
ঝুমকির মুখ আলোকিত হল, "সত্যি?"
আদিত্য মাথা নাড়ল, "হুঁ। আর তোর ওই জানোয়ারটা আবার চমকাতে চেষ্টা করছে। ভালোবাসার টান আর কি। খুব ভালোবাসে তোকে বোঝাই যাচ্ছে।"
ঝুমকি বলল, "ভালোবাসা কতটা সেটা তো বুঝেছি। সবটাই দখল করে রাখার চেষ্টা। মানুষ যে এত তাড়াতাড়ি এভাবে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ওকে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।"
আদিত্যর ফোন বাজছিল। আদিত্য দেখল রুমকি ফোন করছে। আদিত্য ফোনটা ঝুমকির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ধর, তোর দিদি।"
ঝুমকি বলল, "তুমি কথা বলবে না?"
আদিত্য বলল, "কথা বল।"
ঝুমকি ফোনটা ধরল, তিরিশ সেকেন্ড কথা হতে পারল না কাঁদতে শুরু করল।
আদিত্য উঠে নিজের ঘরে গেল। ভালো লাগছিল না তার।
মানুষ অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও কখনও কখনও একা হয়ে পড়ে। খাটের ওপর বসে দেওয়ালে টাঙানো বিয়ের ফটোর দিকে চোখ গেল। দুজনে কী সুন্দর হাসছে! একটা ছবি কত ভুল বার্তা দিতে পারে!
খালি চোখে দেখে যেটা মনে হয়, বাস্তবটা তার থেকে কখনও কখনও অনেক দূরে হয়। রুমকির সন্দেহপ্রবণতা এমন হল যে নিজের বোনকে নিয়েও সন্দেহ করতে ছাড়ল না! এত দিনে তাকে এই চিনল? দীর্ঘশ্বাস ফেলল আদিত্য। একইসঙ্গে বিরক্ত হল। অফিসে বেশ কিছু কথা শুনতে হবে তাকে। এভাবে ডুব দেওয়া যে ঠিক না তার থেকে আর কে ভালো বোঝে!
ঝুমকি নক করল, "দিদি কথা বলবে।"

আদিত্য বলল, "আচ্ছা দে।"
ঝুমকি ফোনটা দিয়ে চলে গেল।
আদিত্য ফোন কানে না নিয়ে কেটে দিল।
রুমকি আবার ফোন করছে।
আদিত্য কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে ধরল, "হ্যালো।"
রুমকি বলল, "তুমি কেটে দিলে কেন?"
আদিত্য বলল, "কেটে গেছে। বলো কী বলবে। ঝুমকি আমার পাশে আছে নাকি এটা বোঝার জন্য ফোন করেছ তো?"
রুমকি একটু চুপ করে থেকে বলল, "মা খুব কান্নাকাটি করছে। ঝুমকিকে দেখতে চাইছে। আমি মাকে নিয়ে আসছি।"
আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, আর ওরা বুঝে গিয়ে এ বাড়িতে অ্যাটাক করুক। এরকম হলেই ভালো হয়, তাই না?"
রুমকি বলল, "আমি সেটা বলিনি। মা কাঁদছে, বাবা চিন্তা করছে, আমি কী করব?"
আদিত্য বলল, "জানি না কী করবে, তবে তোমার মা এলে ওরা ঠিক জেনে যাবে। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির দিকেও নজর রাখছে।"
রুমকি বলল, "তাহলে আমি যাচ্ছি। আমি তো নিজের বাড়ি যেতে পারি, নাকি তাও না?"
রুমকির গলাটা শ্লেষাত্মক শোনাল। আদিত্যর মাথাও খানিকটা গরম হল, বলল, "এসো। আমারও তাহলে অফিস ফেলে বাড়িতে বসে থাকতে হয় না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আমারও যে খুব ভালো লাগে, তা তো নয়।"
রুমকি বলল, "ঠিক আছে। আমিই যাচ্ছি। আর বাবা বলছিল ঝুমকিকে শুদ্ধিকরণ করাবে।"
আদিত্য বলল, "গো-মূত্র খাওয়াবে বুঝি? আর গোবর? এগুলোই বাকি আছে তো! এসবই করো তোমরা।"
রুমকি বলল, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? রাগার তো কিছু নেই! ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে অন্য একটা ধর্মের লোকজন নিয়ে গেছে, রেপ করেছে, সেটার শুদ্ধিকরণ করা দরকার না?"
আদিত্যর মনে হচ্ছিল মাথা এত গরম হচ্ছে যে কেউ ইচ্ছা করলে মাথায় অমলেট ভেজে ফেলতে পারে। ভীষণ জোরে চ্যাঁচ্যাতে ইচ্ছা করছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল, "তুমি এসো। এসে আমাকে উদ্ধার করো। আর যন্ত্রণা দিয়ো না। এসব কথা আমাকে বলবে না দয়া করে। আমি নিতে পারছি না।"
রুমকি বলল, "এখন বেরোচ্ছি আমি। তুমি কিছু খেয়েছ?"
আদিত্য বলল, "সেসব তোমার জানার দরকার নেই। বললাম তো, এসে উদ্ধার করো আমায়!"
রুমকি বলল, "ঠিক আছে, আমি বেরোচ্ছি। রাখলাম।"
আদিত্য ফোন কেটে গুম হয়ে বসে রইল।

৪০

রুমকি এসেছে। একাই। বাবা বা মা কাউকে আনেনি।
আদিত্য দরজা খুলতে রুমকি তাকে দেখে বলল, "ঝুমকি কোথায়?"
আদিত্য বলল, "গেস্ট রুমে।"
রুমকি ঘরে ঢুকলে আদিত্য দরজা বন্ধ করল।
রুমকির গলা পেয়েছিল ঝুমকি। একপ্রকার ছুটে চলে এল।
রুমকিকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, তাকে একপ্রকার চমকে দিয়ে রুমকি ঝুমকিকে জোরে একটা চড় কষাল।
ঝুমকি কেঁদে ফেলল।
রুমকি বলল, "এটা তুই কী করেছিস? একবার আমাকে বলতে পারতিস না?"

ঝুমকি কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল।
আদিত্য কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে গেল।
কিছুক্ষণ পর রুমকি এসে বলল, "তুমি ও ঘর থেকে চলে এলে কেন?"
আদিত্য বলল, "কী করব? তুমি এসে গেছ যখন তুমিই দ্যাখো। আমার অফিস যেতে হবে কাল থেকে।"
রুমকি বলল, "সে যা খুশি করো, ঝুমকিকে ও বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। বাবা বলল, প্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা করে দেবে।"
আদিত্য রাগল না। ঠান্ডা মাথায় রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা রিকশা আর একটা মাইকের ব্যবস্থা করে দেব? তাহলে বেরিয়ে সবাইকে বলে বেড়াতে পারবে ঝুমকি বাড়ি ফিরে এসেছে? রিন্টুদেরও তাহলে দলবল নিয়ে এসে তোমাদের বাড়ি ভাঙচুর করতে সুবিধা হবে।"
রুমকি একটু থতোমতো খেয়ে পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? রাগ করার মতো কিছু বলেছি?"
আদিত্য বলল, "নাহ। কিছুই বলোনি। শোনো সুশোভনের সঙ্গে কথা না বলে আমি অন্য কোনও কিছু ভাবতে পারছি না।"
রুমকি খাটে বসে বেডকভারের দিকে কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।
তারপর বলল, "ছেলেটা ঝুমকিকে রেপ করেছে। প্রোটেকশনও নেয়নি। আমার মনে হয় বোনের মেডিক্যাল টেস্ট করা দরকার। যদি কোনও অঘটন হয়? যদি কোনও রোগ এসে যায়?"
আদিত্য বলল, "তোমার কোনও ধারণা আছে ওদের র‍্যাকেটটা ঠিক কত বড়ো? কত শক্তিশালী ওরা? দুটো দিন যেতে দাও।"
রুমকি বলল, "মেডিক্যাল টেস্ট এখনই করতে হত।"
আদিত্য বলল, "বেশ তো, করা হবে।"
রুমকি গুম হয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "বোনটা এই দুদিনেই কেমন যেন হয়ে গেছে। একবার ভাবছি কষিয়ে পরপর চড় মারি, আর-একবার মনে হচ্ছে বুকে জড়িয়ে ধরি।"
আদিত্য চুপ করে রইল।
রুমকি নরম গলায় বলল, "আমি তোমার সঙ্গে মিসবিহেভ করেছি। ঠিক করিনি। আমার ভুল হয়ে গেছে।"
আদিত্য অবাক হল। রুমকি ক্ষমা চাইছে? সূর্য কোনদিকে উঠেছিল আজ কে জানে! সে বলল, "সুশোভন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে। তবু তুমি বেরোলে একা বেরিয়ো। ঝুমকিকে নিয়ে বেরোবে না। ব্যালকনিতেও যেন ঝুমকি না যায় খেয়াল রাখবে। এভাবে কোনও দোষ না করে কতদিন এভাবে থাকতে হবে সেটা যদি জানতাম।"
রুমকি খানিকটা ইতস্তত করে বলল, "বাবা বলছিল ঝুমকিকে মুম্বইতে যদি দিয়ে আসা যেত। বাবার এক বন্ধুর ছেলের জন্য মেয়ে দেখা চলছে। ওদের কিছু না বলে কোনওভাবে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে ভালো হত। বাবার সঙ্গে একবার কাকাবাবুর ঝুমকিকে নিয়ে কথা হয়েছিল। সেবারে কথা বেশি এগোয়নি। কোনওভাবে যদি পাঠানো যেত..."
আদিত্য কয়েক সেকেন্ড রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঝুমকিকে জিজ্ঞেস করেছ ঠিক এই মুহূর্তে ও আর-একটা সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত নাকি? আর মুম্বই যাবার কথা বলছ? আমাকে নিয়ে যেতে হবে? পারলাম না। যে শহরে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, মানুষ হয়েছি, আমার কাছে সে শহরের থেকে বেশি নিরাপদ শহর আর কিছু হয় না।"
রুমকি বলল, "তুমি কি চাও ঝুমকি এ বাড়িতেই থেকে যাক?"
আদিত্য বলল, "আমার চাওয়া না-চাওয়ায় কিছু যায় আসে না। এভাবে বেশিদিন চলবেও না। সত্যিটা সবাই জেনে যাবে কদিন পর। একটা জলজ্যান্ত মেয়েকে এভাবে মৃত দেখানো তো সম্ভব না। ওরা জানলেই প্রেশার

পলিটিক্স শুরু করবে।"
রুমকি বলল, "যদি ঝুমকির পেটে বাচ্চা চলে আসে তাহলে সেটাকে নষ্ট করার মতো কোনও ডাক্তার চেনো?"
আদিত্য বিরক্ত চোখে রুমকির দিকে তাকাল।

৪১

রুমকি ঝুমকির কাছে গিয়ে বসেছে। দু বোনে মিলে কান্নাকাটি করছে।
আদিত্যর অসহ্য লাগছিল। রুমকি এরকম কেন? একদিকে তাকে সন্দেহও করছে, আর-একদিকে বোনের কাছে গিয়ে করুণাসাগর সাজছে।
একটা সম্পর্কে কেউ থাকলে খামোখা সন্দেহ আসবে কেন? একসঙ্গে থাকার পরে রুমকি তাকে এখনও চিনে উঠতে পারল না। সব পুরুষ কি এক হয়? একজন পুরুষ ধর্ষণ করে, আর-একজন পুরুষ তো মেয়েদের রক্ষাও করে। হাতের সব আঙুল কখনও সমান হয় না রুমকি বুঝবে না? পুরুষ মানেই খারাপ, চরিত্রহীন, আর মেয়ে মানেই অসহায়, এই সরলীকরণ হাস্যকর।
আদিত্য কিছুক্ষণ খাটে শুয়ে থেকে উঠল। তৈরি হয়ে বেরিয়ে রুমকিকে বলল, "আমি একবার অফিস থেকে ঘুরে আসছি। দেখা করে আসাটা দরকার। ঝুমকিকে নিয়ে কোথাও বেরোবে না। বাড়িতে কেউ এলে ঝুমকি যেন বাইরে না যায়। কেউ না, এমনকি পাশের বাড়ির কাকিমা এলেও ঝুমকি সম্পর্কে কোনও কথা বলবে না। বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি?"
রুমকি বলল, "আমি তো ভাবছিলাম তুমি থাকলে ওকে সন্ধে হলে বাড়িতে নিয়ে যাব।"
আদিত্য বলল, "বললাম তো এখন বের করা সম্ভব না। ওদের কড়া নজর থাকবে। সুশোভনের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী স্টেপ ঠিক করব। যদি কোনও অশান্তি না চাও, তাহলে দয়া করে আমি যেমন বলছি সেভাবে চলো।"
রুমকি বলল, "ঠিক আছে।"
আদিত্য বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দাও।"
রুমকি বেরোল। ঘরের বাইরে এসে বলল, "তুমি রাগ করে আছ?"
আদিত্য জুতো পরতে পরতে বলল, "কেন, রাগ করার মতো তুমি কী করেছ?"
রুমকি বলল, "ঠিক আছে, সাবধানে যেয়ো।"
আদিত্য বলল, "দয়া করে কোনওরকম ওপর চালাকি করবে না ঝুমকিকে নিয়ে। মারাত্মক সেনসিটিভ একটা ইস্যু শহর জুড়ে তৈরি হয়ে আছে। ছোটোখাটো কোনও কিছু হয়ে নেই ব্যাপারটা। তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না কী থেকে কী হয়ে যেতে পারে।"
রুমকি বলল, "ওপরচালাকি কথাটা কেন ইউজ করলে? আমি কী ওপরচালাকি করি?"
আদিত্য বলল, "অনেক কিছুই করো। সব কিছু তো বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি তোমার একটা ছোটো ভুল বা পাকামি তোমার ফ্যামিলির প্রতিটা মানুষের লাইফ থ্রেট হতে পারে। আশা করি বোঝাতে পারলাম।"
রুমকি রেগে গেল, "তুমি আমাকে এভাবে ঠুকে ঠুকে কথা বলছ কেন? দুদিনে আমি খারাপ হয়ে গেলাম? আগে তো এরকম করে কথা বলতে না!"
আদিত্য বলল, "আগে এত বড়ো ক্রাইসিস কখনও আসেনি। আমি এভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, কারণ এভাবে কথা না বললে তুমি বুঝবে না। তোমার মাথায় ঢুকবে না। এই কারণেই তোমাকে বলিনি শুরুতেই। মেয়েটা যতক্ষণ ছিল না চিন্তা করলে, যেই ফিরল, প্রায়শ্চিত্ত থেকে শুরু করে মুম্বই পাঠিয়ে দেওয়া অবধি ভেবে ফেলছ। এর থেকে হাস্যকর আর কিছু হয় না। এই মুহূর্তে, যেখানে আমাদের সব কিছু থিতিয়ে

যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে যাওয়া উচিত ছিল, তোমরা সেখানে ঝামেলা করার জন্য একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে দিয়েছ। আমার তোমাদের বলাটাই ভুল হয়েছে। আরও পরে বলতে হত।"

রুমকি বাঁকা সুরে বলল, "আচ্ছা, তাই বুঝি? না বললেই ভালো হত বলো? এভাবে চললেই তো ভালো ছিল!"

আদিত্য বেরোতে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "মানে? কী বলতে চাইছ?"

রুমকি কঠিন মুখে বলল, "যা বলছি বুঝতেই পারছ।"

আদিত্য চুপ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে ঠান্ডা গলায় বলল, "একটা ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, ঝুমকিকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। থাকতে হবে না। জাস্ট গেট লস্ট।"

রুমকি তার দিকে চমকে তাকিয়ে বলল, "মানে?"

আদিত্য বলল, "মানেটা পরিষ্কার, তোমাকে আর তোমার বোনের বা তোমাদের ফ্যামিলির অনেক হেল্প করেছি, করে যখন তুমি আমার দিকেই আঙুল তুললে তখন থাকল। জাস্ট বেরিয়ে যাও। আমি ডিভোর্স ফাইল করব। যা হবে দেখা যাবে।"

রুমকি তার দিকে আগুনে চোখে তাকিয়ে বলল, "এত বড়ো কথাটা তুমি বলতে পারলে?"

আদিত্য বলল, "হ্যাঁ, বলতে পারলাম। তুমি তার থেকেও অনেক বড়ো কথা বলেছ। আমি অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। আর পারলাম না। জাস্ট বেরিয়ে যাও। নইলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করব।"

রুমকি তার দিকে কয়েক সেকেন্ড আগুনে চোখে তাকিয়ে জোরে জোরে শব্দ করে ঝুমকির ঘরের দিকে এগোল।

৪২

সুশোভনকে ফোন না করেই পুলিশ কোয়ার্টারে পৌঁছে আদিত্য সমস্যায় পড়ল।

সুশোভন কোয়ার্টারে ছিল না। ফোন করে জানা গেল ওর ফিরতে আর-একটু দেরি হতে পারে। আদিত্য কমপ্লেক্সের বাইরে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল। মাথা ঠিক নেই। রুমকি বাড়িতে এসে নতুন কী ঝামেলা তৈরি করবে বোঝা যাচ্ছে না।

চায়ের দোকানে মন্দির নিয়ে আলোচনা চলছে। মসজিদ ভাঙা হয়েছিল, তার জায়গায় মন্দির হবে। মানুষ বেশ খুশি।

আদিত্যর অস্বস্তি হচ্ছিল। সবার খুশিই ভীষণ প্যাসিভ। নিজের জীবনে খুশির লেশমাত্র নেই মানুষের। অন্যের ক্ষতিতেই যেন আনন্দটা বেশি আসে আজকাল।

রুমকি মেসেজ করেছে। তাড়াতাড়ি ফেরে যেন। অনেক কথা আছে।

আদিত্য দেখল শুধু। উত্তর দিল না। কোনও কোনও ঘটনায় জড়াতে না চাইলেও জড়িয়ে যেতে যেতে একসময় এমন অবস্থা হয় যে বেরোনোর পথ থাকে না। রিন্টুর নাম রুবেল, এটা জানার পর ঝুমকি যেমন বেরোতে চেয়েছিল।

আদিত্য ভাবল, সত্যিই তো! ভালোবেসে বেরোতে চেয়েছিল, কেন বেরোতে চাইবে? পরক্ষণে মনে হল একটা সম্পর্কে প্রবেশের আগে অপর পক্ষকে নিজের খুঁটিনাটি জানানোটাও সম্পর্কের প্রধান শর্ত হওয়া উচিত। ভালোবাসাটা যদি মোক্ষ হত, তবে ভালোবেসেই রিন্টু ঝুমকিকে অনায়াসে জয় করতে পারত। ঝুমকির পালিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ত না। জোর করা কেন? নিজের ধর্মে আর-একজন মানুষ বাড়িয়ে কী হবে? আদিত্য বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন কি আবার ক্রুসেডের সময় আসছে? সেই মধ্যযুগই ফিরে আসবে? মানুষের থেকে ধর্ম বড়ো হয়ে যাচ্ছে?

চা বিস্বাদ লাগছিল তার। ফেলে দিল। সুশোভনের জিপ থেকে নেমে চায়ের দোকানেই এলেন। তাকে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার? গৃহে শান্তি নেই?"

আদিত্য কাঁধ ঝাঁকাল। সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "চ ভেতরে গিয়ে বসি।"
দুজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ কমপ্লেক্সে ঢুকল। আর পাঁচটা কমপ্লেক্সের মতোই। প্রায় সব কোয়ার্টার থেকেই সিরিয়ালের গান ভেসে আসছে।
সুশোভন বললেন, "তোকে দেখে আজকাল মনে হয় বিয়ে না করে বেঁচে গেছি। মানে কতরকম জ্বালা ভাব মানুষের। বিয়ে করে এক জ্বালা। শ্বশুরবাড়ির পরিবারকে রক্ষা করলে এক জ্বালা। না করলে আর-এক। মানে যা তা মাইরি!"
দরজা খুললেন সুশোভন। আদিত্য বিরক্ত গলায় বলল, "ঝুমকি আমার নিজের বোন হলে কান ধরে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারতাম। পাকা মেয়ে কোথাকার!"
সুশোভন সোফায় বসে জুতো খুলে জুতোজোড়া সোফার তলায় ঠেলে দিয়ে বললেন, "ভুল করছিস। পাকামির কিছু নেই। ভুলের থেকেও বড়ো কথা, ভিকটিম ব্লেমিং করছিস। এটা যে-কোনো রেপের পর পলিটিক্যাল লিডাররা করে। যে রেপড হয়েছে, দোষটা যেন তারই। ঝুমকির দোষ খুঁজছিস তোরা। অথচ আমরাই নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা খুঁজি।"
আদিত্য গুম হয়ে বসল। সুশোভন সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে বললেন, "দিস র‍্যাকেট ইজ ইনক্রিজিং। লাভ জিহাদ অ্যান্ড অল। কনভার্ট অ্যান্ড দেন ম্যারেজ অর ভাইস ভার্সা। অনেকটা স্লিপার সেলের মতো কাজ করে ব্যাপারটা। হুইসপার ক্যামপেনিং, অ্যাজ ইফ অন্য ধর্মের মেয়ে বিয়ে করাটা বিরাট কৃতিত্ব।"
আদিত্য বলল, "আমি কী করব সেটা বল। কাল থেকে অফিস জয়েন করব? রুমকিরা প্ল্যান করছে ঝুমকিকে দূরে কোথায় পাঠাবে।"
সুশোভন হাসলেন, "দূরে মানে? আউটসাইড কান্ট্রি?"
আদিত্য মাথা নাড়ল, "না আউটসাইড স্টেট।"
সুশোভন বললেন, "ধুস, এদের নেটওয়ার্ক কতটা তোদের কোনও ধারণা নেই বলে বলছিস। যেদিন খুঁজে পাবে পাতি খুন করে দেবে।"
আদিত্য শিউরে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখন কী করার আছে?"
সুশোভন তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমিও অন্ধকারে। জাস্ট ভেবে যাচ্ছি কী করা যেতে পারে। তুই অফিস জয়েন কর। আর রুমকিকে বল এখন চুপ করে থাকতে।"
আদিত্য বলল, "ওটাই তো ওদের সমস্যা। চুপ করে থাকলে তো হয়েই যেত!"
সুশোভন বললেন, "ওকে, চল আমি যাব তোর বাড়ি। আমি বললে যদি কিছু হয়।"

৪৩

সুশোভনকে নিয়ে আদিত্য বেরোতে গিয়ে রাস্তাতেই বাধা পেল। মিছিল বেরিয়েছে।
সুশোভন বললেন, "মিছিলটা শান্তই, তবে মিছিলের মধ্যে কয়েকজনের বডি ল্যাংগুয়েজ সুবিধের লাগছে না। এনআরসি বিরোধী মিছিল মানেই এখন রেড অ্যালার্ট থাকছে।"
আদিত্য বিরক্ত মুখে বলল, "চারদিকে সমস্যা। বাড়িতে সমস্যা, বাইরে সমস্যা। এত সমস্যা হলে তো পাগল হয়ে যাব রে।"
সুশোভন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সময়টাই বড্ড খারাপ যাচ্ছে বুঝলি। মানুষজনও কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে। কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ বুঝতে পারছে না। ইভেন আমিও জানি না এনআরসি করে কী লাভটা হবে। তবে এই এক শ্রেণির মানুষকে যে তাতানো হচ্ছে মারাত্মক পরিমাণে, সেটা বুঝতে পারছি। এই যে জ্যামে আটকা পড়ে আছিস এদের জন্য, এই বিশেষ পোশাক পরিহিত মানুষজনকে, যাদের সারাবছর তেমন চোখেই পড়ে না রেড রোডে নামাজের সময়গুলো বাদ দিয়ে, তোর মনে হচ্ছে না একটা বন্দুক নিয়ে সবাইকে শেষ করে দিই? আদতে, সমস্যার গভীরে গেলে দেখতে পাবি তোর থেকে এরাও খুব একটা আলাদা আনন্দে নেই। এরাও কষ্টে আছে, সমস্যায় আছে। পেটের সমস্যা আছে। সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের প্রায়োরিটি চেঞ্জ হওয়া প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয়নি। মধ্যযুগেও ব্যাপারটা ধর্মে আবদ্ধ ছিল, ব্রিটিশ আমলেও। তুই জাস্ট ভাব, একটা জাত আমাদের দুশো বছর শাসন করল। কোথায় তাদের তাড়ানোটা আমাদের কাছে প্রাধান্য পাবে তা নয়, সুকৌশলে তারা আমাদের দুভাগ করে দুটো দেশে ভাগ করে দিয়ে চলে গেল। বাঙালির মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এতদিন পরে কোথায় সেই ক্ষত নিরাময়ের চেষ্টা করব আমরা তা নয়, এখনও সেই ধর্মটাই আমাদের কাছে প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে।"

আদিত্য বলল, "তুই আমাকে একটা কথা বল, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হল। তাহলে পাকিস্তান মুসলমানদের হল আর ভারত কেন ধর্মনিরপেক্ষ হল? হিন্দুরা আলাদা হল না কেন?"

সুশোভন বললেন, "সেটা ভালো হল না খারাপ হল?"

আদিত্য বলল, "অবশ্যই খারাপ হল। আমরা, মানে হিন্দুরা অহেতুক উদারতা দেখাতে যাব কেন?"

সুশোভন বললেন, "উদারতা দেখানোর প্রয়োজন নেই বলে। যদি বলি দেশটা ধর্মনিরপেক্ষ থাকল বলেই দেশের একটা পচা অংশ পার্টিশনের ফলে বেরিয়ে গিয়ে দেশটা শুদ্ধ হয়েছিল বলে? ভারতবর্ষ তো বরাবরই সব ধর্মের দেশ। এই সেই জায়গা যেখানে শাসকেরা শাসন করতে এসে এই দেশের প্রেমে পড়ে গেছিল। মুঘল শাসকেরা যদি এই দেশ লুটতে আসত, তবে তো তারা সব সম্পদ নিয়ে পালাতে পারত, যেটা ব্রিটিশরা করেছিল। কোহিনুর থেকে শুরু করে মুঘল স্থাপত্যের সব মণিমুক্তো খুঁটে খুঁটে নিয়ে পালিয়েছিল ব্রিটিশরা। এ দেশের সবথেকে বড়ো শত্রু তো তারাই। জাতের নামে, ধর্মের নামে সব ভাগ করে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে যুক্ত হল একজন রামমোহন না পাওয়া, একজনও বিবেকানন্দ না পাওয়া একটা জাতি। মুসলমানদের আমরাও কি কম উপেক্ষা করেছি? এই মধ্যযুগীয় লাভ জিহাদের কথা ওরা ভাবছে কী করে? আর কোনও উদ্দেশ্য নেই কেন ওদের? আমরাই আমরা-ওরা করে ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বলেই তো। কেন এখনও ধর্মে ধর্মে বিয়েতে এত সমস্যা হবে? তুই জানিস, এক মুসলিম মেয়ে এক হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করবে বলেছিল বলে তার বাবা দাদা মেয়েটাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায় জাস্ট পাথর ছুড়ে মেরে ফেলেছে? কতটা অশিক্ষা, কতটা গোঁড়ামি থাকলে এই মানসিকতা আসে ভাব তো। ধর্ম জিনিসটাই এত সমস্যার কারণ। এর ফলেই এত চাপানউতোর চলছে চারদিকে। আমার তো মনে হয় এ দেশে অটোক্রেটিক কোনও শাসন আসা দরকার, যারা সবার আগে ধর্ম জিনিসটাকেই ব্যান করে শুধু যুক্তিবাদের চাষ করাতে বাধ্য করবে। জ্যোতিষ থেকে শুরু করে রাস্তায় রাস্তায় শনি মন্দির, পিরের মাজার সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিক। দাঙ্গা ছড়ানোর প্ল্যান করলে জাত ধর্ম না দেখে গুলি করে মেরে দিক। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। ভাবা যায় একটা উন্নয়নশীল দেশে দাঙ্গা ছড়ানোর ভয়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিতে হয়? হাউ রাবিশ!"

মিছিলে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। একদল মানুষ রাস্তায় টায়ার পোড়াচ্ছে। আদিত্য হতাশ চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছিস। উই নিড অ্যান অটোক্রেটিক লিডার।"

৪৪

সুশোভনকে নিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছল আদিত্য, তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। রুমকি দরজা খুলে দুজনকে দেখে রাস্তা ছেড়ে দিল।

সুশোভন হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? সব ঠিক আছে?"

রুমকি একবার আদিত্যর দিকে তাকিয়ে থমথমে চোখে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী করে থাকবে? সমস্যা তো কিছু মেটেনি।"

আদিত্য বিরক্ত হল। রুমকি এখন সুশোভনের কাছে কাঁদুনি গাইতে শুরু করবে।

সুশোভন সোফায় বসে বললেন, "সমস্যাকে সমস্যা মনে করলে সমস্যা। প্রতিটা ফ্যামিলিতেই একটা না একটা সমস্যা হয়। যে বাড়িতে মেয়ে থাকে, সে বাড়ির লোকজনেরা টেনশনেই থাকে। তাই বলে আমরা যদি সব হাল ছেড়ে দি, তাহলে কী করে চলবে?"

আদিত্য বসেছিল। বলল, "ঝুমকি কোথায়?"

রুমকি বলল, "ঘরে আছে। থাক। সব জায়গায় ওর আসার দরকার নেই।"
সুশোভন বললেন, "কেন নেই? পর্দাপ্রথা মানছেন নাকি?"
রুমকি বলল, "তা নয়। আমি চাই না ওকে নিয়ে সব আলোচনায় ও থাকুক। একটা শকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো!"
সুশোভন কাঁধ ঝাঁকালেন, "তা ঠিক। তো এবার কী করা যায়?"
রুমকি বলল, "হায়দ্রাবাদে আমার এক কাকু কাকিমা থাকেন। ওকে আপাতত ওখানে পাঠানো হবে।"
আদিত্য চমৎকৃত হল। এতক্ষণে তাহলে রুমকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুমকি একটু ইতস্তত করে বলল, "তা ছাড়া ঝুমকির মেডিক্যাল টেস্ট করা দরকার বলে আমার মনে হয়। ও যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে..."
রুমকি থেমে গেল।
সুশোভন বলল, "আচ্ছা, যদি ছেলেটা, কী নাম যেন, রিন্টু, ওর ভুল বুঝে ক্ষমা চায় আর ঝুমকিকে ফেরত নিতে চায়, তাহলে?"
রুমকি রাগল এবার, "কোনও মতেই মানা যাবে না। মানা সম্ভবই না এটা।"
সুশোভন মাথা নাড়িয়ে বললেন, "সেটাই স্বাভাবিক। তবু বোনের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। পরে দুর্বল হয়ে পড়ে যদি?"
রুমকি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "প্রশ্নই আসে না।"
সুশোভন বললেন, "দেখুন এরকম হয় বলেই বলছি আমি। প্রশ্ন আসে না সবাই-ই ভাবে। তারপর দেবাকে সামনে দেখলে দেবী কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আপনার বোনের তরফ থেকে ছেলেটির বিরুদ্ধে স্ট্রং চার্জ আনা দরকার।"
রুমকি বলল, "তার আগে ওকে এই রাজ্য থেকে বের করা দরকার। সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন কি? আমার বাবা মা আসতে চাইছিল এখানে। ছেলেটার বাড়ি থেকে জেনে যাবার চান্স আছে বলে ওদের বহু কষ্টে আটকানো গেছে। এখন আমি চাই না ব্যাপারটা নিয়ে বেশি হইচই হোক।"
সুশোভন বললেন, "ধরুন আপনার বোনকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন। ফাইন। বিয়েও দিলেন। ফাইন। তারপর ওরা কোনও ক্ষতি করল? তখন? মেয়েটা তো একবারে উবে যাবে না!"
রুমকি দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, "তো? আপনি কী বলেন?"
সুশোভন বললেন, "দু পক্ষ বসুন। ঝামেলা মেটান।"
রুমকি শক্ত মুখে বলল, "অসম্ভব। আমরা ওই টেররিস্টদের সঙ্গে বসব না।"
আদিত্য বলল, "ঠিকই। ওরা সংখ্যায় বেশি থাকবে। সভ্যতা ভব্যতারও ধার ধারে না। ওদের কীভাবে বিশ্বাস করা যাবে?"
সুশোভন চিন্তিত চোখে চুপ করে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। সিগারেট ধরালেন। বেশ কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, "আমিও আসলে হাতড়াচ্ছি বলতে পারিস। কনফিউজড আমিও। এরকম মানসিকতা নিয়ে কেউ যখন এগোয়, তাদের কীভাবে আটকাতে হবে আগে বুঝে উঠতে পারি না। একটা কেসে আমার ট্রান্সফার অবধি হয়ে গেল। আর কী কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে।"
আদিত্য বলল, "এরকম হবে তা তো কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কেউ যে ভালোবাসার ফাঁদ পেতে রেখে এত বড়ো ক্রাইম করবে, আমি কী করে বুঝব?"
সুশোভন বললেন, "দেখ আইন খুব ক্লিয়ার এই ব্যাপারে। যদি মিয়া বিবি রাজি, তবে আইন কিচ্ছু বলবে না। একজন অরাজি থাকলে, তার ওপর প্রতারণা হলে আইন অভিযুক্তকে ছাড়বে না। মেয়েটিকে ডাকুন। আমি কথা বলতে চাই।"
সুশোভন রুমকির দিকে তাকাল।

জামান সাহেব চেম্বারে একাই ছিলেন। সুশোভন ঢুকতে জামান বললেন, "এসো। তোমার সন্দেশখালি না ডায়মন্ড হারবার কোথায় যেন একটা ট্রান্সফার হয়েছে না?"
সুশোভন হাসলেন, "আর কী বলব সাহেব।"
জামান বললেন, "বসো। কেসটার আপডেট কী?"
সুশোভন বললেন, "ভালো না। মেয়ের বাড়ির লোকও যথেষ্ট গোঁড়া। একবার বলছে দূরে কোথাও বিয়ে দেবে, আর-একবার বলছে শুদ্ধ করবে, এদিকে ইজাজ মল্লিকের লোকেরাও তো ছেড়ে কথা বলবে না।"
জামান সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ দেশে মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই পাপ বুঝলে? আমার মেয়েদের আমি লন্ডনে পড়তে পাঠিয়েছি বলে ভাই-বেরাদরি থেকে কম কথা শুনতে হয় না। ইসলামে এই হারাম, ইসলামে ওই হারাম। এদের কী করে বোঝাব শিক্ষায় কোনও কিছু হারাম হয় না। মানুষ প্রকৃত শিক্ষিত হবে, এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না। তোমার ওই রুবেল শেখ বা রিন্টু, ছেলেটা তো শিক্ষিত। কী লাভ হল? মেয়েটাকে রেপ করল। কনভার্ট করে দিল।"
সুশোভন বললেন, "স্যার লাদেন ইঞ্জিনিয়ার। আইসিসের মাথাগুলো প্রায় সবকটাই উচ্চশিক্ষিত।"
জামান বললেন, "তবেই ভেবে দ্যাখো। সাধে কি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো, এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো! একদিকে এদের গোঁড়ামি শুরু হয়েছে, আর-একদিকে শুরু হয়েছে হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডব। কী, না গোরুর মাংস ফ্রিজে রেখেছে বলে কুপিয়ে খুন করে দিল। আর-একজন ট্রেনে যাচ্ছিল, টিফিন খুলে মাংসের গন্ধ বেরিয়েছে, তাকে মেরে দিল টিফিনে গোরুর মাংস আছে বলে। সিস্টেম কখন ভুল পথে যায় বল তো? এদের বিরোধীরা এখন বলছে মাংসটা গোরুর না। মানে গোরুর মাংস হলে খুন করাটা জায়েজ, অন্য কিছুর মাংস তুমি খেতেই পারো।"
সুশোভন বললেন, "পরিস্থিতিটা এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, শিক্ষিত মানুষেরাও ইসলামোফোবিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে স্যার। ইসলামোফোবিয়া একটা রোগ, এটা বুঝছে না। যে লোকটা গোমূত্র খাচ্ছে, সে যেমন গোটা হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে না, তেমনি আজমল কাসভও কিন্তু গোটা মুসলিম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে না।"
জামান বললেন, "উঁহুঁ। সমস্যাটা অন্য জায়গায় সুশোভন। আমাদের মধ্যে গোঁড়ামি বড্ড বেশি। এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়েও সেটা বাড়ছে বই কমছে না। আমাদের দোষেই বাকিরা আমাদের দিকে আঙুল তুলতে পারছে। বাংলাদেশের অভিজিৎ রায়ের কেসটা বলো। ভদ্রলোক নিজের মতো করে নাস্তিকতাকে প্রমোট করতেন। বইমেলায় এসেছিলেন। জামাতিরা তাঁকে কুপিয়ে খুন করে দিল। শার্লি হেবদো? কার্টুন আঁকা যাবে না। আঁকলেই খুন করে দেবে। কেন? ধর্ম কবে থেকে এত ভয়ংকর হয়ে উঠল? ধার্মিক হওয়া মানে কি মানুষে মানুষে খুনোখুনি? এই দুহাজার কুড়িতে এসে যদি আমরা এসব নিয়ে পড়ে থাকি তাহলে কিছু বলার নেই। তুমি জানো, আমি এই কালকেও একটা মাইনর বিয়ে আটকে এলাম সাউথ টুয়েন্টি ফোর পরগনা থেকে? আমাদের চাচার বাড়ি ওখানে। গিয়ে দেখি চোদ্দো বছর বয়সি মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে গ্রামের লোক ঘিরে ধরে এই মারে কি সেই মারে। আমি চ্যাঁচামেচি করে, শাসিয়ে ব্যাপারটা আটকালাম। আমি মুসলমান বলে ওরা কথাটা শুনল। আমার জায়গায় তুমি থাকলে তোমাকে কুপিয়ে পুঁতে দিয়ে আসত। এই অশিক্ষিত ধর্মভিত্তিক দেশে মুক্তচিন্তা করা লোকেরা অপরাধী হয়ে যাচ্ছে। তাদের বিভিন্ন গালাগাল দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যারাস করা হচ্ছে। দিস ইজ ডিটোরিয়েটিং এভরিডে।"
জামান সাহেব হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।
সুশোভন বললেন, "স্যার, আপনি ইজাজ মল্লিকের সঙ্গে বসুন। ব্যাপারটার একটা সুরাহা হোক। আমার বন্ধু, মানে আদিত্যর জীবনটা হেল হয়ে গেছে। সঙ্গে আমারও।"
জামান বললেন, "কাকে কাকে রাখতে চাও মিটিং-এ?"
সুশোভন বললেন, "আগে একটা প্রাইমারি মিটিং হোক। আমি আপনি আর ইজাজ মল্লিক থাকি। দরকার হলে ওই রিন্টু ছেলেটাকেও ডেকে নেওয়া যেতে পারে। যদি বুঝি আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে, তখন আমরা

পরের স্টেপটা নিয়ে ভাবব।”
জামান বললেন, “ঠিক আছে। ইজাজ মল্লিক কিন্তু ঘুঘু লোক। সতর্ক থেকো সুশোভন।”
সুশোভন মাথা নিচু করলেন, “শিওর স্যার।”

৪৬

“আজকে ইউপিতে আমাদের তিনটে মহল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে হিন্দুরা।”
জামান সাহেবের চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে ইজাজ মল্লিক বলল। সুশোভন আর জামান আগে থেকেই বসে ছিলেন। জামান বললেন, “বসুন জনাব।”
ইজাজ মল্লিক চেয়ারে বসে সুশোভনের দিকে একবার তাকিয়ে জামানকে বলল, “উনি থাকবেন?”
জামান বললেন, “কেন? উনি হিন্দু বলে আপনার অসুবিধা?”
ইজাজ বলল, “আমার কোনও অসুবিধা নেই। হিন্দু, মুসল্লি, খ্রিস্টান সবই তো সামলাই। তবে এনাকে তো ট্রান্সফার করা হয়েছিল। ইনি নিজের কাজ না করে কলকাতায় কী করছেন সেটাই ভাবছি।”
সুশোভন বললেন, “আমরা মেটাতে চাইছি জনাব। আপনার হেল্প ছাড়া তো সেটা সম্ভব না।”
ইজাজ দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, “আমরা কি একবারও বলেছি আমরা মেটাতে চাই না? আপনি মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিন, মেয়েটা স্বামী সংসার করুক, বাচ্চা হোক, সুখ পাক, আর কিছু তো চাইনি।”
সুশোভন বললেন, “প্রথমত মেয়েটা কোথায় আছে, আমরা কেউ জানি না জনাব। দ্বিতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মেয়েটা স্বেচ্ছায় বিয়েটা করেনি। ফোর টুয়েন্টি করে বিয়েটা হয়েছিল, তথ্য গোপন করে। এক্ষেত্রে ছেলেটি দোষী হয়।”
ইজাজ হাত বাতাসে ঘুরিয়ে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে বলল, “ওতে কী হয়? কটা বিয়ে স্বেচ্ছায় হয়? মেয়েমানুষের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু হয় নাকি? বিয়ে হয়েছে মানে ও মেয়ে রুবেলের স্ত্রী, কনভার্শন হয়েছে মানে ও মেয়ে এখন মুসলিম। কহানি খতম।”
জামান এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিলেন। ইজাজের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। ইজাজ বলল, “কী হল সাহেব?”
জামান বললেন, “আপনি দারুণ কথা বললেন কিন্তু মল্লিকবাবু। আই অ্যাম হাইলি ইমপ্রেসড। এত সোজা সব কিছু?”
ইজাজ বলল, “আপনি একজন মুসল্লি হয়ে এই কথা বলছেন জনাব? কিনে নেওয়া জাজ দিয়ে বাবরি মসজিদের রায় ঘুরিয়ে দেওয়া হল। আপনার খুন ঘুমিয়ে ছিল তখন? সবখানে আমাদের মুসলিম ভাইদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, আমরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছি, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?”
জামান সুশোভনের দিকে তাকালেন, “দেখলে সুশোভন, তুমি জাস্ট একজন গেরুয়াপন্থী আর আর-একজন ইজাজ মল্লিককে পাশাপাশি বসাও। দেখবে কথাগুলো জাস্ট রিফ্লেক্ট করে যাবে। গেরুয়াপন্থী বলে যাবে কাশ্মীরে যখন পণ্ডিতদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? আর এখানে মল্লিকবাবুরা এসব বকে যাবেন। মল্লিকবাবু”, জামান সাহেব মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এসব বলতে পারেন না। ঠান্ডা মাথায় ভাবুন সমস্যাগুলো কীভাবে বাড়তে চলেছে।”
ইজাজ মল্লিক বলল, “আপনি কী চান?”
জামান বললেন, “আমরা একটা স্থিতাবস্থায় আসি। মেয়েটাকে টিভির মাধ্যমে জানাই, তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই আমরা মেনে নেব। তুমি যদি চাও সংসার করতে, করো। না চাইলে ইউ আর ফ্রি টু গো। আর আমি চাই, এই অ্যানাউন্সমেন্টটা আপনি করুন।”

ইজাজ বাজে ভাবে হেসে উঠে বলল, “কী সব বলে যাচ্ছেন জামান সাহেব। নিজের ধর্মের মানুষের প্রতি আপনার কোনও সহানুভূতি নেই?”
জামান বললেন, “এই চেয়ারটায় বসলে আমার কাছে সবাই সমান। এ দেশের সংবিধান আমাকে সেটা শিখিয়েছে।”
ইজাজ বলল, “এ দেশের সংবিধান সবাই মানছে? খোদ হিন্দুরাই মানছে?”
জামান বললেন, “কুড়ি শতাংশ হিন্দুরা মানছে না। বাকি আশি শতাংশ হিন্দুরা মানছে বলেই এখনও দেশে শান্তি আছে। একটা মুসলিম কান্ট্রি আর একটা সেকুলার কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়ার মধ্যে এই কারণেই এখনও হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স মল্লিক সাহেব। আমি ভুল বলছি?”
ইজাজ রেগে গেছিল। জোরে জোরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, “আপনার ইমান আপনি বন্ধক রেখে দিয়েছেন জামান সাহেব। আপনি নিজেও জানেন না, আপনি কী ভয়ংকর কথা বলছেন।”
জামান ঠান্ডা গলায় বললেন, “আমি অনেক সহানুভূতিশীল হয়ে কথাটা বলছি। সত্যিকারের ভয়ংকর রূপ দেখাতে চাইলে ওই রুবেল শেখ নামের ছেলেটাকে লাঠি দিয়ে আগাপাশতলা পেটাতাম, সঙ্গে ওকে যারা মদত দিচ্ছে তাদেরও। পুলিশ কিছু করে না, আমাদের হাত পা বাঁধা বলে আমরা চুপ করে থাকি। আপনার কাছে একটা ফেবার চাইছি, আপনি সেটা দয়া করে করে দিন। নইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আমাকে মাঠে নামতে হবে।”
ইজাজ গম্ভীর মুখে জামানের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন জামান সাহেব।”
জামান বললেন, “হুমকি দিচ্ছি না, রিকোয়েস্ট করছি মল্লিকসাহেব। অত্যন্ত ভদ্রভাবে, হাতজোড় করে আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি। পুলিশের হুমকি এত নরমভাবে হয় না, জানেন বোধহয়। আপনার অন্যান্য ব্যবসাও তো আছে মল্লিকসাহেব। কেন সেগুলো অকারণ হ্যাম্পার করবেন বলুন?”
ইজাজ মল্লিক লাল চোখে জামান সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল।

৪৭

খবরের কাগজ এসেছিল। আদিত্য স্নান করে এসে সেটাই দেখছিল। রুমকি আদিত্যকে খেতে দিয়ে বলল, “আজ ওদের মিটিং-এ কী হবে কে জানে।”
আদিত্য বলল, “পজিটিভ ভাবছি।”
রুমকি বলল, “কী পজিটিভ ভাবছ? আমার বোনটার তো যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে।”
আদিত্য বলল, “কীরকম সর্বনাশ? কোনও মেয়ে রেপড হলে কি সব শেষ হয়ে যায়?”
ঝুমকি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রুমকি ঝুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “তুই ঘরে যা।”
আদিত্য খাওয়া থামিয়ে বলল, “না। কোনও ঘরে যেতে হবে না। ঝুমকি। এদিকে আয়। বস।”
রুমকি থমথমে মুখে আদিত্যর দিকে তাকাল। ঝুমকি ইতস্তত করে চেয়ার নিয়ে বসল।
আদিত্য রুমকির দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বলি। এবার মনে হয় এগুলো বলার সময় হয়েছে। বলি?”
রুমকি বলল, “তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।”
আদিত্য বলল, “হোক না। এতদিন তো যাওয়াই হয়নি। আজ নাহয় দেরি হবে। কিন্তু কথাগুলো বলা দরকার।”
রুমকি বলল, “বেশ। বলো।”
আদিত্য বলল, “ঝুমকি একটা ভুল করেছে। ঝুমকির বয়স আঠেরো বা উনিশ। এই বয়সে সবাই ভুল করে। ঝুমকিও করেছে। বয়সটাই খারাপ। কলেজে একজন সুপুরুষ ছেলে দেখে প্রেমে পড়েছে, সেটাকে আমি ভুল বলছি না। ভুল বলছি, কোনও কিছু যাচাই না করে, বাড়িতে কিছু না বলে, অন্ধের মতো ছেলেটার সঙ্গে চলে গেছে এবং যাওয়ার পরে বুঝেছে সে বিরাট ভুল করেছে। আমি ভুল বলছি ঝুমকি?”

ঝুমকি মাথা নাড়ল।
আদিত্য বলল, "আমি অনেক ভেবেছি। সুশোভনের সঙ্গেও কথা বলেছি। আমার মনে হয়েছে, আমাদের সমাজের মূল সমস্যা হল ভিক্টিম ব্লেমিং। একটা মেয়ের রেপ হলে দোষটা মেয়েরই হয়। কেন মেয়েটা রাত করে বাড়ি ফিরেছিল, কেন মেয়েটা ছোটো পোশাক পরেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ভিক্টিম ব্লেমিংটা শুধু সব দিক দিয়ে হল। এমনকি পালিয়ে গেছিল বলে রাগের মাথায় ঝুমকিকে ডিসওন অবধি করা হচ্ছিল। যাই হোক, সেসব মিটেছে। ঝুমকিকে জোর করে রিন্টু ধানবাদ নিয়ে গেল এবং ওর মতের অমতে ওকে রেপ এবং কনভার্ট করতে গেল। যদিও কনভার্ট করা অত সোজা না, ঝুমকির কনসেন্ট না থাকলে সেটা হবেও না, তবু, আমাকে বলো তো, এত কিছুর মধ্যে ঝুমকি কী করল? রেপ হলেই সব শেষ হয়ে যাবে? ঝুমকির কি রিন্টুর প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আছে? থাকলে বলুক। কি রে ঝুমকি, আছে?"
ঝুমকি বলল, "আমি যখন জানতে পারলাম রিন্টু আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে, তখন থেকেই আমার ওর প্রতি সব ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেছে।"
আদিত্য বলল, "এবং অপরাধবোধ এসেছে। তাই তো?"
ঝুমকি মাথা নাড়ল।
আদিত্য রুমকির দিকে তাকাল, "তুমি ঠিক কী করে মনে করো ঝুমকির সর্বনাশ হয়ে গেছে?"
রুমকি কেঁদে ফেলে বলল, "ওকে কেউ বিয়ে করবে না। কে বিয়ে করবে বলো তো ওকে?"
আদিত্য বলল, "ঝুমকির ক্লাস টুয়েলভে নাইন্টি ফাইভ পারসেন্ট ছিল না?"
রুমকি বলল, "তাতে কী হয়?"
আদিত্য বলল, "একটা মেয়ের জীবনে বিয়ে করাটাই কি সব? ঝুমকির যা মেধা আছে, ও চাইলে হায়ার স্টাডি করতে পারে। রিসার্চ করতে পারে। নিজের পায়ে চাকরি করতে পারে। তুমি কী করে ওকে একটা চার দেওয়ালের মধ্যেই কল্পনা করতে পারছ? এদিক দিয়ে ভাবলে ওই রিন্টু শেখ, আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় রুমকি? ওরাও ওকে বাড়ির চাকর বানিয়ে রাখত, আমরাও তাই করছি।"
রুমকি বলল, "বাবা মানবে না।"
আদিত্য বলল, "মানতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আমাদের সমাজের সবথেকে বড়ো সমস্যাই তো লোকে কী বলবে? এই লোকের দৃষ্টিকে পাত্তা যারা দেয়নি, তাদের জন্যই আমাদের সমাজটা পালটেছে। সতীদাহ প্রথা আটকালে লোকে কী বলবে ভাবেননি বলেই রামমোহন সেটাকে আটকাতে পেরেছিলেন। বিধবাবিবাহ হলে লোকে কী বলবে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হলে লোকে কী বলবে ভাবেননি বলেই বিদ্যাসাগরের কৃপায় এখনও দেশে পড়াশোনা জিনিসটা টিকে আছে। সিভিল সার্ভিস ছেড়ে দিলে লোকে কী বলবে ভাবেননি বলেই নেতাজি নেতাজি হতে পেরেছিলেন। বাবাকে মানতে হবে। ঝুমকিকে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কি রে ঝুমকি, পারবি না?"
রুমকি ঝুমকিকে ধরে কেঁদে ফেলল। আদিত্য বলল, "কেঁদো না। কেঁদে কেঁদে নিজেদের পজিটিভ এনার্জিগুলোকে ভাসিয়ে না দিয়ে মেয়েটাকে সাহস দাও। আর হ্যাঁ, তোমাদের দুজনের সামনে আমি বলে দি, ঝুমকি আমার বোনের মতোই। ওকে নিয়ে আমাকে সন্দেহ কোরো না দয়া করে। আমি তোমাদের খারাপ চাই না। ভালো চাই। প্লিজ। দয়া করে বোঝো। এই ক্রাইসিস সিচুয়েশনে আমার যা করণীয়, তা আমি করেছি। এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।"
রুমকি চেয়ারে বসে বলল, "আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আসলে পরিস্থিতিটা এমন হয়ে গেছিল..."
আদিত্য বলল, "অফিস গেলাম। দয়া করে কোথাও বেরিয়ো না। ওরা নজর রাখছে, মাথায় রেখো।"
ঝুমকি বলল, "রাখব। সাবধানে যেয়ো।"

বাদশাহ হুমায়ুন হারেমে প্রবেশ করেছেন। মেহজাবিনকে চোখ উপড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

হারেমের মেয়েরা তাঁকে শাহি স্নান করিয়ে রাধার কাছে নিয়ে গেছে। রুকসানা বাদশাহর সঙ্গে এসেছিল। হুমায়ুন রাধাকে বললেন, "ভালো আছ?"

রাধা ঘাড় নাড়ল।

বাদশাহ হাতের ইশারায় রুকসানাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। রুকসানা বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

বাদশাহ বললেন, "মেহজাবিন তোমাকে নিয়ে এসেছিল। তুমি জানতে মেহজাবিন গদ্দার ছিল? আমার ভাই কামরান মির্জাকে ও এখানকার সব খবর পাচার করত?"

রাধা অস্ফুটে বলল, "না।"

বাদশাহ স্বগতোক্তি করলেন, "স্বাভাবিক। তুমি জানবেই বা কী করে? তোমার ভাষাশিক্ষা হল এই সেদিন। এসো।"

রাধা বাদশাহের কাছে এল।

বাদশাহ রাধার ওষ্ঠ চুম্বন করলেন। রাধা শিউরে উঠল। বাদশাহ রাধাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কী চাও তুমি?"

রাধা বাদশাহের বক্ষলগ্না হয়ে ছিল। সে ফুঁপিয়ে উঠল।

বাদশাহ রাধার চিবুক তুলে ধরে বললেন, "শাহি হারেম থেকে কাউকে বাড়ি ফেরানো সম্ভব নয়। আমি জানি তুমি কী চাও। আমি তোমার গৃহে শাহি উপহার পাঠিয়েছিলাম। তোমার পিতা সমস্ত দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

রাধার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

বাদশাহ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে রাধার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমায় ভালো রাখুন। আমি এলাম।"

বাদশাহ হুমায়ুন রাধার ঘর থেকে বেরিয়ে আর কারও ঘরে গেলেন না। হারেম ছেড়েই বেরিয়ে গেলেন। রুকসানা এসে রাধার ঘরে ঢুকে বলল, "কি রে, বাদশাহ এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন কেন?"

রাধা মুখ গুঁজে কাঁদছিল। কিছু বলল না।

রুকসানা বলল, "মেহজাবিনের জন্য আমরা সবসময় ভয়ে থাকি। এই বুঝি বাদশাহের সেপাইরা এসে আমাদের নিয়ে গিয়ে চোখ উপড়ে নেয়। ওর সঙ্গে তো আমাদেরই সবথেকে বেশি কথা হত। এখন আবার তুই এই নৌটংকি শুরু করেছিস। কী হয়েছে বলবি?"

রাধা বলল, "আমি বাবার কাছে যাব।"

রুকসানা রাধার খাটের ওপর বসে পড়ে বলল, "আব্বার কাছে যাবি? আম্মির কাছে যাবি? আমাদের সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। চাইলেও আর যেতে পারবি না।"

রাধা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একজন মেয়ে এসে রুকসানাকে ডাকল, "আপনাকে বাদশাহ ডেকেছেন।"

রুকসানা একটু শিউরে উঠে সামলে নিয়ে বলল, "আসছি।"

বাদশাহ হারেম ছেড়ে চলে গেছিলেন। আবার ফিরে এসে জলাশয়ের কাছে চুপ করে বসে ছিলেন। রুকসানা গিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়াল, "হুজুর, তলব করেছিলেন?"

বাদশাহ বললেন, "আমি যুদ্ধ করতে যাব মনস্থ করেছি। হারেম থেকে একশো জন জেনানা আমার সঙ্গে যাবে। তুমি ব্যবস্থা করো।"

রুকসানা মাথা নোয়াল, "হুজুর।"

বাদশাহ বললেন, "আর ওই মেয়েটি মনে হয় বাড়ি যেতে চায়। ওকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।"
রুকসানা স্তম্ভিত হয়ে বাদশাহের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা কী করে হয় হুজুর? বাদশাহি হারেম থেকে কেউ তো..."
বাদশাহ বললেন, "বাদশাহ চাইলে না হওয়ার কিছু নেই। আমি ব্যবস্থা করতে বলছি। তুমি ওই মেয়েটিকে বলে দিয়ো।"
রুকসানা বলল, "হুজুরের যা আদেশ।"
বাদশাহ বললেন, "তুমি যাও। এখানে যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে। আমার একা থাকতে ইচ্ছা করছে।"
রুকসানা মাথা নুইয়ে চলে গেল।
রাধা তখনও কাঁদছিল। রুকসানা রাধাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল, "ওরে মেয়ে, তোর কী ভালো নসিব! স্বয়ং বাদশাহ তোকে বাড়ি ফেরাবেন বলেছেন।"
রাধা অবিশ্বাসী চোখে রুকসানার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মুখ হাসিতে পরিপূর্ণ হল।
রুকসানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোর এই হাসিটা যেন থাকে রে মেয়ে।"
রাধা রুকসানাকে জড়িয়ে ধরল।
রুকসানা বলল, "জাহাঁপনা তোর মধ্যে কী দেখলেন কে জানে। সবসময় আত্মমগ্ন হয়ে থাকেন। সবাই ঠিকই বলে, হুজুর যে কখন কী করবেন কেউ জানে না। এই কারও চোখ উপড়ে দিচ্ছেন, তো এই কাউকে গরিব থেকে আমির করে দিচ্ছেন। শাহি অনুগ্রহ পেয়েছিস, খুশি হ মেয়ে।"
রাধা আবার কাঁদতে শুরু করল।
এবার আনন্দাশ্রু।

৪৯

আদিত্য অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পরে রুমকি বলল, "ঝুম।"
ঝুমকি বলল, "বল।"
রুমকি ওর সামনের চেয়ারে বসে বলল, "তোর মনে আছে, ছোটোবেলায় বাবা তোর জন্মদিন কত বড়ো করে করত? তোর স্কুলের সবাইকে বলত?"
ঝুমকি মাথা নাড়ল, "হুঁ।"
রুমকি ঝুমকির হাত ধরল, "শোন না ঝুম, মনমরা হয়ে যাস না। আমরা আছি তো। কিচ্ছু হবে না।"
ঝুমকি বলল, "তুই জামাইবাবুকে আমাকে নিয়ে কী বলেছিস?"
রুমকি একটু থতোমতো খেয়ে বলল, "কী বলব বল? এগুলো কাপল প্রবলেম বুঝিস না?"
ঝুমকি বলল, "আমি জামাইবাবুকে সবসময় নিজের দাদা ভেবে এসেছি। এখানে এসে কোনওরকম ইনসিকিউরিটি ফিল করিনি যে জামাইবাবু কোনও উলটোপালটা কিছু করতে পারে। আর তুই..."
ঝুমকি মাথা নিচু করল।
রুমকি ঝুমকির কাঁধে হাত দিল, "এগুলো তুই বুঝবি না ঝুম। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস করতে নেই। ওরা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তুই নিজেই দেখ তোর লাইফ দিয়ে। এই যে, কী যেন ছেলেটা, রিন্টু না কী, তোকে কী সব মিথ্যে কথা বলে নিয়ে গিয়ে কী করল? তুই বল!"
ঝুমকি বলল, "তাহলে তো বাবাকে বিশ্বাস করা যায় না। তুই বল না, তুই বিশ্বাস করিস, বাবা মাকে লুকিয়ে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে..."
রুমকি ঝুমকিকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিল, "এসব কী বলছিস তুই? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? বাবা কোনও দিন এরকম করতে পারে? সাত্ত্বিক ভদ্রলোক একজন। পাড়ার সবাই বাবাকে দেখলে মাথা নিচু করে। আর তুই বাবার নামে এসব বলে যাচ্ছিস?"

ঝুমকি বলল, "তুই যাকে ভালোবাসিস, বিয়ে করেছিস, তুই যদি তার সম্পর্কেও এরকম ভাবতে পারিস, তাহলে বাবাকে নিয়ে ভাবতেই বা তোর অসুবিধাটা কোথায়? ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে বড়ো হয়েছিস, আর এটুকু চিনতে পারলি না আমাকে?"
রুমকি বলল, "না। চিনতে পারলাম না। যদি চিনতে পারতাম, তাহলে যদি বিন্দুমাত্র বুঝতাম, তুই ওই ছেলেটার সঙ্গে প্রেম করছিস সবাইকে লুকিয়ে, তাহলে তোকে জুতিয়ে সিধে করে দিতাম। তোর কপাল ভালো যে আমি এখানে ছিলাম। বাড়িতে থাকলে তো ঠিকই বুঝতাম। শোন, তোর ওই ছেলেটার সঙ্গে কবে থেকে ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল? সত্যি করে বল। হোটেলে যেতিস?"
ঝুমকি বলল, "এসব কী বলছিস?"
রুমকি বলল, "না বলার কী আছে? তোর রস উঠেছিল, রসের ঠ্যালায় এসব করেছিস। খুব মজা না? কাটা তো ওদেরটা? মজা পেয়েছিস?"
ঝুমকি বিস্ফারিত চোখে দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, "এসব কথা তুই বলতে পারছিস?"
রুমকি বলল, "তুই করে আসতে পারলে আমি বলতে পারব না কেন? কেন করেছিস?"
ঝুমকিকে ক্রমাগত চড় মারতে মারতে কান্নায় ভেঙে পড়ল রুমকি, "আমাদের বাড়ির মান সম্মান সব ধুলোয় মিশিয়ে দিলি তুই। আমি ভাবতেও পারছি না একটা মুসলমানের সঙ্গে গিয়ে... ছি ছি ছিছি... ইশ!!! আমি লোকের সামনে মুখ দেখাব কী করে বল তো?"
ঝুমকি বলল, "তুই কী চাস দিদি? আমি সুইসাইড করি?"
রুমকি ঝুমকিকে আবার চড় মারল, "সুইসাইড করলে নামটা আরও বাড়বে তাই না? এক কাজ করা যাক, আমি, বাবা, মা সবাই মিলে সুইসাইড করি। এই নষ্ট মেয়েছেলে, ছেলেটা তোর ভিতরে ফেলেছিল না?"
ঝুমকি বুঝতে পারল না, বলল, "কী?"
রুমকি বলল, "যখন সেক্স করেছিল, তখন তোর ভিতরে ফেলেছিল, তাই তো? ওরা তো প্রোটেকশন ইউজ করবে না। অশিক্ষিতের বাচ্চা ওরা। ভিতরে ফেলেছিল কি না বল।"
ঝুমকি চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "আমি মনে করতে পারছি না। ওই সময় আমার তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। এত কষ্ট হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না।"
রুমকি বলল, "তা তো হবেই। মজা করতে গেছিলি। দেখ কেমন মজা লাগে। এই তোর ডেট কবে?"
ঝুমকি বলল, "সামনেই। কুড়ি তারিখ।"
রুমকি বলল, "বেঁধে গেলে ওই কাটার বাচ্চা নিয়ে ঘুরবি?"
ঝুমকি বলল, "না। বাচ্চা নষ্ট করব।"
রুমকি বলল, "সব ভেবেই রেখেছিস। জানোয়ার মেয়ে। যা, স্নান কর যা। আমার গা ঘিনঘিন করছে তোকে দেখে। অসভ্য, জানোয়ার, নোংরা মেয়ে কোথাকার।"
ঝুমকি কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে থেকে স্নানে গেল।

৫০

আদিত্য অফিসে কাজ করছিল। ফোন বাজল। দেখল সুশোভন ফোন করছেন। ধরল, "হ্যাঁ, বল।"
সুশোভন বললেন, "ইজাজ মল্লিকের সঙ্গে বসা হল বুঝলি।"
আদিত্য নড়েচড়ে বসল, "দেন?"
সুশোভন বললেন, "এক্সপেক্ট করছি, ঝামেলাটা মিটবে। সম্ভবত ওরা মেয়েটাকে চেজ করা বন্ধ করবে।"
আদিত্য বলল, "তাহলে এখন কর্তব্য? ঝুমকিকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাব?"
সুশোভন বললেন, "খেপেছিস? এসব ভুলেও ভাবিস না। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ।"

আদিত্য বলল, "ওকে।"
সুশোভন বললেন, "চল কাজ কর। আর কোনও আপডেট এলে তোকে জানিয়ে দেব।"
আদিত্য বলল, "ঠিক আছে।"
সুশোভন ফোন রাখলেন।
আদিত্য রুমকিকে ফোন করল। রুমকি ধরল, "বলো।"
আদিত্য বলল, "সুশোভন ফোন করেছিল।"
রুমকি বলল, "কী বলল?"
আদিত্য বলল, "আশা করা যায় মিটে যাবে।"
রুমকি বলল, "শোনো। আমার কিছু কথা আছে।"
আদিত্য বলল, "বলো।"
রুমকি বলল, "দ্যাখো, তুমি মাথা গরম কোরো না। কিন্তু কথাটা তো সত্যি যে ঝুমকির সঙ্গে ওই ছেলেটার কিছু হয়েছে। এবার ওর ডেট কুড়ি তারিখ। যদি পিরিয়ড মিস হয়, তখন বাচ্চাটা নষ্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখনই কোনও ডাক্তার কনসাল্ট করে নেওয়া ভালো।"
আদিত্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সারাক্ষণ একই চিন্তা করতে তোমার ভালো লাগে? অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে পারো তো। আমি নাহয় নাস্তিক মানুষ, তুমি তো ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো। স্পিরিচুয়াল কিছুতে মন দাও। ঝুমকি একটা মারাত্মক স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তুমি ওকে আরও স্ট্রেস দিচ্ছ সেটা বুঝছ?"
রুমকি একটু থমকে গিয়ে বলল, "কী করব বলো? আমার মাথা কাজ করে না। সারাক্ষণ মনে হয় এই মেয়েটা ছোটোবেলায় আমার জামা ধরে ঘুরে বেড়াত। কেউ ওকে আমার থেকে নিতে গেলে কেঁদেকেটে বাড়ি মাথায় তুলত। আমার যখনই মনে পড়ছে ও আমাকে না জানিয়ে সব করেছে, আমি রাগটা সামলাতে পারছি না।"
আদিত্য নিজের টেবিলের চারপাশে তাকিয়ে টেবিল থেকে উঠে অফিসের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "দ্যাখো রুমকি, এই মুহূর্তে তোমার ওপরেই চাপটা সব থেকে বেশি। তোমাকে তোমার বাবাকে সামলাতে হবে। ঝুমকিকেও সামলাতে হবে। দয়া করে সব কিছু ভেস্তে দিয়ো না। তোমার কথা-টথা শুনে ও যদি সুইসাইড অ্যাটেম্পট করে তখন কী হবে?"
রুমকি ভয় পেয়ে বলল, "কী সব বলছ? এরকম হতে পারে নাকি?"
আদিত্য বলল, "হতে পারে না? সেন্টিমেন্টাল লোকজন কখন কী করে বসে কে দেখতে যাচ্ছে? অনেক সাহস জোগাড় করে ও ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছিল। সে সাহসটা এখন ওর মধ্যে ফিরিয়ে আনো। আমরা একটা মিউচুয়াল করতে যাচ্ছি। এই সময় হয়তো সবার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করা হবে ও রিন্টুর কাছে ফিরে যেতে চায় নাকি। এমন কোনও পরিবেশ তৈরি কোরো না, যাতে ও বাড়িতে থেকে এতটাই অতিষ্ঠ হয়ে যায় যে শেষমেশ রিন্টুর কাছেই ফিরে যেতে চাইবে। তুমি কি চাও এরকম কোনও সিচুয়েশন আসুক?"
রুমকি বলল, "না না, সে কী? এসব কেন চাইব?"
আদিত্য বলল, "তাহলে দয়া করে বিহেভ প্রপারলি।"
রুমকি বলল, "আচ্ছা। চেষ্টা করব। সমস্যা হল ওকে দেখলেই কেন যে রাগ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। নিজের বোন তো। শাসন করার অধিকারটুকু তো আছে বলো?"
আদিত্য বলল, "অবশ্যই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে শাসনের থেকেও ওর কেয়ারটা অনেক বেশি দরকার।"
রুমকি বলল, "আমি যখনই ভাবছি ওর পেটে ওই সমাজবিরোধীটার বাচ্চা আসতে পারে আমি শিউরে উঠছি। নিতে পারছি না। আমার গা গুলিয়ে উঠছে।"

আদিত্য বলল, "যা হয়ে গেছে কিছু তো করার নেই আর। বাচ্চা যদি নষ্ট করতে হয় করতে হবে। কী করার আছে?"
রুমকি বলল, "তুমি সাবধানে থেকো। আর আমায় ক্ষমা কোরো।"
আদিত্য বলল, "কী ব্যাপারে?"
রুমকি বলল, "আমি তোমাকে যা নয় তাই বলেছি। ঝুমকিকেও বলেছি। খারাপ লাগছে। বোনটা আমার।"
রুমকি কেঁদে ফেলল।
আদিত্য ফোন হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

৫১

অফিসফেরতা আদিত্য শ্বশুরবাড়ি গেল। তপন তাকে দেখে খুশি হলেন, "ওহ্, বাবা তুমি এসেছ? খবরে তো দেখাচ্ছে ওদের নেতা বলেছে মিউচুয়াল করে নেওয়া হবে। বাড়ির সামনে থেকে উটকো দলবলও সকালের পর আর দেখা যাচ্ছে না। সমস্যা কি মিটল?"
আদিত্য ঘরের ভিতর ঢুকে সোফায় বসল। রুমকির মা উদ্বিগ্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে। তাকে দেখে বললেন, "চা খাবে বাবা?"
আদিত্য বলল, "আপনি বসুন। আমি একটু কথা বলে যাই।"
তপন বসলেন। আদিত্যর শাশুড়িও বসলেন।
আদিত্য বলল, "আপাতত মনে হচ্ছে একটা সমঝোতায় আসা গেছে। আমার বন্ধু সুশোভন ওদের নেতার সঙ্গে কথা বলেছে। ওরা ঝুমকিকে ফেরত নেবার জন্য যে মরিয়া ভাবটা দেখাচ্ছিল, যে জ্বালাতনটা করছিল, মনে হয় না আর করবে। তবু নিরাপত্তার স্বার্থে আপাতত ঝুমকি আমাদের কাছেই থাকুক। দু-চারটে দিন গেলে নাহয় এখানে নিয়ে আসা যাবে।"
তপন খুশি হয়ে আদিত্যর হাত ধরে বললেন, "বাঁচালে বাবা। তুমি না থাকলে যে কী হত।" রুমকির মা ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করতে শুরু করলেন।
আদিত্য বলল, "ঠিক আছে। এখনই সব মিটে গেল ভেবে না নিলেই ভালো হয়। আমি ওদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না। ওদের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব আছে তো, সেটা দুশ্চিন্তার।"
তপন বললেন, "ও পুলিশ যখন স্টেপ নিয়েছে আমি নিশ্চিন্ত। আসছে বুধবার একটা ভালো দিন আছে। ওই দিন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে ঝুমকির দোষ কাটিয়ে ঘরে তুলব।"
আদিত্য অবাক হয়ে বলল, "দোষ কাটাবেন মানে? কীসের দোষ?"
তপনও উলটে অবাক হলেন, "দোষ না? হিন্দু ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েকে মুসলিম ছেলে ফাঁসিয়ে বিয়ে করল। তারপর আর যা যা হয়েছে সেগুলো নাহয় নাই বা বললাম। দোষ তো কাটাতেই হবে।"
আদিত্য বলল, "এটা হলেই দোষ কেটে যাবে? তারপর কী করবেন?"
তপন চিন্তিত মুখে বললেন, "সেটা আমরা সবাই মিলে ঠিক করব। সৎপাত্রে বিয়ে দিতে হবে। এখন তো আর ভালো ছেলে পাওয়া যাবে না। সেই দোজবরে বা..." দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তপন।
আদিত্য শাশুড়ির দিকে তাকাল। কেমন দিশেহারা হয়ে আছেন ভদ্রমহিলা। অবশ্য সারাক্ষণ দিশেহারাই থাকেন। নিজের কোনও মতামত কোনও কালেই দেওয়ার ক্ষমতা নেই।
সে বলল, "ঠিক আছে। আমি উঠি। ফিরতে হবে।"
শাশুড়ি বললেন, "সে কী, কিছু মুখে দিয়ে যাও। গৃহস্থের অকল্যাণ হবে যে!"
তপনও বললেন, "হ্যাঁ। চা জলখাবার অন্তত খেয়ে যাও।"
অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসল আদিত্য। তপন বললেন, "ওদের টার্গেট এটাই থাকে। হিন্দু বাড়ির মেয়েদের ট্র্যাপে ফেলে বিয়ে করবে, তারপর কনভার্ট। এ যে কত বড়ো চক্র, তা যদি আগে বুঝতাম। তাও মেয়েকে বুদ্ধিমতী বলতে হবে, পালাতে পেরেছে ঠিক করে। এখন একটা ঠিকঠাক ছেলে দেখে। আমার এক বোন আছে

সাউথের দিকে। ওর কাছে পাঠাতে পারলে দোজবরেও খুঁজতে হত না, ঠিক একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যেত।"

আদিত্য বলল, "মিথ্যা বলে বিয়ে দেবেন?"

তপন বললেন, "মিথ্যার কিছু নেই তো। নামমাত্র ডিভোর্সিরাও তো বিয়ে করে। আমার মেয়ের তো বিয়েই প্রপার পদ্ধতিতে হয় না।"

আদিত্য বলল, "তবু, ছেলের বাড়ি থেকে যখন জানতে পারবে, তখন সমস্যায় পড়তে পারেন।"

তপন হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, "ও কোনও সমস্যা হবে না। এখন সব আইন মেয়েদের পক্ষে।"

আদিত্য বিস্মিত চোখে তপনের দিকে তাকাল। আদর্শবাদী লোকেরা পার্সোনাল ক্রাইসিসে পড়লে এরকম হয়ে যাবে? শেষে মিথ্যে বলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে?

শাশুড়ি চা নিয়ে এলেন।

বললেন, "একটু বসবে বাবা, লুচি করছি।"

আদিত্য বলল, "না, না, সেসব দরকার নেই। আমি চা খেয়ে রওনা দেব। অনেকটা রাস্তা ড্রাইভ করতে হবে আবার।"

তপন বললেন, "আচ্ছা, তোমার হাতে ভালো ছেলে আছে? অফিসে বা বন্ধু মহলে?"

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানুষ এরকম কেন? কেন?

৫২

রাতের খাবার পর আদিত্য বারান্দায় গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

মাথা গিজগিজ করছে অজস্র ভাবনাচিন্তায়। কোনও কিছু গভীরভাবে ভাবতে গেলে মাথা দিচ্ছে না। সে বুঝতে পারছিল, এই চার দেওয়ালের বাইরে কোথাও একটা যাওয়া দরকার। এই কংক্রিটের জঙ্গলে থাকলে মাথায় এসব কঠিন চিন্তাভাবনা ঘুরঘুর করবেই।

বাইরের রাস্তায় পাড়ার এক দাদু বাড়ি ফিরছেন হাঁটতে হাঁটতে। আদিত্য চোখ বুজল। জীবনটা কোথায় যেন আটকে গেছে এই সময়ে এসে। এত জটিল জীবন তো সে কোনও দিন কল্পনা করেনি! আজকাল কেন জটিলতাগুলো তাকে এরকম পরীক্ষার সামনে ফেলে দেয়?

রুমকি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, "সিগারেট না খেলে হয় না?"

আদিত্য বলল, "এই একটাই। আর খাব না।"

রুমকি বলল, "ঝুমকিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এলাম। খুব কাঁদছিল। আমিও যা নয় তাই বলেছি। খারাপ লাগছে আমারও।"

আদিত্য কিছু বলল না।

রুমকি বলল, "শোনো না, একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো?"

আদিত্য বলল, "বলো।"

রুমকি বলল, "আমি একটা ব্যাপার ভেবেছি। কাউকে বলিনি, নিজের মধ্যেই রেখেছি। কিন্তু কথা দাও, বললেই ঝাঁঝিয়ে উঠবে না।"

আদিত্য বলল, "বলো। আর কী ঝাঁঝিয়ে উঠব? এনার্জি নেই কোনও আর।"

রুমকি বলল, "দ্যাখো সুশোভন তো প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড ছেলে। বিয়ে থা করেনি। আবার পুলিশেও কাজ করে। ও যদি ঝুমকিকে বিয়ে করত, তাহলে ওই ছেলেটাও পুলিশের বউ বলে বেশি জ্বালাতন করত না..."

আদিত্য হেসে ফেলল।

রুমকি বলল, "হাসছ কেন?"

আদিত্য বলল, "আচ্ছা, আমরা শেষ কোথায় বেড়াতে গেছিলাম?"
রুমকি বলল, "কোদাইকানাল। কী দারুণ লংকার চপ খেলাম বলো?"
আদিত্য বলল, "তুমি এক কাজ করো। চোখ বন্ধ করে কোদাইকানালের সেই ঝরনাটার কথা মাথায় আনো। আর ঝুমকিকে পুরো মাথা থেকে বের করে দাও। দ্যাখো তো পারো নাকি।"
রুমকি অবাক হয়ে বলল, "এ আবার কী? না পারার কী আছে?
আদিত্য বলল, "না না, করো। পারা না পারার কিছু না। এই নাও, এই চেয়ারটা নাও, আমি তোমার কাঁধ ম্যাসাজ করে দিচ্ছি, তুমি ভাবো। বসো চেয়ারে।"
রুমকি চেয়ারে বসল। আদিত্য বলল, "চোখ বন্ধ করেছ?"
রুমকি বলল, "হুঁ।"
আদিত্য বলল, "কী দেখতে পাচ্ছ?"
রুমকি বলল, "দেখতে পাচ্ছি মেঘলা আবহাওয়া। বৃষ্টি পড়ছে, তবু আমি ঝরনার সামনে থেকে নড়ছি না। তুমি আবার আমার হাত ধরে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলছ ঠান্ডা লাগাবে নাকি? এখানে ঠান্ডা লাগলে ডাক্তার কোথায় পাব? তারপর চপ এনে দিলে... আহা... কী ভালো... কলকাতায় কোথায় পাওয়া যাবে লংকার চপ?"
আদিত্য বলল, "এরপর দ্যাখো গাড়িটা চলল। আমরা টিটিডিসির গেস্ট হাউজের কটেজে পৌঁছলাম। ওখানে ওরা আমাদের মাছভাজা খেতে দিল। সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। তুমি আবার ব্যাগ থেকে মাখন বের করে বললে মাখন দিয়ে ভাত খেতে ভালো লাগবে। মনে পড়ছে?"
রুমকি বলল, "হ্যাঁ। আমি মাখন ছাড়া খেতেই পারছিলাম না। ওদের তরকারিতে ওই কী সব মশলা দেয়, আমি জাস্ট নিতে পারি না। তুমি তো ওইসবই সোনা মুখ করে গিলে ফেলছিলে।"
আদিত্য বলল, "মাছভাজা আর মাখন দিয়ে ভাত খেয়ে তুমি কম্বল নিয়ে একটা জম্পেশ ঘুম দিলে। আমি হাঁটতে বেরিয়ে সাইকেলের খোঁজ পেয়ে সাইক্লিং করে যখন সন্ধেয় ফিরলাম তুমি আমাকে খুঁজে না পেয়ে কেঁদেকেটে একশা করে গেস্ট হাউজের লোকদের পাগল করে দিচ্ছ।"
রুমকি বলল, "ওরে বাবা, তুমি কী জঘন্য। ফোনটাও পাওয়া যাচ্ছিল না। উফ। কী বিচ্ছিরি!"
আদিত্য বলল, "তারপরের আদরটা?"
রুমকি আদিত্যর হাত ধরল, "হুঁ।"
আদিত্য রুমকির পাশে বসল, "চোখ খোলো।"
রুমকি চোখ খুলল।
আদিত্য বলল, "চলো ভুলে যাওয়া যাক আপাতত। এত টেনশন আর নেওয়ার দরকার নেই। আর সুশোভন তো ঝুমকিকে পছন্দ করেনি। এজ ডিফারেন্সও অনেক। জোর করে কাউকে কোনও সম্পর্কে জড়াবার কী দরকার? সময় দিই মেয়েটাকে? পড়ুক?"
রুমকি আদিত্যর হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল, "আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। কত বাজে বাজে কথা বলেছি। ইশ... আমিও আর পারছিলাম না বিশ্বাস করো।"
আদিত্য রুমকিকে জড়িয়ে ধরে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "বেশ করেছ যা করেছ। এবার একটু শান্তিতে ঘুমাও যাও। ভেবো না আর অন্য কিছু।"
রুমকি আদিত্যর হাত শক্ত করে ধরে থাকল।

৫৩

অফিস ঢোকার মুখে আদিত্যর ফোনটা বেজে উঠল। ধরল সে, "হ্যালো।"
"আমি রিন্টু বলছি।"
আদিত্যর চোয়াল শক্ত হল, "বলো।"

“বলছি দাদা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?”
আদিত্য বলল, “কী, গুন্ডা মস্তান নিয়ে আসবে নাকি?”
“না না, দাদা, সেসব না। মিটমাট তো হয়ে গিয়েছে। মল্লিকচাচা তো বলে দিয়েছেন সব ভুলে যেতে। আমি শুধু একটু দেখা করতে চাই আপনার সঙ্গে। বিশ্বাস করুন আমি একা আসব।” গলায় আর্তি স্পষ্ট।
আদিত্য বলল, “ঠিক আছে। তুমি এসো, এতদিন আমায় ফলো করেছ, অফিসের ঠিকানা তো জানো নিশ্চয়ই, চলে এসো।”
ফোনটা রাখল আদিত্য। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন ধরলেন, “বল।”
আদিত্য বলল, “ওই রিন্টু ছেলেটা ফোন করে দেখা করতে চাইছে। এতদিন হুমকি দিত, এখন রিকোয়েস্ট করছে। আমি আসতে বলেছি।”
সুশোভন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বললেন, “ঠিক আছে, শোন কী বলে। নিজে থেকে কিছু বলতে যাস না।”
আদিত্য বলল, “হুঁ।”
অফিসে কিছুক্ষণ বসার পর রিন্টুর ফোন এল। আদিত্য অফিসের বাইরে বেরিয়ে দেখল রিন্টু দাঁড়িয়ে আছে। একাই এসেছে। সে চারদিকে তাকাল। কোনও গাড়ি নেই। সে বলল, “বলো কী বলতে চাও।”
রিন্টু বলল, “দেখুন, আমি মানছি আমি যেটা করেছি ঠিক করিনি।”
আদিত্য রিন্টুর দিকে তাকাল। মুখে উগ্রতার ভাবটা কম লাগছে কি? বুঝল না।
সে বলল, “বুঝলাম। তো কী দাবি এখন তোমার?
রিন্টু বলল, “দেখুন, আমি ওকে সত্যি ভালোবাসি। আমি চাই ওকে নিয়ে সংসার করতে। আপনি দেখুন না, ওর বাড়ির লোককে বুঝিয়ে।”
আদিত্য বলল, “আমি তো জানি না ঝুমকি কোথায় আছে। আমার পক্ষে ওর বাড়ির লোককে বোঝানোও সম্ভব না। আমি ওদের ফ্যামিলিতে আউটসাইডারের মতো।”
রিন্টু মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বলল, “আমাদের দিক থেকে যেগুলো হয়েছে, সেগুলো সত্যিই বেশি বেশি হয়ে গেছে। আমি ক্ষমা চাইছি তার জন্য।”
আদিত্য হাসল, “তুমি শিক্ষিত ছেলে না? যেগুলো করেছ, সেগুলো তো জেনেবুঝেই করেছ, তাই না?”
রিন্টু বলল, “দেখুন, আপনাকে আমি একটা কথা বলি। আমি যে ওকে ভালোবাসিনি তা নয়। শুধু আমার ধর্মটা বলতে ভয় পেয়েছি। লুকোতে চাইনি বিশ্বাস করুন। ভয় পেয়েছি এ কারণেই যে, আমি যদি ওকে আমার ধর্মটা বলতাম, ও আমাকে বিয়ে নাও করতে পারত। তারপর আমি যে কাজটা করেছি সেটাও ওকে আটকে রাখার জন্যই। জানি গর্হিত কাজ, কিন্তু আমার বন্ধুরা বলেছিল, ওর পেটে বাচ্চা চলে এলে ও আর কোথাও যেতে পারবে না। কনভার্শনটাও প্রি-প্ল্যানড ছিল না। আমার ধানবাদের মুরুব্বিরা যখন জানতে পারল, ওরা জোর দিতে লাগল যে আগে কনভার্ট করিয়ে নে। ও ধানবাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর আমার আর মাথা কাজ করছিল না। আমি মল্লিকচাচাকে জানালাম। ওরা কেসটা এমনভাবে টেক আপ করে নিল যে আমার হাতে কিছুই রইল না। আমি রাগের মাথায় আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, পশুর মতো কাজ করেছি ওর সঙ্গে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। ওর সঙ্গে সংসার করতে চাই।”
আদিত্য সিগারেট ধরাল। বলল, “ঠিক আছে, ঝুমকি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি জানাব।”
রিন্টু বলল, “আপনি বলুন, আমি ওর বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসব।”
আদিত্য বলল, “শোনো, আমার অফিসে কাজ থাকে বুঝলে? এরকম বাইরে তো বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব না।”
রিন্টু বলল, “তাহলে রাতে আপনার বাড়ি আসি?”
আদিত্য বলল, “না। বাড়িতেও কাজ থাকে। তুমি এক কাজ করো, আমার বন্ধু সুশোভনের সঙ্গে তুমি এসব ব্যাপারে আলোচনা করো। তোমার জন্য ওর সন্দেশখালি ট্রান্সফার হয়ে গেছে, জানো তো?”

রিন্টু বলল, “উনি তো আপনাদের ফ্যামিলির কেউ না।”
আদিত্য বলল, “আমাকে এসব কথা বলে কোনও লাভ নেই। বললাম তো, তুমি এসো এখন।”
আদিত্য আর দাঁড়াল না, রিন্টুকে দাঁড় করিয়ে অফিসের ভিতর ঢুকে গেল।

৫৪

অফিসে ঢুকে আদিত্য চুপ করে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে সুশোভনকে ফোন করল। সুশোভন ফোন ধরেই বললেন, “কী বলল ছেলেটা?”
আদিত্য বলল সবটা।
সুশোভন চুপ করে থেকে বললেন, “নাটক করছে না সিরিয়াসলি বলছে? কিছু বুঝলি?”
আদিত্য বলল, “কী যে করছে আমি জানি না। আমার অসহ্য লাগছে ভাই এসব।”
সুশোভন বললেন, “দেখ যদি তোর মনে হয় ছেলেটা সিরিয়াস, সেক্ষেত্রে তোর শালির সঙ্গে ওকে একবার বসানো যেতে পারে। তোর শালি যদি ওকে ভালোবেসে থাকে...”
আদিত্য তেতো গলায় বলল, “আমার মনে হয় না ঝুমকির ওর প্রতি কোনও ভালোবাসা আছে। বরং আমার মনে হয় এটা ওর কাছে চেপে যাওয়াই ভালো। ওকে বললে ও আবার দ্বিধায় পড়ে যেতে পারে।”
সুশোভন বলল, “দ্বিধায় পড়লেও জানা। জানানোটা দরকার। ও একজন অ্যাডাল্ট। ওকে নিজের ডিসিশন নিজেকে নিতে দে।”
আদিত্য বলল, “তারপর আর-একটা ক্যাচাল লাগুক? তুই আমার শ্বশুরমশাইকে চিনিস? বুঝিসনি কীরকম গোঁড়া লোক? সবে একটা ক্যাচাল মিটল। এখন আবার ঝামেলা লেগে যাবে এসব নিয়ে আলোচনা করলে।”
সুশোভন বললেন, “দেখ ভাই, একটা কথা বলি। কাদায় অলরেডি নেমে গেছিস। এখনও যদি বলিস পাঁক ঘাটব না, তাহলে কী করে হয়?”
আদিত্য বলল, “আমার এই ছেলেটাকে পোষায়নি একবারেই। এই দুদিন আগেও হুমকি দিচ্ছিল। ওদের বাড়ির ওখানে ঝামেলা করেছে, পাড়ায় হাঙ্গামা করেছে। আমি এইসব থেকে দূরে থাকতে চাই। বোঝার চেষ্টা কর ভাই।”
সুশোভন বললেন, “ঠিক আছে। তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোস না। তবে ছেলেটা যদি এরপরেও তোকে জ্বালাতন করে, সেক্ষেত্রে আমাকে বলিস। আমি সেক্ষেত্রে জামান সাহেবকে দিয়ে ইজাজ মল্লিককে ফোন করাব।”
আদিত্য বলল, “সে করাবি। এই ঝামেলাটাও প্রায় মিটল, তুই কি ওইখানেই থাকবি? ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করবি না?”
সুশোভন বললেন, “নাহ। চাকরি করাটাই আসল। যেখানে ইচ্ছা দিক না। কলকাতার থেকে এইসব দিকে পলিউশন অনেক কম। ভালোই লাগছে। ক্রাইম যদিও কম নয়, তবু ঠিকঠাক। কদিন কলকাতা থেকে দূরে থেকে শাপে বর হচ্ছে একদিকে।”
আদিত্য বলল, “দেখ যা ভালো মনে করিস। ফোন করব আবার দরকারে।”
সুশোভন হাসলেন, “একশো বার।”
ফোন রেখে আদিত্য ডেস্কে বসে কাজে মন দিল। প্রচুর কাজ জমে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিনটা যে কী করে কেটে গেল বোঝা গেল না। অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে সাতটা বাজল।
গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে দেখল রাস্তায় রিন্টু দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়িটা রাস্তার বাঁদিকে রেখে গাড়ি থেকে নামল, “তুমি এখনও বাড়ি যাওনি?”
রিন্টু তার দিকে তাকিয়ে বলল, “না। আমি আসলে এই এলাকাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমার না আসলে ভীষণ অপরাধবোধ হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না। আমার উচিত হয়নি, এই ঝামেলাগুলো ইজাজ চাচার

কাছে বলাটা। আপনাদের সঙ্গেও যা করেছি, ঠিক করিনি। দেখুন না, ইজাজ চাচা ঠিক টাইমে পলিটিক্স বুঝে সরে পড়ল। সবাইকে বলে দিয়েছে আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করতে।"

আদিত্য কয়েক সেকেন্ড রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বাড়ি যাও। গিয়ে বিশ্রাম করো। যা হয়ে গেছে, সেসব তো আর পিছনে গিয়ে রেক্টিফাই করা যাবে না।"

রিন্টু বলল, "দাদা আমি সংসারটা করতে চাই। সিরিয়াসলি করতে চাই। দেখুন না কিছু করা যায় নাকি। আপনার চাইলে আমি হিন্দু হয়ে যাব। বিশ্বাস করুন। অন্য কোথাও গিয়ে সংসার করব নাহয়।"

আদিত্য কপালে হাত দিল, "আমি না তোমাদের এই হিন্দু মুসলমানের জ্বালায় পাগল হয়ে যাব। হিন্দু হয়ে গেলেই ঝামেলা মিটে যাবে? রিডিকিউলাস রিন্টু! প্লিজ আমায় জ্বালিয়ো না। যদি ঝুমকির সঙ্গে দেখা হয়, আমি তোমার কথা জানাব। ও যা ডিসিশন নেবে, সেটাই ফাইনাল হবে। ঠিক আছে?"

রিন্টু অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি খুব বাজে করেছি। ইজাজ চাচা লোক দিত, তাদের দিয়ে আমি ভাবতাম আমি বিরাট কোনও ডন হয়ে গেছি। আপনাকে কী না কী বলেছি। এখন বুঝতে পারছি, সব রাজনীতির খেলা।"

আদিত্য রিন্টুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "তুমি বাড়ি যাও। আমিও বাড়ি যাই। সময় দাও সবাইকে। যাও।"

রিন্টু হঠাৎ করে কেঁদে ফেলল।

আদিত্য রাস্তার মধ্যে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৫৫

রাত সাড়ে নটা বাজে।

লোকাল অফিসে ইজাজ মল্লিক পারিষদ পরিবৃত হয়ে বসে ছিল। এলাকার কোন ক্লাবে অনুদান দেওয়া হবে সেসব নিয়ে কথা হচ্ছিল।

রিন্টু ঢুকল থমথমে মুখে। চোখ লাল। ইজাজ মল্লিক আড়চোখে রিন্টুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার শেখ? এরকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন?"

রিন্টু উত্তর না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসল।

ইজাজ মল্লিকের একজন পারিষদ রশিদ। সে রেগে গেল, "কি রে রিন্টু, তোকে মল্লিকচাচা কী জিজ্ঞেস করছে উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

রিন্টু রশিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে জিজ্ঞেস করেছেন? কুকুরের মতো ভৌ ভৌ করছিস কেন?"

রশিদ রিন্টুর দিকে তেড়ে যেতে গেল। ইজাজ হাত দিয়ে তাকে আটকাল, "এই রশিদ। তোরা দূরে যা। রিন্টুর সঙ্গে ঝামেলায় যাচ্ছিস কেন? ওর মনখারাপ।"

রিন্টু ইজাজের দিকে তাকিয়ে রাগি গলায় বলল, "সব আপনার জন্য হয়েছে। আপনি শুরু থেকে আমাকে মিসলিড করলেন। এখন পালটি খাচ্ছেন নিজের স্বার্থে। টাকা খেয়েছেন?"

এবারেও সবাই রিন্টুর দিকে তেড়ে গেল।

ইজাজ মল্লিক হাতের ইশারায় সবাইকে থামিয়ে বলল, "দেখ রুবেল, তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস। তুই যেটা করেছিস সেটাও তো ঠিক করিসনি! মেয়েটাকে রেপ করার কী দরকার ছিল?"

রিন্টু বলল, "আপনি তাহলে আগে বলেছিলেন কেন, যা করেছিস বেশ করেছিস? এখন কেন আবার এসব বলছেন?"

ইজাজ বলল, "শোন বেটা, শোন। মাথা গরম করিস না। সব কিছু বুঝে শুনে চলতে হয় তো। গোটা শহর জুড়ে কেসটা বেকায়দায় চলে গেছে। তোর ওই মেয়েটা, কী যেন নাম, যাই নাম হোক, সে সবাইকে বলে বেরিয়েছে তুই ওকে রেপ করেছিস। আমাদের গোটা কমিউনিটিরই বদনাম হচ্ছে। এমনিতেই সবাই বলে আমাদের নাকি তোষণ করা হয়, তার উপরে সামনে ভোট আসছে। এখন যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা

ঝামেলা চালিয়ে যেতাম তাহলে কি সমস্যা কমত? শোন বেটা, মাথা ঠান্ডা কর। কদিন পর দেখছি, আমিই এনে দেব ওই মেয়েছেলেকে তোর কাছে।”

রিন্টু চেয়ার থেকে উঠে চেয়ারটা টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, “কাউকে কিছু দেখতে হবে না। সবাই নিজের ধান্দা দেখুন। দেখতে হবে না কিছু।”

বাকিরা আবার রিন্টুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ইজাজ মল্লিক আবার আটকাল। রিন্টু বেরিয়ে চলে গেল।

রশিদ বলল, “ফালতু ছেলে চাচা এই রিন্টু। আমরা শুধু শুধু এর জন্য ফাইট দিচ্ছিলাম। সম্মান করতেই শেখেনি দেখলেন?”

ইজাজ বলল, “ঠিক আছে, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। দুদিন ছেলে এদিক সেদিক ঘুরবে, মদ মারবে। তারপর আবার কোনও একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে যাবে। দাঁড়া, আমি ওর মাকে বলে ওর ভালো ঘর দেখে নিকাহর ব্যবস্থা করছি। বয়স বুঝিস না, এই বয়সে শরীর গরম থাকে। আমার এত বয়সেও গরম কমল না, আর শেখের তো কচি বয়স।”

রশিদ বলল, “যাই বলুন চাচা, দু ঘা দেওয়ার দরকার ছিল। আপনি না থাকলে ও খেয়েও যেত। এত বড়ো সাহস হয় কী করে এখানে এসে ঝামেলা করার?”

ইজাজ বলল, “ঠিক আছে। ও দেখে নেওয়া যাবে। এখন বল তোদের ক্লাবের জন্য যে টাকা দেব, সেটা কোন খাতে দেখাবি?”

রশিদ মাথা চুলকে একটু ভেবে হাসিমুখে বলল, “নাইটে একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট লাগিয়ে দি।”

ইজাজ বলল, “ঠিক আছে। বাকি সব পকেটে ভরবি, নাকি রে?”

রশিদ অভিমানী গলায় বলল, “কী যে বলেন চাচা, সব কি আমি একা খাই নাকি? ক্লাবের মুরুব্বিরা আছে না?”

ইজাজ বলল, “তাও ঠিক। তোরা তো খুব সৎ, তাই না রশিদ? কি রে, আব্বাস, তুই চুপ করে আছিস কেন?”

আব্বাস কিছু বলার আগেই ঘরটায় রিন্টু একছুটে উদ্যত রিভলভার হাতে ঢুকে একদম সামনে থেকে ইজাজ মল্লিককে পরপর গুলি করতে লাগল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইজাজ মল্লিকের রক্তাক্ত শরীরটা চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল।

রশিদ রিন্টুকে ধরতে এল। রিন্টু রশিদকেও গুলি করল। গুলি কাঁধের কোনায় লাগল। রশিদ পড়ে গেল। সবাই এবার ভয় পেয়ে অফিস থেকে বেরোতে এলোপাতাড়ি দৌড় শুরু করল।

রিন্টু রিভলভারটা ইজাজ মল্লিকের মৃতদেহে ছুড়ে মেরে তার মাথায় একটা লাথি মেরে বলল, “শালা, শুয়োরের বাচ্চা।”

৫৬

আদিত্য, রুমকি আর ঝুমকি খেতে বসেছিল।

ঝুমকি ভাত নিচ্ছিল না। আদিত্য বলল, “কি রে, তুই কি ডায়েট করছিস নাকি? ভাত নিচ্ছিস না কেন?”

ঝুমকি বলল, “দিদি আর আমি বিকেলে একগাদা চিপস খেয়েছি। পেট ভর্তি।”

রুমকি বলল, “ফুচকাও এনেছিলাম। অনেকদিন পর দুই বোন মিলে খেলাম।”

আদিত্য বলল, “ভালো করেছ।”

রুমকি বলল, “শোো না, বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবার কয়েকজন বন্ধু আছে। ওরা ওই সভা-টভা করে। ওরা বলেছে ঝুমকির প্রায়শ্চিত্তটা করিয়ে দেবে।”

আদিত্য খেতে খেতে ঝুমকির দিকে তাকাল। ঝুমকি ভাবলেশহীন মুখে খেয়ে যাচ্ছিল।

সে বলল, “করাবে। তোমাদের বাড়ির ব্যাপার, যা যা করতে হবে করাবে।”

রুমকি বলল, “মানে তুমি এই অনুষ্ঠানগুলোতে থাকবে তো? বাবা জিজ্ঞেস করছিল আর কি! না থাকলে বাজে দেখাবে।”
আদিত্য বলল, “দ্যাখো, আমি তো অফিস যাইনি কদিন, অনেক কাজ পড়ে আছে। এই মুহূর্তে আমাকে রবিবারেও অফিসে যেতে হবে। তাই ধরেই নিতে বলো আমি থাকব না।”
রুমকি বলল, “চেষ্টা করো।”
আদিত্য খাওয়া থামাল, “যদি যাওয়া সম্ভব হত, তাও যেতাম না। তুমি খুব ভালো করে জানো। ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরতে হলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই কনসেপ্টটাই আমি মানতে পারছি না।”
রুমকি বলল, “এরকম বলছ কেন? স্বয়ং সীতাকেও অগ্নীপরীক্ষা দিতে হয়নি?”
আদিত্য বলল, “সেটা কি সীতা মেনে নিয়েছিলেন? পাতালপ্রবেশ করেননি? কি রে ঝুমকি, তোর প্রায়শ্চিত্ত করালে তুই সেটা মেনে নিবি?”
ঝুমকি একবার রুমকির দিকে তাকিয়ে তার দিকে তাকাল, “আমাকে এখন বাবা যা বলবে তাই তো করতে হবে। আমার হাতে কি কিছু আছে? এমনিতেই বাড়িতে কী অপেক্ষা করছে কে জানে।”
আদিত্য দুই বোনের দিকে তাকিয়ে খেতে শুরু করল। রুমকি বলল, “অকারণ রাগারাগি না করে স্রোতের সঙ্গে চলো আপাতত। অকারণ ঝামেলা করে কি আর লাভ আছে? পাড়ায় মুখ দেখানোরও তো ব্যাপার আছে একটা। ঝুমকি লাইভ করেছে (লাইভ করল কোথায়?) বলে, নইলে দেখিয়ে দিতাম ছেলেটা ওকে ছোঁয়ওনি।”
আদিত্য বলল, “তাতে কী হবে? পাড়ার লোকে কী বলল, তাতে কী আসে যায়?”
রুমকি বলল, “সারাক্ষণ এ কাকিমা, সে জেঠিমা আমাদের বাড়ি আসে। মাকে ইনিয়েবিনিয়ে উলটোপালটা কথা শোনায়। ভালো লাগে? তুমি মেয়েদের দিকটা বুঝবে না। মা এতদিন বড়ো মেয়ের জামাই নিয়ে কত গর্ব করেছে, এদিকে ছোটো মেয়ে যে কী করে বসল...”
রুমকি বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছল। ঝুমকি একটা কথাও না বলে পাথরের মতো মুখ করে খেতে থাকল।
আদিত্যর মাথায় রক্ত চড়ছিল। সে আর কিছু না বলে খাওয়া শেষ করে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল।
ফোন বাজছিল। সে দেখল সুশোভন, বলল, “কী রে? বল।”
সুশোভন বললেন, “টিভি দেখছিস?”
আদিত্য বলল, “না না। কেন?”
সুশোভন বললেন, “নিউজ চ্যানেল দেখ। তারপর ফোন কর।”
আদিত্য বেডরুমের টিভি অন করে নিউজ চ্যানেল দিল। ব্রেকিং নিউজে দেখাচ্ছে খিদিরপুরে হত্যাকাণ্ড। রুবেল শেখ নামের এক যুবক ইজাজ মল্লিককে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ধৃত যুবক রশিদ আলি মোল্লা নামের এক যুবককেও গুলি করে আহত করেছে। এলাকায় সন্ত্রস্ত পরিবেশ।
রুমকি খবর শুনে এঁটো হাতেই বেডরুমে চলে এসেছিল। খবরটা দেখে আর্তনাদ করল। ঝুমকিও এল। নির্লিপ্ত চোখে খবরটা দেখে মেঝেতে বসে পড়ল। আদিত্য রুমকিকে বলল, “তুমি ঝুমকিকে সামলাও। আমি সুশোভনকে ফোন সেরে আসি।”
টিভি বন্ধ করে বারান্দায় গিয়ে সুশোভনকে ফোন করল আদিত্য। সুশোভন ফোন ধরেই বললেন, “দেখলি?”
আদিত্য বলল, “তার মানে আমার সঙ্গে কথা বলার পরে ছেলে এ কাণ্ড করল?”
সুশোভন বললেন, “হুঁ। তোদের জন্য ভালোই হল। এক ঢিলে দুই পাখি টাইপ। আপাতত এদিক দিয়ে তোর শ্বশুরবাড়ির দিকে আর কোনও ক্যাচাল যাবে না যা বুঝলাম।”
আদিত্য বলল, “হুঁ। সব কি এত সোজা হবে?”
সুশোভন হাসলেন, “লেটস হোপ।”

রাত এগারোটা।
লোডশেডিং হয়েছে। ইনভার্টার কাজ করছে না। রুমকি মোমবাতি খুঁজে জ্বালিয়েছে ডাইনিং টেবিলে। তারা তিনজন অন্ধকারে বসে আছে।
ঝুমকি চুপ করে বসে আছে।
রুমকি বলল, “ঝুম, তোর মনের মধ্যে কী চলছে বলবি?”
ঝুমকি বলল, “কিছু চলছে না।”
রুমকি বলল, “আমাদের কী হয় জানিস তো, যখন কোনও ইনফ্যাচুয়েশন আসে, তখন তার সব ভালো লাগে। সেই ঝড়টা যখন চলে যায়, আমরা বুঝতে পারি কত বড়ো ভুল করেছিলাম। তুই আমাকে খুলে বল। তোর কি এখনও ওর প্রতি কোনও ফিলিংস আছে?”
ঝুমকি চুপ করে থাকল। ঘরবাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু রাস্তায় গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।
আদিত্য বলল, “ঝুমকি কিছু বলতে না চাইলে থাক। জোর করে বলার দরকার নেই।”
ঝুমকি এবার মুখ খুলল, “না, ঠিক তা নয়। জোর করার কিছু নেই। একটা কুকুর পুষলেও তার ওপর মায়া জন্মায়। ভুল করে হোক আর যে করেই হোক, আমি তো ওকে ভালোবেসেছিলাম। ওকে নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করেছিলাম। তারপর আমার সব কিছু ভেঙেচুরে দিল ও।”
রুমকি বলল, “তুই কী চাইছিস?”
ঝুমকি বলল, “আমার কী চাই সেটা তো বরাবর বাবাই ঠিক করে এসেছে। একবার শুধু আমি ঠিক করেছিলাম। সেটা এত বড়ো একটা সমস্যা তৈরি করল। আমার আর নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সাহসও নেই।”
আদিত্য বলল, “এই মুহূর্তে রিন্টু জেলে থাকবে। আত্মসমর্পণ করেছে মানে এই অধ্যায় ফুরাল। কাল তোকে তোর বাড়ি নিয়ে যাব। নতুন করে সব শুরু করার চেষ্টা কর। তোর বাবা যেসব লোকাচার বা ঘর ওয়াপসি টাইপের জালি জিনিসপত্র করবে, মেনে না নিলেও চুপ করে সহ্য কর। আর কী বলব?”
রুমকি রেগে গেল, “তুমি আমার বাবাকে জালি বললে কেন?”
আদিত্য শান্ত গলায় বলল, “তোমার বাবাকে বলিনি। তোমার বাবার কাজকর্মকে বলছি। ওসব শুদ্ধি-ফুদ্ধি করে এতদিন যন্ত্রণা সহ্য করা মেয়েটাকে যে আরও যন্ত্রণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, সেটা বোঝার চেষ্টা করো।”
রুমকি বলল, “তুমি যেটা বোঝো না সেটায় ঢুকতে যাও কেন? আমাদের পরিবারের ব্যাপারে তোমাকে ঢুকতে হবে না। কোনও ধর্মকে ছোটো করার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি।”
আদিত্য বলল, “ধর্ম যখন কোনও মানুষের বেঁচে থাকাটাকেই নষ্ট করে দেয়, দুমড়ে মুচড়ে দেয়, তখন সে ধর্মের আমার কাছে কানাকড়িও মূল্য নেই। যে ধর্ম ভালোবাসাকে ব্যবহার করে একটা সদ্যযৌবনা মেয়েকে ধর্মান্তরিত করে, তাকে ফেরাতে আর-একদল তাকে আবার কোনও প্রাণীর পেচ্ছাপ খাওয়ায়, সেসব ধর্ম আমার কাছে মূল্যহীন। অ্যাম আই ক্লিয়ার?”
রুমকি বলল, “তুমি আমার বাবাকে, আমাদের বাড়ির সমস্ত কিছুকে অপমান করছ তুমি বুঝছ?”
আদিত্য বলল, “আর ধর্মের নামে কতগুলো বিকৃত কাজকর্ম করে তোমরা যে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছ, সেটা কি বুঝছ?”
রুমকি বলল, “আমার আর এসব নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে নেই। কাল আমি ঝুমকিকে বাড়ি নিয়ে যাব, ব্যস।”
আদিত্য বলল, “বেশ তো। তবে আমি আমার আপত্তিটা বলে রাখলাম। এতদিন কিছু বলিনি, কারণ লোকাচার মানাকে আমি কখনোই খারাপ চোখে দেখিনি। এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি। যেটুকু আস্তিকতা ছিল আমার মধ্যে, ঝুমকির ঘটনা তার সবটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষকে বাঁচতে দিচ্ছে না এই নব্য ধার্মিকরা।

এসব কী শুরু হয়েছে? একদল বিয়ে করার নামে ধর্মান্তর করবে, আর-একদল তার হাত ধরে টানাটানি করবে, এসব তো মধ্যযুগে হত? এই দুহাজার কুড়িতে আমরা কি আবার পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম নাকি?"
ঝুমকি বলল, "বাবা যা চায় করুক, করে যদি মনে শান্তি পায়, করুক।"
আদিত্য হাসল, "হেরে গেলি দেখলি? সেই সেন্টিমেন্টের কাছেই হেরে গেলি।"
রুমকি বলল, "তোমাকে বললাম তো, আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার আমরাই বুঝে নেব।"
আদিত্য বলল, "এখন যখন ঝামেলা মিটেছে তখন ব্যাপারটা তোমাদের ফ্যামিলির হয়ে যাবে সেটা আমিও বুঝেছিলাম, তবে একটা জিনিস আমি এখন থেকেই তোমাকে বলে রাখলাম, তোমার বাবা যদি আমার সামনে রুমকির ঘর ওয়াপসির ব্যাপারে একটা কথাও বলেন, আমি কিন্তু শুনে আসব না। আমি প্রতিবাদ করব। তাতে তোমার বাবার প্রেশার বাড়লে আমাকে দোষ দেবে না।"
রুমকি থমথমে মুখে আদিত্যর দিকে তাকাল।

৫৮

রাত সাড়ে বারোটা।
রুমকি পাশে চুপ করে শুয়ে আছে। আদিত্য বুঝতে পারছে রুমকি ঘুমায়নি। সে চোখ বন্ধ করল। কারেন্ট এসেছে একটু আগে।
আদিত্যর রিন্টুর মুখটা মনে পড়ছিল। ও কি তার মানে সত্যিই ঝুমকিকে ভালোবেসেছিল? নাকি প্ল্যানটা অনেক আগে থেকেই ছিল? আগে ফাঁসাবে ভেবেছিল, পরে ভালোবেসে ফেলল!
অদ্ভুত মানুষের মন। এই মনের রহস্যের কিনারা করা হয়তো মিস্টার হোমসেরও অসাধ্য।
ঘরে নাইটবালব জ্বলছে। নাইটবালবের সবজেটে আলোয় একটা টিকটিকি দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালেই ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে কি? নাকি শিকার ধরার জন্য বসে আছে? বোঝা যায় না। কে যে শিকারি, আর কে যে ঘুমিয়ে থাকে, কিছুই বোঝা যায় না। রিন্টু শহরের একজন প্রভাবশালী মানুষকে প্রকাশ্যে খুন করেছে। যাবজ্জীবন নিশ্চিত, ফাঁসিও হতে পারে। ওদের মধ্যে অস্ত্র পাওয়া এত সোজা? তারও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেছে টিমলিডারকে গুলি করে উড়িয়ে দিতে, হয়তো রিন্টুর মতো অস্ত্র পেয়ে গেলে করেও ফেলত। আসল কথা তো অ্যাভেলেবিলিটি অফ ওয়েপন। সেটা পাওয়া গেলে অনায়াসে অনেক মানুষই রুবেল শেখ রিন্টু হয়ে যেতে পারত। পায় না বলে। আমেরিকায় কোনও কোনও কলেজ স্কুলে তো প্রায়ই কোনও ছেলে বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ে একে তাকে মেরে দেয়। পুরোটাই হতাশা থেকে করে। রিন্টু ঝুমকিকে আদৌ ভালোবেসে কাজটা করেছে? নাকি হেরে যাওয়ার মানসিকতা ওকে এতটা হিংস্র করে দিল? সবাই গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার পর যে অসহায়তা আসে, তার থেকেই হয়তো এই কাজটা করে ফেলল সে। আদিত্যর এখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না, এরকম মানুষ সত্যিই আছে যারা শুধুমাত্র ধর্মের কারণে কাউকে বিয়ে করতে পারে। ভাব ভালোবাসার মধ্যে ধর্ম কেন আসবে? কী অদ্ভুত! ভালো লাগছিল না কিছুই। সময় বড়ো দ্রুত পালটে যাচ্ছে। পৃথিবীর সত্যিই গভীরতর অসুখ এখন।
"তুমি বাবার নামে কথাগুলো ঝুমকির সামনে না বললেই ভালো করতে।"
রুমকি হঠাৎ করে বলে উঠল।
আদিত্য শুধু বলল, "হুঁ।"
রুমকি বলল, "ওকে এখন বাড়ি নিয়ে যাওয়া দরকার। ও কি চিরকাল এ বাড়িতে থাকবে?"
আদিত্য বলল, "আমি শুধু বলেছি উলটোপালটা কিছু দেখলে আমি প্রতিবাদ করব। সেটা আমি করব।"

রুমকি বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না। আমাদের মতো কনজারভেটিভ ফ্যামিলিতে এটা মেনে নিতে হবে। লোকগুলো অশান্ত হয়ে আছে। দিনের পর দিন এত মানসিক চাপ নিতে হয়েছে। এখন যদি ওরা একটু ভালো থাকতে চায় তাহলে সমস্যা কোথায়? এতদিনের বিশ্বাস কি তুমি একটা বিপ্লব করে ভেঙে দিতে পারবে?"
আদিত্য বলল, "কাল সকালে ক্যাব ডেকে দেব। তুমি ঝুমকিকে দিয়ে এসো। আর কিছু বলব না কোনও দিন। খুশি?"
রুমকি বলল, "হুঁ, আমি মাঝে মাঝে একটু বেশিই বলে ফেলি। কী করব, বাড়ির অবস্থাটা দেখা যায় না। আমি দেখতে পারি না।"
আদিত্য বলল, "ঠিক আছে, ঘুমাও এখন। আমার অফিসে ভাইটাল মিটিং আছে কাল। গুড নাইট।"
রুমকি বলল, "গুড নাইট।"
#
ভোরবেলা আদিত্যকে ঠেলে তুলল রুমকি, "এই শোনো, ওঠো, শিগগিরি ওঠো।"
আদিত্য ঘুমচোখে বলল, "কী হল?"
রুমকি বলল, "ঝুমকি চলে গেছে।"
আদিত্য অবাক হয়ে বলল, "মানে? কখন গেল?"
রুমকি একটা কাগজ আদিত্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "পড়ো।"
আদিত্য কাগজটা নিল। লেখা—

"দিদি,
আমি জানি আমি ভুল করেছি। আমি এও জানি, সারাজীবন আমার ভুলের জন্য আমার পরিবার আমায় কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবে না। তোদের কষ্টটাও বুঝতে পারি। সবার সব চিন্তা, ঝগড়া, ঝামেলা আমাকে নিয়ে। আমি আর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। খুঁজতে চেষ্টা করিস না। ভালো থাকিস তোরা। জামাইবাবুকে সন্দেহ করিস না। আমার নিজের দাদার থেকেও বেশি সম্মান করি ওকে।
বাবা-মার খেয়াল রাখিস। ওরা জানুক, ওদের একটাই মেয়ে ছিল। আর-একটা মেয়ে নাহয় জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছিল। ধানবাদ থেকে পালিয়ে এসে ভেবেছিলাম ভুল শোধরানো গেল। বুঝলাম যা ভুল করেছি, তা তো শুধরালই না, বরং সবাইকে আরও অনেক ঝামেলায় ফেলে দেব যত দিন যাবে। এর থেকে না থাকাই ভালো।
ভালো থাকিস।
তোর ঝুম।"

৫৯

দ্বিপ্রহর।
শীত পড়ছে গ্রামে।
ব্রাহ্মণ হরি মিশ্র ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ক্লান্ত শরীরে মন্দিরে বসে আছেন।
রাধা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে শরীর ভঙ্গুর হয়েছে। নিজেই বুঝতে পারছেন এ জীবন আর বেশি দিন নেই। হরির স্ত্রী কাত্যায়নী মন্দিরে এসে বললেন, "খাবেন না?"
হরি বললেন, "ইচ্ছে করচেনে বামনী, তুমি খেয়ে নাও।"
কাত্যায়নী বললেন, "আপনি না খেলে আমি খেতে পারি? আসুন। খেয়ে নিন।"
হরি উঠলেন না। বিমর্ষ মুখে বসে রইলেন।
কাত্যায়নী বললেন, "কৈবর্তদের কে একজন কাশী থেকে এয়েচে, সংবাদ দিল বিশ্বম্ভর আসতে পারে।"

হরি বললেন, "আসুক। ওকেই এই মন্দিরের দায়িত্ব নিতে হবে।"
কাত্যায়নী খানিকটা শিউরে উঠে বললেন, "এ কথা কেন বলচেন আপনি?"
হরি ম্লান হেসে বললেন, "সময় ফুরিয়েচে বামনী। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে।"
কাত্যায়নী মুখে আঁচল চাপা দিলেন, "এমন অশুভ কথা বলতে নেই। বিশ্বনাথ আমাদের মরণ বাঁচনের ভার নিয়েচেন। তিনি আমাদের দেখবেন, আপনি চিন্তা করবেন না।"
তাঁদের চমকে দিয়ে দুজন অশ্বারোহী মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছল। হরি সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কাত্যায়নী ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালেন।
হরি বললেন, "কী চাই?"
অশ্বারোহী অত্যন্ত উদ্ধতভাবে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। হরি কাত্যায়নীকে বললেন, "তুমি ঘরে যাও বামনী।"
কাত্যায়নী আতঙ্কিত সুরে বললেন, "গ্রামের লোকেদের ডেকে আনব?"
হরি বললেন, "তুমি ঘরে যাও। কাউকে ডাকতে হবেনে।"
কাত্যায়নী সভয়ে কুটিরে রওনা হলেন।
অশ্বারোহী দুজন নিজেদের মধ্যে পুস্তু ভাষায় আলাপ করছিল বলে হরি মিশ্র কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেন মন্দিরের সামনে, যাতে জাত না জানা ওই দুজন বুঝতে পারে মন্দিরের কাছে তাদের আসতে বারণ করা হচ্ছে।
কিছুক্ষণ পরেই বেশ কয়েকজন সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে একটা পালকি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। হরি মিশ্র বিস্ফারিত চোখে দেখলেন রাধা পালকি থেকে নামল। নিজের মেয়েকেই চিনতে পারলেন না তিনি। কোথায় সেই গ্রাম্য রূপ আর কোথায় এই সুললিত সাজ। রাধার শিক্ষক ব্রাহ্মণকে বাদশা রাধার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তিনি হরি মিশ্রকে বললেন, "আপনার মেয়েকে বাদশা আপনার কাছেই ফেরত পাঠিয়েছেন।"
গ্রামের লোকজন খবর পেয়ে চলে এসেছিল। তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে রাধাকে দেখছিল। কিছু বলতে পারছিল না সৈনিকদের দেখে। মোগলরাজের সৈনিক তারা আগে দেখেনি, কিন্তু তাদের অস্ত্রবর্মপরিবৃত চেহারা ভয় ধরাবার মতোই।
রাধা হরির দিকে ছুটে আসতে গেলে হরি হাত তুলে বারণ করে বললেন, "ওখানেই দাঁড়া। বাদশা পাঠিয়েছেন মানে?"
বাঙালি ব্রাহ্মণ জানালেন রাধা বাদশার হারেমে সসম্মানে ছিল। তাকে বাদশা ফেরত পাঠিয়েছেন।
হরি মিশ্র শিউরে উঠে কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বসে বললেন, "ও মেয়ে আমার মরে গেচে। ওকে নিয়ে যাও।"
রাধা মাটিতে বসে কাঁদতে শুরু করল। কাত্যায়নী এসেছিলেন। দূর থেকে রাধাকে দেখে দৌড়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।
মা বাপ আর মেয়ে কত কাছে থেকেও তাদের দূরত্ব যেন কয়েক কোটি কিলোমিটারের হয়ে গেল।
হরি মিশ্র বললেন, "ওকে নিয়ে যান। এখানে ওর কোনও জায়গা নেই।"
রাধার দুচোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। সে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল।
কাত্যায়নীর কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। কলসি এনে সৈনিকদের একজনকে দিলেন। তারা রাধার মুখে জলের ছিটা দিয়ে রাধার জ্ঞান ফেরাল।
রাধা অসহায় চোখে বাবা-মার দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছে পুনরায় পালকিতে গিয়ে বসল।
কিছুক্ষণের মধ্যে বাদশার সৈনিকরা পালকি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।
হরি মিশ্র মন্দিরের চারদিকে গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ করে ঘরে যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

গ্রামের বৈদ্য হরির নাড়ি দেখে মাথা নেড়ে বিমর্ষভাবে কাত্যায়নীকে বললেন, "শেষ মা জননী। সব শেষ।"
কাত্যায়নী পাথরের মতো বসে রইলেন।

৬০

গঙ্গার ধারে ওরা দুজন বসে ছিল।

সুশোভন আর আদিত্য।

সুশোভন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমরা একটুও এগোইনি। কিংবা এগিয়ে ছিলাম, আবার পিছিয়ে যাচ্ছি। ধর্ম, ধর্ম, ধর্ম করেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

আদিত্য কিছু বলল না। রুমকি ভীষণ কান্নাকাটি করছে। সর্বত্র খোঁজ নেওয়া হয়েছে। ঝুমকির কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুশোভন বললেন, "মানুষ ভুল করে। প্রায়শ্চিত্তও হয়। কিন্তু মেয়েদের ভুলে মনে হয় কোনও প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তোর শ্বশুর খুশি নিশ্চয়ই এখন? তিনি তো বলেই দিয়েছিলেন তেনার মেয়ে মারা গেছে ধরে নিয়েছেন।"

আদিত্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "বাদ দে। মানুষ যদি মনুষ্যত্ব ভুলে তার মস্তিস্ককে কুসংস্কার দিয়ে ঢেকে রাখে তখন তার আর কিছু পড়ে থাকে না। মেয়েটা পালিয়ে বেঁচে গেল। থাকলে যে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত, তা কহতব্য না।"

দুজন প্রেমিক প্রেমিকা হেঁটে যাচ্ছিল। সুশোভন দেখে বললেন, "মানুষ প্রেম করার সময় কখনও ভেবে প্রেম করে জাত ধর্ম কী? যারা করে, তারা কি আদৌ প্রেম করে? এরা জানে কী হতে চলেছে?"

আদিত্য বলল, "আমার মনে হয় খুব শিগগিরি আমাদের এই জায়গাগুলোও উত্তরপ্রদেশ বা হরিয়ানা টাইপের হয়ে যাবে। লোকে আবার নতুন করে জাত নিয়ে মারপিট শুরু করবে। অনার কিলিং করবে। এর সপক্ষে বলারও লোক থাকবে। এবং দেখবি, আমার মনে হয় খুব শিগগিরি সতীদাহ প্রথাও হয়তো শুরু হয়ে যাবে। ধর্মরক্ষার্থে সব যখন হচ্ছে, এটা আর বাকি থাকে কেন?"

সুশোভন বললেন, "চেনা শহরটা কেমন বদলে গেল চোখের সামনে।"

আদিত্য বলল, "ইজাজ মল্লিকের পর এখন কে যাবে ওর জায়গায়?"

সুশোভন বললেন, "রশিদ।"

আদিত্য বলল, "দেখাটা করেই আসি চল।"

সুশোভন বললেন, "সিগারেটটা শেষ করে নি।"

#

জেলের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে আদিত্যকে নিয়ে সুশোভন জেলের ভিতরে ঢুকল।

ভিজিটরস চেম্বারে আলাদা করে ডাকা হয়েছে রিন্টুকে।

আদিত্য দেখল রিন্টুর চোখের তলা কালো, আধাখ্যাঁচড়া দাড়ি, বিক্ষিপ্ত চুল। তাদের দেখে খানিকটা সিঁটিয়ে গেল রিন্টু।

সুশোভন বললেন, "কী খবর রিন্টুবাবু? জেল ঠিক লাগছে?"

রিন্টু ম্লান হাসল।

সুশোভন বললেন, "এত বড়ো কাজটা করে ফেললে?"

রিন্টু অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ভুল করেছিলাম আগে। পরে সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করলাম বলতে পারেন।"

সুশোভন বললেন, "নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াটাও ভুল। একটা ভুল দিয়ে আর-একটা ভুলকে কি ঠিক করা যায়?"

রিন্টু আদিত্যর দিকে সরাসরি তাকাল, "ওর কোনও খোঁজ পেলেন?"

আদিত্য বলল, "ও আমার বাড়িতেই ছিল এতদিন।"
রিন্টু হাসল, "আমার মনে হয়েছিল কয়েকবার। তারপর? এখন নিশ্চয়ই ও খুব খুশি? পথের কাঁটা সরে গেল?"
আদিত্য বলল, "সেসব আর জেনে তুমি কী করবে?"
রিন্টু বলল, "হ্যাঁ। সব নিজের হাতে শেষ করলাম। একদম প্রথমেই আমার পরিচয় দিলে হয়তো এত কিছু হত না বলুন?"
আদিত্য সুশোভনের দিকে তাকাল।
সুশোভন বললেন, "ভালো থেকো রিন্টু।"
রিন্টু বলল, "শুনুন না। ও যেন ভালো থাকে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। যেন খুব ভালো থাকে। আমার কথা যেন আর কোনও দিন ওর মনে না আসে, প্লিজ দেখবেন।"
সুশোভন হাসলেন, "ঠিক আছে। দেখব। আসি, কেমন?"
রিন্টু নীরবে কাঁদতে থাকল।
আদিত্যকে নিয়ে সুশোভন বেরিয়ে এসে বললেন, "ভালোবাসায় যখন মিথ্যা আর ধর্মের কুসংস্কার যুক্ত হয় তখন কী হয়, এই কেসটা তার সবথেকে বাজে নিদর্শন হয়ে থাকল। কোনও মানে হয়, একজোড়া যুবক যুবতি ভালোবাসবে আর তাদের মনের ভিতরে ক্রমাগত একে অপরকে ঘিরে অবিশ্বাস পাক খাবে?"
আদিত্য বলল, "বাদ দে। আমি যাই, বুঝলি? আমারও আর কিছু ভালো লাগছে না। ঝুমকির কোনও খবর পেলে দেখিস।"
সুশোভন আদিত্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "রিন্টু জানল ঝুমকি ভালো আছে। জানল না, ঝুমকিও হারিয়ে গেছে সেই সমাজেরই রক্তচক্ষু থেকে বাঁচতে। এটাই ভালো হল, বল?"
আদিত্য আর কিছু বলল না।
বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না আর...

শেষের পরে

১

মিঠুন চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল, "এসব কী হচ্ছে বলো তো? তুমি যে লেভেলে সাজছ, আমার তো মনে হয় গ্রামে যেতে যেতে ভোর হয়ে যাবে।"
চন্দ্রিমা বলল, "এগুলোকে সাজা বলে না জান। একটু লিপস্টিক আর একটু কাজলকে মেক আপ বলে না।"
মিঠুন অবাক চোখে চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে বলল, "লিপস্টিক আর কাজল পরতেই তো দু ঘণ্টা হয়ে গেল।"
চন্দ্রিমা বলল, "মোটেও দু ঘণ্টা হয়নি। তোমার সব কিছু বাড়াবাড়ি। আর এত তাড়া দিলে কী করে হবে?"
মিঠুন বলল, "হ্যাঁ, কলকাতা থেকে চার ঘণ্টা ড্রাইভ করতে হবে আমায়, তাও সে কোনও গ্রামের ভিতরে। রাস্তা হারালে কোনও দিকে গিয়ে পড়ব কে জানে!"
চন্দ্রিমা বলল, "দ্যাখো মিঠুন আমার মামাবাড়ির রাস্তা আমার থেকে ভালো কেউ জানে না। তুমি চিন্তা কোরো না তো!"
মিঠুন হাল ছেড়ে দিল। চন্দ্রিমা বলল, "তুমি আজকের দিনটা থাকবে তো?"
মিঠুন বলল, "দেখি, যদি বিকেলের মধ্যে বেরোতে পারি তবে ফিরে আসব।"
চন্দ্রিমা বলল, "অ্যাজ ইউ উইশ। পুজো আর্চা থেকে দূরে থাকতে চাও, তাই তো?"
মিঠুন একটু শক্ত হল, "তুমি তো বোঝোই। আমি থাকলে যদি কোনওও প্রবলেম হয়।"
চন্দ্রিমা বলল, "আমি কিন্তু যেতে চাইনি। তুমিই জোর করলে।"
মিঠুন বলল, "কেন যাবে না, প্রতি বছর যাও।"
চন্দ্রিমা বলল, "আচ্ছা শোনো, আমি যখন থাকব না, পাশের ফ্ল্যাটের বউদি আবার খোঁজ-টোজ নিতে এলে বেশি ভালোবেসে ফেলো না যেন। ওর হাজব্যান্ড পারে না মনে হয়। বউদিটা সারাক্ষণ কেমন খাই খাই মুখ করে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় পেলেই খেয়ে নেবে একবারে।"
মিঠুন হাসতে হাসতে বলল, "খেলে খাবে। আমি তো সবসময় আছিই। বউদি ইজ সেক্সি। দিতে চাইলে ছেড়ে দেব?"
চন্দ্রিমা পাউডারের কৌটোটা মিঠুনের দিকে ছুড়ে মারল, "একবারে পিস পিস করে কেটে রেখে দেব বুঝলে? দাঁড়াও না, আমি রুমে রুমে সিসি টিভি বসাব এবার। আমি না থাকলে কী করো সব রেকর্ড হয়ে থাকবে।"
মিঠুন বলল, "বসিয়ো। আমি গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি এসো।"

২

যশোর রোড থেকে গাড়িটা যখন গ্রামের পথে ঢুকল তখন দুপুর দেড়টা বাজে। মিঠুন বলল, "আর কতক্ষণ বলো তো? উফ, এবার টায়ার্ড লাগছে কিন্তু।"
চন্দ্রিমা বলল, "ম্যাক্স আধ ঘণ্টা। এই তো বড়োমামা ফোন করছে। দাঁড়াও।"
চন্দ্রিমা ফোনটা ধরল, "হ্যাঁ মামা... হ্যাঁ আমরা এসে গেছি... আচ্ছা আচ্ছা... ঠিক আছে।"
ফোন রেখে চন্দ্রিমা বলল, "খানিকটা গিয়ে দেখবে একটা পুকুর পড়বে। ওখানে একটু দাঁড়িয়ো। মামা

দাঁড়িয়ে আছে।”
মিঠুন অবাক হয়ে বলল, “পুকুরের ওখানে কী করছে?”
চন্দ্রিমা বলল, “কে জানে কী করছে। বুড়োর তো কাজ নেই কোনও। খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায়।”
মিঠুন বলল, “তোমার মামা আমার গাড়িতে উঠবেন?”
চন্দ্রিমা বলল, “কেন উঠবে না?”
মিঠুন বলল, “আমাকে পছন্দ না তো!”
চন্দ্রিমা বিরক্ত হল, “তুমি এখনও সব পুরোনো কথা ধরে আছ কেন বলো তো? মামার যদি অতই রাগ থাকত তাহলে কি তোমাকে গ্রামে নেমন্তন্ন করত?”
মিঠুন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “ভালো হলেই ভালো। এই নাও তোমার পুকুর এসে গেছে।”
চন্দ্রিমা বলল, “দাঁড়াও দাঁড়াও।”
মিঠুন গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বলল, “কী হল? কেউ নেই তো?”
চন্দ্রিমা বলল, “দাঁড়াও। মামাকে ফোন করি।”
চন্দ্রিমা ফোন করল, “হ্যালো... আচ্ছা আচ্ছা।”
ফোন রেখে বলল, “পাঁচ মিনিট।”
মিঠুন কাঁধ নাচাল, “ওকে।”
চন্দ্রিমা বলল, “নামি চলো গাড়ি থেকে। হাত পা ধরে গেল পুরো।”
মিঠুন বলল, “চল।”
দুজনে নামল। চারদিকে ধু-ধু মাঠ। চন্দ্রিমা চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিল। বলল, “উফ... তিন বছর পর। কী ফ্রেশ, তাই না?”
মিঠুন বলল, “হ্যাঁ। শুধু মানুষগুলো এই প্রকৃতির মতো একটু ফ্রি থিংকার হলে ভালো লাগত।”
চন্দ্রিমা বলল, “সবার একটু সময় লাগে মিঠুন। মানুষকে সময় দিতে হয়। দেখলে তো, সব ভুলে পুজোয় আসতে তো বলেছে আমাদের।”
মিঠুন চন্দ্রিমাকে কাছে টানল। দীর্ঘক্ষণ ধরে চন্দ্রিমার ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে চুমু খেল। চন্দ্রিমা ছাড়িয়ে নিল, “কী করছ? মামা কাছেই আছে।”
মিঠুন চারদিকে দেখে বলল, “কোথাও নেই।”
চন্দ্রিমা এবার আর বাধা দিল না, বলল, “মিস্টার মিঠুন, এত গরম হয়ে শহরে ফিরবে, দ্যাখো আমার সতিন না এসে যায়।”
মিঠুন চন্দ্রিমার কোমর ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, “ইচ্ছা তো করছে তোমায় নিয়েই শহরে যাই। তিন দিন আমি বেঁচে থাকব কী করে জান?”
মামা এসে গেছিলেন। চন্দ্রিমা তাড়াতাড়ি মিঠুনকে ছাড়িয়ে নিল।
চন্দ্রিমা মিঠুনের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে মামার দিকে দৌড়ে গেল। মামা তাদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন সম্ভবত। গম্ভীর হয়ে ছিলেন। চন্দ্রিমা তড়িঘড়ি বড়োমামাকে প্রণাম করল। বড়োমামা বললেন, “জামাই কি আজ ফিরে যাবে?”
চন্দ্রিমা বলল, “হ্যাঁ মামা, ওর আবার অফিস আছে কাল।”
মিঠুন প্রণাম করল এগিয়ে এসে।
বড়োমামা বললেন, “থাক থাক। চলো। রওনা হওয়া যাক।”
চন্দ্রিমা পিছনের সিটে বসল। বড়োমামা মিঠুনের পাশে বসলেন।
মিঠুন গাড়ি স্টার্ট দিল।
বড়োমামা বললেন, “মাঝে মাঝে এসে থাকতে পারো তো।”

মিঠুন বলল, “বুঝতেই পারছেন, অফিসের যা ঝামেলা চলে।”
চন্দ্রিমা বুঝল বড়োমামার সঙ্গে মিঠুন সহজ হতে পারছে না। সে কথা ঘোরাবার জন্য বলল, “মামা এবার রিংকুদিরা আসবে?”
বড়োমামা বললেন, “হ্যাঁ। সবাই আসবে।”
রাস্তা সরু হলেও পাকা রাস্তা। সবে হয়েছে। মিঠুনের ড্রাইভ করে ভালো লাগছিল।
খানিকটা যাবার পর বড়োমামা বললেন, “একটু দাঁড়াও এখানে।”
কয়েকজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।
মিঠুন গাড়ি দাঁড় করাল। বড়োমামা গাড়ি থেকে নামলেন।
মিঠুন গলা নামিয়ে বলল, “তোমার বড়োমামা তো লোকাল ট্রেনের মতো সব স্টেশনে দাঁড়ানো শুরু করল।”
চন্দ্রিমা বলল, “জানোই তো মামা এখানে খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল। নিশ্চয়ই গ্রামে কোনও প্রবলেম হয়েছে আবার।”
বড়োমামা মিঠুনকে হাত নেড়ে ডাকলেন। চন্দ্রিমা বলল, “তোমাকে ডাকছে আবার, নিশ্চয়ই সবার সঙ্গে পরিচয় করাবে।”
মিঠুন বলল, “উফ। রিডিকিউলাস। এই গ্রামের লোকগুলো না!”
চন্দ্রিমা বলল, “প্লিজ যাও, জামাই বলে কথা। আচ্ছা চলো, আমিও যাচ্ছি।”
মিঠুন বলল, “থাক। দাঁড়াও যাই।”
মিঠুন গাড়ি থেকে নামতে চন্দ্রিমা মোবাইল বের করল। টাওয়ার ভালোই ধরে গ্রামে। তবে ফোর জি থেকে টু জি হয়ে গেছে। সে হোয়াটসঅ্যাপ খুলল। অনেকক্ষণ চেক করা হয় না। ফ্ল্যাটের বউদের গ্রুপে নতুন কী গসিপ হচ্ছে দেখতে হবে।
মোবাইলে চোখ রাখতে রাখতেই সে একটা শব্দ শুনল। মিঠুন খুব জোরে “আহ” বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।
বাইরে তাকাতে চন্দ্রিমা স্থির হয়ে গেল। বড়ো একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে কে মিঠুনের গলায় চালিয়ে দিয়েছে। মিঠুন রাস্তায় কাটা পাঁঠার মতো পড়ে কাতরাচ্ছে। দরজা খুলে নেমে যে মিঠুনের দিকে দৌড়ে যাবে চন্দ্রিমার সে সময়টুকুও ছিল না। প্রবল আক্রোশে তিন-চারজন মিঠুনকে লাথি মারছে।
কয়েক মিনিট পরে দেহটা স্থির হয়ে গেল।
সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সিনেমার মতো দেখছিল চন্দ্রিমা। কী হচ্ছে বুঝে উঠতে উঠতেই গোটা ব্যাপারটা হয়ে গেল। সংবিৎ ফিরল কিছুক্ষণ পর। গাড়ি থেকে নেমে বড়োমামার দিকে ছুটে গেল হাঁফাতে হাঁফাতে, “এ তুমি কী করলে?”
বড়োমামা তার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, “সিঁদুর পরিস আবার? যাক গে, মুছে ফেলবি বাড়ি গিয়ে। গাড়িতে ব্যাগ-ট্যাগ যা আছে নিয়ে নে। আমাদের গাড়িটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। যা উঠে বস। আমার কিছুক্ষণ দেরি হবে যেতে।”
চন্দ্রিমা রাস্তার উপরে বসে রইল। মিঠুনের লাশটা রাস্তার ওপরে পড়ে আছে।
চন্দ্রিমার মনে হচ্ছিল সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে।
খানিকক্ষণ পরেই ঘুম থেকে উঠে পড়বে ঘামতে ঘামতে।

৩

একটা সময় ছিল যখন কল্যাণ পুজোর সময়টা শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন।
দু বছর হল সেটা বন্ধ হয়েছে। গ্রামে যাওয়া অনেক হ্যাপা। গিন্নি সোমার পায়ে ভেরিকোজ ভেইনের প্রবলেম আছে। সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। বসে বসে টিভিতে পুজো পরিক্রমা দেখেন।

কাজের একটা মেয়ে রাখা হয়েছে। সে পুজোতে আসেনি।
কল্যাণ নিজেই রান্না করছিলেন। ছোটো মাছ, আলু পোস্ত আর ভাত। গিন্নিকে রান্না থেকে ছুটি দিয়েছেন। পাড়ার প্যান্ডেল থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে।
সোমা ড্রয়িং রুম থেকে বললেন, "এই তোমার রান্না হয়েছে?"
কল্যাণ বললেন, "শেষের দিকে। চা চলবে?"
সোমা বললেন, "দিয়ো।"
মাছটা অল্প আঁচে দিয়ে কল্যাণ চা নিয়ে বসার ঘরে এলেন।
সোমা বললেন, "তোমার রান্না ভালো। কিন্তু একটু স্লো। কদিন পর ঠিক হয়ে যাবে।"
কল্যাণ বললেন, "তা বটে। কাজের মেয়েটা আসার আগে ঠিক হয়ে যাবে তো? তবেই হবে।"
সোমা বললেন, "দেখা যাক।"
কল্যাণ বললেন, "মেয়ে ফোন করেছিল?"
সোমা বললেন, "না এখনও করেনি। পৌঁছয়নি হয়তো।"
কল্যাণ বললেন, "মিঠুন ছেলেটা সত্যিই ভালো।"
সোমা হাসলেন, "কেন? আমাদের বাড়ি যাচ্ছে তাই?"
কল্যাণ বললেন, "তাই নয়তো কী? তোমার ভাইগুলো যা এক-একটা জিনিস! মিয়া বিবি রাজি! তেনাদের যত আপত্তি। হাস্যকর না?"
সোমা রাগলেন, "দ্যাখো, সবারই নিজেদের মেয়ে নিয়ে একটা এক্সপেক্টেশন থাকে। ওদেরও ছিল। সবাই তোমার মতো এত মুক্তমনা নয়।"
কল্যাণ বললেন, "তুমিও নও? আমাদের তো ইন্টার কাস্ট ম্যারেজ ছিল। তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? ঝামেলা তখন তো কম হয়নি।"
সোমা বললেন, "দুটো আলাদা।"
কল্যাণ বললেন, "সময়ও আলাদা। আমি মানছি আমার মেয়ের বিয়ে, তাদের কী বলো তো?"
সোমা গম্ভীর হলেন, "থাক। পুজোর দিনে এসব শুরু কোরো না।"
কল্যাণ বললেন, "ছেলেটা আজই কলকাতা ফিরবে। কত হ্যাপা!"
সোমা বললেন, "তোমার দেখি মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। মেয়ের থেকে জামাই নিয়ে বেশি ভাবো।"
কল্যাণ বললেন, "ভাবলে দোষ নেই। ছেলে হিরে।"
সোমা বললেন, "শুধু..."
কল্যাণ বললেন, "কোনও শুধু নেই। মানুষ মানুষই হয়। তুমি যাই ভাবো।"
সোমা বললেন, "মিঠুনকে ও বাড়িতে ঢুকতে দেবে? যদি পুজোর সময় ঢোকে..."
কল্যাণ বললেন, "না গেলেই ভালো হত। বারবার বারণ করেছিলাম। মেয়েটাও অদ্ভুত। অনেকদিন পর মামাবাড়ির পুজো দেখার সাধ হয়েছে। একটা সময়ের পরে যে জীবনের কোনও কোনও জানলা বন্ধ করতে হয় সেটা বোঝে না।"
সোমা চায়ের কাপ রেখে বললেন, "ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে বাঁচি।"
ফোন বাজছিল। সোমা বললেন, "দ্যাখো তো কে।"
কল্যাণ দেখলেন, বললেন, "তুমি ধরো, তোমার ভাই। আমার পোষায় না।"
সোমা রেগেমেগে ফোনটা তুললেন। কয়েক সেকেন্ড পরে ফোনটা হাত থেকে পড়ে গেল।

গায়ে রক্ত লেগে ছিল অনেকখানি। শম্ভু পুকুরে নেমেছিল। দায়ের কোপ দেওয়ার সময় ছেলেটার যন্ত্রণায় কাতর অবাক মুখটা চোখে ভাসছিল তার। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে।

বাকিরা লাশ আর গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে পুলিশকে খবর দিয়েছে। পুলিশ আসতে কিছুক্ষণ লাগবে। তাকে বাবু ছেড়ে দিয়েছেন আগেই। আসল কাজ তার যেহেতু।

শম্ভু স্নান সেরে যখন বাড়িতে এল তখন রম্পার রান্না হয়ে গেছিল। অনেকক্ষণ ধরে রক্ত ধুতে হয়। পুকুরের একদিকটা লাল হয়ে গেছে। শম্ভু ঠিক করল খেয়ে ঘুম দেবে একটা বিকেলে।

গরম ভাত আর মাংসের ঝোল। সকালে মাংস এনে রেখেছিল শম্ভু। জানত আজ মাংসের দরকার পড়বে।

রম্পা খেতে দিতে দিতে ঠান্ডা গলায় বলল, "আমার শাড়িটা বাজে লেগেছে।"

শম্ভু বলল, "আর-একটা কিনে আনিস। টাকা দিয়ে দেব।"

রম্পা অবাক গলায় শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল, "টাকা পেলি কোত্থেকে?"

শম্ভু হাসল, "পুজো বোনাস।"

রম্পার চোখে মুখে খুশি ফুটে উঠল, "কত টাকা?"

শম্ভু চোখ নাচাল, "বলব কেন?"

রম্পা মুখ ব্যাজার করল, "বুঝেছি। তারপর মদ খাবি। খেয়ে এসে আমাকে পিটবি।"

শম্ভু বলল, "তোর গরম কমে যাচ্ছে। মাংস খা। দুদিন পর পর মাথাব্যথা বললে সব বর পিটবে।"

রম্পা বলল, "মেয়েমানুষ তো। রোগ হবেই। রক্ত পড়ার দিনেও তোর করার ইচ্ছে জাগে। যা না খারাপ পাড়ায়। আমি কি বাধা দিয়েছি?"

শম্ভুর রাগ হওয়া উচিত ছিল। হল না। কাজগুলোর পর মাথা গরম হয় না। বলল, "যাব তো। যেখানে ইচ্ছা যাব। মাংস দে।"

রম্পা মাংসের হাঁড়ির সব মাংস শম্ভুর থালায় দিয়ে দিল।

শম্ভু রেগে বলল, "তুই খাবি না?"

রম্পা বলল, "খা তুই। তোর টাকা তুই খা।"

শম্ভু মাংস ভাতে মেখে এক গ্রাস রম্পার মুখে ধরল। রম্পা মুখ সরিয়ে নিল।

শম্ভু বলল, "খা বলছি।"

রম্পা ভাতটা খেল। বলল, "নুন কম হয়েছে তো। খাচ্ছিস কী করে?"

শম্ভু বলল, "তোর সব কিছুতে নুন বেশি খাওয়ার অভ্যাস।"

রম্পা মুখ ব্যাজার করে বলল, "আমার অনেক কিছু কেনার আছে।"

শম্ভু বলল, "বল।"

রম্পা বলল, "আমায় বলেছিলি একটা সোনার চুড়ি দিবি। দিসনি।"

শম্ভু বলল, "ওরে বাবা, সে তো অনেক টাকা।"

রম্পা বলল, "বেশি না। তুই তো টাকা পেয়েছিস।"

শম্ভু বলল, "সোনার দাম জানিস?"

রম্পা বলল, "বনার বর কি তোর থেকেও গরিব? ওকে রমেন কিনে দিল কী করে?"

শম্ভু হাসতে হাসতে বলল, "ওরে মাগি! ওটা ঝুটো সোনা। ঝুটো সোনা বুঝিস না?"

রম্পা মুখ বেঁকিয়ে বলল, "খুব বুঝি। বনার দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। আমি তো বিকেলে বাড়ির বাইরে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম বনার জন্য।"

শম্ভু রেগে বলল, "যাবি না। যাওয়ার দরকার নেই। তুই যাবি, আর দুদিন পর পর নতুন নতুন বায়না করবি। রমেন সোনার দোকানে কাজ করে। নিশ্চয়ই সোনা চুরি করে কিনে দিয়েছে।"

রম্পা বলল, "আমি কী করে জানব? যা হোক করে কিনে দিক। চুরি করুক, ডাকাতি করুক, খুন করুক।"
শম্ভু শেষ কথাটা শুনে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল, "খাবই না। খানকি মাগির জন্য আমার খাওয়া হবে না। সারাক্ষণ শুধু মাগির এটা চাই এটা চাই এটা চাই। আর যখন আমার চাই তখন মাথা ব্যথা, গুদে ব্যথা। বাল তুই মরিস না কেন?"
রম্পা ছাড়ার পাত্রী না, সেও চ্যাঁচ্যাতে শুরু করল, "তুই খানকি, তোর মা খানকি। কিছু দেবার বেলায় নেই, শুধু মারবে আর মদ গিলবে। তুই মর, তোর মা মর, তোর বাপ মর।"
শম্ভুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে রম্পাকে একটা জোরে চড় মারল। রম্পা ছিটকে পড়ল ঘরের কোনায়।
সে আরও আক্রমণাত্মকভাবে রম্পার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরের দরজায় কে জোরে ডাকাডাকি করতে লাগল, "শম্ভু দাস, বাইরে আয়।"
শম্ভু অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দেখল পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।
ও বাড়ির বাবুও আছেন সঙ্গে।
সকালেই আজ থানার বড়োবাবুর সঙ্গে ও বাড়িতে দেখা হয়েছিল।
"শম্ভু থানায় চ।"
শম্ভু অবাক হয়ে ও বাড়ির বাবুর দিকে তাকাল।
ও বাড়ির বাবু এগিয়ে এসে তার কানে কানে বললেন, "বেশি কিছু না। তোর নামটা কেসে রাখতে হয়েছে, নয়তো ঝামেলা হত একটু। তুই আপাতত যা। জেলে ভালোই খাওয়াদাওয়া হয়। তিন-চার মাস থাকতে হবে। তারপর জামিন হবে। তোর বউকে নিয়ে চিন্তা করিস না। আপাতত আমার গিন্নির দেখভাল করুক। খাওয়া পরার চিন্তা করতে হবে না।"
শম্ভু মাথা নাড়ল। বাবু তার ঈশ্বর। যা বলেন সেটা শোনাই তার অভ্যাস।
গাড়িতে গিয়ে উঠল সে।
রম্পা নিজেকে সামলে বেরিয়ে এসে দেখল গাড়িটা মিলিয়ে গেছে।
সে অবাক চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

৫

জীবেন সান্যাল ঠাকুরঘরে ছিলেন। প্রতিমা এবার বড়ো সুন্দর হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে মাকে দেখছিলেন।
প্রণতি এসে তাঁকে ডাকলেন, "মিষ্টি বমি করছে শুধু। চ্যাঁচামেচি করছে।"
জীবেন সান্যাল ভুরু কুঁচকে বললেন, "বড়দা ফিরেছে?"
প্রণতি বললেন, "না। বললেন, থানায় যাবেন। ফিরতে দেরি হবে।"
জীবেন বললেন, "চলো আমি যাচ্ছি।"
ঠাকুরদালান বাড়ির বাইরে। চন্দ্রিমাকে দোতলার কোনার ঘরে রাখা হয়েছে। প্রথমে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল। এবার বমি শুরু করেছে।
প্রণতি ভয়ার্ত গলায় বললেন, "এভাবে বমি করলে কিন্তু ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে।"
জীবেনবাবু বললেন, "আজকে দেওয়া যাবে না। মেয়েকে সামলাতে হবে আগে।"
প্রণতি বললেন, "মেয়ে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।"
জীবেনবাবু বললেন, "চলো দেখছি।"
দরজা বন্ধ ছিল। জীবেনবাবু দরজা ধাক্কালেন। দুজন মেয়ে চন্দ্রিমাকে সামলাচ্ছিল। কেউ একজন দরজা খুলে দিল।
জীবেনবাবু গলায় আদর ঢেলে বললেন, "কি রে মা, কেমন আছিস?"

চন্দ্রিমা চেঁচিয়ে উঠল, "ছোটোমামা, ওরা ... ওরা..."
কথা শেষ করতে পারছিল না চন্দ্রিমা। জীবেনবাবু চন্দ্রিমার পাশে বসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর মা।"
চন্দ্রিমা বমি করার চেষ্টা করল। বেশ খানিকটা জল ফেলল মেঝের ওপর। জীবেনবাবু স্মিত মুখে চন্দ্রিমার মাথায় অক্লান্ত হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন। প্রণতি মেয়ে দুটোকে বললেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছিস কী? মেঝেটা কে পরিষ্কার করবে?"
মেয়ে দুটো তড়িঘড়ি মেঝে মুছতে শুরু করল। জীবেনবাবু বললেন, "মার সঙ্গে কথা বলবি মিষ্টি?"
চন্দ্রিমা হাঁফাচ্ছিল। কিছু বলতে পারছিল না। জীবেনবাবু সোমাকে ফোন করলেন, দুটো রিং হতেই সোমা ধরল, "আমরা আসছি। ও ঠিক আছে তো?"
জীবেনবাবু বললেন, "কথা বল।"
ফোনটা চন্দ্রিমাকে দিলেন জীবেনবাবু। চন্দ্রিমা ফোনটা নিয়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারল। একটা শব্দ হয়ে মোবাইলটা মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল। জীবেনবাবু সেদিকে তাকিয়ে প্রণতিকে বললেন, "ডাক্তার সাঁতরাকে খবর দাও। ঘুমের ওষুধ না দিলে মেয়েটাকে শান্ত করা যাবে না।"
প্রণতি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটা মেয়ে মোবাইলটা তুলে জীবেনবাবুর হাতে দিল। একটা দিক ভেঙে বেরিয়ে গেছে। ফোনটা গেল। জীবেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
চন্দ্রিমা বলল, "বড়োমামা ওকে মেরে ফেলল। মেরে ফেলল। মেরে ফেলল।"
জীবেনবাবু মেয়ে দুটোকে ইশারায় চন্দ্রিমাকে ধরতে বলে উঠলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের ঘরে এসে ল্যান্ডলাইন থেকে দাদাকে ফোন করলেন। রিং হতেই ফোন ধরলেন সত্যেনবাবু, "কে, জীবু?"
জীবেন বললেন, "হ্যাঁ। মিষ্টিকে সামলে রাখা যাচ্ছে না। ডাক্তার সাঁতরাকে ঘুমের ওষুধ দিতে ডাকলাম।"
"ভালো করেছিস। সাঁতরাকে বলবি গ্রামের একটা ছাগলকে ওদের গাড়ি মারায় গ্রামের কয়েকজন না বুঝে ওর হাজব্যান্ডকে মারধোর করেছিল। কেসটা সেভাবেই যাবে।"
"মিষ্টি ডাক্তারের সামনে উলটোপালটা বললে?"
সত্যেন বিরক্ত হলেন, "তাহলে তুই আছিস কী করতে? ডাক্তারকে আগে থেকেই বুঝিয়ে দিবি যে চোখের সামনে ওসব দেখে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"
"আচ্ছা। ওদিকে কী খবর?"
"চিন্তা নেই। মিটিয়ে এসে বলছি। তুই ওদিকটা সামলা। সোমা আর কল্যাণও আসছে।"
"শুনলাম।"
"চিন্তার কোনও কারণ নেই। কালকের মধ্যে সব ঠিক করে দেব। রাখ এখন।"
"আচ্ছা।"
জীবেন ফোন রাখলেন।
মাথার ওপর এমন দাদা থাকলে কোনও চাপকেই আর চাপ বলে মনে হয় না।

৬

সত্যেন ওসির বাড়ি এসেছেন। ছোটো ছোটো ঘর। ওসি নির্মল চৌধুরী একা থাকেন। ট্রান্সফারের চাকরি আর ছেলের স্কুলের ঝামেলা আছে বলে পরিবারকে নিয়ে বয়ে বেড়ান না।
থানায় সব কথা বলা যাবে না বলে নির্মলবাবু ওঁর বাড়িতে আসতে বলেছেন।
ডাইনিং টেবিলে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছেন সত্যেনবাবু। নির্মলবাবু কয়েকবার থানায় ফোন করে এসে

বললেন, "ঝামেলা নেই স্যার। কেসটা দাঁড়িয়ে যাবে।"
সত্যেনবাবু বললেন, "বুঝতে পারছেন তো? আমার ভাগনিজামাই। মেরেছে গ্রামের লোক। কোনওরকম যেন হালকা না দেওয়া হয়।"
নির্মলবাবু হাসলেন, "বুঝেছি স্যার।"
সত্যেনবাবু বললেন, "শম্ভু কোথায়?"
নির্মলবাবু বললেন, "লক আপে।"
সত্যেনবাবু বললেন, "কেস কবে কোর্টে উঠবে?"
নির্মলবাবু বললেন, "পুজোর পরেই। ততদিন ও এখানেই থাকবে।"
সত্যেনবাবু বললেন, "রাখুন। আপনাকে পুজোর নেমন্তন্ন করতে এলাম। কাল থেকে আমার বাড়িতেই সেবা করবেন।"
নির্মলবাবু বললেন, "তা স্যার আবার বলতে? সেভাবে বলতে গেলে আপনিই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। নইলে এই অজ গাঁয়ে কে এত করত?"
সত্যেনবাবু বললেন, "আপনার মাইনেপত্র ব্যাংক থেকে সব ঠিকঠাক আসছে তো?"
নির্মলবাবু মাথা নাড়লেন, "তা স্যার ঠিক আছে।"
সত্যেন একটা ব্যাগ বের করে নির্মলবাবুর হাতে দিলেন, "আমি চাই আমার ভাগনিজামাইয়ের কেসের খুনিকে যত তাড়াতাড়ি ফাঁসির কাঠে দেখতে। এর জন্য যা যা করার দরকার আপনি করবেন।"
নির্মল তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিলেন। কী করবেন স্থির করতে না পেরে ফ্রিজটা খুলে ফ্রিজে ব্যাগটা রেখে দিলেন। সত্যেন সেটা দেখলেন। তাঁর ঠোঁটের কোনায় একটা বিদ্রুপের হাসি এসেই মিলিয়ে গেল। নির্মল বললেন, "স্যার চা খাবেন?"
সত্যেন বললেন, "বানাবেন?"
নির্মল বললেন, "হ্যাঁ।"
সত্যেন বললেন, "বানান। আজ দিনটা বড়ো ব্যস্ত গেল।"
নির্মল চা বসালেন। সত্যেন নির্মলের ঘর দেখতে লাগলেন। আর পাঁচটা গৃহস্থর ঘর যেমন হয় তেমনই। শুধু দরজার ওপরে রাখা খাকি উর্দিটা জানান দিচ্ছে নির্মলবাবুর পরিচয়।
সত্যেন বললেন, "আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?"
নির্মল বললেন, "ক্লাস সেভেন স্যার। স্ট্যান্ড করে।"
সত্যেন খুশি হলেন, "বাহ। খুব ভালো। আপনি তো এখানেই থাকেন। ছেলের মাকে বলবেন ছেলের ওপর নজর রাখতে। এই প্রেম-ট্রেম খুব খারাপ। পরিবারের মানসম্মান মাটিতে মিশিয়ে দেয়।"
নির্মল বললেন, "তা স্যার ওর মা খুব কড়া। সবে তো ক্লাস সেভেন।"
সত্যেন বললেন, "তা হোক না। এখন থেকেই নজর রাখবেন। সবেধন নীলমণি।"
নির্মল চায়ের জল বসিয়ে এসে বসলেন। বললেন, "আমাদের চাকরি তো দেখতেই পাচ্ছেন স্যার। পুজো বলে কিছু নেই আমাদের। সবসময় ডিউটি। ছেলেও বাপকে পায় না। যতটা ওর মা চেষ্টা করে আর কি।"
সত্যেন বললেন, "তা ঠিক।"
নির্মল বললেন, "আচ্ছা স্যার, শম্ভু বিশ্বস্ত তো?"
সত্যেন বললেন, "কুকুর দেখেছেন? ওয়েল ট্রেইন্ড কুকুর?"
নির্মল বললেন, "হ্যাঁ স্যার। কেন বলুন তো?"
সত্যেন হাসলেন, "এরা সব আমার কুকুরের মতো। কাল যদি বলি তোর বউকে আমার বিছানায়..."
সত্যেন চুপ করে গেলেন।
নির্মল বললেন, "বুঝেছি বুঝেছি স্যার। চিনি ক চামচ স্যার?"

সত্যেন বললেন, "লাগবে না। রক্তে শর্করা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আলাদা করে আর দিতে হবে না। যেদিন ভাগনির বিয়ে হয়েছিল, সেদিন থেকে আমার..."
নির্মল চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন, "দেখুন স্যার ঠিক আছে নাকি।"
সত্যেন চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "বাহ ওসি সাহেব, আপনার হাত অসাধারণ। মাঝে মাঝে আপনার কাছে এসে চা খেয়ে যাব।"
নির্মল বললেন, "অবশ্যই স্যার। আমি আপনি এলে খুবই খুশি হব।"
সত্যেন আর কথা বললেন না। মন দিয়ে চা খেলেন।
চা শেষ করে কাপ নিয়ে উঠলেন। নির্মল বললেন, "না না স্যার আমি ধুয়ে নেব।"
সত্যেন বললেন, "কোনও দরকার নেই। নিজের কাজ নিজেকে করতে দিন।"
বেসিনে মন দিয়ে নিজের চায়ের কাপ ধুলেন সত্যেন। তারপর কাপটা গুছিয়ে রেখে বললেন, "আমি এলাম ওসি সাহেব। কোনও সমস্যা হলে ফোন করবেন।"
নির্মল চৌধুরী সত্যেনকে গাড়ি অবধি তুলে দিয়ে ঘরে এলেন।
ফ্রিজ থেকে প্যাকেটটা বের করলেন। প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বললেন, "শালা..."

৭

রম্পার জ্বর এসেছে। শম্ভু যখন মেরে চলে যায়, রম্পার জ্বর আসে।
মানুষটা যখন ভালোবাসে তখন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। যখন মারতে শুরু করে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। মারতে থাকে। বোঝে না যে মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল সে আর পাঁচটা ব্যাটাছেলের মতো না যাদের সঙ্গে ও গায়ের জোর ফলায়। মুখ ছাড়া আর কোনও অস্ত্রও নেই তার।
প্রথম যেদিন হাতে মুখে রক্ত নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল সেদিন তাদের বিয়ের পনেরো দিন পেরিয়েছে। অবাক হয়ে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে। তাকে তো বলেছিল শম্ভু ভাগচাষি। সে ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "এত রক্ত কীসের?"
শম্ভু হেসে বলেছিল, "বাবুর বাড়িতে মুরগি কেটেছি। রক্ত লেগে গেছে।"
রম্পা সরল মনে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। দ্বিতীয়বারে তার কেন জানে না মনে হয়েছিল এ রক্ত মুরগির রক্ত হতে পারে না। সারারাত জেগে বসেছিল সে। অদ্ভুত একটা ভয় জাঁকিয়ে বসেছিল তার মনে। কার সঙ্গে বিয়ে হল তার?
বিয়ের তিনমাসের মাথায় একদিন মদ গিলে এসে শম্ভু গড়গড় করে বলে ফেলেছিল তাকে বিয়ের পনেরো দিনের মাথায় সে কী করেছিল। রম্পা কেঁদে উঠেছিল। কান্না শুনে শম্ভু সে কী মার তাকে! সেই প্রথম গায়ে হাত তোলা। তারপর তো কারণে অকারণে লেগেই আছে।
অথচ এমনটা হওয়ার ছিল না। তার বাবা এত ভালো কীর্তন শিল্পী। মানুষ খুঁজে খুঁজে এসে তাকে নিয়ে যেত। গ্রাম থেকে যখন সান্যালবাড়িতে কীর্তনের জন্য ডাক এল, বাবা তাকেও নিয়ে এসেছিল। বড়ো বায়না ছিল। রম্পা সবে গান শুরু করেছে। কীর্তনের শেষে শম্ভুর সঙ্গে আলাপ। কালো শরীরটার মধ্যে কত মায়া! রম্পা লজ্জা পেত। একদিন গাঁ খুঁজে হাজির ছেলেটা। তার মাকে নিজের মা পাতিয়ে কত গল্প। বাপ আসতেই মেয়ের জন্য বিয়ের কথা পেড়ে ফেলল রম্পার মা। রম্পার বাবার ইচ্ছা ছিল না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন মেয়ে হাতের বাইরে চলে গেছে। অগত্যা মেনে নিলেন।
নিতান্ত অনাড়ম্বর বিয়ে। আশেপাশের একশো লোকও খায়নি।
কিন্তু বিয়ের পর আদর ছিল। ভালোবাসা ছিল। প্রথম মার খাবার পর রম্পা বুঝে উঠতে পারেনি কী করবে। শম্ভু বেরিয়ে যাবার পর হা হা করে কেঁদেছে। ভাবেনি বাড়ি যাবার কথা। মা কানের কাছে বারবার বলে

দিয়েছে বিয়ের পর মেয়েদের কোনও বাড়ি হয় না। মন্ত্রের মতো মনে প্রবেশ করে গেছে কথাগুলো। হয় না, হয় না, হয় না। বিয়ের পর মেয়েদের কোনও বাড়ি হয় না।
রম্পা উঠল। জ্বর গায়ে শম্ভুর ফেলে যাওয়া থালাবাসন পরিষ্কার করল। সেই সকালে রান্না করেছিল। ভেবেছিল শম্ভুর খাওয়ার পর খাবে। খাওয়াটাও হল না।
রম্পা খাটে এসে শুল। মাটির ঘর। রম্পার সংসার। ঘরের বাইরে রান্না হয়। জ্বরের সঙ্গে অস্বাভাবিক মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম মাথাব্যথা হলে রম্পা ছটফট করতে থাকে। আজকে ছটফটানি হচ্ছিল না। সে মড়ার মতো শুয়ে থাকল।
কিছুক্ষণ পর রমেনের বউ এল, "কি রে, ঘুমাস নাকি?"
দরজা খোলাই ছিল। বনা ঘরে ঢুকে গেল। রম্পা বলল, "মাথা ধরেছে রে খুব।"
বনা হেসে হেসে বলল, "শম্ভুরে তো ধরসে। শুনছস তো?"
রম্পা উত্তর দিল না। শুয়ে থাকল। মাথাব্যথার সময় কোনও কথা শুনতে ইচ্ছা করে না।

৮

রাত সাড়ে এগারোটা। কল্যাণ এবং সোমা পৌঁছলেন। সত্যেন এবং জীবেন বসে ছিলেন বৈঠকখানায়।
সোমার হাঁটতে কষ্ট হয় পায়ের জন্য। কল্যাণ সোমাকে ধরে বসালেন।
সোমা বিহ্বল চোখে দাদার দিকে তাকালেন, "জামাই?"
সত্যেন গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন।
সোমা মুখে আঁচল চাপা দিলেন।
কল্যাণ বললেন, "বডি কোথায়?"
সত্যেন চমকে তাকালেন কল্যাণের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পরে সামলে বললেন, "পোস্টমর্টেম চলছে।"
সোমা সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছেন। চোখ মুখ ফুলে গেছে। বললেন, "মিষ্টি কোথায়? ওর কিছু হয়নি তো?"
প্রণতি এলেন। সোমা প্রণতিকে দেখে কেঁদে উঠলেন, "এই কদিন আগে মেয়েটার বিয়ে হল।"
সত্যেন উঠলেন, "তোমরা খেয়ে নাও। আমাদের সকালে পুজোর কাজ আছে।"
কল্যাণ মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। বললেন, "মিঠুনের বাড়ির লোককে কিছুক্ষণ আগে খবর দিয়েছি। ওঁরা রওনা দিয়েছেন। কাল সকালে এসে পড়বেন।"
সত্যেনের মুখ ফ্যাকাশে হল, "বেশ তো। এত বড়ো বাড়ি। কোথাও না কোথাও জায়গা হয়ে যাবে।"
জীবেন একটু গলা খাঁকরে বললেন, "দাদা, আমাদের ফার্ম হাউসটা ফাঁকা পড়ে আছে। ওঁরা বরং ওখানে থাকুন। পুজোর বাড়িতে...।"
কল্যাণ স্থির চোখে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরাও তাহলে ওখানেই থাকব। আজ থাকা যাবে?"
প্রণতি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না না, আজ কী করে হবে, ওখানে আজ থাকা যাবে না। কাল পরিষ্কার করা হলে নাহয় দেখা যাবে।"
সত্যেন সোমার দিকে তাকালেন। বললেন, "খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নে। কী আর করবি, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।"
কল্যাণ বললেন, "পুলিশ কিছু করতে পারল?"
সত্যেন বললেন, "থানা খুব ভালো কাজ করেছে। কালপ্রিট বিকেলেই অ্যারেস্ট হয়েছে।"
কল্যাণ বললেন, "কালপ্রিট কে কী করে জানলে? মব লিঞ্চিং শুনলাম।"

সত্যেন বললেন, “গ্রামে একটা পাতা নড়লেও আমার কাছে খবর আসে।”
কল্যাণ কয়েক সেকেন্ড সত্যেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মিষ্টির সঙ্গে দেখা করব। কোথায় ও?”
প্রণতি ইতস্তত করে বললেন, “ওকে ঘুমের ওষুধ দিতে হয়েছে। দোতলার কোনার ঘরে আছে।”
কল্যাণ সোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার দোতলায় ওঠার দরকার নেই এখন। আমি দেখা করে আসছি।”
সোমা চুপ করে বসে রইলেন।
প্রণতি বললেন, “তা কী করে হয়, মিষ্টি তো এখন ঘুমাচ্ছে।”
কল্যাণ বললেন, “ঘুমাক না। মেয়ে তো আমার। দেখতে ক্ষতি কী?”
সত্যেন প্রণতিকে বললেন, “নিয়ে যাও।”
প্রণতি কল্যাণকে নিয়ে গেলেন।
জীবেন সত্যেনকে বললেন, “কাল রিংকু, পিকলুরাও আসছে।”
সত্যেন সোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “চিন্তা করিস না বোন। সব ঠিক হয়ে যাবে।”
সোমা বিহ্বল চোখে দাদাকে দেখল।
চন্দ্রিমা নিস্তেজ হয়ে ঘুমাচ্ছিল। ঘরে দুজন মেয়ে চুপচাপ বসে আছে। ঘরের মধ্যে একটা বমির গন্ধ নাকে এল কল্যাণের। প্রণতিকে বললেন, “খুব বমি করেছে?”
প্রণতি বললেন, “হ্যাঁ দাদা। বারবার বমি করছিল মিষ্টি। শেষমেশ ডাক্তারকে ডাকতেই হল।”
কল্যাণ মেয়ের পাশে বসলেন। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। চন্দ্রিমা শিউরে উঠল ঘুমের ঘোরেই। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, “মেরো না ওকে বড়োমামা, মেরো না, মেরো না বড়োমামা, মেরো না।”
কল্যাণ প্রণতির দিকে স্থির চোখে তাকালেন।
প্রণতি ব্যস্ত হয়ে “যাই, আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করি”, বলে তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
কল্যাণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন।

৯

ভোর পাঁচটা।
সারাদিনে যত কাজই থাক, প্রতিদিনই এই সময় ঘুম ভেঙে যায় সত্যেনের। উঠে প্রাতঃভ্রমণে বেরোনো তাঁর চিরকালীন অভ্যাস। বর্ষাকালটায় নিজের ঘরেই শরীরচর্চা সেরে নেন।
পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও বার্ধক্য ধরেনি। গিন্নি জবা পাঁচ বছর আগে চলে যাবার পর (শম্ভুর বউকে বলেছিলেন গিন্নির দেখাশোনা করতে) কিছুদিন ম্রিয়মাণ ছিলেন। সেসব সামলে উঠেছেন অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই। শক্ত মনের মানুষ তিনি। শোক দুঃখ বেশিদিন কাবু করে রাখতে পারেনি।
স্পোর্টস ট্রাউজার আর টিশার্টটা পরে ঘর থেকে বেরিয়ে বৈঠকখানায় এসে দেখলেন কল্যাণ বসে আছেন।
সত্যেন অবাক হলেন, “ঘুমাওনি?”
কল্যাণ বললেন, “বসো। কথা আছে।”
সত্যেন বললেন, “আমি তো মর্নিং ওয়াকে যেতাম।”
কল্যাণ বললেন, “কথা বলে যাবে। অসুবিধা আছে কোনও?”
সত্যেন বসলেন। বললেন, “বলো।”
কল্যাণ বললেন, “মিঠুনের বাড়ির কেউ আসবে না। কাল রাতে জানিয়ে দিয়েছে।”
সত্যেন অবাক হলেন, “কেন?”

কল্যাণ বললেন, "ওর বাড়ি থেকে বিয়েটা মেনে নেয়নি। ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা নিয়ে ওরা চিন্তিত নয়। ওর বাবা আমাকে এই ভাষাতেই কথাটা জানিয়েছেন।"
সত্যেন বললেন, "তুমি তো কাল বললে ওরা আজ আসবে। সেইমতো ফার্ম হাউস ক্লিন করতে বলে দিয়েছিলাম।"
কল্যাণ বললেন, "রাত্রে আবার ফোন করেছিল।"
সত্যেন নির্বিকার মুখে বললেন, "তাহলে এখানেই সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে?"
কল্যাণ বললেন, "কীভাবে করবে?"
সত্যেন বললেন, "ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমাকে বেরোতে হবে।"
কল্যাণ বললেন, "শুনে কি খুশি হলে?"
সত্যেন বললেন, "কেন বলো তো?"
কল্যাণ বললেন, "এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কথা হয়ে গেছে। তুমি যেতে পারো।"
সত্যেন উঠলেন। বললেন, "মিষ্টিকে সামলাও। ওর এখন তোমাদের দরকার।"
কল্যাণ বললেন, "তা বটে। তবে আমাদের তো বয়স হচ্ছে। ওর সবার আগে মিঠুনকেই দরকার ছিল।"
সত্যেন বললেন, "বয়স কম, শোক সামলে উঠলে আর-একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"
কল্যাণ বললেন, "হুঁ। জীবন তো সরলরেখাতেই চলে, তাই না?"
সত্যেন বললেন, "আমি তো তোমাদের কাল বললাম। থানায় কথা বলা আছে। খুনির শেষ দেখে ছাড়ব আমরা।"
কল্যাণ বললেন, "রিংকুরা কখন আসছে?"
সত্যেন বললেন, "ভোরে ট্রেন হাওড়া ঢোকার কথা। এখানে দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছে যাবে। রিংকু এলে মিষ্টি খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে আশা করা যায়।"
কল্যাণ বললেন, "চলো তোমার সঙ্গে আমিও হাঁটি। বহুদিন হাঁটা হয় না।"
সত্যেন বললেন, "চলো।"
দুজনে বেরোলেন। বিরাট বাড়ির সামনের ঘরে দুজন চাকর ঘুমায়। সত্যেন বেরোনোর আগে তারা জেগে যায়।
তাদের দেখে তটস্থ হয়ে দরজা খুলে দিল।
দুজনে রাস্তায় নামলেন। ভোরের দিকে হালকা একটা ঠান্ডা ভাব। সত্যেন খেতের দিকে তাকিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন।
কল্যাণ বললেন, "আজ সপ্তমী।"
সত্যেন বললেন, "হ্যাঁ, আজ থেকে চাপ বাড়বে পুজোর। গোটা গ্রাম খাবে।"
কল্যাণ বললেন, "গোটা গ্রাম কথাটা ভুল। কয়েকটা ঘর বাদ দিয়ে।"
সত্যেন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক গলায় বললেন, "গোটা গ্রামের মানুষদের ডেকেছি। তাদের বাইরে কাউকে ডাকিনি।"
কল্যাণ সত্যেনের দিকে না তাকিয়ে বললেন, "বুঝলাম। আমরা আজ চলে যাব।"
সত্যেন বললেন, "বেশ। আমারও মনে হয় মিষ্টি তোমাদের ওখানে থাকলে সামলাতে সুবিধা হবে।"
কল্যাণ বললেন, "কার সামলাতে? তোমার? কী সামলাবার কথা বলছ বলো তো?"
সত্যেন একটু থমকে বললেন, "আমি মিষ্টিকে সামলাবার কথা বলেছি।"
কল্যাণ বললেন, "ওহ। বুঝেছি। ঠিক আছে। দুপুর নাগাদ আমরা চলে যাব।"
সত্যেন কিছু বললেন না। গম্ভীর মুখে হাঁটতে থাকলেন।

রম্পার ঘুম ভাঙল সাতটা নাগাদ। উঠে দেখল রাত্তিরে দরজা খোলা ছিল। মাথা এতটাই ধরেছিল যে খেয়াল ছিল না। অবশ্য আজকাল আর ভয়ও লাগে না তার। প্রথম প্রথম শম্ভু রাতে বাইরে থাকলে সারারাত জেগে থাকত। কোথাও একটু শব্দ হলে ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত। হাতে একটা লাঠি রেখে দিত। সকাল হলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

বাড়ির উঠোনে শরতের রোদ এসে পড়েছে। রম্পা উঠে বাইরে গিয়ে বসল। দাঁতন বাকি। পুজোয় কত কিছু করার কথা ছিল। সান্যালবাড়ি যাবে। পাশের গ্রামে মেলা হয়। সেখানে কত কিছু কিনবে বলে ঠিক করেছিল।

পুজোর সময়টা গ্রামের রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় অনেকটাই। কেমন একটা মায়াবী হয়ে ওঠে চারপাশটা। আকাশটা নীল হয়ে আছে। ঘরের সামনের মাঠে কাশফুল ফুটেছে। সান্যালবাড়ি থেকে ঢাকের আওয়াজ আসছে। রম্পা বেশ খানিকক্ষণ সব কিছু ভুলে চুপচাপ মুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

তার একটা নেড়ি কুকুর আছে। কাল ভালো খাবার পেয়েছিল। শম্ভু সেভাবে খায়নি। অনেকটা ফেলা গেছিল। সব খেয়েছিল কুকুরটা। তাকে দেখে লোভাতুর দৃষ্টিতে লেজ নাড়াচ্ছিল। রম্পার মনখারাপ হল। ঘরে গিয়ে দেখল কিছুই নেই। বিস্কুট পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

সে দাঁতন সেরে ঘর ভেজিয়ে সান্যালবাড়ির দিকে রওনা দিল। কিছু না কিছু খাওয়া পেলেই হল। পুজোর দিনে ও বাড়িতে বসে থাকলে খাওয়ার সময় ঠিক কেউ না কেউ ডেকে নেয়।

রম্পার পিছন পিছন কুকুরটাও আসছিল। খানিকটা রাস্তা আসার পর কুকুরটা দাঁড়িয়ে গেল। অন্য এলাকা এসে গেছে। এর পর থেকে অন্য কুকুরদের রমরমা। তাকে দেখলে খেদানি খাবার সমূহ সম্ভাবনা।

ঢাকের শব্দ কাছে আসছে ধীরে ধীরে। রম্পা পা চালাল। সান্যালবাড়ির কাছে এসে দেখল বেশ কিছু লোক ভিড় করেছে। সে চুপচাপ ঠাকুরদালানের চেয়ারে গিয়ে বসল। প্রতিমাকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন বউ। রম্পা সবাইকে চিনল না। পুজোর সময় অনেকেই শহর থেকে আসেন। সবাইকে তার চেনার কথাও নয়।

সত্যেন ঠাকুরদালানে তদারকি করছিলেন। তার দিকে চোখ পড়তে এগিয়ে এলেন, “তুমি শম্ভুর বউ না?”

রম্পা মাথায় ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করল। কোনও কথা বলল না।

সত্যেন হাত বাড়িয়ে একজনকে ডেকে কানে কানে কিছু বললেন। রম্পা দেখল শম্ভুরই বন্ধু দেবু। সত্যেন কথাটা বলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দেবু এসে তার কানে কানে বলল, “বউদি, চিন্তার কোনও কারণ নেই, শম্ভুকে থানায় বেশিদিন রাখবে না। ছেড়ে দেবে।”

রম্পার দেবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, “ঘরে কিছু নেই । চাল ডাল তরিতরকারি।”

দেবু গলা নামিয়ে বলল, “বাইরে এসো।”

রম্পা বাইরে গেল। সান্যালবাড়ির পাঁচিলের বাইরে।

দেবু পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে বলল, “জ্যাঠা এই টাকাটা দিয়েছেন। যা যা কেনার কিনে নাও। আমি কাল গিয়ে দিয়ে আসব। এখানে এখন বারবার এসো না।”

রম্পা অবাক গলায় বলল, “কেন?”

দেবু বলল, “জ্যাঠা বলেছেন। কেসটা চলবে তো। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে।”

রম্পা বলল, “কী বলবে?”

দেবু বিরক্ত হল, “আহ, তোমাকে এখন অত বোঝাতে পারব না। শুধু বুঝে নাও, তুমি এখানে এলে শম্ভুর সমস্যা হবে।”

রম্পা বলল, “শম্ভু তো বাবুর কাছেই থাকে। আমি এলে কী হবে। ভোগের প্রসাদ খাব না বলছ?”

দেবু বলল, “আমি গিয়ে দিয়ে আসব তোমায় ভোগের প্রসাদ। ঠিক আছে? আজ বাড়ি যাও।”

দেবু বাড়ির ভিতর চলে গেল।

রম্পা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।
ঢাকের শব্দটা আবার দূরে যেতে শুরু করেছে।

১১

জীবেন সান্যাল হিসেব করছিলেন। সপ্তমী থেকে প্রচুর লোক খাবে। আনাজ, চাল, ডাল আসা শুরু হয়েছে। এই কটা দিন নাওয়াখাওয়া মাথায় ওঠে। অনেক নেতারাও আসবেন সদর থেকে। সান্যালবাড়ির পুজো বলে কথা। বড়দা তাঁকে ভরসা করেন, জীবেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ভরসার মর্যাদা দেবার।
বাইরে থেকে ছেলে, ভাইঝিরা আসবে। ওদের জন্য আবার আলাদা খাবার ব্যবস্থা। জল আনাতে হচ্ছে সদর থেকে। এমনি জল খাবে না ওরা মিনারেল ওয়াটার ছাড়া। জামাইয়ের আবার হাজারখানেক বায়নাক্কা থাকবে। এটা দাও রে সেটা দাও রে। জীবেন সান্যালের মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয় এই সময়টা।
জীবেনের পাশে সত্যেন এসে বসলেন। জীবেন বললেন, “সব ঠিক আছে তো?”
সত্যেন বললেন, “মিষ্টির ঘুম ভেঙেছে।”
জীবেন বললেন, “দেখা করলি?”
সত্যেন বললেন, “হ্যাঁ।”
জীবেন বললেন, “কী বুঝলি?”
সত্যেন বললেন, “শান্ত হয়েছে। বাপ আছে মেয়ের সঙ্গে। ঠান্ডা হয়ে যাবে। আজ চলে যাবে।”
জীবেন অবাক হয়ে বললেন, “আজই? দুদিন থাকলে ভালো হত না?”
সত্যেন হালকা গলায় বললেন, “যাক, কেস থিতিয়ে যাবে। কিছুই হবে না।”
জীবেন বললেন, “তবু। মেয়ে যেরকম ভায়োলেন্ট ছিল কাল...”
সত্যেন বললেন, “থাম তো। ওর বাবা মা জানে মেয়ের ভালো কীসে। জলঘোলা করে কোনও লাভ হবে না।”
জীবেন বললেন, “বডি কী হবে?”
সত্যেন বললেন, “ও থানা থেকে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।”
জীবেন একটু ইতস্তত করে বললেন, “পোড়াবে?”
সত্যেন ঠান্ডা চোখে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সেটা জেনে তুই কী করবি? যা পারে করুক।”
জীবেন বললেন, “পিকলু আসছে আজ, রিংকুরও তো আসার সময় হয়ে গেল।”
সত্যেন একটু খুশি হলেন। বললেন, “হ্যাঁ। রিংকুদের ঘর গোছানো হয়ে গেছে তো?”
জীবেন বললেন, “সেসব কালই প্রণতি করে রেখেছে। ওসব নিয়ে ভাবিস না।”
সত্যেন বললেন, “শোন, আমার তো খেয়াল থাকবে না কাজের চাপে, নজর করিস শম্ভুর বউ যেন বারবার না আসে এখানে। দেবুকে বলে দিয়েছি।”
জীবেন বললেন, “সে দেখে নিচ্ছি। শম্ভুকে সদরে চালান করে দিলে বাঁচি। এখানে থাকা মানে আরও ঝামেলা বাড়বে।”
সত্যেন জীবেনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন, “শম্ভু বেঁকে বসে যদি?”
জীবেন নড়েচড়ে বসলেন, “সে তো হতেই পারে। না হবার কিছু নেই। জেলে কানে মন্ত্র দেবার লোকের কি অভাব আছে? গাঁয়ে একরকম, ওখানে গেলেই সাপের পাঁচ পা দেখাবার লোকের অভাব হবে না। তখন এই শম্ভুই দেখা গেল কোর্টে বেগড়বাঁই করে বসল।”
সত্যেন বসে বসে গম্ভীর মুখ পা নাচাতে লাগলেন। জীবেন চুপচাপ বসে রইলেন।

১২

কিছু লোক আছে যাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নিজেরই ভরসা নেই। অন্য কেউ ঠিক করে না দিলে তারা বলতে পারে না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।
দীপক লাহিড়ী বিয়ের আগে মায়ের কথায় উঠবোস করত। বিয়ের পরে নিজের জাঙিয়ার রং কী হবে, সেটাও রিংকু ঠিক করে দেয়। দীপক একটু নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। রিংকুর মুড খারাপ হলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।
যশোর রোড ছেড়ে গাড়ি সান্যালবাড়ির দিকের রাস্তায় ঢোকার পরে রিংকু বলল, "শোনো, বাড়িতে একটা প্রবলেম হয়েছে। মিষ্টিদের গাড়ির নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। মিষ্টির বর আর বেঁচে নেই। তুমি আবার এই নিয়ে কোথাও কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেলো না। বুঝেছ?"
দীপক অবাক গলায় বলল, "মিষ্টির বর বেঁচে নেই? কই আমাকে বলোনি তো?"
রিংকু গম্ভীর বলায় বলল, "এখন বলেছি তো। জেনে গেছ। কোনও প্রবলেম?"
দীপক বলল, "না। তবে ছেলেটা ভালো ছিল। খারাপ লাগছে।"
রিংকু বলল, "ভালো ছিল কী করে বুঝলে? কবার দেখা হয়েছে তোমার সঙ্গে?"
দীপক থতোমতো খেয়ে বলল, "না, মানে চন্দ্রিমার সঙ্গে যখন ওর অ্যাফেয়ার চলছিল তখন যেবার চন্দ্রিমা পুজোতে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়েছিল ফোনে, ভুলে গেলে?"
রিংকু বলল, "সব মনে আছে, কিন্তু মিষ্টি অনেক কিছু লুকিয়েছিল। সেটা মনে আছে তো? আর যারা লুকোয় তারা ভালো হয় কী করে?"
দীপক একটু ভীত গলায় বলল, "চন্দ্রিমা লুকিয়েছিল, মিঠুন তো আমাদের কিছু লুকোয়নি।"
রিংকু কয়েক সেকেন্ড দীপকের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "দিন দিন তুমি একটা যা তা হয়ে যাচ্ছ। সেটা বুঝতে পারো?"
দীপক কিছু বলল না। কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল, "এবছর মেলা দেখতে যাবে তো?"
রিংকু দীপকের দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি হেনে সামলে বলল, "হ্যাঁ।"
দীপক বলল, "আমার মেলা বেশ ভালো লাগে।"
রিংকু বলল, "গিয়ে একগাদা পাঁপড়ভাজা খাবে আর পেটখারাপ করবে। এ বছর আমি যাব তোমার সঙ্গে।"
দীপক খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, "সে যেয়ো। তুমি গেলে তো আমি খুশিই হব। তোমার বাবা না গেলেই হল।"
রিংকু দীপকের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? বাবা গেলে কী হবে?"
দীপক বউকে একবার মেপে বলল, "তাহলে সবাই যেরকম তটস্থ হয়ে থাকে, মেলাটা ঠিক দেখা হয়ে ওঠে না। নিজেরা নিজেরা মেলা দেখার মজাই আলাদা, তাই না?"
রিংকু বলল, "তাই কোরো। তুমি একা একাই ঘুরো। আমিও যাব না। বাবাও যাবে না। তবে পেটখারাপ করলে এবার আর ডাক্তার ডাকব না। একদম হাসপাতালের জেনারেল বেডে পাঠিয়ে দিতে বলব বাবাকে। মাঝরাতে ভূতে ধরবে।"
দীপক বলল, "হাসপাতালে ভূত আছে নাকি?"
রিংকু বলল, "না থাকলেও তোমাকে ধরবে ঠিক। এক তোমাকে দেখলাম, বউকে ছাড়া কত আনন্দে থাকো। পরশুও তো অফিসের পার্টিতে খুব খেয়েছিলে, তাই না? আমাকে অদিতি বলেছে।"
দীপক শঙ্কিত গলায় বলল, "এমন কিছু না। অদিতি শঙ্করের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে। ও তো নিজেই বলে ও প্রায়ই কনফিউজ হয়ে যায় কে শঙ্কর আর কে দীপক।"
রিংকু বলল, "সে যা ইচ্ছা করো। কিন্তু যা বললাম সেটা মাথায় রেখো। মিষ্টির সঙ্গেও এই নিয়ে কোনও কথা না। পারলে দূরে দূরে থাকবে। ওকে?"

দীপক বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল, “ওকে।”
গাড়ি সান্যালবাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। সত্যেন বাইরেই ছিলেন। রিংকু ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। দীপক গাড়ি থেকে নেমে শ্বশুরকে প্রণাম করল। সত্যেন দীপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “দিন দিন এত মোটা হয়ে যাচ্ছ কী করে? শুধু খাও আর ঘুমাও নাকি?”
দীপক কুঁচকে গেল খানিকটা, ক্যাবলার মতো হেসে বলল, “আসলে অফিসে এত চাপ থাকে, ওয়ার্ক আউট হয়ে ওঠে না।”
সত্যেন ভুরু তুললেন, “আমার থেকেও বেশি কাজ? জানো পঞ্চায়েতে কত ঝামেলা থাকে?”
দীপক শ্বশুরের সাথে কোনও তর্কে না গিয়ে হাসার চেষ্টা করল। রিংকু বলল, “পিসিরা চলে গেছে?”
সত্যেন বললেন, “না। ঘরে আছে। যাবে আজকেই।”
প্রণতি আর জীবেন এসে গেছিলেন। রিংকু আর দীপক দুজনকেই প্রণাম করল। সত্যেন বললেন, “তোরা ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। সকালের পুজোটা মিস করে গেলি।”
রিংকু বলল, “কী করব বাবা,রাস্তায় যা জ্যাম ছিল! পিকলুরা আসেনি?”
জীবেন বললেন, “রাস্তাতেই আছে। চলে আসবে যে-কোনো মুহূর্তে।”
কল্যাণ বাড়ির ভিতর থেকে ঠাকুরদালানে আসছিলেন। রিংকুকে দেখে থমকে গেলেন। রিংকু হাসার চেষ্টা করল, “মিষ্টি শুয়ে আছে পিসেমশাই?”
কল্যাণ বললেন, “হ্যাঁ। উঠেছে। তুমি দেখা করতে গেলে যেতে পারো।”
রিংকু আমতা আমতা করে বলল, “হ্যাঁ পিসেমশাই, আমি ফ্রেশ হয়েই যাচ্ছি।”
দীপক সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে কল্যাণকে প্রণাম করল। কল্যাণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

১৩

জীবেন ঠাকুরদালানে তদারকি করছিলেন এমন সময় প্রণতি তাঁকে ডাকলেন। জীবেন বললেন, “কী হল?”
প্রণতি বললেন, “একটু এদিকে এসো।”
জীবেন প্রণতির কাছে এলেন, “কী হল?”
প্রণতি থমথমে গলায় বললেন, “পিকলুর সঙ্গে বউমার মনে হচ্ছে কোনও সমস্যা চলছে।”
জীবেন বললেন, “কেন? কী দেখে বুঝলে?”
প্রণতি বললেন, “তুমি দেখোনি? দুজনে তো কথাই বলছে না।”
জীবেন বললেন, “মরুক গে যাক, ওদের নিজেদের নিজেদের ব্যাপার, নিজেদের মিটিয়ে নিতে দাও। এদিকে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়।”
প্রণতি বললেন, “বাচ্চাটাকে এনেই ঘুম পাড়িয়ে দিল।”
জীবেন বিরক্ত হয়ে বললেন, “এতটা রাস্তা এসেছে, ক্লান্ত হয়েছে হয়তো। তুমি সব ব্যাপারে চিন্তা করছ কেন? এদিকে কত বড়ো ঝামেলা ঘোঁট পাকিয়ে আছে সেটা ভুলে গেলে?”
প্রণতি বললেন, “ঝামেলাটা তো তোমার দাদা নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। আমি বলেছিলাম ঝামেলাটা আনতে?”
জীবেন চারদিকে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে বললেন, “চুপ করো। বেশি জোরে কথা বোলো না। সোমার সঙ্গে কথা বলেছ?”
প্রণতি বললেন, “উনিও তো ঘরে গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছেন। পুজো আচ্চার দিন এসব অলুক্ষুনে কাণ্ড চলছে বাড়িতে। আর সহ্য হয় না বাপু। ওদিকে আর-এক কাণ্ড হয়েছে।”
জীবেন বললেন, “কী?”

প্রণতি বললেন, “আমাদের বউমা মিষ্টির ঘরে গিয়ে বসে আছেন।”
জীবেন সচকিত হয়ে বললেন, “সে কী! এ কথা তুমি এতক্ষণ পরে বলছ? এই হল তোমাদের মেয়েমানুষের দোষ। আসল কথা পেটে রেখে যত উলটোপালটা গৌরচন্দ্রিকা করে চলেছ। পিকলুকে আমি পইপই করে বলে দিলাম বউমাকে বলে দিতে, যেন মিষ্টিদের ধারেকাছে না যায় এখন। এর মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল? চলো চলো চলো, আগে ওই ঘরে যাই।”
জীবেন তড়িঘড়ি বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। সদর থেকে দুজন নেতৃস্থানীয় লোক এসেছেন। সত্যেন বৈঠকখানায় তাঁদের সঙ্গে বসে আছেন। জীবেনকে শশব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, “তুই আবার কোথায় যাচ্ছিস?”
জীবেন দুজনের দিকে তাকিয়ে সত্যেনকে বললেন, “দোতলায়।”
সত্যেন “ওহ” বলে দুজনের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জীবেন ছুটলেন। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে প্রণতিকে বললেন, “পিকলু কোথায়?”
প্রণতি বললেন, “সে তো দেখলাম কিছুক্ষণ আগে পুকুরের দিকে গেল। মাছ ধরবে নাকি!”
জীবেন বিরক্ত গলায় বললেন, “আমার হয়েছে বুড়ো বয়সে যত জ্বালা, কোথায় একটু মায়ের কাছে দু দণ্ড বসব সে খেয়াল আছে?”
প্রণতি নিচু গলায় বললেন, “আরও দাদার ধুতি ধরে চলো, এমন লক্ষ্মণ ভাই দেখিনি বাপু।”
জীবেন কড়া চোখে প্রণতির দিকে তাকালেন। প্রণতি চুপ করে গেলেন।
দরজা ভেজানো ছিল। জীবেন দরজা খুলে দেখলেন মিষ্টি, পিকলুর বউ আর কল্যাণ বসে আছে। প্রণতি হাসিমুখে বললেন, “এ কী বউমা, ভোগের ওখানে তোমাকে দরকার আর তুমি এখানে বসে আছ?”
পিকলুর বউ তনয়া হাসিমুখে বলল, “আমি একটু মিষ্টির কাছে এসে বসেছিলাম।”
জীবেন কল্যাণের দিকে তাকালেন। বললেন, “তোমাদের গাড়ি দুপুরে বলা হয়েছে। দুটোর সময় রওনা দিলে ঠিক আছে?”
তনয়া অবাক গলায় বলল, “সে কী! মিষ্টি এই অবস্থায় যাবে কী করে?”
জীবেন প্রণতির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, “না মানে ওরাই তো যেতে চেয়েছিল।”
তনয়া একবার চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলল, “না না, আজকে তো কিছুতেই ওদের নিয়ে যাওয়া যাবে না। পিসেমশাই, কী করে যাবেন বলুন তো?”
তনয়া কল্যাণের দিকে তাকাল। কল্যাণ হাসার চেষ্টা করলেন, “সে ব্যবস্থা করা যাবে।”
তনয়া বলল, “না না, বাবা আপনি ক্যানসেল করে দিন। ওরা অন্তত দুদিন থাকুক, মা আপনি বাবাকে বোঝান না।”
প্রণতি কী বলবেন বুঝতে না পেরে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সেই তো, আমি তো সেটাই...”
জীবেন থমথমে মুখে একবার তনয়ার দিকে, আর-একবার প্রণতির দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
তনয়া উঠল, “চলুন মা, ভোগের ওখানে যাই।”
প্রণতি চন্দ্রিমার দিকে তাকালেন। মেয়ে মনে হচ্ছে পাথর হয়ে গেছে।

১৪

শম্ভুর ঘুম ভেঙেছে সকাল নটায়। একটা লোম ওঠা কম্বলের ওপর শুয়েছিল। শেষরাতের দিকে ঘুম এসেছে। একই সেলে পাশের গ্রামের ঘেঁটুও আছে। ঘুম থেকে উঠে শম্ভু দেখল ঘেঁটু তার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। শম্ভু বলল, “কী হল, ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?”
ঘেঁটু বিড়ি খাচ্ছিল। একটা সুখটান দিয়ে বলল, “কত পাপ করলাম তার হিসেব করছি। নইলে পুজো আচ্চার

দিনে এরকম জেলে পচতে হয়?"
শম্ভু বলল, "বিড়ি দে একটা।"
ঘেঁটু বলল, "নেই আর। ওই কনস্টেবল দাদার থেকে একটাই ম্যানেজ করতে পেরেছি। আমি একটু টেনে নি, তারপর দিচ্ছি। নইলে গুরু তোমার যা শরীর, একটান দিলেই বিড়ি শেষ হয়ে যাবে।"
শম্ভু তেজ দেখাল, "লাগবে না তোর বিড়ি। ও কাকা, কে আছ?"
বিপিন কনস্টেবল বিরক্ত গলায় এসে বলল, "কী হয়েছে?"
শম্ভু বলল, "একটা বিড়ি দাও তো।"
বিপিন পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বের করে শম্ভুর দিকে ছুড়ে মারল। শম্ভু প্যাকেটটা ক্যাচ নিয়ে একটা বিড়ি বের করে ধরাল। ঘেঁটু বলল, "এইজন্য বড়ো গাছে নৌকো বাঁধতে হয়। আমাকেও দিয়ো একটা গুরু।"
শম্ভু অবহেলাভরে বিড়ির প্যাকেটটা ঘেঁটুর দিকে ছুড়ে মারল। ঘেঁটু বলল, "দ্যাখো না গুরু একটু চা পাওয়া যায় নাকি। সকাল থেকে মনটা খুব চা চা করছে।"
বিপিন কথাটা শুনতে পেয়ে একটা খিস্তি মেরে বলল, "বেয়াইবাড়ি এসেছিস তো! এরপর বলবি একটা মেয়েছেলে জোগাড় করে দাও।"
শম্ভু খুব হাসল বিপিনের কথা শুনে। বলল, "মালটা ব্লাউজ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। শুয়ার।"
ঘেঁটুও হাসল। বলল, "মেয়েছেলের খপ্পরে পড়লে যা হয়। কান খেয়ে নিল মাগি কাল সকাল থেকে। কী করব বলো?"
শম্ভু বলল, "সব মাগি এক। দাও দাও দাও দাও। না দিলে ঝাঁপ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়বে। কী কাকা, তোমার বউ চায় না?"
বিপিন খইনি ডলছিল। শম্ভুর কথা শুনে বলল, "আমি বাইরে গেলাম। এসব কথা বলছি বড়োবাবু জানতে পারলে আমার পেছনে রুল ভরে দেবে।"
শম্ভু বলল, "আরে কিচ্ছু হবে না, তুমি দাঁড়াও। আমি আছি তো।"
বিপিন শুনল না। বেরিয়ে গেল।
ঘেঁটু গলায় এক্সট্রা এফোর্ট দিল, "দ্যাখো না ভাই, যদি সত্যেনদা আমাকেও নেন।"
শম্ভু বলল, "দাঁড়া আগে হেগে নি।"
ঘেঁটু বলল, "জল কম আছে। বালতির জল শেষ করে দিয়ো না।"
শম্ভু বিরক্ত মুখে বলল, "এইজন্য হাজত পোষায় না মাইরি। আমার আবার মাঠে না হাগলে হয় না।"
ঘেঁটু খুশি হয়ে বলল, "আমারও। মেয়েছেলেটার জন্য যত ঝামেলা হয়ে গেল।"
শম্ভু বলল, "তোর বউ?"
ঘেঁটু বলল, "মেয়েছেলে। ওই... তুমি বললে চিনবে না।"
শম্ভু বলল, "বউদি?"
ঘেঁটু মন দিয়ে বিড়ি টানতে লাগল।
শম্ভু হাজতের বাথরুমে ঢুকেই বেরিয়ে এল, "ঈশ, বাঁড়া জল দিসনি?"
ঘেঁটু বলল, "বললাম না জল নেই।"
শম্ভু নাক টিপে ভেতরে ঢুকল। ঘেঁটু ফিসফিস করে বলল, "জমিদার এয়েচেন। হাজতে ওঁর ফাইভস্টারের মতো হাগতে হবে।"
খানিকক্ষণ পরে শম্ভু বেরোল।
বলল, "বউটা যে কখন আসবে।"
ঘেঁটু বলল, "তোমার বউ আসবে নাকি?"

শম্ভু বলল, "এর আগে যখন এসেছিলাম তখন এসেছিল তো।"
শম্ভু চেঁচাতে লাগল, "ও কাকা, শোনো না।"
তাদের অবাক করে নির্মলবাবু এলেন। বললেন, "কী ব্যাপার শম্ভু, কিছু বলবে?"
শম্ভু বড়োবাবুকে দেখে একটু সামলিয়ে বলল, "স্যার, বলছি আমার বউকে একটু খবর দেওয়া যাবে?"
নির্মলবাবু বললেন, "আচ্ছা, আমি সত্যেনবাবুকে বলে দিচ্ছি।"
শম্ভু খুশি হয়ে বলল, "খুব ভালো হয় স্যার, আমাকে কবে ছাড়বে স্যার?"
নির্মলবাবু হাসিমুখে বললেন, "শিগগিরি। চিন্তা কোরো না, কাল যা যা বললাম মনে আছে তো?"
শম্ভু বলল, "হ্যাঁ স্যার। বাবু আছেন যখন আমি জানি তো কোনও চিন্তা নেই। বাবু বললে বাসের সামনে গলা দিয়ে দেব।"
নির্মল বললেন, "আমরা একটা চেষ্টা চালাচ্ছি। সেরকম হলে আজ বিকেলেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে।"
শম্ভু খুশি হয়ে বলল, "তাহলে তো ভালো হয় স্যার। বুঝতেই পারেন পুজো আচ্চার দিন।"
ঘেঁটু বলে উঠল, "স্যার আমাকেও ছেড়ে দিন না স্যার। আমিও সত্যেনবাবুকে ভোট দি।"
নির্মল কয়েক সেকেন্ড ঘেঁটুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।
শম্ভু বসল।
ঘেঁটু শম্ভুর পা টিপে দিতে লাগল।
শম্ভু গম্ভীর মুখে বিড়ি টানতে লাগল।

১৫

এলাকার দুই নেতা এসেছেন। তাঁদের খেতে দেওয়া হয়েছে। লুচি, ছোলার ডাল, পায়েস, তিনরকম মিষ্টি। সত্যেন নিজে তদারকি করছিলেন।
জীবেনকে দোতলা থেকে নেমে আসতে দেখে সত্যেন বললেন, "কি রে, কী হল?"
জীবেন চোখের ইশারায় সত্যেনকে ডাকলেন। সত্যেন দেবুকে ডেকে গেস্টদের দায়িত্ব দিয়ে জীবেনের কাছে গেলেন, "কি রে, কী হল? উপরে গেলি কেন তখন হঠাৎ?"
জীবেনের শ্বাস জোরে পড়ছিল। বললেন, "একটা প্রবলেম হয়ে গেছে।"
সত্যেন বললেন, "কী প্রবলেম?"
জীবেন বললেন, "বউমা ওদের যেতে বারণ করছে।"
সত্যেন অবাক হয়ে বললেন, "মানে?"
জীবেন সংক্ষেপে বললেন, সত্যেন কয়েক সেকেন্ড বিস্মিত হয়ে জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত সাহস পায় কী করে?"
জীবেন মাথা নিচু করলেন। সত্যেন বললেন, "পিকলু কোথায়?"
জীবেন বললেন, "মনে হয় পুকুরে গেছে।"
সত্যেন বললেন, "চল।"
দুজনে বেরোলেন বাড়ি থেকে। একের পর এক গ্রামের লোক এসে ভিড় জমাচ্ছিল ঠাকুরদালানে, সত্যেন সেদিকে তাকালেন না। অন্যান্য দিন বাইরে থেকে দেখলে তাঁর রাগ বোঝা যায় না, এবারে তিনি যে বিচলিত তা বোঝা যাচ্ছিল।
সান্যালবাড়ির পেছনে বিরাট পুকুর। মাছ চাষ হয়। পিকলু চেঞ্জ না করেই মাছ ধরতে চলে এসেছে। সত্যেন আর জীবেন পৌঁছে দেখলেন পিকলু নির্লিপ্তভাবে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে।
সত্যেন বললেন, "পিকলু।"
পিকলু বলল, "বলো জেঠু। তখন তোমার সঙ্গে দেখা করা হয়নি, ব্যস্ত ছিলে দেখলাম।"

সত্যেন বললেন, "তোকে জীবেন বলেনি তনয়াকে বলার জন্য যে, মিষ্টিদের ধারেকাছে যেন ও না ঘেঁষে?"
পিকলু সত্যেনের দিকে তাকাল, "বলেছে।"
সত্যেন বললেন, "তাহলে তনয়া ওদের ঘরে কী করছিল? তুই কি জানিস তনয়া ওদের যাওয়াটা পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে?"
পিকলু বলল, "আমার সঙ্গে ওর অনেকদিন হল কথা হয় না জেঠু। তবু বাবা যখন বলেছিল তার পরে আমি ওকে হোয়াটসঅ্যাপে সেটা জানিয়ে ছিলাম। ও মেসেজ সিন অবধি করেছিল। আমি ভেবেছিলাম বুঝেছে।"
সত্যেন বললেন, "কী সব বলছিস, সিন করেছে-টরেছে এসব কী?"
পিকলু বলল, "মানে দেখেছিল।"
সত্যেন বললেন, "তোরা দুজনে কথা বলিস না? কেন?"
পিকলু একটু অস্বস্তির সঙ্গে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেসব পার্সোনাল কথা।"
সত্যেন জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পার্সোনাল ব্যাপার মানে কী? পিকলুর আবার কী পার্সোনাল ব্যাপার থাকতে পারে?"
জীবেন সত্যেনের হাত ধরে শান্ত করতে চাইলেন, "আচ্ছা, দাঁড়া, আমি দেখছি, পিকলু।"
পিকলু বলল, "বলো।"
জীবেন বললেন, "সেরকম বুঝলে তোর তনয়াকে এখানে আনাই উচিত হয়নি। তুই বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটার গুরুত্ব?"
পিকলু বলল, "কী করেছে তনয়া?"
জীবেন বললেন, "মিষ্টিদের থাকার ব্যাপারে জোর করেছে। অথচ ওরা আজকে চলে যেত। ঝামেলাটাও মিটে যেত। ওরা আমাদের বাড়িতে থাকা মানেই তো চোরা টেনশন কাজ করবে দাদার মনে।"
পিকলু বলল, "থাকলেই বা কী সমস্যা? বরং ওরা চলে গেলে তো ব্যাপারটা আর-একটু দৃষ্টিকটু হত, তাই না?"
সত্যেন পিকলুর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, "তোমরা বড়ো হয়েছ, ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছ, বড়োদের সিদ্ধান্তের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া শিখেছ ভালো কথা, কিন্তু মনে রেখো, ভবিষ্যতে এর ফলে যদি কোনও সমস্যা তৈরি হয়, তার সমস্ত দায় তোমাকে নিতে হবে।"
জীবেন সত্যেনকে বললেন, "আমি কি একবার কল্যাণকে বলব চলে যাওয়ার কথা?"
সত্যেন হাত তুললেন, "না। আর কাউকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার আমি এরকম কিছু বরদাস্ত করব না। সেটা মনে রাখবি।"
সত্যেন দাঁড়ালেন না। জীবেন পিকলুকে বললেন, "দাদা রেগে গেছে বুঝতে পারলি?"
পিকলু কিছু বলল না। জীবেন বললেন, "বউমার সঙ্গে কথা বলিস না কেন?"
পিকলু চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "বললাম তো, ব্যক্তিগত ব্যাপার।"
জীবেন অবাক চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ছেলে কবে বড়ো হয়ে গেছে খেয়ালই করেননি!

১৬

শ্বশুরবাড়ি দীপকের কোনও কালেই ভালো লাগে না। সবসময় শ্বশুরের জ্ঞান শুনতে হয়। কিন্তু কিছু করার নেই। রিংকু যেতে বললে তাকে যেতেই হবে। রিংকু যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে, তবে দীপক দ্বিধায় পড়ে যাবে, সূর্য হয়তো সত্যিই পশ্চিম দিকে ওঠে।
এ বাড়িতে তাদের ঘরটা সবথেকে ভালো। দোতলায়। দক্ষিণ খোলা। সামনে একটা ব্যালকনি আছে। ব্যালকনির মধ্যে চেয়ার রাখা। গ্রীষ্মকালের সন্ধেবেলা এখানে বসে চা খাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। তাদের বিয়ে গ্রীষ্মকালেই হয়েছিল। সে বছর সে দ্বিরাগমনে এসে এই ঘরটার প্রেমে পড়ে গেছিল। কিন্তু

রিংকুর প্রেমে বেশি পড়তে পারেনি। স্ত্রীর থেকে রিংকু অনেক বেশি তার বসের মতো আচরণ করে। দীপকের মা মাঝে মাঝেই দুঃখ করে বলেন এত ভালো ছাত্রটা বিয়ের পরে এমন বউয়ের ভেড়ুয়া হয়ে যাবে জানলে কিছুতেই তিনি ছেলের বিয়ে দিতেন না।

রিংকু এসে ফ্রেশ হয়ে ঠাকুরদালানে চলে গেছিল। দীপক ব্যালকনিতে বসে ছিল চুপচাপ। বেশি ভিড় পোষায় না তার। যদি রিংকু ডাকে, তবেই সে নিচে যাবে। ঘরে ঢুকেই একপ্রস্থ কথা শুনতে হয়েছে রিংকুর কাছে। কেন কল্যাণকে প্রণাম করেছে সে! দীপক অবাক হয়ে বলেছিল সবাইকেই করেছি, ওঁকে করলে সমস্যাটা কোথায়? উত্তরে রিংকু রাগি দৃষ্টি হেনে গেছে। সম্ভবত রাতে এই নিয়ে আরও কিছু হতে পারে। পুকুরের দিকে তাকাতে দীপকের চোখে পড়ল পিকলু মন দিয়ে ছিপ ফেলে বসে আছে। দীপক ঘর থেকে বেরোল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই রিংকুর সঙ্গে দেখা। রিংকু ব্যস্ত হয়ে কোথাও একটা যাচ্ছিল। তাকে দেখে বলল, "কোথায় যাবে? ঠাকুরদালানে?"

দীপক বলল, "পিকলুর কাছে যাচ্ছি।"

রিংকু অবাক হয়ে বলল, "পিকলু কোথায়?"

দীপক বলল, "মাছ ধরছে।"

রিংকু বলল, "তুমি কী করবে গিয়ে? তুমি মাছ ধরতে পারো?"

দীপক বলল, "না। দেখব।"

রিংকু বলল, "খেয়েছ?"

দীপক বলল, "এখন খিদে নেই। রাস্তায় স্যান্ডউইচ খেলাম তো।"

রিংকু বলল, "যাও, যেখানে ইচ্ছা যাও, আমার এখন একগাদা কাজ।"

রিংকু ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে গেল।

দীপক হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রিংকু বারণ করলে তার যাওয়া হত না।

পিকলুর সঙ্গে সারাবছর তার খুব বেশি কথা হয় না। তবে এখানে এলে পিকলুর সঙ্গেই সে সাধারণত বেশি থাকে। পিকলু খাওয়াদাওয়া ভালোবাসে। সেও। দুজনে মিলে মেলায় গিয়ে গান্ডেপিন্ডে গেলে। সান্যালবাড়িতে খাওয়া নিয়ে হাজার রেস্ট্রিকশন। প্রচুর এঁটোকাটা মানা হয়। রিংকুর মধ্যেও শুচিবাই আছে। তাকে দেখে খুশি হল পিকলু, "বাড়ি তো সরগরম। কী বুঝলে?"

দীপক বুঝতে না পেরে বলল, "কী বুঝব?"

পিকলু অবাক হয়ে বলল, "তুমি কি এরকমই বোকা, নাকি অভিনয় করো বলো তো সবসময়?"

দীপক বলল, "আমি সত্যি বুঝিনি। কোন ব্যাপারে বলছ? মিষ্টির ব্যাপারে?"

পিকলু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। বাড়ির জামাই মরেছে অথচ বাড়িতে কারও কোনও হেলদোল নেই। লোক খাচ্ছে, পুজো হচ্ছে, সবাই হইহই করছে, সব কিছু কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?"

দীপক একটু ভেবে বলল, "এতটা তো ভাবিনি।"

পিকলু বলল, "ভাবো ভাবো। না ভাবলে কী করে হবে? এখনও কত কিছু দেখার আছে জীবনে।"

দীপক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তোমার ছেলে কেমন আছে?"

পিকলু বলল, "ঘুমাচ্ছে। ভালোই আছে। তোমাদের কী খবর? পাঁচ বছর তো হল। কোনও খবরই পাচ্ছি না।"

দীপক লজ্জা পেয়ে বলল, "হবে নিশ্চয়ই।"

পিকলু বলল, "দিদি চায় না, তাই তো?"

দীপক বলল, "না মানে ব্যাপারটা সেরকম না।"

পিকলু বলল, "জেঠু কিন্তু দুনিয়াশুদ্ধ লোককে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে, শুধু নিজের মেয়ের বেলায় টুঁ শব্দটি নেই।"

দীপক চুপ করে থাকল।
পিকলু বলল, "মেলায় যাবে আজ?"
দীপক বলল, "রিংকু যাবে বলছিল।"
পিকলু বলল, "হয়ে গেল আর কি! যাও তবে ওর সঙ্গে।"
দীপক একটু ইতস্তত করে বলল, "মিঠুনের বডিটা কোথায় আছে বলতে পারবে?"
পিকলু দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, "পোস্টমর্টেম হচ্ছে শুনছিলাম।"
দীপক বলল, "দেখতে যাবে?"
পিকলু অবাক হয়ে দীপকের দিকে তাকাল।
একটা মাছ ঘাই মারছিল ছিপে। সে খেয়াল করল না।

১৭

খাসির মাংস আর ভাত। ভাতের হাঁড়ি আর মাংসের কড়াই দিয়ে গেল বিপিন কনস্টেবল। সঙ্গে দুটো থালা, গ্লাস।
আয়োজন দেখে চমকে ঘেঁটু বলল, "গুরু, হাজতে খাসির মাংস? ভাবতে পারছি না যে?"
বিপিন বলল, "জামাই এসেছে না? ওর জন্যই বড়োবাবু আনালেন।"
শম্ভু একটুও অবাক হল না। মন দিয়ে থালায় মনোনিবেশ করল।
ঘেঁটু খেতে খেতে বলল, "উফ, কতদিন পরে খাসির মাংস খেলাম। শেষ খেয়েছিলাম একটা বিয়েবাড়িতে।"
শম্ভু বলল, "তোকে বলেছিল?"
ঘেঁটু বলল, "না না। মাঝে মাঝে এদিক সেদিক খেয়ে আসি।"
শম্ভু বলল, "ধরা পড়লে মার খাস না?"
ঘেঁটু বলল, "উহ, মারবে, অত সোজা নাকি? উপহার নিয়ে যাই তো! চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস আছে তো মানুষের।"
শম্ভু বলল, "মাংসটা কার জন্য খাচ্ছিস বুঝতে পারছিস তো?"
ঘেঁটু একগাল হেসে বলল, "সে আর বলতে। দুজনের জন্য এক কিলো মাংস দিয়েছে। থানায় এসেছি না বউদিবাড়ি এসেছি বুঝতেই পারছি না।"
শম্ভু বলল, "বউদিকে খুব ভালোবাসিস?"
ঘেঁটু বলল, "আমি না ভালোবাসলে কে ভালোবাসবে? দাদা তো সেই কোন মুলুকে থাকে, ন মাসে ছ মাসে একবার থাকে। আমি না দেখলে কে আর দেখবে!"
শম্ভু থালায় ভাত নিল আরও। রম্পার কথা মনে পড়ল তার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাত মাখতে শুরু করল।
ঘেঁটু বলল, "আমি গেলে বউদি আদর করে ভাত খাওয়ায়। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দোষের মধ্যে মাগির বড়ো বায়না। মাঝে মাঝে বড়ো ঘ্যানঘ্যান করে।"
শম্ভু বলল, "দাদা টাকা পাঠায় না?"
ঘেঁটু দাঁত বের করে বলল, "সে আর পাঠায়? দাদা দ্যাখো গে সে মুলুকে গিয়ে আবার কোনও বউদি ধরেছে।"
শম্ভু বলল, "সোনা কত করে ভরি যাচ্ছে জানিস?"
ঘেঁটু মেটে ভেঙে ভাতে মাখতে মাখতে বলল, "আমি আদার ব্যাপারী, সোনার দাম কত জানব কী করে? বড়োবাবু এলে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।"
শম্ভু বলল, "বেটি চারদিক থেকে লোকের গয়না দেখে আসবে, আর বাড়িতে এসে খালি আমার চাই আমার

চাই করবে। তাই দেব, সদর থেকে নিয়ে আসব।”
ঘেঁটু ভাত চিবোতে চিবোতে অবাক গলায়, “কে? তোমারও বউদি আছে নাকি?”
শম্ভু বিরক্ত হল, “আমার বউ।”
ঘেঁটু বলল, “তোমার বউ তো এল না দাদা।”
শম্ভু বলল, “ওর হেবি রাগ। কাল থালা ছুড়ে মেরেছিলাম তো। এখনও রাগ করে বসে আছে।”
ঘেঁটু সন্তর্পণে মাংসের কড়াই থেকে দু পিস নিতে নিতে বলল, “মেয়েমানুষের রাগ না হলে ভালো লাগে নাকি? রাগ হবে, তবেই তো মজা।”
শম্ভুর রম্পার জন্য একটু একটু মনখারাপ হচ্ছিল। আগের দিনের কথা মনে পড়ায় একটু অনুশোচনা হচ্ছিল। সে আর খেতে পারল না। থালা রেখে উঠে পড়ল।
ঘেঁটু অবাক গলায় বলল, “এ কী! এত খাবার কে খাবে এবারে?”
শম্ভু বলল, “তুই খেয়ে নে।”
ঘেঁটু আর দ্বিতীয় কোনও কথা বলল না। মন দিয়ে খেতে লাগল।
শম্ভু মুখ হাত ধুয়ে বসতে যাবে এমন সময় নির্মলবাবু এসে বললেন, “তোমার জন্য খুশির খবর আছে শম্ভু। এখনই তোমাকে ছেড়ে দেবার অর্ডার এসেছে।”
শম্ভু অবাক হল না। বলল, “এখনই বেরোব?”
নির্মলবাবু বললেন, “হ্যাঁ, তোমার বন্ধুরা তোমাকে নিতে এসে গেছে।”
ঘেঁটু খেতে খেতে বলল, “আমাকেও ছেড়ে দিন না বড়োবাবু, একটা ব্লাউজের জন্য এত ঝামেলা আর পোষাচ্ছে না বিশ্বাস করুন।”
নির্মলবাবু ঘেঁটুকে ধমক দিয়ে বললেন, “মাংস ভাত দেওয়া হয়েছে তো। কোন খারাপটা আছিস তুই?”
ঘেঁটু ঘাড় চুলকে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, “সেটা মন্দ বলেননি। আচ্ছা রাতে কি মাছ হবে না মাংস?”
নির্মলবাবু কটমট করে ঘেঁটুর দিকে তাকালেন। ঘেঁটু গতিক সুবিধের নয় বুঝে মাংসে মনোনিবেশ করল।
নির্মলবাবু বিপিনকে বললেন, “শম্ভুকে ছেড়ে দিন।”
শম্ভু বেরিয়ে দেখল দেবুরা তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কোথাও সই করতে হবে?”
নির্মলবাবু হাসিমুখে বললেন, “না না। সাবধানে যেয়ো।”
শম্ভু দেবুর কাঁধে হাত রেখে বলল, “বিলিতি খাব আজ। আমি খাওয়াব।”
দেবু বলল, “ঠেকে নিয়ে এসেছি আসার আগেই। চ গিয়ে বসি।”
শম্ভু খুশিমনে বেরোল।
থানা থেকে বেরিয়ে ধানি জমি শুরু। শম্ভু দেবুর বাইকে উঠল। চারটে বাইকে আটজন। খেত ভেদ করে বাইক চলছে।
শম্ভু বলল, “আমি একবার বাড়ি হয়ে ঠেকে যাব বুঝলি? বউটা হেবি রাগ করে আছে।”
দেবু বলল, “ঠিক আছে।”
কিছুটা গিয়ে দেবু বাইক দাঁড় করাল। শম্ভু অবাক হল, “কী হল?”
দুজন এসে সরাসরি শম্ভুর পিঠে ছুরি মারল।
শম্ভু অবাক হবার সময়টুকুও পেল না।

১৮

“তোর হাতেরটা নতুন নিলি?”
দুপুরে খাওয়ার পরে ঠাকুরদালানে তনয়াকে দেখে বলল রিংকু।

তনয়া বলল, “না তো, এটা তো আগের বছরও ছিল। দেখোনি?”
রিংকু বলল, “না তো!”
তনয়া বলল, “কোনও কারণে মিস করে গেছিলে হয়তো।”
রিংকু একটু চিন্তিত হয়ে বলল, “তাই হবে। তবে আমার তো মিস করার কথা না। গয়না হলে সবথেকে বেশি চোখ পড়ে যায় আমার।”
তনয়া হাসল, “গতবার আমরা নবমীর দিন এসেছিলাম। দুদিনে নজর পড়েনি, দেখাও তো খুব বেশি হয়নি। এসে থেকেই দেখেছিলাম তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে।”
রিংকু বলল, “তা ঠিক। সপ্তমী অবধি তাও দম ফেলবার ফুরসত থাকে। অষ্টমী, নবমী, দশমী কেমন ঝড়ের বেগে কেটে যায়।”
বাড়ির বাইরে প্যান্ডেল হয়েছে। গ্রামের লোকেরা সেখানে খাচ্ছে। সত্যেন, জীবেন ওখানেই তদারকি করছেন।
তনয়া বলল, “মিষ্টির সঙ্গে দেখা করেছ?”
রিংকু বলল, “না। কখন যাব?”
তনয়া বলল, “খারাপ লাগল ওকে দেখে।”
রিংকু তনয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, “কেন খারাপ লাগল?”
তনয়া অবাক হল, “খারাপ লাগারই তো কথা, তাই না?”
রিংকু কথাটা ঘোরাতে চাইল, “তোরা ব্যাঙ্গালোরে নতুন ফ্ল্যাটে শিফট করে গেছিস? এবার আমরা যাব কিন্তু।”
তনয়া বলল, “সে তো যাবেই, কতবার বলেছি তোমাদের। গত মাসে তো মিষ্টিরাও...”
কথাটা বলে তনয়া চুপ করে গেল।
রিংকু বলল, “মানে? মিষ্টিরা গেছিল?”
তনয়া থতোমতো খেয়ে বলল, “না না, ওই আর কি, আসবে আসবে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত আসেনি।”
রিংকু সন্দিগ্ধ চোখে তনয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল, তাই না?”
তনয়া হাসার চেষ্টা করল, “কোথায় আর। একবার ফোন করেছিল শুধু।”
রিংকু বলল, “বাবা জানলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।”
তনয়া বলল, “বাবা তো অনেক কিছু জানলেই কুরুক্ষেত্র হবে দিদি। দু বছর আগে অষ্টমীর দিন কী খেয়েছিলাম আমরা ভুলে গেলে?”
রিংকু বলল, “সেটা একরকম। পুজোর সময় আমার নিরামিষ একেবারেই ভালো লাগে না। কিন্তু মিঠুনের সঙ্গে তোদের যোগাযোগ ছিল, এটা শুনলে অনেক ঝামেলা হতে পারে।”
তনয়া বলল, “ঝামেলা তো সব কিছুতেই হতে পারে। তোমার ভাই আমাকে লুকিয়ে এক কলিগকে নিয়ে ঘুরতে গেছিল। আমি তো সেসব জেনে বুঝেও চুপ করে আছি। ঝামেলা করলেই ঝামেলা।”
রিংকু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “পিকলু? হতেই পারে না।”
তনয়া ম্লানমুখে হাসল। বলল, “এই কথাটা জেঠুকে বলব ভেবেছি। ভালো হয় না বললে?”
রিংকু অন্য দিকে তাকাল, “সেটা তোদের ব্যাপার। ভালো মন্দ নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে তোরা ভালো বুঝবি।”
তনয়া বলল, “সেটাই। বড়োরা তো জাত ধর্ম ঠিক করে বিয়ে দেবে। ছোটোরা সে বিয়েতে ঝামেলা হলে নিজেরা বুঝে নেবে। তাই না?”
রিংকু বলল, “বাবা জানলে তোর কি কোনও সুরাহা হবে? মনে হয় না। বাবা তোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার প্রাচীন কনজারভেটিভ পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দেবে তোর বর বিপথে গেছে তার দোষটাও আসলে তোরই। তুই-

ই নিজের বরকে বেঁধে রাখতে পারিসনি। সুখী রাখতে পারিসনি।”
তনয়া হাসল, “তা ঠিক বলেছ। তবে গল্পে একটা ট্যুইস্ট আছে।”
রিংকু বলল, “কীরকম?”
তনয়া বলল, “ইদানীং আমারও একটা অ্যাফেয়ার হয়েছে। খানিকটা জোর করেই। জেদের বশে বলতে পারো। ফেসবুকে আলাপ। একদিন দেখাও করেছি ছেলেটার সঙ্গে।”
রিংকুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল। একটু সামলে বলল, “পিকলু জানে?”
তনয়া বলল, “সমস্তটাই। আপাতত আমাদের যুদ্ধবিরতি চলছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না।”
রিংকু মাথায় হাত দিল।
বলল, “তোরা কি ডিভোর্সের কথা ভাবছিস? বাচ্চাটার কী হবে?”
তনয়া বলল, “জানি না। ব্যাপারটা ডেলি সোপ হয়ে যাচ্ছে না?”
রিংকু অবাক হয়ে তনয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

১৯

দীপককে নিয়ে সত্যেন ঠাকুরদালানে বসেছেন। দীপকের ইচ্ছা ছিল না। শ্বশুরের নজরে পড়ে গেছিল। বিকেল সোয়া চারটে। কিছুক্ষণ আগে ব্যাচ শেষ হয়েছে। সত্যেন বললেন, “তোমার অফিস কেমন চলছে?”
দীপক বলল, “ভালো।”
জীবেন এখনও বাইরের প্যান্ডেলে আছেন। যারা পরিবেশন করছিল তারা খেতে বসেছে।
সত্যেন বিড়বিড় করে বললেন, “কাল অনেক কাজ, লুচি হবে, জেলার সভাপতি আসবেন, ঘুম থেকে সকাল সকাল উঠে পড়তে হবে।”
দীপক বলল, “রাতে আমরা একটু বেরোতে পারি বাবা।”
সত্যেন সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, “তোমার একটা ট্রান্সফার হবে শুনছিলাম, সেটা কি হবে?”
দীপক বলল, “হ্যাঁ। জানুয়ারিতে। তিন বছরের জন্য একটা প্রোজেক্টে লন্ডন যাবার কথা চলছে।”
সত্যেন বললেন, “তা যাও, রিংকুকে ছ মাস পরে এসে নিয়ে যাবে?”
দীপক মাথা নাড়ল। সত্যেন বললেন, “ভালো। মেয়েটা কদিন আমার কাছে থাকুক।”
দীপক খানিকটা ইতস্তত করে বলল, “আমাদের বাড়িতে থাকার কথা বলছিল মা।”
সত্যেন দীপকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ও। ঠিক আছে। আমি তোমার মার সঙ্গে কথা বলে নেব।”
দীপক মাথা নাড়ল। সত্যেন বললেন, “তোমার বাবা কেমন আছেন?”
দীপক বলল, “ভালো।”
সত্যেন বললেন, “বিদেশে যাচ্ছ, খাওয়াদাওয়া নিয়ে খুব সাবধান কিন্তু। উলটোপালটা মাংস খাবে না। সে ব্যাপারে আশা করি তোমার সম্যক ধারণা আছে।”
দীপক বলল, “আছে।”
সত্যেন বললেন, “এখন তো অনেকরকম ফ্যাশান হয়েছে। ছেলেপিলের পাখা গজাচ্ছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। তবে তোমার ওপর আমার এখনও ভরসা আছে।”
দীপক সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যেন বললেন, “ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভেবেছ?”
দীপক ঘাবড়াল খানিকটা, “ভবিষ্যৎ মানে?”
সত্যেন বললেন, “সন্তান সন্ততি কী হবে, কবে হবে কিছু ঠিক করেছ তোমরা?”
দীপক বলল, “সেটা আমি ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। যেমন চাইবে।”
সত্যেন খানিকটা বিদ্রুপের সুরে বললেন, “তাহলে তো তুমি বড়ো সমস্যায় পড়বে। নিজের মতামত রাখতে এত কুণ্ঠা কেন?”

দীপক বলল, “আমিও এ ব্যাপারে খানিকটা ওর সঙ্গে একমত।”
সত্যেন বললেন, “এত একমত হচ্ছ বলেই সংসারের রাশটা রাখতে পারছ না। পুরুষ হবে পুরুষের মতো। মেয়েদের আঁচল ধরে চলা পুরুষ আমার একেবারেই পছন্দ না। রিংকু আমার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু আমি চাইব তুমি একজন প্রকৃত পুরুষের মতো চলাফেরা কর।”
দীপক এ কথার উত্তরে কিছু বলল না। হাসি হাসি মুখে বসে থাকল। জীবেন এসে সত্যেনের পাশে বসলেন, “তাহলে ওরা থাকছে।”
সত্যেন বললেন, “কারা?”
জীবেন দীপকের দিকে তাকালেন।
সত্যেন বললেন, “কী হয়েছে? ও তো আমার জামাই। অত চিন্তা করিস না।”
দীপকের অস্বস্তি হচ্ছিল। উঠে চলে যাবার তুমুল ইচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠতে পারছিল না।
সদর দরজা দিয়ে দেবু ঢুকল। জীবেন সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেন বললেন, “হয়েছে?”
দেবু মাথা নাড়ল। সত্যেন বললেন, “যা, হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে।”
দেবু একবার দীপককের দিকে তাকাল। সত্যেন বললেন, “বল কী বলবি। অসুবিধা নেই।”
দেবু বলল, “বড়োবাবুকে ফোন করে দিয়েছি।”
সত্যেন বললেন, “কোনও সমস্যা হয়নি তো?”
দেবু হেসে বলল, “বুঝতেই পারেনি আগে থেকে।”
সত্যেন বললেন, “ঠিক আছে।”
দেবু বেরিয়ে গেল।
সত্যেন ফোন বের করলেন। দীপক উঠল। সত্যেন বললেন, “কোথায় যাচ্ছ?”
দীপক বলল, “ঘরে।”
সত্যেন বললেন, “আচ্ছা যাও। পরে কথা বলছি তোমার সঙ্গে।”
দীপক তড়িঘড়ি ঘরে এসে দেখল পিকলু আর রিংকু গম্ভীর মুখে বসে আছে। সে বলল, “আমি কি ঘুরে আসব?”
রিংকু বলল, “কেন ঘুরে আসবে? বসো।”
দীপক ইতস্তত করে বসল। রিংকু বলল, “এই ভদ্রলোকের কাণ্ড শুনেছ?”
দীপক বলল, “না তো।”
পিকলু বলল, “আহ দিদি, কী হচ্ছে?”
রিংকু বলল, “তুই থাম। ওই মেয়েটার সঙ্গে অ্যাফেয়ার করার সময় খেয়াল ছিল না? বাবা জানলে কী হতে পারে ভাবতে পারছিস?”
পিকলু হেসে বলল, “জেঠু জানলে তো খুশিই হবে। সারাক্ষণ পুরুষমানুষ পুরুষমানুষ বলে জ্ঞান দেয়। এসব কাজ তো পুরুষমানুষই করে।”
রিংকু একটা বালিশ ছুড়ে মারল পিকলুর দিকে। বলল, “খুব মার খাবি কিন্তু তুই। খুব পেকেছিস না? দেখ ভাই, বাচ্চার বাবা হয়েছিস, এখন সেদিকে মন দে। সব তনয়া করবে? সংসারটা তো ভাঙতেই পারিস, তারপর কী করবি?”
পিকলু দীপকের দিকে তাকাল, “ধর্মবাণী শুনে এলে নিচ থেকে? কেমন লাগছে? কান মাথা সব ভোঁ ভোঁ করছে না?”
রিংকু বলল, “এসব কী হচ্ছে পিকলু? আমার তো বাবা হয়। আমার সামনে নাহয় এসব কথা নাই বা বললি।”
পিকলু বলল, “আমার বাবাকে নিয়ে বলি? দ্যাট গ্রেট চাকর ভাই অফ মিস্টার সত্যেন সান্যাল?”

রিংকু কঠিন চোখে পিকলুর দিকে তাকিয়ে রইল।
পিকলু শিস দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২০

রম্পা দুপুর রোদে হেঁটে মেলা পৌঁছেছে। নবারুণ সংঘের মাঠে মেলা হয়। তাদের গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে মেলার মাঠ। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। হাতে পাঁচশো টাকার নোটটা।
একের পর এক দোকানে মেলার মাঠ জমজমাট। কেউ "হরেক মাল দশ টাকা"য় দিচ্ছে, কেউ কাশ্মীরের সোয়েটার বিক্রি করছে, কেউ আচার বিক্রি করছে, কেউ বা রংবেরঙের গেঞ্জি। রম্পা অনেক ভেবে, অনেক দর করে একশো টাকা দিয়ে একটা পাপোশ কিনল।
একগাদা চুড়ি কিনতে গিয়েও কিনল না। এক দোকান থেকে একশো টাকা দিয়ে দুটো চায়ের কাপ কিনল। শম্ভুর সঙ্গে বসে নতুন কাপে চা খাওয়া যাবে।
মেলার এক কোণে সোয়েটারের দোকান। রম্পা অনেকক্ষণ সোয়েটার দেখল। একটা লাল রঙের সোয়েটার পছন্দ হল শম্ভুর জন্য। বাজেটের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মনখারাপ হল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে দরাদরি করে একটা মাফলার কিনল।
একটা পাপোশ, দুটো চায়ের কাপ আর একটা মাফলার নিয়ে রম্পা নাগরদোলার সামনে এল। কোনওবারই সে চড়তে চায় না। শম্ভু জোর করে তাকে নিয়ে উঠবে। রম্পা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।
রম্পা বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। কী মনে হতে টিকেট কেটে নাগরদোলায় উঠল। অন্য সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। আজ আর চোখ বন্ধ করল না। বিকেল রোদ এসে পড়ছে নাগরদোলায়। রম্পা উপরে উঠতে উঠতে দেখতে পাচ্ছে চারদিকটা কেমন পায়ের নিচে নেমে যাচ্ছে। ঘূর্ণিতে একটুও তার বমি পাচ্ছে না আর।
নাগরদোলা থেকে নেমে অনেকখানি উদ্দেশ্যহীন হাঁটাহাঁটি করে যখন ক্লান্ত হল সে, আচারের দোকান থেকে তেঁতুলের আচার কিনল। মেলার ঘাসের ওপর বসে পড়ে সেই তেঁতুলের আচার খেল। মেলায় মানুষের পর মানুষ আসতে শুরু করেছে। আশেপাশের গ্রামের মানুষ সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকে এই মেলার জন্য। টাকা জমায়, ঠিক করে রাখে কী কী কিনবে মেলা এলে। বিছানার চাদর থেকে শুরু করে বাড়ি সাজানোর খুঁটিনাটি, সব কিনতে হবে এখান থেকে। অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়ে গেছে, সঙ্গে মেলার বিভিন্ন স্টল থেকে বিচিত্র সব শব্দ, কোথাও বাচ্চা হারিয়ে যাচ্ছে, কাউকে বা মেলা কমিটির অফিসে এসে দেখা করতে বলছে, কোথাও মাকড়সা মানুষ দেখা দিয়েছে, কোথাও আফ্রিকার দুর্লভ পাখি, কোথাও বা হজমি গুলিতেই মানুষের সব রোগ সেরে যাচ্ছে। কান ঝালাপালা করা এক ধরনের বাঁশি বাচ্চারা এন্তারসে বাজিয়ে চলেছে, কোথাও চিনেবাদাম বিক্রি হচ্ছে দেদার, খাওয়ার জায়গা থেকে ভেসে আসছে এগরোল, মোগলাইয়ের গন্ধ, সব মিলিয়ে এক অপূর্ব মায়াবী অভিজ্ঞতা।
রম্পা চোখ বন্ধ করে মেলার শব্দ, গন্ধ অনুভব করল অনেকক্ষণ ধরে। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের দুচোখ ভরে দেখল। কল্পনা করার চেষ্টা করল, শম্ভুর হাত ধরে মেলায় এসেছে, তার বাচ্চা একের পর এক জিনিসের বায়না ধরছে, শম্ভু সব কিনে দিচ্ছে, আর সে ছদ্মরাগে শম্ভুকে বকে চলেছে কেন এতগুলো টাকা ফালতু খরচ করছে।
সন্ধে নামতে একগাদা পাঁপড় কিনে রম্পা মেলা থেকে বেরোল।
এক হাতে পাপোশ, চায়ের কাপ আর মাফলারের ব্যাগ, অন্য হাতে পাঁপড়ের ঠোঙা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত রম্পা যখন থানায় পৌঁছল তখন সন্ধে নেমেছে। থানার সামনে একটা ভ্যানে শম্ভুর লাশটা পরম অবহেলায় ফেলে রাখা। মুখের ওপর ভন ভন করে মাছি ঘুরছে। রম্পা প্রথমে থানার ভিতরে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী খেয়াল হতে লাশটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুখের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে কেমন একটা কালচে দাগ পড়ে গেছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রম্পা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাশটা দেখল। কিছুক্ষণ বাদে বসে পড়ল। সব প্যাকেট ধুলোয় ফেলে।

২১

দীপক ছাদে এসে দেখল পিকলু একা একা দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, "মেলায় কাল যাব। আজ আর ভাল্লাগছে না।"

দীপক বলল, "আমারও ভালো লাগছে না।"

পিকলু হেসে বলল, "নাকি দিদি বারণ করেছে বলে যাবে না?"

দীপকও হেসে ফেলল। বলল, "না না, সত্যিই ভালো লাগছে না।"

পিকলু বলল, "তোমার একটা এক্সট্রাম্যারিট্যাল অ্যাফেয়ার করা উচিত। বুঝলে?"

দীপক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "মানে?"

পিকলু বলল, "তোমার মনে জং ধরে গেছে। আরাত্রিকা সান্যাল তোমার বস হয়ে গেছে। তিনি উঠতে বললে তুমি উঠছ, বসতে বললে বসছ। দ্যাটস নট লাইফ।"

দীপক অবাক হয়ে বলল, "তুমি চাইছ তোমার দিদির সংসারটা..."

পিকলু বিরক্ত হয়ে বলল, "ধ্যাত। তুমি তো দেখছি বাংলা সিরিয়ালের বউগুলোর থেকেও বেশি সতী। দিদিকে জানিয়ে করতে কে বলেছে?"

দীপক আর-একটু সংকুচিত হয়ে বলল, "ঠিকই জেনে যাবে। তুমিও তো লুকোতে পারোনি বউয়ের কাছে।"

পিকলু সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে বলল, "আমি চাইলে ঠিকই লুকোতে পারতাম। আমি চেয়েছি ও জানুক। ম্যাড়ম্যাড়ে স্থির জলের মতো সংসারে একটা বড়ো ঢিল পড়ুক। এটা একটা লাইফ? সর্বক্ষণ একজন বিগ বসের মতো এই বাড়ি থেকে বাণী দিয়ে যাচ্ছেন, এই করবে না, ওই করবে না, এই মাংস খাবে না, ওই মাংস খাবে না, আর একদিকে সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় লাইফ!"

দীপক অবাক হয়ে বলল, "তুমিই ইচ্ছা করে জানিয়েছ?"

পিকলু বলল, "সরাসরি জানাইনি। এমনভাবে জানিয়েছি যাতে ও জানতে পারে আমি ওকে চিট করছি। রেজাল্ট ইজ অলসো স্যাটিসফ্যাক্টরি। আমার সঙ্গে ওর এখন কথা বন্ধ। আশা করি বুঝতে পারছ, বউ কথা বন্ধ করবে, এর থেকে সুখের জিনিস আর হয় না।"

দীপক খানিকটা ভেবলে গিয়ে বলল, "যদি রাগের মাথায় উলটোপালটা কিছু করে বসত?"

পিকলু বলল, "সেই রিস্ক ফ্যাক্টরটা ছিল। তবে স্বামী অন্য মেয়ের সঙ্গে শুলে সব বউ গায়ে আগুন দেয় না। তনয়া তো একেবারেই সেই টাইপের নয়।"

দীপক বলল, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার একটা ছেলে হয়েছে। এখন এইসব না করলেই হত না?"

পিকলু বলল, "সেটা তো ভালো হয়েছে। ডিভোর্সের কথা ভাবতে চাইবে না কেউই।"

দীপক বলল, "ব্যাপারটা খুব জটিল।"

পিকলু বলল, "জটিল তো বটেই। এত গতে বাঁধা জীবনের থেকে জটিল জিনিসই আমার ভালো। ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি বাপটা দাদার মোসাহেবি করে আসছে। স্পাইনলেস ক্রিচারের ছেলে হয়ে এভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবার থেকে মরে যাওয়া ভালো। বিয়েটা পর্যন্ত তিনি ঠিক করে দেবেন।"

দীপক বলল, "তনয়া কিন্তু যথেষ্ট ভালো মেয়ে পিকলু।"

পিকলুর সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। সে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "খারাপ কে? কেউ খারাপ না। সবাই ভালো। নিজের মাথা কাজে না লাগিয়ে দাদার কথা শুনে চলা, কিংবা... তোমার নিজের কথাই ধরো।

এটা ভালো ? বউ উঠতে বললে উঠছ, বসতে বললে বসছ, এটা ভালো? তোমার কী মনে হয়?"
দীপক বলল, "আমার কেমন অভ্যাসের মতো হয়ে গেছে।"
পিকলু একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "যে মেয়েটা জীবিকার প্রয়োজনে সকাল বিকেল নতুন নতুন লোকের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে পড়ে, সেও তো অভ্যাসেই শোয়, তাই না? তার সঙ্গে তোমার তফাত কী?"
দীপক চুপ করে রইল।
পিকলু বলল, "একটা লোক, সে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে, তাকে তার মুখের ওপর বলার কেউ নেই। আই হ্যাভ এনাফ ডাউটস দীপক, মিঠুনের ডেথ ইজ নট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। যেভাবে বারবার আমাদের বলা হচ্ছে এই ব্যাপারে কোনও কালচার না করতে, আমার যথেষ্ট ডাউট হচ্ছে।"
দীপক একটু ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে বলল, "সেটা হয়তো তুমি মিষ্টির সঙ্গে কথা বললেই জানতে পারতে। এত গেস করতে হত না।"
পিকলু অবাক হয়ে বলল, "তুমি কথা বলেছ?"
দীপক বলল, "না।"
পিকলু বলল, "তুমি কী করে জানলে?"
দীপক চুপ করে রইল।
পিকলু সিগারেটটা ফেলে দিয়ে অস্ফুটে বলল, "শিট।"

২২

সত্যেন ঘরে বসে হিসেব করছিলেন। রিংকু বলল, "আসব বাবা?"
সত্যেন বললেন, "আয় মা। কিছু বলবি?"
রিংকু সত্যেনের খাটে এসে বসল। বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"
সত্যেন বললেন, "দীপকের সঙ্গে আমার কথা হল।"
রিংকু বলল, "কী ব্যাপারে বলো তো?"
সত্যেন বললেন, "ওই ছ মাস যখন ও থাকবে না, তুই তখন এখানে থাকবি।"
রিংকু খুশি হল, "তা ভালো করেছ। ওদের বাড়িতে আবার অনেক ঝামেলা।"
সত্যেন বললেন, "কী ঝামেলা?"
রিংকু বলল, "ওই আর কি!"
সত্যেন বললেন, "না না, বল, কী ঝামেলা?"
রিংকু বলল, "আরে তুমি বেশি ভেবে ফেলছ। আমি ঝামেলা বলতে এমনি বলছি। বোঝোই তো, শ্বশুরবাড়ি থাকতে কি ভালো লাগে? তাও একা একা। ওর মা একরকম, বাবা একরকম, সব সামলেসুমলে থাকা। দীপক থাকলে তাও খানিকটা সামাল দেওয়া যায়। তার ওপর ওরা খানিকটা আনকুথ। ধরো ভালো করে হয়তো আমি সোফাটা গুছিয়ে রাখলাম, বলা নেই কওয়া নেই এমনভাবে বসল যে সব এদিক সেদিক হয়ে গেল। বললে অবাক হয়ে বলবে সোফা তো সাজিয়ে রাখার জন্য না। বসার জন্যই। আমি দেখেছি দীপক না থাকলে ওর মা বিশেষ করে ইচ্ছা করে এগুলো করেন।"
সত্যেন বললেন, "তাতে কী? শ্বশুরবাড়ি মানেই তো মেয়েদের সবসময় মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। যত সমস্যাই হোক নিজেকে মুখ বুজে সব সহ্য করতে হবে।"
রিংকু বলল, "তুমি এখনও মান্ধাতার আমলে পড়ে আছ বাবা, দিনকাল অনেক বদলেছে। শ্বশুরবাড়ি মানেই মেয়েদের লাথি ঝ্যাঁটা খাবার দিন আর নেই এখন। অনেক আইনকানুন তৈরি হয়েছে মেয়েদের জন্য।"
সত্যেন বললেন, "ওগুলোই তো সমস্যা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন আইন ঢুকে পড়ে তখনই তো অসৎ উপায়ে লোক সেটার ব্যবহার করার কথা চিন্তা করে।"

রিংকু বলল, “সেটার পার্সেন্টেজটা আছে ঠিকই, তবে মেয়েদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতেও এই আইন দরকার ছিল।”
সত্যেন খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, “কোনও অত্যাচার নয়। মেয়েদের এভাবেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। কষ্ট তো হবেই, সংসার করবে, কষ্ট হবে না? তা বলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে? ছি ছি, এ কেমন কথা?”
রিংকু বুঝল বাবা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে কথা ঘোরানোর জন্য বলল, “মিষ্টির কী হবে বাবা?”
সত্যেন বললেন, “কী হবে?”
রিংকু বলল, “না মানে, একটা গোছানো সংসার ছিল। হঠাৎ করে এত কিছু...”
সত্যেন বললেন, “ওসব নিয়ে এত ভাবছিস কেন? ওর আমি খুব ভালো একটা বিয়ে দেব। ওদের পালটি ঘরেই।”
রিংকু বলল, “ও যদি না করতে চায়?”
সত্যেন বললেন, “ওর ইচ্ছায় হবে নাকি? অত সোজা? দেখল তো নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করলে কী হয়?”
রিংকু চুপ করে গেল।
সত্যেন বললেন, “যারা নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে করে, সব নিয়মকানুন ভেঙে, তাদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। আর যেখানে যা ইচ্ছা হোক, আমার পরিবারে হবে, সেটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে, আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।”
রিংকু বলল, “তুমি কি এবারে ওদের নেমন্তন্ন করেছিলে, না ওরা নিজেরাই এসেছিল?”
সত্যেন বললেন, “আমি নেমন্তন্ন করেছিলাম।”
রিংকু একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, “ব্যাপারটা নিয়ে জলঘোলা হবে না তো বাবা?”
সত্যেন বললেন, “কিচ্ছু হবে না। অত চিন্তা করিস না। তোর বাবা এখনও মরে যায়নি।”
রিংকু বলল, “এদিকে তো আর-এক সমস্যা তৈরি হয়েছে।”
সত্যেন বললেন, “পিকলুকে নিয়ে? ওকে দেখেই আমার কেমন কেমন মনে হচ্ছে।”
রিংকু বলল, “হ্যাঁ। একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।”
সত্যেন বললেন, “তা পুরুষমানুষের ওরকম এক আধটা সম্পর্ক থাকেই। সেসব নিয়ে অত চিন্তা করার কিছু নেই। ছেলে বড়ো হবে, দায়িত্ব আসবে, ধীরে ধীরে পিকলু বুঝবে সম্পর্কের মানে। ওসব নিয়ে চিন্তা করিস না।”
রিংকু বলল, “কিন্তু বাবা, তনয়াও তো...”
সত্যেন বললেন, “তনয়া? মানে?”
রিংকু বলল, “না না, কিছু না।”
সত্যেন কড়া গলায় বললেন, “আমি শুনতে পেয়েছি রিংকু, কী বলতে যাচ্ছিলি বলে ফেল।”
রিংকু ইতস্তত করে বলল, “তনয়াও জেদের বশে একটা ছেলের সঙ্গে...”
সত্যেন বললেন, “তুই কথা বলেছিস?”
রিংকু বলল, “হ্যাঁ, আমাকে তনয়াই বলল।”
সত্যেন বললেন, “আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।”
রিংকু ব্যস্ত হয়ে বলল, “না না, তুমি কেন বলবে, তাহলে ও ভাববে এইসব নিয়ে আমি তোমাকে লাগিয়েছি।”
সত্যেন গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

কল্যাণ ঘরে ঢুকে দেখলেন সোমা জেগে বসে আছেন। তিনি ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে এগারোটা বাজে। বললেন, "ঘুমের ওষুধটা খাওনি?"

সোমা বললেন, "মিষ্টি ঘুমিয়েছে?"

কল্যাণ বসলেন, "হ্যাঁ। ঘুমিয়েছে। খেয়েছেও খানিকটা।"

সোমা বললেন, "আমরা কাল চলে যাই। এখানে থেকে কী হবে?"

কল্যাণ বললেন, "তোমার দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে?"

সোমা মাথা নেড়ে না বললেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, "মিঠুনের বাড়ি থেকেও কেউ এল না। ছেলেটার কি কোনও মূল্য থাকল না কারও কাছে?"

কল্যাণ বললেন, "তোমার মনে আছে এই বাড়িতে যখন প্রথম পুজোয় এসেছিলাম আমাকে অন্য থালায় খাবার দিয়েছিল? গ্লাস থেকে শুরু করে সব কিছুই আলাদা। আমি অবাক হইনি খুব একটা। এক্সপেক্টেড ছিল। তবে এটাও আশা করেছিলাম যত দিন যাবে, সব কিছু ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়। যত দিন যাচ্ছে, সমস্ত গোঁড়ামি আরও নতুন করে ফিরে আসছে। এর শিকড় বিস্তৃত হয়ে পড়ছে কোনায় কোনায়, জানি না কে দায়ী এর জন্য? আধুনিকতা কি বড্ড বেশি একপেশে হয়ে গেল? নাকি আসলে আমাদের ভেতরেই ওই প্রচণ্ড গোঁড়ামিটা কোথাও একটা বাসা বেঁধে ছিল, আমরা কেউ বুঝতে পারিনি? নইলে ছেলে নিজের ইচ্ছায় একটা বিয়ে করেছে বলে বাবা মা তার মৃতদেহ পর্যন্ত নিতে চাইছে না? এ কেমন গোঁড়ামি?"

সোমা বললেন, "ছেলেটা তো কিছুই মানত না। তবু..."

দরজায় কেউ নক করল। কল্যাণ বললেন, "খোলা আছে।"

পিকলু দরজা দিয়ে গলা বাড়াল, "ঘুমিয়ে পড়েছ?"

সোমা উঠে বসে ক্লান্ত গলায় বললেন, "আয় বাবা।"

পিকলু ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজাল। সোমার পাশে এসে বসে বলল, "সারাদিন পরে এখন একটু আসার সাহস পেলাম পিসি। তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ানোর সৎ সাহসটুকু হারিয়ে গেছে আসলে। মিষ্টির কাছে এখনও যেতে পারিনি।"

সোমা পিকলুর হাতটা হাতে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। পিকলু চুপ করে বসে রইল।

কল্যাণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "এই তো বেশ সামলে উঠেছিলে, আবার কী হল?"

পিকলু বলল, "পোস্টমর্টেম হয়েছে? বডি কোথায় আছে জানো?"

কল্যাণ বললেন, "সম্ভবত মর্গে।"

পিকলু বলল, "আমরা কিচ্ছু করতে পারি না, তাই না?"

কল্যাণ বললেন, "কী করতে পারি?"

পিকলু বলল, "আমার তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে বাড়িটা আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দি।"

সোমা বললেন, "এসব বলিস না বাবা, এভাবে ভাবতে নেই।"

পিকলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সেটাই। এভাবে একজনই ভাবতে পারে। আমরা ভাবলেই বরং সেটা অস্বাভাবিক ভাবনার আওতায় পড়ে। সত্যি, কী হাস্যকর, তাই না?"

দরজাটা কেউ ধাক্কা মারল। কল্যাণ গলা তুললেন, "কে?"

কেউ সাড়া দিল না দেখে কল্যাণ বেরিয়ে দেখলেন কেউ নেই।

পিকলু বলল, "ওহ, নজরদারি চলছে। রেস্ট্রিকটেড ঘরে ঢুকে পড়েছি কিনা।"

সোমা বললেন, "বাবা, শোন, আজ তনয়া খানিকটা না বুঝেই আমাদের আটকে দিয়েছে। কালকে আমাদের আর আটকাস না। আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে যাই। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি আর সহ্য করতে পারছি

না, দ্যাখ তুইও আর এই ঘরে আসিস না। কী দরকার আমাদের জন্য ঝামেলায় পড়ার?”
পিকলু বলল, “আমাদের বাড়ি পিসি। এটা তোমারও বাড়ি। আমাদের প্রত্যেকটা ঘরে যাবার অধিকার আছে। কেন বলো তো ভয় পেয়ে পেয়ে কাটাতে হবে?”
কল্যাণ বললেন, “বাস্তব আর নিজের ক্ষমতাকে আমরা কতদূর অবধি অস্বীকার করতে পারি পিকলু?”
পিকলু বলল, “নিজেদের অধিকারটাকে তো আমরা বুঝে নিতে পারি, তাই না? কেন তোমরা চলে যাবে? কেন আমাকে সবসময় একটা অলিখিত নিয়মে চলতে হবে? কেন বলতে পারো?”
দরজায় কেউ নক করল।
কল্যাণ বললেন, “কে?”
ওপাশ থেকে সত্যেনের গলা ভেসে এল, “আমি।”

২৪

দীপক জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।
রিংকু দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল।
রিংকু অবাক হয়ে বলল, “তুমি সিগারেট খাচ্ছিলে?”
দীপক হেসে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, “না না, ওই একটাই।”
রিংকু বলল, “তুমি তো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার ধরলে কবে?”
দীপক বলল, “পিকলুর থেকে একটা নিয়েছিলাম।”
রিংকু বলল, “এখানে এলে পিকলুর সঙ্গে এত মেলামেশা বেড়ে যায় কেন তোমার?”
দীপক কিছু বলল না।
রিংকু বলল, “এত লোক আছে, বাবা আছে, কাকা আছে, কই তাদের সঙ্গে তো বেশি দেখতে পাই না তোমায়!”
দীপক বলল, “তোমার বাবার সঙ্গে তো কথা হয়েছে আমার।”
রিংকু বলল, “সে যাই হোক। কথা হয়েছে ভালো হয়েছে। কিন্তু পিকলুর পাল্লায় পড়লে কেন?”
দীপক বলল, “পাল্লায় পড়ার কী আছে? তুমিই তো প্রথম দিকে বলতে এ বাড়িতে পিকলুর সঙ্গেই একমাত্র কথা বলা যায়, ও অনেক ফ্রেশ মাইন্ডের ছেলে।”
রিংকু বলল, “এখন বলি না। তা ছাড়া ও কেমন পালটে যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে। তোমার কানে মন্ত্র দিয়ে তোমাকেও ও চেঞ্জ করে দেবে ঠিক। তুমি জানো ওর একটা মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার আছে? তুমি নিজে তো ছ মাস লন্ডনে একা ফুর্তি করবে। আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না কী করবে একা একা। বলা তো যায় না কিছুই। সামনে তো এমন ভাব করে থাকো যেন ভাজা মাছটাও উলটে খেতে জানো না।”
দীপক বলল, “সেটুকু বিশ্বাস তো রাখতেই হবে তোমাকে।”
রিংকু বলল, “যে ছেলেটা তোমার একটা ছেড়ে দেওয়া নেশা এতদিন পরে আবার নতুন করে ধরাতে পারে, সে সব কিছু করতে পারে।”
দীপক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “একটা কাজ করি তবে, যাওয়াটা ক্যানসেল করে দি।”
রিংকু বলল, “ক্যানসেল করবে না কী করবে সেটা তোমার ডিসিশন, তবে আমি চাইব তুমি এখানে যে কটা দিন থাকবে, পিকলুর সঙ্গে কম মিশবে। আমার ওকে একদম সহ্য হচ্ছে না এবারে।”
দীপক বলল, “আচ্ছা।”
রিংকু বলল, “তুমি জানো ও এখন পিসিদের ঘরে ঢুকেছে?”
দীপক একটু চমকাল কিন্তু সামলে নিয়ে বলল, “আমি কী করে জানব, আমি তো এখানেই ছিলাম। তুমি দেখলে?”

রিংকু বলল, "হ্যাঁ, বাবার ঘর থেকে আসার সময় দেখলাম।"
দীপক বলল, "ওহ। সে তো যেতেই পারে। পিসির ঘরে যাবে এতে সমস্যা কোথায়?"
রিংকু বলল, "কোথাও সমস্যা নেই। আমি কি বলেছি কোনও সমস্যা আছে? কিন্তু ব্যাপারটা অন্য কোনও দিন গেলে তো এই নিয়ে কেউ কিছু বলত না। আজকেই যেতে হল? যখন এত বড়ো একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে? তুমি হয়তো জানো না, পিকলু হঠাৎ করে বিপথে যায়নি। ওর অফিসে বেশ কিছু প্রবলেম তৈরি হয়েছে। সম্ভবত ওর চাকরিটা নিয়ে।"
দীপক অবাক হয়ে বলল, "সেটা তোমাকে কে বলল? তনয়া?"
রিংকু বলল, "সেসব খবর দেওয়ার লোকের অভাব নেই। সব খবরই পাই। পিকলুর মধ্যে সে সব কিছু নিয়েই একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। মেন্টাল ডিস্টার্বেন্সের জন্যই ও এসব উলটোপালটা কাজ করা শুরু করেছে। তোমার এত কিছু জানার কথা না। সেজন্যই বললাম। জেনে রাখো, এবং এখন ওর থেকে দূরে থাকো।"
দীপক খাটে বসল, "আচ্ছা ঠিক আছে।"
রিংকু বলল, "দ্যাখো দীপক, তোমার থেকে আমার বাবার অনেক এক্সপেক্টেশন। তুমি জানো কি না জানি না, তবে বাবা কিন্তু তোমাকে একদম অন্য চোখে দ্যাখে। আমার তো মনে হয় বাবা তোমাকে আমার থেকেও বেশি পছন্দ করে। চেষ্টা করো বাবার কথা শুনে চলতে। অসৎ সঙ্গে পড়লে বুঝতেই পারছ, সবথেকে বেশি ক্ষতিটা আমাদেরই হবে।"
দীপক বলল, "মিষ্টির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"
রিংকু চোখ ছোটো করে বলল, "হঠাৎ করে মিষ্টির কথা বললে কেন?"
দীপক বুঝল প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। সে বলল, "এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। বাড়িতে এত বড়ো একটা ব্যাপার হয়ে গেল, তাই আর কি।"
রিংকু বলল, "তোমাকে বোধহয় এ বাড়িতে আসার আগে একটা কথা বলেছিলাম। ভুলে গেছ?"
দীপক বলল, "না না, মনে আছে। বললাম তো, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।"
রিংকু গম্ভীর হয়ে বসে থাকল।

২৫

পিকলু দরজা খুলল, "এসো জেঠু।"
সত্যেন ঘরে ঢুকলেন, "তুই এই ঘরে কী করছিস?"
পিকলু বলল, "খবর নিতে এসেছিলাম, মিষ্টি কেমন আছে।"
সত্যেন পিকলুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "সেটা এত রাতে নিতে হল? তোরা এখনও ঘুমাসনি?"
সোমা উঠে বসলেন। বললেন, "বস।"
সত্যেন চেয়ারে বসে পিকলুকে বললেন, "তোর সম্পর্কে অনেক কিছু শুনলাম পিকলু।"
পিকলু যেন আকাশ থেকে পড়ল, এমন মুখ করে বলল, "কী শুনলে জেঠু?"
সত্যেন কয়েক সেকেন্ড পিকলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এমন কিছু কথা যেগুলো না শুনলেই হয়তো ভালো হত আমার।"
কল্যাণ বললেন, "তুমি ঘুমাও কখন?"
সত্যেন বললেন, "আমি ঠিক সময়ে ঘুমাই। পিকলু বলুক, আমি যেগুলো শুনেছি সে সম্পর্কে।"
পিকলু বলল, "জেঠু, আমিও একটা কথা শুনলাম।"
সত্যেন একটু রাগলেন, "তুই আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দে।"

পিকলু বললেন, "জেঠু, তুমি কি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাও?"
সত্যেন বললেন, "কথা ঘোরাচ্ছিস?"
পিকলু বলল, "না না, কথা ঘোরাব কেন, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। আসলে কী জানো তো, আমার অফিসে মিঠুনের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা বলায় আমার বস খুব খুশি হয়ে বলল, বাহ, তোমাদের গ্রামের বাড়ি তো খুব উন্নত জায়গায়। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করায় মব গাড়িচালককে মেরে দিল আর তার সুন্দরী বউয়ের গায়ে কেউ ছুঁল পর্যন্ত না? আমাদের গ্রাম হলে তো আগে মেয়েটার গায়ে হাত পড়ত।"
সত্যেন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, "এতক্ষণ কি এইসব কথা আলোচনা হচ্ছিল?"
পিকলু হাসল, "পিসেমশাই অত আলোচনা করতে পারেন নাকি জেঠু? সেরকম লোক হলে এতক্ষণে খুনিকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতেন।"
সত্যেন কাঁপতে লাগলেন রাগে, গলা তুলে বললেন, "তোর এত বড়ো সাহস, তুই কার সঙ্গে কী বলছিস বুঝতে পারছিস?"
পিকলু অবাক হবার ভান করে বলল, "কী যে বলো না জেঠু, আমি কী বললাম বলো তো? আমি তো খুনিকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর কথা বলেছি।"
জীবেন ব্যস্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, "কী হল, এত রাতে এই ঘরে সবাই কেন?"
পিকলু হাসতে হাসতে বলল, "ওহ, তুমি, আমি তাই ভাবছিলাম বাবা, তুমি এতক্ষণ কোথায় পড়ে ছিলে?"
জীবেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুই এই ঘর থেকে যা। রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়।"
পিকলু বলল, "ধুস, আমার তো রাত জাগা অভ্যাস আছে। তুমি বরং জেঠুকে বলো। কাল অতগুলো কাজ বাড়িতে, অঞ্জলি আছে, বড়ো বড়ো সব লোক আসবে, নিজে সুস্থ না থাকলে তো ফ্যামিলির সম্মানটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এখন তো মনে হয় ফ্যামিলির সম্মানটাই সবথেকে বড়ো কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"
জীবেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "তুই ঘরে যা পিকলু। তোকে আগেও বলেছি, আবার বলছি, এখানে অযথা উলটোপালটা কথা বলবি না। তুই বোধহয় জানিস না, দাদা মিঠুনের খুনিকে শাস্তি দেবার জন্য কতটা চেষ্টা করছে।"
সত্যেন বললেন, "তুই বরং নিজের সংসার সামলা পিকলু। নিজের বউ অন্য ছেলের সঙ্গে দেখা করছে, ছি ছি ছি। সান্যাল বংশের সম্মান এভাবে বাজারে বিক্রি হয়ে গেল! মিষ্টির কথা তোর না ভাবলেও চলবে। মিঠুনের খুনি উপযুক্ত সাজা পেয়েছে। তুই বরং নিজের দিকে তাকা। তোর লজ্জা হওয়া উচিত।"
জীবেন অবাক হয়ে সত্যেনের দিকে তাকালেন।
পিকলু জীবেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, তুমি সবসময় সাইলেন্ট মুভির সাইড ক্যারেক্টার প্লে করো, ভালো লাগে তোমার?"
কল্যাণ পিকলুকে থামালেন, "পিকলু, আমার মনে হয় তোমার ঘরে যাওয়া উচিত। এত রাতে সোমার উত্তেজনা ভালো নয়। ইন ফ্যাক্ট, সবাই ঘরে গেলেই বোধহয় ভালো হয়।"
সত্যেনের জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল, কল্যাণকে বললেন, "তোমাদের যদি মনে হয়, আমার বাড়িতে থেকে, আমার বিরুদ্ধেই কন্সপিরেসি করবে, তাহলে কিন্তু তোমরা ভুল ভেবেছ, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, থাকছ, খাওয়াদাওয়া করছ, ব্যস। পারলে কালকেই তোমরা বিদেয় হও। সান্যালবাড়িতে যারা ঢুকতে কোনও দিন সাহস পেত না, তাদের বাড়িতে ঢোকালে কী হয়, তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।"
সোমা বললেন, "এটা তুই কী বললি দাদা?"
সত্যেন একবার কড়া চোখে পিকলুর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
পিকলু জীবেনকে বলল, "জেঠুকে একটা কথা বলা হল না বাবা।"
জীবেন ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। কোনও মতে বললেন, "কী?"
পিকলু বলল, "আমার এক বন্ধু, পুলিশে একটু ওপরের দিকের অফিসার। ওকে মিঠুনের ব্যাপারটা বলেছি।

ব্যাপারটা লোকাল থানা দিয়ে মিটবে না বোধহয় আর। পারলে ঘুমোতে যাবার আগে জেঠুকে খবরটা জানিয়ে দিয়ো, ঘুমটা ভালো হবে। মিঠুনের খুনির শাস্তি হোক, সবথেকে বেশি বোধহয় জেঠুই চায়, তাই না?"

জীবেন চমকে পিকলুর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছিল।

২৬

পিকলু আসেনি দেখে তনয়া দরজা ছিটকিনি না দিয়ে ভেজিয়ে শুয়েছিল। বাচ্চাটা কাঁদছিল। সামলেসুমলে ঘুম পাড়িয়ে মোবাইলটা খুলল। অবনীশ বেশ কয়েকবার পিং করেছে।

তনয়া লিখল, "সরি। বিজি ছিলাম।"

অবনীশ লিখল, "অনেক কাজ করতে হয়?"

তনয়া নিজের মনে হেসে লিখল, "হয়। সংসার মানেই অনেক কাজ।"

"চলে এসো আমার কাছে। কিচ্ছু করতে হবে না।" অবনীশ একদিনের দেখাতেই তার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। সর্বক্ষণ শুধু একই কথা। তনয়া চেষ্টা করে চলেছে এই প্রবল ইচ্ছাকে বাঁধ দিয়ে দমিয়ে রাখতে।

তনয়া একটা স্মাইলি দিয়ে বলল, "আমার বরও একই কথা বলত।"

"আমাকে তোমার বরের মতো ভেবো না। আমি আলাদা।" অবনীশের মুখটা মানসচোখে দেখতে পেল তনয়া।

সে লিখল, "পৃথিবীর সব পুরুষই তাই ভাবে। বলো?"

"আমি ভাবি না, আমি যা, আমি তাই।"

"একজ্যাক্টলি, এটাই সবাই ভাবে।"

"ওহ। প্লিজ। তোমরা মেয়েরা চিরকাল এত কনজারভেটিভ হলে কী করে হবে বলো তো?" অবনীশ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

"ভাগ্যিস কনজারভেটিভ। তাই হয়তো খানিকটা ব্যালান্স থাকল।" তনয়া অনেকটা ভেবে লিখল।

"কীসের ব্যালান্স?" অবনীশ যেন কিছুই বোঝে না।

তনয়া লিখল, "বুঝবে না। সব কথা বুঝে কী করবে?"

দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল পিকলু। তনয়া মেসেঞ্জার বন্ধ করল না।

পিকলু ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক, ব্যাটা ঘুমিয়েছে।"

বেশ কিছুদিন হল পিকলুর সঙ্গে তনয়ার কথা নেই।

তনয়া ভেবেছিল এখনও পিকলু কিছু বলবে না। তাকে চমকে দিয়ে বলল, "অবনীশের কথা দিদিকে বলেছ নিশ্চয়ই?"

তনয়া এতটা জোরে চমকাল যে ফোনটা তার হাত থেকে খাটের ওপর পড়ে গেল। একটু সামলে বলল, "হ্যাঁ, বলেছি।"

পিকলু বলল, "কাল আনন্দবাজারে বেরোবে। ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমনও হতে পারে। বাড়ির আর কারও জানার বাকি নেই।"

তনয়া ঠোঁট কামড়াল। বলল, "আমি অত ভেবে কিছু বলিনি।"

পিকলু বলল, "বলা উচিত।"

তনয়া কিছুক্ষণ পিকলুর দিকে তাকিয়ে থাকল। কোত্থেকে যেন চোখে জল চলে এল, "তোমারও বলা উচিত ছিল আমাকে। তুমি কী করে করলে ওটা?"

পিকলু তনয়াকে কাঁদতে দিল। বেশ খানিকক্ষণ পর বলল, "মানুষ তো। মানুষের কিছু জৈবিক প্রবৃত্তি থাকে। আমি তোমার কাছে সাফাই গাইব না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি খানিকটা বয়ে গেছিলাম, নিজেই চেয়েছিলাম

হয়তো।”
তনয়া চুপ করে থাকল।
পিকলু বলল, “আমাদের বাড়ির পরিস্থিতি আমাদের সম্পর্কের থেকেও অনেক গুণ জটিল তনয়া। তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ?”
তনয়া বলল, “আমার মাথায় কিছুই আসছে না।”
পিকলু বলল, “একটা লোক, তাকে তার অসংখ্য কুসংস্কার আর গোঁড়ামির সঙ্গে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে খোলা বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে প্রভূত ক্ষমতা পেয়ে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে। তাকে সাহায্য করার জন্য আছে আমার নিজের বাবা, যে প্রত্যেকটা নির্দেশ পরম ভক্তিভরে পালন করে চলেছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সম্পূর্ণ লড়াইটাই ভীষণ অসম। এই সময় কি আমরা একটা যুদ্ধবিরতি নিতে পারি?”
তনয়া পিকলুর চোখে চোখ রেখে বলল, “যুদ্ধবিরতির পরে আমরা আবার যুদ্ধ করব?”
পিকলু বলল, “যুদ্ধ তো হয় সমানে সমানে। আমি তোমার কাছে প্রথম থেকেই তো হেরে গেছি।”
তনয়া চুপ করে রইল।
পিকলু বলল, “জানতে চাইলে না, কীভাবে যুদ্ধ করব?”
তনয়া বলল, “তুমিই জানো।”
পিকলু বলল, “আচ্ছা, তুমি অবনীশের সঙ্গে আবার কথা বলতে পারো, আমি ঘুমিয়ে পড়ি।”
তনয়া হঠাৎ পিকলুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল, “তুমি এমন অদ্ভুত কেন? কেন? কেন?”
পিকলু তনয়াকে বুকের কাছে নিয়ে তনয়ার কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, “মানুষ বলে।”

২৭

মেলায় টহল দিয়ে নির্মল চৌধুরী ঠিক করলেন ঘরে ফিরে একটু শুয়ে নেবেন। থানার মেজোবাবুকে দায়িত্ব দিয়ে নির্মলবাবুর বাড়ির সামনে যখন গাড়িটা দাঁড়াল তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে।
কনস্টেবল বিকাশ সাহা বলল, “স্যার, আপনার বাড়ির বাইরে কে বসে আছে?”
নির্মল গাড়ি থেকে নেমে অবাক হলেন। বললেন, “কে বলো তো?”
বিপিন গাড়ি থেকে এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে বলল, “শম্ভুর বউ স্যার।”
নির্মল বললেন, “এখানে কী করছে? আচ্ছা, তোমরা বেরিয়ে যাও, আমি দেখছি।”
গাড়িটা বড়োবাবুকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।
ঘরের চাবি পকেটেই থাকে নির্মলবাবুর। চাবি বের করে ঘরের দরজা খুলতে এগোলেন।
তাঁকে দেখে রম্পা উঠে দাঁড়াল।
নির্মলবাবু বললেন, “এখানে কী চাই?”
রম্পা বলল, “বিচার চাই বাবু।”
বাড়ির বাইরের একশো পাওয়ারের বালবে রম্পার অবিন্যস্ত পোশাক দেখে নির্মল চ্যাঁচ্যাতে গিয়েও থমকে গেলেন। দরজা খুলে বললেন, “আয়, ঘরে আয়।”
রম্পা ধরা গলায় বলল, “বিচার চাই বাবু। বিচার দ্যান।”
নির্মল ঘরের ভিতর ঢুকে আলো জ্বালিয়ে সোফায় বসলেন। পিছন পিছন রম্পা ঢুকে মেঝেতে বসল। নির্মলের মনে পড়ে গেল বহুদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। বউয়ের সঙ্গে কতদিন... নির্মল দীর্ঘশ্বাস ফেলে রম্পার দিকে তাকালেন। এখানে মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। কত আর বয়স হবে মেয়েটার। খুব বেশি হলে তেইশ চব্বিশ। পাশের বাড়িটাও তাঁর বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ভিতরের পুরুষমানুষটা জেগে উঠছিল একটু একটু করে।

নির্মল একটু সামলে দরজাটা বন্ধ করে সোফায় বসে বললেন, "নিচে বসিস না, ঠান্ডা লেগে যাবে, উপরে আয়।"

রম্পা গোঁজ হয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "বিচার চাই, বিচার চাই।"

নির্মল উঠে রম্পাকে ধরে তুলতে গেলেন, রম্পা ছিটকে গেল না, নির্মল খানিকটা উৎসাহিত হয়ে রম্পাকে সোফায় এনে বসালেন। শাড়ির আঁচল খসে গেছে, নির্মলের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছিল। রম্পার পিঠে হাত রাখলেন, "আমরা তো আছি, আমি আছি, তোদের বাবু আছেন, সবাই আছে।"

রম্পা বলল, "সবাই বলল, কোনও ভয় নেই, শম্ভু যাবে, ফিরেও আসবে, কিন্তু শম্ভু ফিরল না আর। ওকে কে মেরেছে? সবার বিচার করতে হবে।"

নির্মল নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, রম্পাকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

রম্পা প্রাণপণে নির্মলকে ধাক্কা মারল। নির্মল ভেবেছিলেন রম্পা বাধা দেবে না। হঠাৎ করে ধাক্কা লাগায় জেদ চেপে গেল তাঁর। বললেন, "শোন, আমিই তোকে বিচার দিতে পারব, আর কেউ পারবে না, এদিকে আয়।"

রম্পা বিহ্বল চোখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরোতে গেল। নির্মল সোফা থেকে উঠে রম্পাকে আটকাতে গেলেন। রম্পা নির্মলকে আবার ধাক্কা দিতে গেল, এইবারে নির্মল প্রস্তুত ছিলেন, রম্পার আক্রমণ প্রতিহত করে ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন।

রম্পা জোরে চেঁচিয়ে উঠল, নির্মল রম্পার মুখে হাত দিতে গেলেন, রম্পা নির্মলের হাতে কামড়ে দিল। নির্মল এবার মরিয়ে হয়ে উঠলেন, রম্পার গালে কষিয়ে এক চড় মারলেন।

রম্পা ছিটকে পড়ল ঘরের কোণে। দিনের পর দিন শম্ভুর চড় খেয়ে সেও অভ্যস্ত হয়ে গেছিল, সামলে উঠতে একটুও সময় না নিয়ে পরমুহূর্তেই উঠে প্রাণপণে চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। নির্মল দরজা আটকে দাঁড়ালেন। সার্ভিস রিভলভার বের করে রম্পাকে বললেন, "জানে মেরে দেব, একদম জানে মেরে দেব।"

রম্পা ফাঁদে পড়া বিড়ালের মতো নির্মলের দিকে তাকিয়ে ফুঁসতে লাগল। হাতের কাছে একটা ফুলদানি ছিল, নির্মলের দিকে ছুড়ে মারল।

নির্মল প্রস্তুত ছিলেন না। ফুলদানিটা কপালে এসে লাগল। বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। কপাল থেকে রক্ত বেরোনো শুরু হয়েছে। টেবিলের ওপর আর-একটা ফুলদানি ছিল। রম্পা দৌড়ে এসে গায়ের সমস্ত জোর একত্রিত করে সম্মান বাঁচাবার তাগিদে নির্মলের মাথায় বারবার আঘাত করতে শুরু করল। নির্মল আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না।

রম্পাকে তাক করে তাঁর রিভলভার গর্জে উঠল। রাতের নিস্তব্ধতা মুহূর্তের মধ্যে খানখান হয়ে গেল। রম্পা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

নির্মলের মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি উঠতে গিয়েও মেঝেতে পড়ে গেলেন।

২৮

প্রণতি দেখলেন জীবেন একটু উত্তেজিত হয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চোখে ঘুম লেগে এসেছিল প্রণতির। জীবেনকে উত্তেজিত দেখে উঠে বসলেন, "কী হল আবার?"

জীবেন ঘামছিলেন।

খাটে বসে বললেন, "পিকলু কেমন একটা হয়ে গেছে। দাদার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলছে, আর..."

প্রণতি বললেন, "আর মানে? আর মানে কী বলতে চাইছ?"

জীবেন প্রণতির দিকে তাকালেন, "ও পুলিশের ওপরমহলে মিঠুনের ব্যাপারে জানিয়েছে। ব্যাপারটা নাকি নতুন করে তদন্ত হবে।"

প্রণতি বললেন, "দাদা কী বলছে এটা শুনে?"
জীবেন বললেন, "দাদা জানে না। দাদা বেরোনোর পর পিকলু আমাকে বলেছে। দাদাকে রাতে আর বলব না। এমনিতেই খুব কথা কাটাকাটি হল। সকালে বলব নাহয়।"
প্রণতি ধরা গলায় বললেন, "আমার ছেলেটার কোনও ক্ষতি করে দেবে না তো দাদা?"
জীবেন গম্ভীর হলেন, বললেন, "আমাকে এসব কথা বলবে না। ছেলে এখন লায়েক হয়ে গেছে। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে।"
প্রণতি বললেন, "আমার প্রথম থেকেই কু গাইছিল মনটা। মিষ্টি যখন আসবে শুনছিলাম, তখন থেকেই আমার কেমন যেন একটা লাগছিল। তবু তোমার দাদা যে এত দূর ভেবে ফেলেছিল, সেটা আমার স্বপ্নেও মাথায় আসেনি।"
জীবেন কিছু বললেন না।
প্রণতি বললেন, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"
জীবেন বললেন, "কী?"
প্রণতি বললেন, "তুমি জানতে না পুরো ব্যাপারটা কী হতে চলেছে?"
জীবেন বললেন, "এ আবার কেমন প্রশ্ন?"
প্রণতি বললেন, "তোমাদের যদি ছেলেটাকে পছন্দ না হত, না ডাকলেই পারত, ঘরে ডেকে এনে এটা কি না করলেই হচ্ছিল না? এ তো ঘোর পাপ। এত বড়ো পাপ পুজোর দিনে করতে পারলে? ছি ছি ছি, শেষে আমিও এত বড়ো পাপের ভাগীদার হলাম!"
জীবেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "পাপ কে বলেছে তোমায়? এর থেকে পুণ্য আর কিছুতে নেই। আর পুজোর দিনই এর জন্য সেরা দিন।"
প্রণতি জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাদা ছাড়া কিছু বোঝো তুমি কোনও দিন? কাল যদি তোমার দাদা তোমাকে বলেন নিজের বউ ছেলেকে কুপিয়ে দিতে, তোমার বোধহয় হাতটুকুও কাঁপবে না, তাই না?"
জীবেন ভ্রূ কুঁচকালেন, "তোমার কী হয়েছে? এসব কেমন কথা বলা শুরু করেছ?"
প্রণতি বললেন, "পিকলুটার ওরকম অবস্থা, তোমাদের এরকম অবস্থা, আমি কোথায় যাই বলো তো? সারাবছর ধরে হাপিত্যেশ করে অপেক্ষা করে থাকি কখন ছেলেটা আসবে, নাতিটাকে দেখব, কিন্তু শেষে কী হল? ছেলেটা ওভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাতিটাকে দেখতে পর্যন্ত পারলাম না ভালো করে বাড়ির কাজের চাপে। বউমাও কেমন হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে সংসারটা কেমন হয়ে গেল।"
প্রণতি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন।
জীবেন বিরক্ত গলায় বললেন, "মাঝরাতে যাত্রাপালা শুরু কোরো না তো, কাল অনেক কাজ আছে। আমি আর এত উত্তেজনা নিতে পারছি না, আমাকে ঘুমাতে দাও।"
প্রণতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "ঘুমিয়ে পড়ো। আমিই জেগে থাকি সারারাত। আমার আর আজকে ঘুম হবে না। হ্যাঁ গো, তোমার জেল হবে না তো?"
জীবেন বললেন, "হলে হবে। আমি এসবে এত ভয় পাই না।"
প্রণতি বললেন, "সে তো কোনও কিছুতেই ভয় পাও না তুমি, কিন্তু যে বাড়ির সম্মানের কথা বলে সারাক্ষণ সবার কান মাথা খেয়ে নাও তোমরা, সেই তোমাদেরই যদি জেল হয়ে যায়, তাহলে সেই সম্মানের কী হবে সে সম্পর্কে কি কখনও ভেবেছ?"
জীবেন বললেন, "সম্মান বাড়বে।"
প্রণতি বললেন, "বাড়বে?"
জীবেন বললেন, "অবশ্যই বাড়বে, ওই ছেলেকে মারার দায়ে ফাঁসি হলেও পুণ্য হবে। স্বর্গে যাব।"
প্রণতি বললেন, "শোনো, আমি অত শিক্ষিত নই, কিন্তু আমি এটুকু বুঝি মানুষে মানুষে কোনও তফাত নেই।

কাউকে মেরে কোনও দিন কোনও পুণ্যিলাভ করা যায় না। সবসময় তুমি, তোমার দাদা আমাকে পায়ের তলায় রেখে দিয়েছ, আমাকে কোনও কিছু নিয়েই কিছু বলতে দাওনি। তোমরা যা যা বলেছ, আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি, কিন্তু এইবারে অনেক হল। যদি এরকম দিন আসে, যদি কখনও মনে হয় আমার ছেলের দিকে কেউ চোখ তুলেও তাকাবে, তখন কিন্তু আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না। এই কথাটা তুমি আর তোমার দাদা মনে রেখে দিয়ো। ছোটো থেকে ছেলেটা জেঠুর বকা খেয়ে খেয়ে মানুষ। অত বড়ো চাকরি পেল বাইরে যাবার, যেতে দিল না। কই নিজের মেয়ে জামাইকে তো বাধা দিল না? এইসব আমার চোখে পড়ে না ভেবেছ? কিন্তু আমি মুখ বুজে থাকি। এবার আর না। পিকলুর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। তাহলে আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না।"

জীবেন থমথমে মুখে বসে রইলেন।

২৯

সত্যেন ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলেন। পিকলু তাঁর রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

খাটে এসে জোরে জোরে শ্বাস নিলেন এবং ছাড়লেন। অতিরিক্ত টেনশনে এভাবেই নিজেকে সামলান তিনি। খাটে শুয়ে বালিশে হেলান দিলেন।

মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন কিছুক্ষণ।

প্রতিদিন ঘুমানোর আগে ফোন অফ করে ঘুমান তিনি। কী মনে হতে নির্মলকে ফোন করলেন। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরল না। নিজের মনে বললেন, "ঘুমিয়ে পড়েছে নির্ঘাত।"

বহুদিন সব নেশা ছেড়েছেন। অনেকদিন পরে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছিল।

বেশ খানিকটা গরম লাগছে। সত্যেন এসি চালালেন। জানলা খোলা ছিল। বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ একটা হার্টবিট মিস হল।

তাঁর মনে হল জানলার ওপাশে শম্ভু এবং মিঠুন দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

সত্যেন জানলা বন্ধ করলেন। বুঝতে পারলেন সবটাই তাঁর দুর্বল মনের কল্পনা। বজ্রাসনে বসলেন। মনটাকে এক জায়গায় আনার চেষ্টা করলেন।

খুব ভালো করে জানেন সত্যেন সান্যাল, দুর্বল মন কঠিন কোনও কাজের ক্ষেত্রে সবথেকে বড়ো অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়।

খাটের পাশের টেবিলের ওপর একটা কাগজ রাখা। সত্যেনের এতক্ষণ চোখে পড়েনি। তিনি কাগজটা নিয়ে দেখলেন তার ওপর গোটা গোটা হাতের লেখায় একটা কবিতা লেখা,

দীন দান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদিল রাজভৃত্য, "মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম উপবনে

উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।“

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
‘হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে? '

‘সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু ।

রাজা কহে রোষে,
‘দেব নাই! হে সন্ন্যাসী , নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন 'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?'

‘শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ’”

কবিতাটা এতখানি লেখা। রাজদম্ভে পূর্ণ লেখাটার নিচে আন্ডারলাইন করা।

সত্যেন বিড়বিড় করে বললেন, “কত সাহস হয়েছে এদের! এত বাড় বেড়েছে? দেখছি সবকটাকে কাল। দেখে নিচ্ছি।”

কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেঝেতে ফেলে দিলেন। গ্লাসে জল রাখা ছিল টেবিলে। গোটা গ্লাসের জলটা এক ঢোকে খেয়ে নিলেন।

কী মনে হতে ফোনটা বের করে আবার নির্মলবাবুকে ফোন করলেন। কেউ ফোন ধরল না। সত্যেন বিরক্ত হয়ে থানার ল্যান্ডলাইনে ফোন করলেন। কেউ একজন ফোন ধরল, সত্যেন বললেন, “বড়োবাবুকে দিন তো। জরুরি দরকার আছে।”

ওপাশ থেকে উত্তর এল, “উনি বাড়িতে গেছেন। সকালে আসবেন আবার। কে বলছেন আপনি?”

“সত্যেন সান্যাল।”

“ওহ, স্যার আমি ধীরেন বলছি, এই থানার মেজোবাবু, কোনও সমস্যা হয়েছে?”

“না, না, ঠিক আছে।”

“স্যার কাল আসছি আমরা সবাই মিলে আপনার বাড়িতে।”

“হ্যাঁ অবশ্যই। তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। কাল জেলা সভাপতিও আসবেন, জানেন তো?”

“হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, রাখছি।”

ফোনটা কেটে সত্যেন চোখ বোজার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

ওষুধের বাক্সের মধ্যে একটা ঘুমের ওষুধের পাতা ছিল। সত্যেন বাক্স বের করে দেখলেন ওষুধের পাতাটা খালি।

এসি ঘরের তাপমাত্রা দ্রুত কমিয়ে দিচ্ছে, তবু সত্যেন বুঝতে পারছেন কপাল, পিঠ সব ঘেমে যাচ্ছে।

ঘড়িতে একটা বাজে। ভোরে উঠতে হবে তাঁকে।

ফোনটা বন্ধ না করে খাটের ওপর রেখে শুতে যাবেন এমন সময় দেখলেন আবার ফোন আসছে।

দেখলেন থানা থেকে ফোন। ধরলেন, “বলুন।”
“সর্বনাশ হয়েছে স্যার।”
ওপাশ থেকে মেজোবাবুর উত্তেজিত গলা।
সত্যেন ফোনটা ধরে বসে রইলেন।

৩০

ভোর পাঁচটা। এমনিতেই রাতে ঘুম হয়নি। ঘড়িতে পাঁচটা দেখে জীবেন উঠে সত্যেনের ঘরের সামনে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বৈঠকখানায় বসলেন।

সত্যেন প্রতিদিন পাঁচটাতে বেরিয়ে যান। জীবেন দশ মিনিট অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন সত্যেন বেরোননি, তখন সত্যেনের ঘরের দরজায় নক করলেন।

সত্যেনের দরজা খুলতে যত দেরি হচ্ছিল, জীবেনের হার্টবিট তত বেড়ে যাচ্ছিল।

পাঁচটা পনেরো নাগাদ সত্যেন দরজা খুললেন। জীবেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি রে, কী হল?”

জীবেন সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেনের চোখ লাল হয়ে আছে। একটু থমকে বললেন, “তুই হাঁটতে যাবি না?”

সত্যেন বললেন, “কাল সেই দুটোর সময় ঘুমোতে পেরেছি কোনও মতে, আজ আর বেরোব না। তুই ভিতরে আয়।”

জীবেন সত্যেনের ঘরের ভিতর ঢুকে অবাক হলেন। এতটা অবিন্যস্ত সত্যেনের ঘর কখনোই থাকে না। সত্যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করেন। তার পরিবর্তে মেঝেতে কাগজ ছিঁড়ে পড়ে আছে। জীবেন বললেন, “এগুলো কীসের কাগজ? ছিঁড়ে মেঝেতে ফেলেছিস কেন?”

সত্যেন বললেন, “কোনও এক হারামজাদা আমার সঙ্গে কবিতা কবিতা খেলছে। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা কাগজে লিখে রেখে গেছে টেবিলে।”

জীবেন অবাক হয়ে বললেন, “এই ঘরে রেখে গেছে? এত স্পর্ধা?”

সত্যেন মাথা নাড়লেন, “তাই তো দেখছি, অনেকগুলো পাখা গজিয়েছে। সময়মতো সেগুলো ছাঁটতে না পারলে সান্যাল বংশের ঘোর অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা। আর সেটা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না।”

জীবেন বললেন, “কাল তোর ঘুমোতে অত রাত হল কেন? পিকলুর জন্য?”

সত্যেন বললেন, “না, পিকলু দুদিনের ছোঁড়া, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, ওকে নিয়ে আমি রাতের ঘুম নষ্ট করব এত খারাপ সময় এসেছে নাকি আমার?”

জীবেন বললেন, “তবে?”

সত্যেন বললেন, “নির্মলবাবুর বাড়িতে শম্ভুর বউয়ের লাশ পাওয়া গেছে। নির্মলকে সম্ভবত মারতে গেছিল। নির্মলের মাথায় বেশ জোরে কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। ব্লিডিং হয়েছে। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।”

জীবেন চমকে গিয়ে বললেন, “সে কী! বাঁচবে তো?”

সত্যেন বললেন, “বাঁচা মরাটা তো বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে নির্মলের পরিবর্তে থানায় নতুন কে আসছে সেটা বুঝতে হবে। এই সময় নির্মলকে দরকার ছিল আমাদের। একেবারে পোষা কুকুর হয়ে গেছিল। যা করতে বলতাম তাই করত।”

জীবেন একটু ইতস্তত করে বললেন, “দাদা একটা কথা আছে।”

সত্যেন বললেন, “বল।”

জীবেন বললেন, “কাল আমাকে পিকলু জানাল ও মিঠুনের মার্ডারের ব্যাপারটা পুলিশের ওপরমহলে জানিয়েছে। সম্ভবত নতুন করে ইনভেস্টিগেশন হতে পারে।”

জীবেন কথাটা বলে মাথা নিচু করলেন।
সত্যেন বললেন, “কীরকম ওপরমহল?”
জীবেন মাথা নাড়লেন, “সেটা তো আমাকে কিছু বলেনি।”
সত্যেন বললেন, “আজ কতজন লোকের খাবার কথা বাড়িতে?”
জীবেন বললেন, “অন্তত এগারোশো। বেশিও হতে পারে। খিচুড়ি ভোগের কাজ পুকুরের পাশের মাঠে শুরুও হয়ে গেছে কাল থেকেই।”
সত্যেন বললেন, “এবারে কতজন গরিবকে জামা আর শাড়ি দেওয়া হচ্ছে?”
জীবেন বললেন, “দুশোর ওপরে।”
সত্যেন বললেন, “এগুলো পুণ্য নয়? মানুষের ভালো করা নয়? গ্রামের রতন তাঁতির ছেলের টিউমার অপারেশনে গত বছর আমি একা এক লাখেরও বেশি টাকা দিয়েছিলাম। এগুলো পুণ্য নয়? মানুষের জন্য করা নয়?”
জীবেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।
সত্যেন বললেন, “নিজেদের হাতে মানুষ করা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলো যখন কথা শিখে বড়ো বড়ো কথা বলে তখন কেমন লাগে? মনে হয় না, আমাদের এত কিছু যাদের জন্য করা সেটাই আসলে ব্যর্থ হল?”
জীবেন বললেন, “তুই... তুই চিন্তা করিস না, আমরা সব আছি তো। কেউ কিছু করতে পারবে না এই কেসে।”
সত্যেন বললেন, “একটা ইয়ে ছেলে, উলটোপালটা বুঝিয়ে আমাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করবে আর আমি হাতে চুড়ি পরে বসে থাকব, কিচ্ছু করব না? এটা সম্ভব?”
জীবেন বুঝলেন সত্যেন ভীষণ রেগে যাচ্ছেন, তিনি বললেন, “নিজেকে সামলা, আমি দেখছি, পিকলুর সঙ্গে কথা বলি, ও উঠুক।”
সত্যেন গুম হয়ে বসে থাকলেন। জীবেন সত্যেনের ঘর থেকে বেরলেন।

৩১

সকাল সাড়ে সাতটা। অঞ্জলি শুরু হয়ে যাবে একটু পরেই। প্রণতি, রিংকুরা ঠাকুর দালানে জড়ো হয়েছে। গ্রামের অনেক মহিলাই এসে বসেছেন। সত্যেন আজ বেশি সক্রিয় নন। গম্ভীর মুখে বসে আছেন একটা চেয়ার নিয়ে। দীপককে দূরে বসে থাকতে দেখেও অন্যান্যবারের মতো পাশে ডেকে আনেননি। জীবেন পুজোর দিকটা দেখছেন।
রিংকু তনয়াকে জিজ্ঞেস করল, “পিকলু অঞ্জলি দেবে না?”
তনয়া বলল, “বলতে পারব না, এখনও তো ঘুমোচ্ছে।”
রিংকু বলল, “যা ইচ্ছে করুক।”
তনয়া বলল, “তুমি আমাদের ব্যাপারটা কাউকে বলেছ দিদি?”
রিংকু যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন মুখ করে বলল, “কোন ব্যাপারটা?”
তনয়া বলল, “যেটা কাল বললাম।”
রিংকু বলল, “না না, আমার তো মনেও নেই ঠিক করে। কেন বল তো?”
তনয়া বলল, “এমনি। মনে হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।”
রিংকু বলল, “আমার একদম এসব লোকের কান ভাঙানো স্বভাব নেই। তুই জানিস না, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সব মেয়েদের সব গোপন কথা আমি জানি। কিন্তু কাউকে বলি না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।”

তনয়া হাসল, “আচ্ছা দিদি। না সেরকম কিছু না।”
রিংকু বলল, “তবে পিকলু আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। সেটা আশা করি তুইও বুঝতে পারছিস। কাল তো শুনলাম বাবার সঙ্গেও ওর কথা কাটাকাটি হয়েছে।”
তনয়া বলল, “এ বাবা, তাই নাকি? ওহ, আমার সঙ্গে তো ওর কোনও কথাও হয়নি কাল, এত কিছু করে এসেছে নাকি?”
রিংকু একটু উৎসাহিত হল “তা নয় তো কী, আচ্ছা ওর কি অফিসে কোনও প্রবলেম চলছে?”
তনয়া বলল, “জানি না তো এই ব্যাপারে কিছু। তুমি কিছু জানো?”
রিংকু বলল, “খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, সব জানিয়ে দেব তোকে। তুই শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগটা রাখবি। খবরদার পিকলু যেন এ ব্যাপারে না জানে। আর বাই দ্য ওয়ে, একটা জিনিস জানিস তো...”
তনয়া বলল, “কী?”
রিংকু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় একটা গাড়ি এসে সান্যালবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চারজন খাকি উর্দিধারী পুলিশ সোজাসুজি সদর দিয়ে ঠাকুরদালানে প্রবেশ করলেন। জীবেন এগিয়ে গেলেন, “কাউকে খুঁজছেন?”
রিংকু বলল, “কী ব্যাপার বল তো?”
তনয়া বলল, “বুঝতে পারছি না তো। থানা থেকে কেউ এসেছে হয়তো।”
রিংকু হাসল, “ওসব থানা-ফানা বাবার পকেটে থাকে।”
চারজন সত্যেনের কাছে এসে কিছু কথা বললেন। সত্যেন উঠলেন। চারজনকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।
জীবেন ঘামছিলেন। রিংকু উঠে জীবেনের কাছে গিয়ে বলল, “কী ব্যাপার কাকামণি? কী হয়েছে?”
জীবেন হাসার চেষ্টা করলেন, “ওই কয়েকজন পুলিশ এসেছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই, তোরা অঞ্জলির জন্য তৈরি হ।”
রিংকু ফিসফিস করে বলল, “হ্যাঁ, আমিও এতক্ষণ তনয়াকে তাই বলছিলাম জানো তো, এইসব পুলিশ-টুলিশ বাবার পকেটের ভিতর থাকে।”
জীবেন গলা নামিয়ে বললেন, “আস্তে কথা বল। পিকলুকে দেখেছিস?”
রিংকু বলল, “ঘুমোচ্ছে বলল তো তনয়া!”
জীবেন বললেন, “ঠিক আছে, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি, চিন্তা করিস না।”
রিংকু তনয়ার পাশে গিয়ে বসল। জীবেন বাড়ির ভিতর গিয়ে পিকলুর ঘরে প্রবেশ করলেন।
মশারির ভিতর পিকলু আর পিকলুর ছেলে ঘুমাচ্ছিল।
জীবেন পিকলুকে ঠেললেন, “শুনছিস?”
পিকলু উঠে বসল। বলল, “ওহ বাবা, কত দিন পরে তোমার মুখ দেখে উঠলাম বলো তো! দিনটা ভালো যাবে আজ। কটা বাজে?”
জীবেন বললেন, “আটটা বাজতে চলল।”
পিকলু অবাক হয়ে বলল, “আটটা বেজে গেছে! সে কী! এতক্ষণ তো সুদর্শনবাবুদের চলে আসার কথা ছিল! আসেননি?”
জীবেন বললেন, “সুদর্শনবাবু মানে? স্টেট লেভেল পুলিশের কেউ?”
পিকলু হাই তুলতে তুলতে বলল, “ঠিক ধরেছ। এসেছেন?”
জীবেন ঘামছিলেন, “এর পিছনে তোর হাত আছে, তাই না?”
পিকলু বলল, “আমার? কী যে বলো না, আমি একজন সাধাসিদে লোক। আমার আবার হাত কীসের?”
জীবেন রুমাল বের করে ঘাড় মাথার ঘাম মুছলেন।

পিকলু বলল, "চলো। জেঠুকে একা ছাড়া ঠিক না। আমি আর তুমিও জেঠুর ঘরে ঢুকি।"
জীবেন কড়া চোখে পিকলুর দিকে তাকালেন, "কাজটা তুই ভালো করলি না পিকলু। আজ অষ্টমীর মতো একটা দিনে বাড়িতে পুলিশ এল..."
পিকলু হাসতে হাসতে বলল, "শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ।"
জীবেন বুঝলেন না, হাঁ করে পিকলুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

৩২

"সত্যেনবাবু।"
"বলুন। ব্রেকফাস্ট দিতে বলব?"
"না না, আমাদের নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা একটা রুটিন প্রশ্নোত্তর করে চলে যাব।"
"বেশ বেশ। আপনারা বোধহয় জানেন, এই এলাকার নির্বাচিত মন্ত্রী আমার বেশ কাছের একজন..."
"না সত্যেনবাবু জানি না। আমাদের এত কিছু না জানলেও চলে। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে চাই।"
"বলুন। দাঁড়ান এসি-টা চালিয়ে নি।"
"শ্যাল উই স্টার্ট?"
"হুঁ। শুরু করুন।"
"পরশু দিন আপনার ফ্যামিলিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে।"
"হ্যাঁ। কী বলব আর। আমার নিজের ভাগনিজামাইকে গ্রামের কয়েকজন..."
"কয়েকজন বলে তো জানি না, দেখলাম মাত্র একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। সেও শুনলাম অ্যারেস্ট করার সময় নাকি গণপিটুনিতে মারা গেছে।"
"বুঝতেই পারছেন, আমার ভাগনিজামাই, গণরোষ। বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করেও বিফল হতে হল।"
"সত্যেনবাবু।"
"বলুন।"
"আপনাকে একটা খবর দি।"
"বলুন।"
"নির্মলবাবু কিছুক্ষণ আগে এক্সপায়ার করেছেন।"
"ভেরি স্যাড।"
"কেন এরকম একটা ঘটনা ঘটল, সে সম্পর্কে আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন?"
"না, আমি কাল রাতেও ওঁকে ফোন করেছিলাম। তখন ধরেননি। পরে থানার ল্যান্ডলাইনে ফোন করে জানতে পারি ঘটনাটা।"
"ওহ্। ফোন করেছিলেন ওঁকে? কত রাতে?"
"একটা।"
"রাত একটা? সে কী! অত রাতে? খুব দরকার ছিল?"
"না মানে সেরকম কিছু না। ঘুমোতে যাবার আগে মনে পড়েছিল বড়োবাবুকে বলা হয়নি আজকের জন্য। উনি তো প্রায় সারারাতই জেগে থাকেন, তাই ফোন করেছিলাম আর কি।"
"আচ্ছা। সান্যালবাবু।"
"বলুন।"
"আপনার ফ্যামিলির মনে হয় পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল, তাই না?"
"হ্যাঁ।"

"দাঙ্গায় আপনাদের ফ্যামিলির কারও কিছু..."
"নিজের মাকে..."
"ওহ্, এখন যিনি আছেন?"
"সৎমা।"
"ওহ্, এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট।"
"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"
"এমনি, বেসিক কৌতূহল আর কি!"
"আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"
"বলুন।"
"আপনাদের এখানে কে আসতে বলেছে?"
"সেটার উত্তর আমরা দিতে পারব না সান্যালবাবু। আপনি বরং চেষ্টা করুন আমাদের প্রশ্নগুলোর যথাসম্ভব ঠিক উত্তর দিতে।"
"আমি তো আশা করি সব উত্তরই দিয়েছি।"
"চন্দ্রিমা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।"
"নিশ্চয়ই। উপরের ঘরে আছে ও। তবে ওর সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভালো। ওর মেন্টাল স্টেট খুব খারাপ।"
চারজন উঠে দাঁড়ালেন। "ওকে মিস্টার সান্যাল। আপনি যখন বারণ করছেন তবে পরেই কথা বলা যাবে। থ্যাংকু ফর কো-অপারেটিং আস। আমরা এখন বেরোচ্ছি। পরে আবার দরকার হলে আসব।"
সত্যেনের দরজা ভেজানো ছিল। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে দরজাটায় নকের শব্দ পাওয়া গেল। চারজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।
একজন বললেন, "আপনি বসুন সত্যেনবাবু। আমি দেখছি।"
দরজাটা খোলা হল। দরজার ওপাশে চন্দ্রিমাকে নিয়ে প্রণতি দাঁড়িয়ে আছেন।
সত্যেন ঘরের ভিতর থেকেই রাগি গলায় বললেন, "তোমরা এখানে কেন?"
চন্দ্রিমা দৃঢ় পায়ে ঘরের ভিতর এসে বসল। বলল, "আপনারা কি লোকাল থানা থেকে আসছেন?"
"আজ্ঞে না। আমরা একটু দূর থেকে আসছি।"
সত্যেন প্রণতিকে বললেন, "ওকে নিয়ে যাও না। ও তো অসুস্থ।"
প্রণতি ঘরের মধ্যে ঢুকে গম্ভীর মুখে বসলেন। বললেন, "একটুও অসুস্থ নেই। জ্বর নেই, বমি ভাবটা নেই। মিষ্টি এক্কেবারে সেরে গেছে।"
একজন ইন্সপেক্টর বললেন, "ওঁকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"
চন্দ্রিমা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ওঁর বোনের মেয়ে। আমার হাজব্যান্ডকেই উনি লোক দিয়ে খুন করিয়েছিলেন।"

৩৩

ঠাকুরদালান ভর্তি গ্রামের লোক। সবার সামনে দিয়ে সত্যেন পুলিশের গাড়িতে গিয়ে বসলেন।
পুজোর ঢাক শুধু অনবরত বেজে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলি শুরু হবে।
গাড়িটা বেরিয়ে যেতে সংবিৎ ফিরল রিংকুর। জীবেন একপাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
রিংকু দৌড়ে গিয়ে বলল, "কী হল কাকামণি, বাবাকে নিয়ে কোথায় গেল ওরা?"
জীবেন রিংকুকে বললেন, "কিছু প্রশ্ন করার আছে, সেজন্যই নিয়ে গেল। দেখ, বিকেলের মধ্যেই দিয়ে যাবে

হয়তো।”
রিংকু অবুঝের মতো বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো বাড়িতেই করা যেত? সভাপতিকে ফোন করো না, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। বাবাকে পুজোর দিন বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেল! এত বড়ো সাহস ওরা পায় কী করে!?”
জীবেন বাকিদের দিকে তাকালেন। সবাই তাঁদের দেখছে। বললেন, “তোরা অঞ্জলিটা দে। দাদা বলে গেছে যেন কোনও কিছু না আটকায়।”
জীবেন বৈঠকখানার দিকে রওনা হলেন, রিংকু জীবেনের পিছন পিছন এল, “ওরা কি বাবাকে অ্যারেস্ট করেছে?”
জীবেন রিংকুকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন, “না না, সেসব কিছু না।”
বৈঠকখানায় কল্যাণ, সোমা চন্দ্রিমাকে নিয়ে বসে আছেন। পিকলুও আছে।
ঘরে ঢুকেই রিংকুর তাদের দেখে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, বলল, “এক বাড়িতে থেকে নিজের থেকে পরের জন্য দরদ বেশি, তাই না? এইজন্য বলে সৎ বোন কখনও আপন হয় না।”
সোমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসেছিলেন। রিংকুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। পিকলু জীবেনকে বলল, “দিদিকে বাইরে নিয়ে যাও। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”
জীবেন সোফায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। চন্দ্রিমা বলল, “রিংকুদি, আপন হয় না বলেই আমার বরটাকে মেরে দিল মামা, বলো?”
জোঁকের মুখে যেন কেউ নুন দিল। রিংকু চন্দ্রিমার দিকে তাকাতে পারল না। একপ্রকার পালিয়ে গেল ঘর থেকে।
পিকলু বলল, “ক্যাপ্টেনের উইকেট পড়ে গেছে বাবা। তুমি তো আবার নাইট ওয়াচম্যান। বলা যায় না, উইকেটে থাকবে, না যখনতখন আউট হয়ে যাবে।”
জীবেন পিকলুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “তুই অঞ্জলি দিবি না?”
পিকলু বলল, “দেব, অবশ্যই দেব। রাজদম্ভ দূর হয়েছে। দেবীপক্ষ শুরু হল আজ থেকে। আজ দেব না তো আর কবে দেব?”
জীবেন পিকলুর দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বললেন, “মা অবশ্যই আছেন, তিনিই দাদাকে রক্ষা করবেন।”
পিকলু জীবেনের চোখে চোখ রেখে বলল, “যারা ধর্মের নামে মানুষে মানুষে হানাহানি বোঝে, যারা ধর্ম বলতে শুধুই হিংসা বোঝে, তাদের জন্য মা কোনও দিনও ছিলেন না বাবা। থাকবেনও না। অসুর কোনও কালেই দেবতা হতে পারেনি। পারবেও না। তোমরা ভেবে এসেছ ক্ষমতা আছে মানে যা ইচ্ছা তাই করবে, আইনকানুন সব পকেটে রেখে দেবে! সব এত সহজ? এত? তোমরা হয়তো জানো না, পুলিশে শুধু নির্মল চৌধুরীরা নেই। আরও অনেকে আছে। এবারে জানবে।”
জীবেন মাথা নিচু করলেন। ছেলের চোখে চোখ রেখে তাকানোর ক্ষমতা আর নেই তাঁর।
পিকলু বলল, “চিরকাল ভেবে এসেছ সব বড়ো বড়ো লোকেদের সঙ্গে তোমাদেরই আনাগোনা, তাই না? একটা ছোট্ট ইনফো দিয়ে দি। পিসেমশাইয়ের বন্ধুই সুদর্শনবাবু। মাংসটা এতক্ষণ নুন ছাড়া রান্না হচ্ছিল বলো? এবার একটু মশলা পড়ল। ভেবো না বাবা, তুমিও রেহাই পাবে না।”
জীবেন কল্যাণের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। কল্যাণ চুপ করে রইলেন।
প্রতিবারের মতোই।
#
রিংকু ঠাকুরদালানে এসে দেখল গ্রামের মেয়ে বউরা সবাই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।
দীপক চুপচাপ এক কোণে বসে আছে। তার সব রাগ পড়ল গিয়ে দীপকের ওপর। থমথমে মুখে দীপককে বলল, “এদিকে এসো।”

দীপক রিংকুর কথা যেন শোনেনি এমন মুখ করে বসে রইল।
রিংকুর ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ চেপে থাকা রাগটার বিস্ফোরণ ঘটল, সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই তোমাকে ডাকছি না আমি? শুনতে পাচ্ছ না?"
সবাই রিংকুর দিকে তাকাল।
দীপক উঠল। রিংকুর সামনে এসে দাঁড়াল, রিংকু বলল, "কী হল? না চ্যাঁচালে শুনতে পাও না, না?"
দীপক বলল, "আমি বাড়ি যাব আজ। এখন বেরোব। তুমি কী করবে ঠিক করে নাও।"
রিংকু বলল, "বাড়ি যাবে মানেটা কী? এত বড়ো ঘটনা ঘটে গেল বাড়িতে আর তুমি বাড়ি যাবে?"
দীপক চোয়াল শক্ত করল, "হ্যাঁ। একজন খুনির বাড়িতে থাকার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।"
রিংকু দীপকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সে ভাবতেই পারেনি দীপক এই কথাটা বলতে পারে।
দীপক বলল, "আর-একটা কথা, ভবিষ্যতে এই বাড়ির সঙ্গে যদি তোমার কোনও সম্পর্ক থাকে, তাহলে এই বাড়ির সঙ্গেই রেখো, আমার কাছে আসার কথা ভেবো না। এখন নটা কুড়ি বাজে, দশটার মধ্যে আমি বেরোব। তুমি ঠিক করে নাও, তুমি কী করবে, থাকবে, না যাবে।"
রিংকু ঠাকুরদালানের মেঝেতে বসে পড়ল। দীপক হনহন করে নিজেদের ঘরে রওনা দিল।

৩৪

সান্যালবাড়ির বাইরে দেবু গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এতক্ষণ ছিল না। এসে খবরটা শুনে মুষড়ে পড়েছে।
জীবেনের বাড়ির ভিতর ভালো লাগছিল না। বাইরে বেরিয়েছিলেন। দেবুকে দেখে ডাকলেন, "তুই কোথায় ছিলি?"
দেবু বলল, "বাবু তো আমাকে থানায় পাঠিয়েছিলেন।"
জীবেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর পাঠিয়ে কী হবে? খেলা তো শেষ।"
দেবু বললেন, "কেন শেষ হবে বাবু? কোর্টে কত খেলা বাকি জানেন? আসল খেলাই তো কোর্টে। প্রমাণই করতে পারবে না কেউ।"
বাড়ির ভিতরে নিতান্ত নিয়মরক্ষার মতো অঞ্জলি হচ্ছে। দেবুর কথাটা জীবেন শুনলেও আমল দিলেন না। বললেন, "অনেক লোক আসবে। থাকিস। আমি আজকে হয়তো বেশি তদারকি করতে পারব না।"
দেবু কিছু বলল না। জীবেন বাড়ির ভিতরে এলেন। দীপক ব্যাগ নিয়ে বসে আছে গম্ভীর মুখে। কিছুক্ষণ পরেই ওরা বেরিয়ে যাবে। পিকলুকে ঠাকুরদালানে দেখতে না পেয়ে পিকলুর ঘরে গেলেন। পিকলু মন দিয়ে পুরোনো খবরের কাগজ পড়ছে। তাঁকে দেখে বলল, "আবার কোনও হুমকি দিতে এলে বাবা?"
জীবেন কথা বললেন না, চুপ করে খাটে এসে বসলেন।
পিকলু কাগজে মুখ রেখে নির্লিপ্ত গলায় বলল, "আমাকে কিছু বলে লাভ নেই বোধহয়। পিসেমশাইও যথেষ্ট শক্ত মানুষ। পোষা গুন্ডাগুলোকে লেলিয়ে দিয়ে বড়োজোর খুন করাতে পারো। কিন্তু তাতে জেঠু আরও বেশি ফাঁসবে মনে রেখো।"
জীবেন বললেন, "আমি কি তোর কাছে একটু বসতেও পারি না?"
পিকলু অবাক হয়ে জীবেনের দিকে তাকাল। বলল, "তোমার শরীর-টরীর ঠিক আছে তো? নাকি জেঠু নেই বলে মস্তিষ্কহীন হয়ে পড়েছ?"
জীবেন রাগ করলেন না। বললেন, "ছোটোবেলা থেকে মা না থাকার যন্ত্রণা সবাই বোঝে না পিকলু। একটা সময় ছিল যখন দাদা নিজের হাতে আমাকে খাইয়েও দিয়েছে। তুই আমাকে এসব বলে রাগাতে পারবি না।"
পিকলু বলল, "তোমাকে রাগানোর কোনও ইচ্ছা আমার কোনও কালেই ছিল না বাবা। তবে মেরুদণ্ডহীন

একটা লোককে বাবা বলে ডাকতে খুব কষ্ট হয় আজকাল। ধর্মের নামে যারা একটা তরতাজা যুবককে খুন পর্যন্ত করতে পারে, তারা সব কিছু পারে।”

জীবেন বললেন, “তোকে সব কিছু বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব না। তোরা চোখে ঠুলি পরে বসে আছিস।”

পিকলু বলল, “বেশ করেছি ঠুলি পরে বসে আছি। যাদের মেয়ে তার চিন্তা নেই, মামাদের ঘুম নেই! সত্যেন সান্যালের মেয়ে মিষ্টি? তার বাপের কী ছিল? যে মেয়ের বাপ মা মেনে নিয়েছে জামাইকে, তোমাদের কী সমস্যা ছিল, বলতে পারবে?!”

জীবেন পিকলুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “প্ল্যানটা মেরে ফেলার ছিল না প্রথমে।”

পিকলু অবাক হয়ে বলল, “তবে?”

জীবেন বললেন, “প্রথমে ঠিক ছিল মিষ্টি এখানে এলে ওকে বোঝানো হবে। মিঠুনের সেদিনই কলকাতা ফিরে যাবার কথা ছিল। মিষ্টিকে এখানেই আটকে রেখে ওকে আর কলকাতা যেতে না দেওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু দাদা ওকে আর মিঠুনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিল। তারপরে আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি।”

পিকলু একটু গুছিয়ে বসে বলল, “ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে থাকলে সমস্যাগুলো ঠিক কোথায় বাবা? ধরো, আমি আর তনয়া এই ঘরে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আছি, তুমি ভুল করে দরজা খুলে দেখে ফেলেছ। তুমি কি আমাদের খুন করতে বলে দেবে? নাকি ছেলেটা মিঠুন ছিল বলেই তোমাদের যত সমস্যা?”

জীবেন বললেন, “আমার তোকে বোঝানোর ক্ষমতা নেই। তুই কাগজ পড়। আমি চুপচাপ বসে থাকি। বাড়ির যেখানে যাচ্ছি, লোকের প্রশ্নবাণ আমি আর নিতে পারছি না। আমাকে একটু বসে থাকতে দে দয়া করে।”

পিকলু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাগজে মন দিল। জীবেন চুপচাপ বসে থাকলেন।

দীপক এসে জীবেনকে দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পিকলু বলল, “এসো এসো, বাবা এখন স্লিপ মোডে আছে, তোমার চিন্তা নেই।”

দীপক ঘরের ভিতর ঢুকে বলল, “আমরা বেরোব একটু পরে।”

পিকলু অবাক হয়ে বলল, “সে কী! বাড়িতে পুজো হচ্ছে আর তুমি বাড়ির লক্ষ্মীকে নিয়ে চলে যাবে? ইয়ার্কি নাকি?”

দীপক জীবেনের দিকে একবার তাকিয়ে পিকলুর দিকে তাকাল, “রিংকু থাকলে এখানে সমস্যা বাড়বে পিকলু। ও বারবার মিষ্টিকে আঘাত করতে পারে, যেটা এই সময় অভিপ্রেত নয়।”

পিকলু দীপকের কথায় আমল না দিয়ে বলল, “গতবার আমি পাঁপড় খাইয়েছিলাম, এবার তোমার পালা ছিল। পালিয়ে গেলে হবে ভাই?”

জীবেন উঠছিলেন। পিকলু বলল, “বসো বাবা। অনেক কথা আছে। পুজোটা তো আমাদেরই সামলাতে হবে। মা এসেছেন বাড়িতে, তাঁর যেন কোনওরকম অনাদর না হয়। দ্য শো মাস্ট গো অন।”

জীবেন পিকলুর কথা শুনে ছেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

৩৫

দশটা নাগাদ গাড়িটা যশোর রোডে উঠল। একজন সত্যেনকে বললেন, “কিছু খাবেন?”

সত্যেন গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন, বললেন, “না, আমার খিদে নেই। আপনাদের নামগুলো আমাকে দেবেন। আমি ওপরমহলে কথা বলব।”

জিপের পিছনের সিটে সত্যেনের দুপাশে যে দুজন বসে ছিলেন তাঁরা হাসলেন, সত্যেনের ডানদিকের জন বললেন, “কী ব্যাপারে কথা বলবেন? আমাদের প্রোমোশনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই?”

সত্যেন চুপ করে গেলেন। ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, “আমার নাম সুদর্শন রায়, আপনার ডানদিকে যিনি বসে আছেন তিনি রাতুল মিত্র, বাঁদিকে মাসুদ হক, ড্রাইভারের নাম আর বললাম না। ওর প্রোমোশন না হলেও চলবে বোধহয়।”

সত্যেন বললেন, “আপনারা জানেন না, আপনারা কত বড়ো ভুল করছেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়িতে জেলা সভাপতি আসবেন।”

সুদর্শনবাবু ড্রাইভারকে বললেন, “গাড়িটা দাঁড় করাও।”

গাড়িটা রাস্তার পাশে সাইড করল ড্রাইভার। সুদর্শন বললেন, “বলুন সত্যেনবাবু, অনেকক্ষণ ধরে আপনি বলে যাচ্ছেন আমরা ভুল করেছি। বলুন, কী কী ভুল করেছি।”

সত্যেন রাগি গলায় বললেন, “যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, নিয়ে চলুন। ফালতু কথাবার্তা আমার একেবারে ভালো লাগছে না।”

সুদর্শন বললেন, “আপনার জন্য দুটো খবর আছে সত্যেনবাবু।”

সত্যেন বললেন, “কে খবর দিল? কোনও ফোন এল না তো?”

সুদর্শন হাসলেন, “খবরটা একটু দূরে এসেই বলব ভেবেছিলাম।”

সত্যেন বললেন, “বলুন। যা বলার বলুন।”

সুদর্শন বললেন, “এক নম্বর খবর, মিঠুনকে লোক দিয়ে খুন করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনি জানতেন না, যাকে আপনি খুন করাচ্ছেন, তার বীজ চন্দ্রিমার শরীরে বপন করা হয়ে গেছে। ইয়েস স্যার, শি ইজ প্রেগন্যান্ট। তাই আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মিঠুনকে শেষ পর্যন্ত মারতে পারলেন না। কপাল কত ভালো বলুন তো মেয়েটির, আপনাকে সুখবরটা আগে দেয়নি। দিলে হয়তো মেয়েটিকেও আর আপনি ইহজগতে বাঁচিয়ে রাখতেন না।”

সত্যেন কড়া চোখে সুদর্শনের দিকে তাকালেন, “আর দু নম্বর খবর?”

সুদর্শন বললেন, “আমরা আপনাকে কলকাতা অবধি নিয়ে যাচ্ছি না।”

সত্যেন বললেন, “মানে?”

সুদর্শন বললেন, “পোয়েটিক জাস্টিস মানে কাকে বলে জানেন?”

সত্যেন কড়া গলায় বললেন, “যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।”

সুদর্শন বললেন, “সত্যেন সান্যাল। ইনফ্লুয়েনশিয়াল পলিটিশিয়ান। মাকে হারিয়েছেন দাঙ্গায়। দাঙ্গার দগদগে ঘা মেটার নয়। এই অবস্থায় মানুষ দুরকম ভাবে রিঅ্যাক্ট করে। এক, মানুষ দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে, এবং এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে সারাজীবন ধরে। দুই, মানুষটা সামান্য কিছু এদিক ওদিক দেখলেই নিজের রেফারেন্স টেনে আনে এবং তার মাথায় আর অন্য কোনও কিছুই চলে না। সে এতটাই ভায়োলেন্ট হয়ে যায় যে চরমতম অপরাধ করতেও সে দ্বিধাবোধ করে না।”

সত্যেন বললেন, “কী বলতে চাইছেন আপনি?”

সুদর্শন বললেন, “ফ্যাক্ট নম্বর ওয়ান, মিষ্টি যেমন আপনার ভাগনি, তেমনি আমারও ভাইঝি। হ্যাঁ, রক্তের সম্পর্ক নেই হয়তো। কিন্তু সেটা ম্যাটার করে না। একজোড়া মানুষ ভালোবেসেছিল সেটাই ম্যাটার করেছিল সেদিন। ওদের বিয়েটা আমিই দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছিলাম মিস্টার সান্যাল। ফ্যাক্ট নাম্বার টু, মর্গে মিঠুনের পাশের ট্রে-টা খালি আছে।”

সত্যেন অবাক হয়ে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সুদর্শন বললেন, “কী আশ্চর্য বলুন, হিন্দু মুসলিম শিখ বৌদ্ধ খ্রিস্টান, মর্গে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। মৃতরা দাঙ্গাও করতে পারে না।”

সত্যেন দরদর করে ঘামছিলেন।

সুদর্শন বললেন, “ঘুমের ওষুধ দেব সত্যেনবাবু? এফেক্টিভ। চিন্তা করবেন না, আপনার মৃত্যু হবার আগে অবধি আমরা আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব না। কিংবা আপনার কোনও অল্টারনেটিভ ওয়ে জানা আছে?”

সত্যেন একটু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, “আমার মার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারলে ভালো হত।”

সুদর্শন বললেন, “সৎমা তো। ভদ্রমহিলাকে ঘরের এক কোণে ফেলে রেখে দিয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনি খেতেও দেন না ভালো করে। আর আমাদের দয়া করে এসব সেন্টিমেন্ট দেবেন না। বুঝতেই পারছেন, আমাদের হৃদযন্ত্রে রস কষ তেমন নেই।”

সত্যেন বললেন, “পুজোর দিনে... আপনারা এটা করতে পারবেন?”

সুদর্শন হাসলেন, “পরশু ষষ্ঠী ছিল সত্যেনবাবু। আপনি করতে পেরেছিলেন যখন, আমরাও নাহয় কষ্টেসৃষ্টে করে নেব!”

সত্যেন মাথা নিচু করে জিপের মধ্যে বসে রইলেন।

সুদর্শন একটা সিগারেট ধরালেন।

দূর থেকে কোথাও একটা ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে।

সুদর্শন মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

পুজোর সময় ঢাকের আওয়াজ শুনলে মনে হয় স্বর্গ পৃথিবীতেই নেমে এসেছে...